
Boighar.com
বইঘর নিবেদন
মাসুদ রানা
নীল রক্ত
কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন
সেবা প্রকাশনী
বইঘর
বইঘর

বইঘর নিবেদন

মাসুদ রানা

নীল রক্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগীঃ কাজী মায়মুর হোসেন

ডক্টর লাবনী আলমকে ডুবন্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার করেই মহা ঝামেলায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল মাসুদ রানা। কিংবদন্তীর সেই আটলাণ্টিসের মহামূল্যবান এক আর্টিফ্যাক্ট ক্রয় করতে ইরানে গেল ওরা। ভুলেও ভাবেনি, কবর-লুঠেরা আরাশ খানসারি টাকা তো নেবেই, খুনও করতে চাইবে ওদের। মরতে আপত্তি আছে বলে প্রাণপণে লড়ল ওরা। ইরান থেকে ফিরেই ব্রাযিল, গাল্ফ্ অভ কেডিয, তিব্বত। জটিল রহস্যের সব গিঁঠ যখন খুলল, রানা চিনল আসল শত্রুটা কে। পৃথিবীর পঁচাশি ভাগ— অর্থাৎ, সাড়ে পাঁচ শ' কোটি মানুষের মৃত্যু ঠেকাতে ঝাঁপ দিতে হলো ওকে মৃত্যুর মুখে। রেইভেন্সফিওর্ডের উপকূলে ভয়ঙ্কর ভাইরাস বহনকারী বিমানে উঠেই রানা বুঝল: পড়েছে উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী বেলাল
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ৪৪৬

নীল রক্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ISBN 984-16-7446-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
websites: facebook.com/sebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

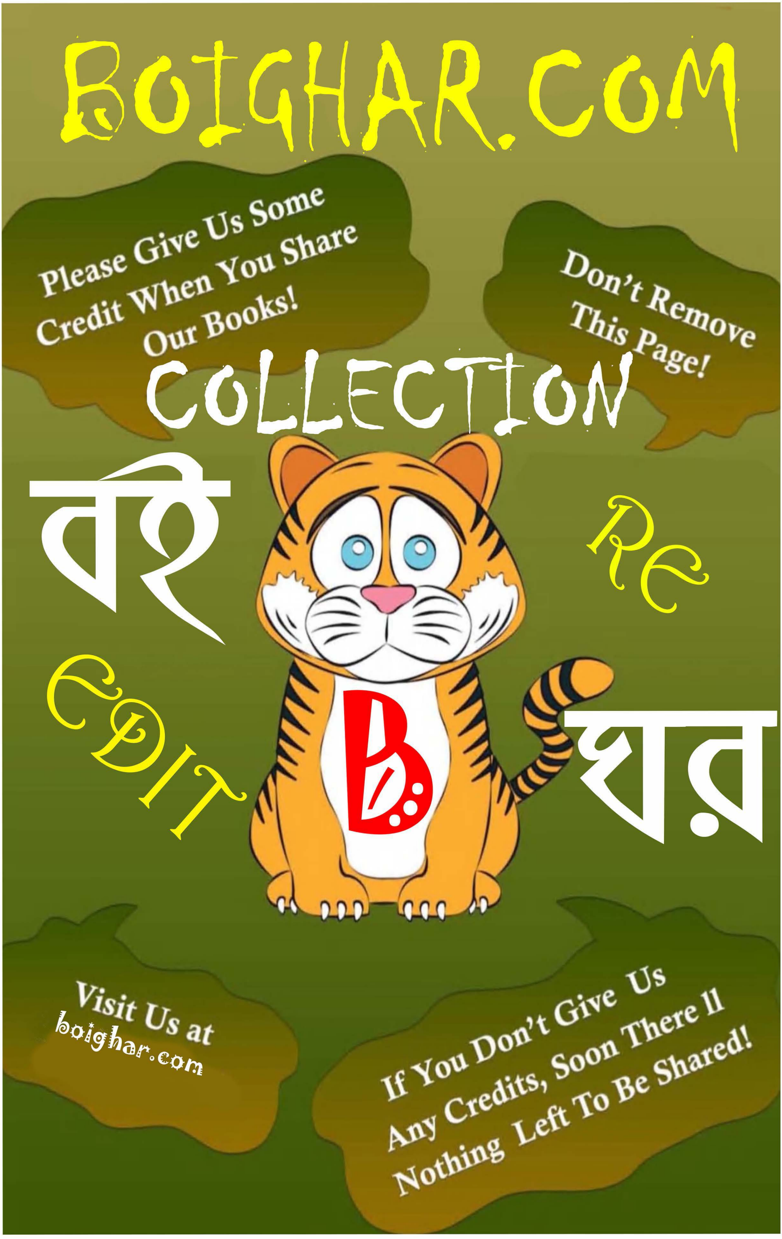
Masud Rana-446
NEEL RAKTO
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

একশ' ছিয়াশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।


BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
COLLECTION
বই
RE
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২◆◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্ণরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা ১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সংকেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা ১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সংকেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর ১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী ১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ ১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি- ◆ কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত

যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-৯৯ ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সংকেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ কুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

—লেখক

এক

দুর্গম, জনবিরল, পাহাড়ি অঞ্চল তিব্বত।

হিমালয়ের প্রকাণ্ড সব আকাশছোঁয়া চূড়া বেয়ে সঠিক সময়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসবে ভোরের নিষ্পাপ সূর্য। কিন্তু আপাতত কালো কালিতে ডুবে আছে ধবল তুষারের উপত্যকা।

গভীর রাতে জেগে গেছেন ডক্টর ফেরদৌস আলম। আজ তাঁর খুবই খুশির দিন। ভোরের পুরো দু'ঘণ্টা আগেই কনকনে শীতের ভেতর বেরিয়ে এসেছেন স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে। তখন থেকে অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণ পর সোনারঙে পর্বত রাঙিয়ে দেবে রবি মামা।

অতীত-স্মৃতি ঘাঁটছেন ডক্টর আলম। সেই ছোটবেলায় বুক ভরা যে স্বপ্ন দেখতেন, ওটা জেঁকে বসেছিল মনে। সাধারণ মানুষ বলবে অবসেশন। তাঁকে মানসিক রোগীও ভাবতে পারে। বাস্তবে, এসব কম বলেনি লোকে। অ্যাকাডেমিক জগতে সহ্য করেছেন অনেক ঠাট্টা ও টিটকারি। পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে আর সারাজীবন ধরে যা আয় করেছেন, এ নেশার পেছনে ছুটতে গিয়ে শেষ করেছেন তার বেশিরভাগ।

অতীত নিয়ে ভাবতে গিয়ে মৃদু হাসলেন ডক্টর আলম। দুনিয়ার নানানদিকে ছুটবার সময় পাশে পেয়েছেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই অদ্ভুত ভাল মেয়েকে, তুলনা নেই

তাদের।

'কখন সূর্য উঠবে?' জিজ্ঞেস করলেন লিলিয়া আলম। পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে কখনও স্বামীকে ছেড়ে কোথাও যাননি। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পার্কা পরে বসলেন স্বামীর পাশে। তাঁদের পরিচয় হয়েছিল নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে, দু'জনই ছিলেন আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রী। ফেরদৌস আলম ছয় ফুট দু'ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের সুঠাম যুবক, মাথাভরা কালো চুল, খেলাধুলোয় দারুণ সফল। আর অনাঘ্রাত ফুলের মতই ফুটফুটে ছিলেন তরুণী লিলিয়া। লালচে চুল নেমেছে হাঁটু তক। পরস্পরকে পছন্দ করলেও দু'জনের পরিচয় হয়েছিল ফেরদৌসের একটি বিতর্কজনক রিপোর্টের ফলে। বাঙালি বাদামি ছেলেটাকে ক্লাসের আর সবার সামনে অপমান করছিলেন বদমেজাজী প্রফেসর। তখনই প্রথমবারের মত মুখ খুলেছিলেন লিলিয়া। ওঁর প্রথম পাঁচটি শব্দ শুনেই প্রেমে পড়েন ডক্টর আলম।

প্রফেসরকে পাত্তা না দিয়ে জোর দিয়ে বলেন লিলিয়া, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।'

'একটু পর সূর্য উঠবে,' ঘড়ি দেখে নিয়ে বামহাতে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরলেন ডক্টর আলম। 'লাবনী আমাদের সঙ্গে এলে খুব খুশি হতো।' তাঁদের একমাত্র সন্তান লাবনী। মা-র মতই সুন্দরী, অত্যন্ত মেধাবী, পড়ছে নামকরা ইউনিভার্সিটিতে।

'ওর পরীক্ষার সময় এক্সপিডিশন না হলেই ভাল ছিল,' বললেন লিলিয়া।

'বলো, দোষটা আমার?' অপরাধী কণ্ঠে বললেন আলম। 'দোষ দেয়া উচিত চাইনিজ সরকারকে! আগামী মাসে আসতে চাইলেও মানা করে দিল। শুনবে না কিছুই। এক্সপিডিশন করতে হলে হাজির হতে হবে তাদের সময়মত, নইলে ঢুকতেই দেবে না

এই দেশে!'

'ফেরদৌস, হানি?'

'হুঁ?'

'ঠাট্টা করেছি। আমিও চাইনি হাতছাড়া হোক এই সুযোগ। তবুও খারাপ লাগছে লাবনীর জন্যে। খুশিতে পাহাড় থেকে লাফ দিত ও।'

'যিয়াওদং থেকে পোস্টকার্ড পাঠালে বা ই-মেইল করলে ক্ষতিপূরণ হবে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আলম, 'ওকে নিয়ে একের পর এক ব্যর্থ অভিযানে গেছি, কিন্তু সত্যি যখন মনে হলো ভাল সূত্র পেয়েছি, বেচারি আসতে পারল না— একে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলবে?'

'এবার কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিক পথেই আছি,' বললেন লিলিয়া।

'একমিনিটের ভেতর বুঝে যাব,' বললেন আলম।

দূরে তুষারে ঢাকা পাশাপাশি তিনটে প্রকাণ্ড চূড়া। পুবের উপত্যকায় ক্যাম্প করেছেন তাঁরা। নক্ষত্রের মৃদু আবছা আলোয় সাদা তুষারের ভেতর সবই ছায়াময়। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর পাল্টে যেতে লাগল পরিবেশ। এইমাত্র তিন চূড়া বেয়ে উঠছে সোনালি সূর্য।

যে প্রাচীন কাহিনি শুনে এখানে এসেছেন আলম ও লিলিয়া, যে-কোনও সময়ে বুঝবেন, তা সঠিক কি না।

তাঁদের মনে হলো, আছেন বহু ওপরের কোনও স্বর্গে।

হাত ধরে প্রিয় স্ত্রীকে দাঁড় করিয়ে দিলেন আলম। বড় করে দম নিয়ে ধূসর ধোঁয়া ছুঁড়লেন লিলিয়া। সাগর-সমতল থেকে পুরো দশ হাজার ফুট ওপরে এই উপত্যকা। বাতাস হালকা ও শীতল। বিন্দুমাত্র ধুলো নেই, পরিষ্কার দেখা গেল বহু দূরে।

অন্তরের ভেতর আলম বুঝলেন, যা খুঁজতে এসেছেন, এবার

তা-ই পাবেন।

ভোরের প্রথম পবিত্র রশ্মি পড়েছে মাঝের চূড়ার ওপর। যেন সফেদ তুষারে বিস্ফোরিত হয়েছে সোনালি আলো, চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে চোখ ধাঁধানো ঝিলিক। তরল সূর্যালোকের সোনালি স্রোত নেমে এল চূড়া থেকে। দু'পাশের দুই চূড়া রয়ে গেল ছায়ায়। ভোরের প্রভা এখনও স্পর্শ করেনি উপত্যকার বেশিরভাগ এলাকা।

'সত্যি, লিলিয়া...' প্রায় ফিসফিস করলেন আলম।

'যেন সোনার পাহাড়,' অবাক সুরে বললেন লিলিয়া।

একবার স্ত্রীকে দেখে নিয়ে আবারও অদ্ভুত কনক পর্বতে চোখ রাখলেন আলম, ঠোঁটে মৃদু হাসি। বিড়বিড় করে বললেন, 'সত্যি! ওরা ঠিকই বলেছে!'

'মন ছোট হয়,' নিচু স্বরে বললেন লিলিয়া, 'সত্তর বছরেরও আগে এখান থেকে ঘুরে গেছে নরপশু নাযিরা। প্রায় পেয়েও গিয়েছিল সব।'

'প্রায়... হ্যাঁ... তবুও পায়নি,' বললেন আলম। 'আমরা খুঁজে পাব।'

হাজার বছর ধরেই ছড়িয়ে আছে ওই সোনালি চূড়ার কাহিনি। জীবনের মস্ত একটি অংশ জুড়ে ওই পাযলের টুকরো একত্র করেছেন ডক্টর আলম। অথচ এখনও জানেন না, কী অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। অবশ্য বুঝে গেছেন, আজ যা পাবেন, তা একেবারে পাল্টে দেবে তাঁদের জীবন।

উন্মোচিত হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিকাল রহস্য!

আটলান্টিস!

সোনালি চূড়ায় মাত্র একমিনিট থামল উজ্জ্বল রশ্মি, তারপর আরও ওপরে দু'পাশের চূড়ায় উঠে হাসল সূর্য। ততক্ষণে মাঝের চূড়ার পুব ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে এক্সপিডিশনের সবাই।

গুগ চড়েছে বলে মাথার ওপর থেকে হারিয়ে গেল পাহাড়ের কালচে ছায়া। রোদে ঝকঝক করছে সাদা তুষার।

এবারের অভিযানে এসেছে সবমিলে সাতজন। দলের নেতা বাঙালি আর্কিওলজিস্ট ডক্টর ফেরদৌস আলম। তাঁর সঙ্গে হাঁটছেন প্রিয় স্ত্রী লিলিয়া আলম। তাঁকে ধরে এ দলে রয়েছে দু'জন আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট। অন্য চারজন তিব্বতীয় আদিবাসী, কাজ মাল বহন ও পথ নির্দেশ করা। লোককথা সত্যি হতে দেখে বিদেশিদের মতই অবাক, আগে কখনও আসেনি নির্জন এই এলাকায়।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন ডক্টর আলম, তাঁদের আগে এখানে এসেছিল আরেক দল লোক। হয়তো খুঁজে পেয়েছিল জরুরি সূত্র। তারপর হারিয়ে গেছে কোথায় যেন।

আরও কিছুক্ষণ চড়াই বেয়ে ওঠার পর সবাইকে থামতে বললেন ডক্টর আলম। তাতে খুশি হয়ে আশপাশের পাথরের ওপর থেকে তুষার ঝেড়ে বসে পড়ল সবাই। ব্যাকপ্যাকের পকেট থেকে সাবধানে সরু এক বাইণ্ডার নিলেন আলম।

স্বামী প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া পাতা ওল্টাচ্ছেন দেখে তাঁর পাশে থেমে ঠাট্টার সুরে বললেন লিলিয়া, 'আবারও দেখছ? আমার তো মনে হয় সব মুখস্থ করে ফেলেছ!'

'জার্মান ভাষা ভাল বুঝি না,' নির্দিষ্ট একটি পাতা দেখালেন ডক্টর আলম। ভেজা পরিবেশে বাদামি হয়েছে কাগজ।

এই গোপন ডকুমেন্ট এসেছে জার্মান অ্যানসেস্ট্রাল হেরিটেজ সোসাইটি বা আহনেনেরবে থেকে। হিটলারের অধীনে সরাসরি হাইনরিখ হিমলারের নিয়ন্ত্রণে ছিল এসএস বাহিনীর ওই সংস্থা। ওয়েওয়েলসবার্গ দুর্গের নিচে এক সেলারে ছিল অসংখ্য ফাইল। মহাযুদ্ধের সময় এসএস বাহিনীর অবসেশন, পৌরাণিক কাহিনি বা অযৌক্তিক অকাল্টের দস্তাবেজের আস্তানা ছিল ওই দুর্গ।

যুদ্ধের শেষ অংশে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যেন ধ্বংস করে দেয়া হয় সমস্ত তথ্য ও ওয়েওয়েলসবার্গ দুর্গ। কিন্তু কেউ না কেউ অগ্রাহ্য করেছিল সে-নির্দেশ, লুকিয়ে ফেলা হয় দরকারী কাগজ।

এসব ডকুমেন্টের জরুরি একটি পেয়ে গেছেন ডক্টর আলম। গতবছর তাঁর এক অ্যাকাডেমিক বন্ধু ডেটারিং হেন্সম্যান যোগাযোগ করে জানান কী পেয়েছেন। এসএস-এর বেশিরভাগ ডকুমেন্ট তুলে দেয়া হয় জার্মান সরকারের হাতে। কিন্তু হেন্সম্যানের মনে ছিল, আটলান্টিস বিষয়ে যে-কোনও তথ্য খুশি মনে কিনবেন ডক্টর আলম। নিজ সম্মানের ঝুঁকি নিয়েও কিছু কাগজ সরিয়ে ফেলেন তিনি। যদিও বন্ধু মানুষ, তবুও ওই ডকুমেন্টের জন্য হেন্সম্যান আদায় করেছেন প্রায় একপাহাড় ডলার। ডক্টর আলম ভাল করেই জানতেন, তাঁর কাজে আসবে এসব তথ্য।

ঘৃণ্য নাযিদের জিনিস নিজ কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে বড্ড অস্বস্তি হয়েছে তাঁর। আর এ কারণেই নিজের মেয়েকেও বলেননি, কোথা থেকে পেয়েছেন এই ডকুমেন্ট। ভাল করেই জানেন, প্রয়োজনীয় তথ্য না পেলে কখনোই খুঁজে পাবেন না রহস্যময় আটলান্টিসকে। কী করে যেন তিরিশের দশকে নাযিরা জেনে গিয়েছিল, কোথায় আছে ওই কিংবদন্তীর পথচিহ্ন

উনিশ শ' ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ইউরোপে মহাযুদ্ধের সময়েও আহনেনেরবে থেকে তিব্বত অভিযানে পাঠানো হয়েছিল জার্মান অভিযাত্রীদেরকে। নাযি সমাজের অন্যতম সদস্যরা অংশ নিয়েছিল এসব অভিযানে। তাদের ভেতর কেউ কেউ ছিল ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর থুলে সোসাইটির সদস্য। নিজেও এক্সপিডিশন করতে তিনবার এশিয়া ঘুরে গেছে হিমলার। থুলে সোসাইটির সবাই ভাবত, হিমালয়ের নিচে আছে পাতাল শহর। ওগুলো তৈরি করেছে আটলান্টিয়ানদের উত্তরপুরুষরা। তারা ছিল

জার্মানদের মতই আর্য জাতির মানুষ, অর্থাৎ নীল রক্তের, জার্মানদেরই আত্মীয়। বহু কিছু পাওয়া গেছে তিব্বত অভিযানে, জানা গেছে এ এলাকার দীর্ঘ ইতিহাস, কিন্তু পাওয়া যায়নি আটলান্টিয়ান কোনও চিহ্ন। খালি হাতে ফিরতে হয়েছে জার্মানদের।

অবশ্য ডক্টর ফেরদৌস আলমের কাছে যে কাগজপত্র আছে, তাতে লেখা: চতুর্থবারের মত এক্সপিডিশনে আসে জার্মানরা। সেটা গোপন করা হয়েছিল স্বয়ং হিটলারের কাছ থেকেও।

দলের বেশিরভাগ লোক পৌরাণিক কাহিনি বিশ্বাস করলেও নিজে সেসব মানত না হিটলার। দিকে দিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে ভেবেছিল, দুনিয়ার আরেক প্রান্তে কাল্পনিক কিংবদন্তীর পেছনে লোকবল ও বিপুল অর্থ বিনষ্ট না করে উচিত হবে সব ঘি নাযি ওয়ার মেশিনে ঢালা।

পৌরাণিক কাহিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করত হিমলার। আহনেনেরবের আবিষ্কৃত সব জিনিস দেখে তার মনে হয়েছিল, হাতের মুঠোর খুব কাছে চলে এসেছে সেই আটলান্টিস।

ওই একই মতামত পোষণ করতে গিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে ডক্টর আলমের। ভাল করেই জানেন, প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পর এসেছেন এখানে। গত দশ বছর আগে এমনই এক সূত্র পেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন মরোক্কোয়। আফ্রিকার বালির নিচে পান প্রাচীন এক পরিত্যক্ত বসতি। খুব খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর বুঝলেন, আগেই ওই জায়গা ঘুরে গেছে কারা যেন। পাওয়া গিয়েছিল সামান্য কিছু জিনিসপত্র।

ডক্টর আলম এখন জানেন, ঠিক কারা গিয়েছিল ওখানে।

তাঁর মত করেই জিগ-স'ও পাযল মেলাতে গিয়ে মরোক্কোয় পৌঁছে গিয়েছিল নাযি অভিযাত্রীরা। আহনেনেরবের কয়েকটি ডকুমেন্টে আবছাভাবে লেখা আছে, ওখানে কী পাওয়া গেছে। এ

কারণেই আরেকটি এক্সপিডিশন যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। নাযি ডকুমেন্টে লেখা নেই ওখানে কী পাওয়া গেছে। কিন্তু মন্তব্য করা হয়েছে: ওই মিশনের কারণে তিব্বতের কনক-চূড়ায় অভিযান পরিচালনা জরুরি।

এখন ওই একই জায়গায় আছেন ডক্টর ফেরদৌস আলম। 'ওরা দক্ষিণ আমেরিকায় কী পেয়েছে, জানলে ভাল হতো,' বললেন হতাশ সুরে।

পাতা উল্টে চোখ বোলালেন লিলিয়া। 'যা পেয়েছি, তা কিন্তু কম নয়। পৌঁছে গেছি এই পর্যন্ত।' কালি জাবড়ে যাওয়া মলিন পাতা থেকে পড়লেন, '"ভোরে দুই চূড়ার মাঝে যে চূড়া সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করে সোনার মত, ওখানেই আছে সূত্র।" অত হতাশ হচ্ছ কেন? মিথ্যে তো লেখেনি।' স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি।

'সূত্র বলতে এ-ই,' পুরনো পাতা দেখালেন ডক্টর আলম। পড়েছেন অন্তত একহাজার বার। নিশ্চিত হয়েছেন, ভুল হয়নি অনুবাদ করতে।

না, ঠিক জায়গায় এসেছেন তাঁরা।

'"চাঁদের পথের শেষে ওই দরজা," বিনকিউলার তুলে ওপরের ল্যাণ্ডস্কেপ দেখলেন ডক্টর আলম। ওদিকে পাথর আর তুষার ছাড়া কিছুই নেই। 'কেন যে পৌরাণিক কাহিনিতে এত সব রহস্যপূর্ণ নাম থাকে! পড়লে মনে হবে যেন পথ গিয়ে উঠবে চাঁদে। এ থেকে কী বুঝব? "চাঁদের পথ অনুসরণ করে..."'

'বুঝেছি চাঁদ কী,' নিচু স্বরে বললেন লিলিয়া, 'অর্ধচন্দ্রাকার, তাই না?'

'এই ভর সকালে চাঁদ পেলে কই?' পাহাড়ে চোখ রেখে কোথাও চাঁদ আকৃতির কোনও কিছু দেখলেন না ডক্টর আলম।

'দেখোনি,' হাত তুলে স্বামীর বিনকিউলার নামিয়ে দিলেন

লিলিয়া, 'কারণ, একেবারে কাছে দেখছ না।'

চোখ পিটপিট করে স্ত্রীকে দেখলেন আলম, পরক্ষণে বড় করে দম নিলেন। এবার বুঝতে পেরেছেন।

সামনে বাঁকা, সরু এক দীর্ঘ পথ গেছে চূড়ার দিকে। ডানে গিয়ে আরও ওপরে উঠে মিশে গেছে চওড়া এক কার্নিশে। চারপাশে কালো সব পাথর খণ্ড, কিন্তু চিকন ওই পথ জুড়ে পড়ে আছে সাদা তুষার। ওই সফেদ পথ দেখতে ঠিক আধখাওয়া চাঁদের মতই। ওখানে ভূমি অনেকটা মসৃণ। আগে কেন দেখতে পাননি, সে-কথা ভেবে অবাকই হলেন ডক্টর আলম। নিচু স্বরে বললেন, 'লিলিয়া?'

'হুঁ?'

'ভাগ্যিস তোমাকে বিয়ে করেছি!'

হাসিমুখে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা।

'নইলে কেমন সর্বনাশ হতো?' জিজ্ঞেস করলেন লিলিয়া।

মাথা দোলালেন আলম। 'খাবার পেতাম কোথায়?'

তাঁর কাঁধে মাথা রেখে হাসলেন লিলিয়া। 'বলো তো, কত দূরে ওই পথ?'

'আন্দাজ একমাইল? পাঁচ শ' ফুট ওপরে। বেশ খাড়া।'

'আটলান্টিয়ানরা স্যাণ্ডেল পরে অত ওপরে উঠতে পারলে, হাইকিং বুট পরে আমরাও পারব।'

'ঠিক।' ঠিক জায়গায় বাইণ্ডার রাখলেন ডক্টর আলম। দলের উদ্দেশে হাতের ইশারা করলেন। 'ওঠো সবাই! রওনা হতে হবে! ওপরে উঠব আমরা!'

সবাই যা ভেবেছিল, সে তুলনায় অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ওই পথ। তুষারের নিচে আলগা সব ছোট নুড়িপাথর। পিছলে গেলেই শুরু হবে ভূমিধস। প্রতিটা পা ফেলতে হচ্ছে সাবধানে।

কার্নিশে পৌঁছতে গিয়ে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়া পেরিয়ে

গেল সূর্য, ফলে ছায়া পড়ল পুবে। থেমে দূর দিগন্তে চোখ বোলালেন ডক্টর আলম। পথের শেষ কয়েক ফুট টেনে তুললেন স্ত্রীকে। উত্তর থেকে ভেসে আসছে ভারী সব কালচে মেঘ। ওঠার সময় ওদিকে নজর ছিল না তাঁর। হঠাৎ কমে গেছে তাপমাত্রা।

'পরিবেশ খারাপ হবে?' স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করলেন লিলিয়া।

'মনে হয় তুষারঝড় আসছে।'

'যাক, কপাল ভাল, ঝড় আসার আগেই উঠে আসতে পেরেছি।' কিনারা থেকে নিচে দেখলেন লিলিয়া। তাক এখানে মাত্র বারো গজ চওড়া। 'ক্যাম্প করতে অসুবিধা হবে না।'

'আবহাওয়া খারাপ হওয়ার আগেই গাইডদের বলো তাঁবু ফেলুক,' স্ত্রীকে বলে পথের শেষাংশ দেখলেন ডক্টর আলম। ওখান থেকে খাড়া হয়ে উঠেছে পাহাড়। পর্বতারোহণ করতে চাইলে লাগবে ক্লাইমার গিয়ার। তাতে অসুবিধা নেই, সঙ্গে আছে দরকারী সব ইকুইপমেন্ট। যদিও আহনেনেরবে ডকুমেন্ট অনুযায়ী, ওদের আরও ওপরে উঠতে হবে না।

স্বামীর নির্দেশ তিব্বতীয়দের জানিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বললেন লিলিয়া, 'এবার কী করবে?'

'আগে চারপাশ ঘুরে দেখব। পাহাড়ের গায়ে ফাটল থাকতে পারে। ওটা হয়তো কোনও গুহার মুখ। খুঁজতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

ভুরু কুঁচকে স্বামীকে দেখলেন লিলিয়া, সবুজ চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'তা হলে তাঁবু ফেলতে বললে কেন?'

'কাজে ব্যস্ত থাকুক।' একটু দূরে পাথরের ওপর বসে আছে করমচার মত লাল মুখওয়ালা এক আমেরিকান লোক। 'জিম? আমাদের সঙ্গে আসবে?' জানতে চাইলেন আলম।

পার্কার হুডের মাঝ দিয়ে বাঙালি আর্কিওলজিস্টকে দেখলেন

জাম করোল। 'আগে কফির পানি ফুটুক, একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও আলম! হাঁফ লেগে গেছে!'

'তিব্বতে এসেও গেল না ক্যাফেনের নেশা!' হাসলেন ডক্টর আলম। স্ত্রীকে হাতের ইশারা করে পাহাড়ি খাড়া অংশের দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'এত বছর ধরে বলছে, পাগল হয়ে খুঁজছে আটলান্টিস, আর আমরা যখন ভালো সূত্র পেয়ে গেছি, তখন পিছিয়ে পড়ে বিশ্রাম নেবে; ওর দরকার কফি!' কয়েক মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ পাথুরে দেয়ালের কাছে থেমে গেলেন তিনি।

'কিছু দেখলে?' জানতে চাইলেন তাঁর স্ত্রী।

'এসব পাথর...' নুড়িপাথর ভরা পাহাড় দেখালেন ডক্টর আলম।

ভারতীয় ও এশিয়ান টেকটোনিক দুই প্লেটের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে মিলেমিশে গেছে নানান পাথর— ছিটকে সরে যাওয়ার বদলে চারপাশের চাপ খেয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে আকাশের দিকে, ফলাফল হিমালয় মহাপর্বত।

'পাথরের আবার কী হলো?'

'যদি সরিয়ে দেয়া যায় এসব,' স্তূপ হয়ে জমে থাকা পাথর দেখালেন আলম, 'আমার মনে হয় দেখতে পাব প্রবেশপথ।'

আট ফুট ওপরের পাথুরে দেয়ালে কালো এক অংশ চোখে পড়ল লিলিয়ার। তাঁর মনে হলো না ওখানে পাথর আছে। যেন কোনও গর্ত।

'ভাবছ ভেতরে ঢুকতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখি।' স্তূপের ওপরের পাথর সরাতে লাগলেন ডক্টর আলম। ফলে ঝরঝর করে ঝরতে লাগল নুড়িপাথর। ক' সেকেণ্ড পর দেখা দিল কালো গর্ত। 'হাত লাগাও, লিলিয়া।'

'ও?' হাল ছেড়ে হাসলেন লিলিয়া। 'স্থানীয়রা আরাম করে

তাঁবু ফেলবে, আর এদিকে ভারী সব পাথর সরাতে এনেছ নিজের বউকে?'

'নিশ্চয়ই ভূমিধস,' স্ত্রীর দিকে খেয়াল নেই ডক্টর আলমের। 'ওপরে গুহা বা সুড়ঙ্গ।' ব্যস্ত হয়ে সরাচ্ছেন পাথর। পাশে হাত লাগালেন তাঁর স্ত্রী। 'লিলিয়া, ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করো। দেখো তো ভেতরে কী।'

ব্যাকপ্যাক নামিয়ে ম্যাগলাইট বের করে কালো গর্তের ভেতর জোর আলো ফেললেন লিলিয়া। 'ওদিকে মিলিয়ে যাচ্ছে আলো!' চুপ হয়ে গেলেন তিনি। পরক্ষণে বললেন, 'প্রতিধ্বনি!' অন্ধকার গুহা থেকে ফিরে এসেছে তাঁর কণ্ঠ।

'তাই তো!' বললেন ডক্টর আলম, 'ভেতরে গুহা!' তাঁর মাথায় আলতো চাপড় দিলেন লিলিয়া। 'একবার এই পাথরটা সরাতে পারলেই হাঁচড়েপাঁচড়ে ঢুকে পড়ব।'

'তুমি বলতে চাইছ, আমি ঢুকব,' বললেন লিলিয়া।

'আপত্তি নেই! লেডিয ফার্স্ট!'

'অত সৌজন্য দেখাতে হবে না!'

স্বামীর দেখাদেখি বড়সড় পাথরটা পাশ থেকে ঠেলতে লাগলেন লিলিয়া। কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেলেও কিছুই ঘটল না, তারপর ঘর্ষণের আওয়াজ তুলে নিচের পথে গিয়ে পড়ল পাথর। ওটার জায়গায় এখন তিন ফুট উচ্চতার একটি গর্ত। চওড়ায় হবে এক ফুট। ছাত দেখা গেল না।

'ঢুকতে পারবে?' জানতে চাইলেন ডক্টর আলম।

গর্তে ডানহাত ভরে ভেতরের অংশ স্পর্শ করলেন লিলিয়া। 'চওড়া। মনে হয় না একবার ঢুকে পড়লে সমস্যা হবে।' আরও ঝুঁকে ফ্ল্যাশলাইট তাক করলেন নিচে। 'হ্যাঁ, সত্যিই ভূমিধস হয়েছিল। বেশ খাড়াভাবে নিচে গেছে।'

'দাঁড়াও, তোমার কোমরে লাইন আটকে নিই,' দ্রুত হাতে

ব্যাকপ্যাক থেকে দড়ি নিলেন ডক্টর আলম। 'কোনও সমস্যা হলেই তুলে আনব।'

বাঁর ক্লাইমিং হার্নেসে দড়ি লাগিয়ে দেয়ার পর সন্তুষ্ট হলেন তিনি। দক্ষ হাতে লালচে চুল পনিটেইল করলেন লিলিয়া, তারপর খুব সাবধানে গর্তে নামিয়ে দিলেন দু'পা। ভেতরে নেমে যাওয়ার পর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলেন। তবে এক সেকেণ্ড পর বুঝে গেলেন, পায়ের নিচে টলমল করছে স্তূপ।

'কী দেখছ?' জানতে চাইলেন ডক্টর আলম।

'শুধু পাথর।' আবছা আঁধারে চোখ সইয়ে নিচ্ছেন লিলিয়া। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও জ্বেলে নিলেন ম্যাগলাইট। 'নিচে সমতল মেঝে। দেখে মনে হচ্ছে...' আবারও আলো ওপরে তুললেন তিনি। রশ্মি পড়েছে পাথুরে দেয়ালে। এ ছাড়া আর সব হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। 'গেছে একটা করিডোর। বেশ চওড়া। বেশি দূরে দেখতে পাচ্ছি না।' উত্তেজনার ছাপ পড়ল লিলিয়ার কণ্ঠে: 'মনে তো হচ্ছে মানুষের তৈরি!'

'মেঝেতে নামতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখি।' সাবধানে এক পা নামলেন লিলিয়া। দু'হাত ওপরে তুলে রাখছেন ভারসাম্য। স্তূপ থেকে ঝরঝর করে নামল ছোট সব পাথর। 'খুব ফস্কা। পড়লে...'

পরক্ষণে শোনা গেল হুড়মুড় করে পাথর নেমে যাওয়ার আওয়াজ। বোকা হয়ে গেছেন লিলিয়া। চিত হয়ে পড়ে সরসর করে নেমে গেলেন মেঝের কাছে। হাত থেকে ছুটে গেছে ফ্ল্যাশলাইট।

'লিলিয়া!! লিলিয়া!!!' স্বামীর হাহাকার শুনলেন।

'ঠিক আছি! তবে পিছলে গেছি!' উঠে দাঁড়ালেন লিলিয়া। তাঁর ভারী সব পোশাক ঠেকিয়ে দিয়েছে পতনের আঘাত। হাত-পা ছড়ে যায়নি বললেই চলে।

'তোমাকে তুলে আনব?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর স্বামী।

'না। ঠিক আছি। নেমে যখন এসেছি, চারপাশ ঘুরে দেখি।' উবু হয়ে মেঝে থেকে ধাতব ফ্ল্যাশলাইট তুললেন লিলিয়া। আর তখনই বুঝলেন, তিনি একা নন। মুহূর্তের জন্য চমকে গেলেন ভয় পেয়ে। সেই ভয় অবশ্য অবাক হওয়ার কারণে। কৌতূহল পেয়ে বসল তাঁকে। জোরালো আলো ফেললেন চারপাশে।

'ফেরদৌস?' স্বামীকে ডাকলেন।

'হ্যাঁ, লিলি?'

'তিব্বতে নাযিদের এক্সপিডিশন হয়েছিল, মনে আছে? পরে যাদেরকে আর কোথাও দেখা যায়নি?'

'হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম! তাতে কী হয়েছে?'

'আমি তাদেরকে খুঁজে পেয়েছি,' লিলিয়ার কণ্ঠে বিজয়।

গুহার মেঝেতে পড়ে আছে পাঁচটি লাশ মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে লিলিয়া বুঝলেন, পাথর-ধসে মৃত্যু হয়নি তাদের। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে মামির মত শুকিয়ে গেছে লাশ।

কিছুক্ষণের মধ্যে দলের সবাই নেমে এল গুহার মেঝেতে। প্রায় প্রত্যেকে গেল টানেলের ওদিক আবিষ্কার করতে, কিন্তু লাশগুলোর কাছ থেকে সরলেন না ডক্টর আলম ও তাঁর স্ত্রী।

'আবহাওয়ার জন্যে এই অবস্থা,' নিচু স্বরে বললেন আলম। বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের আলোয় দেখছেন মৃতদেহ। 'আশ্রয় নেয়ার জন্যে এখানে এসেছিল। তারপর আর বেরোতে পারেনি।'

তিব্বতীদের একজনের নাম রুপম, দীর্ঘ টানেলের আরেক মাথা থেকে ডাকল সে, 'ডক্টর! এখানে আরও কিছু আছে!'

শুকনো লাশ পেছনে ফেলে সুড়ঙ্গের আরও গভীরে চললেন আর্কিওলজিস্ট দম্পতি। লিলিয়ার কথাই ঠিক, পাহাড়ের বুকে পাথুরে এই প্যাসেজ মানবসৃষ্ট। তিরিশ ফুট দূরে সুড়ঙ্গের

শেষমাথায় থেমে গেছে সবাই। তাদের ফ্ল্যাশলাইট দেখাল অদ্ভুত এক দৃশ্য।

টানেল শেষ হওয়ার পর একটু দূরেই একটি মন্দির, বা হতে পারে ওটা কোনও সমাধি।

সামনে বেড়ে মন্দিরের মাঝে আয়তাকার একটা বেদি দেখলেন আলম।

আগেই বেদি পরীক্ষা করেছেন আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট। ডক্টর আলমের উদ্দেশে বললেন, 'তিব্বতীয় নয়। পাথরে লেখা গ্লোযেল বা ওই ধরনের ভাষা।'

ডক্টর আলমের কণ্ঠ থেকে একইসঙ্গে ঝরল বিস্ময় ও খুশি, 'গ্লোযেল? আগেই না তোমাদেরকে বলেছি, এ ধরনের লিখিত ভাষা ব্যবহার করত আটলাণ্টিয়ানরা!'

'আসলে আটলাণ্টিস কোথায় কে জানে,' পাথুরে দেয়ালে আলো ফেললেন লিলিয়া। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত সারি সারি খোদাই করা শিলালিপি। একটু কাত করে লেখার ভঙ্গি দেখলে মনে হয় কার্যকারিতা আছে এসবের। একেবারে সঠিক জায়গায় হাজির হয়েছিল নাযিরা, ভাবলেন লিলিয়া। এ ধরনের স্থাপত্য তৈরি করত আলবার্ট স্পিয়ার।

লিপির মাঝে রয়েছে মানুষের নানান আকৃতি। সবচেয়ে বড়টার সামনে থামলেন ডক্টর আলম। ওটা অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বেশি যত্নে তৈরি। মাত্র এক সেকেণ্ডে তিনি বুঝে গেলেন ওটা কার।

'পসেইডন...' ফিসফিস করে বললেন।

তাঁর পাশে থেমে মাথা দোলালেন লিলিয়া। 'মাই গড! সত্যিই পসেইডন!' ওই দেবতা গ্রিকদের আর সব দেবতার মত নয়। ডানহাতে ত্রিশূল!

'এই এক্সপিডিশনের সাফল্যে খুবই খুশি হবেন মিস্টার

ডেনিয়েলসন,' বললেন তাঁদের আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট বন্ধু।

'মরুক গে, লোভিস ডেনিয়েলসন,' নাক কুঁচকে বললেন লিলিয়া। 'এসব আমাদের আবিষ্কার। কাজ বলতে ফাণ্ড জোগাড় করতে সামান্য সাহায্য করেছেন।'

'অত খেপে যেয়ো না,' হাসিমুখে বললেন ডক্টর আলম। 'উনি টাকার জোগান না দিলে হাওয়া হয়ে যেত লাবনীর জন্যে রাখা ইউনিভার্সিটির টাকা! আর গাড়িটাও বিক্রি করতে হতো।' ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন, 'রুপম, এদিকে আর কিছু দেখেছেন? অন্য কোনও ঘর বা করিডোর?'

'না,' মাথা নাড়ল তিব্বতীয় গাইড, 'শেষমাথায় শুধু পাথরের দেয়াল।'

'তাই, আর কিছুই নেই?' একটু হতাশ হলেন লিলিয়া। 'অবশ্য, এটাও ঠিক যে দুর্দান্ত সাইট আবিষ্কার করেছি আমরা। কিন্তু তার পরেও ভেবেছিলাম...'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিলেন ডক্টর আলম, 'এখানে আরও বহু কিছুই থাকতে পারে। কে বলবে, বাইরের ওই কার্নিশে আরও সমাধি নেই? বেরিয়ে যাওয়ার পর ভালভাবে চারপাশ দেখব।'

আবারও করিডোরে বেরিয়ে লাশগুলোর কাছে এসে থামলেন তিনি। তাঁকে অনুসরণ করে এসেছেন লিলিয়া ও আর্কিওলজিস্ট বন্ধু।

লাশগুলোর পরনে বহু বছর আগের শীতের পোশাক। করোটিগুলোর অক্ষিকোটর চেয়ে আছে দূরের আঁধারে। ত্বক হয়ে গেছে খসখসে পার্চমেন্টের মত। 'কে জানে, এদের কেউ হয়তো স্বয়ং ক্রাউস,' বললেন আলম।

'ওই যে সে,' একটা লাশ দেখিয়ে দিলেন লিলিয়া। 'দলের নেতা।'

'তুমি জানলে কী করে?' অবাক হলেন তাঁর স্বামী।

লিলিয়ার গ্লাভ্‌স্ পরা আঙুল দেখিয়ে দিল নির্দিষ্ট মৃতদেহ। প্রায় স্পর্শ করেছে লাশের বুক। লণ্ঠন আরও কাছে নিয়ে গেলেন আলম। পোশাকে ছোট, ধাতব ব্যাজ বা ইনসিগনিয়া।

ওটা দেখে শিরশির করে উঠল তিন অভিযাত্রীর বুক।

হ্যাঁ, এসএস বা শাট্‌যস্টাফেল-এর ইনসিগনিয়া!

ওই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ও নৃশংস সংগঠন ধ্বংস করে দেয়ার এত বছর পরেও ভাবতে গিয়ে চমকে উঠতে হয়, হত্যা করা হয়েছিল কোটি কোটি নিরীহ মানুষকে।

'ইয়ুর্গেন ক্রাউস,' খুব কাছ থেকে লাশের মুখ দেখে নিচু স্বরে বললেন ডক্টর আলম। ভাগ্যের কী পরিহাস, নাযি এক্সপিডিশনে এসে এসএস ইনসিগনিয়ার মতই হয়ে গেছে লোকটার নিজেরই করোটি। বিড়বিড় করে বললেন বাঙালি আর্কিওলজিস্ট, 'ভাবিনি তোমার সঙ্গে দেখা হবে, বাপু! বলো তো, কী পাবে ভেবে এখানে এসে ঢুকেছিলে?'

'নিজে খুঁজে দেখি না, কী জন্যে এসেছিল?' বললেন লিলিয়া, 'এর প্যাক তো আমাদের কাছেই আছে। ভেতরে পেয়ে যেতে পারি নোটবুক। হাতড়ে দেখো তো, আলম।'

'কাজটা আমাকে করতে বলছ?' একটু দ্বিধা করলেন ডক্টর আলম।

'অসুবিধে কী?' বলেই শিউরে উঠলেন লিলিয়া। 'তবে আমি নিজে মরলেও মরা নাযি ছুঁতে পারব না!'

'কামড়ে দেবে?' হাসলেন আলম। করেলির দিকে তাকালেন। 'জিম?'

মাথা নাড়লেন আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট। 'বহু প্রাচীন লাশ ঘেঁটেছি, কিন্তু এসব নরপশুর দেহ স্পর্শ করব না।'

'ভিতু,' হেসে ফেললেন আলম। আরও ঝুঁকে গেলেন লাশের

দিকে। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করে খুললেন ওটার ব্যাকপ্যাক। ভেতর থেকে বেরোল ক্ষয়ে যাওয়া বাল্ব ও ব্যাটারিসহ একটা ফ্ল্যাশলাইট। কুঁচকে যাওয়া গ্রিসপ্রুফ কাগজ। ওগুলো দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হতো অবশিষ্ট খাবার। এরপর পাওয়া গেল আগ্রহ তৈরি হওয়ার মত জিনিস— ভাঁজ করা মানচিত্র, চামড়া দিয়ে মোড়া নোটবুক, কাগজের পর কাগজ, ভেতরে লেখা গ্লোযেল অক্ষর... পরিমার্জিত তামার পাত, ওপরে কী যেন... এ ছাড়া সাবধানে কালচে ভেলভেট দিয়ে মুড়িয়ে রাখা কিছু।

তামার পাত হাতে নিয়ে দেখলেন লিলিয়া। 'বালিতে ঘষে গেছে... এটা এসেছে বোধহয় বহু দূরের সেই মরোক্কো থেকে।'

'সম্ভবত তা-ই,' বললেন ডক্টর আলম। প্রথমে নোটবুকে মনোযোগ দেয়ার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু রহস্যময় তামার পাত চুম্বকের মত টানছে। সমতল পাত যথেষ্ট ভারী. দৈর্ঘ্যে এক ফুট। মেঝেতে লণ্ঠনের পাশে ওটা রাখলেন, তারপর চোখ বোলালেন ভেলভেটের ওপর।

'ওটা কী?' জানতে চাইলেন লিলিয়া।

'জানি না। ভেতরে মনে হয় কোনও ধাতু আছে।' শক্ত হয়ে গেছে শীতল ভেলভেট। কঠিন হয়ে গেল ভেতরের জিনিস বের করা। টানা-হেঁচড়া করে শেষ পরত খুলে ফেললেন আলম।

'দারুণ তো!' হাঁ হয়ে গেলেন লিলিয়া।

বিস্ময়ের কারণে বিস্ফারিত হলো আমেরিকান বন্ধুর চোখ।

ভেলভেটের ওপর শুয়ে আছে কোনওকিছুর দুই ইঞ্চি চওড়া ধাতব অংশ। ওটার এক প্রান্ত গোল, তাতে খোদাই করা তীরের ফলা। বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের শীতল নীলচে আলোয় ঝিকমিক করছে লালচে-সোনালি ধাতু। ওঁরা কেউ আগে এমন কোনও ধাতু দেখেননি।

আরও ভালভাবে দেখার জন্যে ঝুঁকে গেলেন ডক্টর আলম।

প্রাচীন আমলের ছাপ নেই লালচে-সোনালি ধাতুর ওপর। একটু আগে যেন পালিশ করা হয়েছে। মনে হলো না জিনিসটা ব্রোঞ্জ না সোনা।

কয়েক সেকেণ্ড স্বামীর পাশে ঝুঁকে দেখলেন লিলিয়া, তারপর বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, আলম, যা ভাবছি, ওটা এই সেই জিনিস?'

'তা-ই তো মনে হয়,' বিড়বিড় করলেন আলম। 'নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সতিই আটলাণ্টিসের কোনও আর্টিফ্যাক্ট পেয়ে গিয়েছিল নাযিরা! অরিচালকাম! ঠিক যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন প্লেটো! সত্যিকারের আটলাণ্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট! প্রায় পৌনে এক শ' বছর আগে আবিষ্কার করেছে নাযিরা!'

'বাড়ি ফিরে লাবনীকে সত্যি কথা বলতে হবে,' বললেন লিলিয়া। 'ও সবসময় ভেবেছে মরোক্কোর ওই ধাতুর টুকরো আসল অরিচালকাম।'

'হয়তো সত্যিই তা-ই, ক্ষয় হয়েছে বলে ওরকম হয়েছে,' বললেন ডক্টর আলম। সাবধানে তুলে নিলেন ধাতুর টুকরো। 'এটাও রং নষ্ট হওয়া ব্রোঞ্জ হতে পারে।' জিনিসটার চৌকো দিকে বৃত্তের মত সামনে বেড়ে থাকা একটা অংশ। ঠিক তার উল্টোদিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাংগেলে ছোট এক খাঁজ। 'বড় কোনও অংশের টুকরো,' মন্তব্য করলেন তিনি। 'ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল কোথাও।'

'পেণ্ডুলামের হাতলের মত,' বললেন লিলিয়া।

'নির্দেশ করত কোনওদিকে?' তীরের ফলার চিহ্ন দেয়া অংশে আঙুল বোলালেন আলম।

'ওই চিহ্নগুলো কীসের?' জিজ্ঞেস করলেন করেলি।

আর্টিফ্যাক্টের পাশে সরু লাইনে আবছাভাবে ছাপ দেয়া। পাতের দু'দিকেই আছে। খুদে ছোট সব বিন্দু। একইসঙ্গে

রয়েছে আটটি করে। এ ছাড়া দেখা গেল আরও অক্ষর।

'আরও গ্লোয়েল ক্যারেকটার,' বললেন ডক্টর আলম। 'কিন্তু ঠিক মন্দিরের অক্ষরের মত নয়। দেখো, এগুলো অনেকটা হাইরোগ্লিফিকের মত। আশ্চর্য!'

আরও কাছ থেকে দেখলেন তাঁর আমেরিকান বন্ধু। 'দেখে তো মনে হচ্ছে অলমেক ক্যারেকটার, বা ওই ধরনের কিছু। নাকি কয়েকটা ভাষার মিশ্রণ হয়ে...'

'কী বোঝাতে চেয়েছে এগুলো দিয়ে?' জানতে চাইলেন লিলিয়া।

'জানা নেই। আমি আসলে ঠিক ওই ভাষায় পটু নই। তবে শিখে নেব।' খুকখুক করে কাশলেন করেলি।

'জিনিসটা তৈরির বেশ পরে এসব লিখেছে,' মন্তব্য করলেন ডক্টর আলম। 'তীরের ফলা যে খোদাই করেছে, তার চেয়ে অনেক অদক্ষ হাতে লিখেছে অন্য কেউ।' রহস্যময় পাত ভেলভেটে মুড়িয়ে রেখে দিলেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এর ফলে আমরা নিশ্চিত হলাম, সফল আমাদের এক্সপিডিশন!'

তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন লিলিয়া। 'আমরা প্রমাণ করে দিলাম, সত্যিই ছিল আটলান্টিস! ওটা পৌরাণিক কোনও কাহিনি নয়!' স্বামীর গালে চুমু দিয়ে বললেন, 'এবার শুধু খুঁজে বের করতে হবে আটলান্টিস, তাই না, ডার্লিং?'

'নিশ্চয়ই! এক পা এক পা করে সামনে বাড়ব আমরা।'

তখনই সুড়ঙ্গের অনেক গভীর থেকে এল চিৎকার। কে যেন ডাকছে ওদেরকে। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ডাকল। এবারের কণ্ঠ রূপমের। 'ডক্টর! এখানে কী যেন আছে!'

মেঝেতে আর্টিফ্যাক্ট ফেলে তিব্বতীয় লোকটার পেছনে ছুটলেন ডক্টর আলম ও লিলিয়া। আধ মিনিট পর পৌঁছে গেলেন গাইডের সামনে।

'দেখুন, স্যর!' বাতি তুলে সমাধির দেয়াল দেখাল রুপম। 'ভেবেছিলাম ওটা পাথুরে দেয়ালে সামান্য ফাটল। কিন্তু তারপর টের পেলাম, ওটা অন্য কিছু।' এক হাতের গ্লাভ খুলে ফেলল সে, কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে দিল ফাটলে। ওপরে গেল তার আঙুল। 'এই ফাটল ঠিক সমান। উঠে গেছে সেই ছাত পর্যন্ত। আর ওদিকের দেয়ালে এমনই আরেকটা ফাটল।' নয় ফুট দূরের দেয়াল দেখাল সে।

'দরজা?' জানতে চাইলেন লিলিয়া।

ফাটলে আলো ফেলে ওপরে উঠছে ডক্টর আলমের চোখ। আট ফুট ওপরে সমান্তরালভাবে গেছে আরেকটা সরু ফাটল। 'মস্ত বড় দরজা! জিম দেখলে খুব অবাক হবে!' গলা উঁচু করলেন তিনি: 'জিম! ...জিম!' ওদিক থেকে জবাব এল না। শুধু ফিরল প্রতিধ্বনি। অবাক হয়ে বললেন আলম, 'অবাক কাণ্ড, কোথায় গেল ও?'

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন লিলিয়া। 'এই শতাব্দীর সেরা আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার বাদ দিয়ে হয়তো হিশু করতে গেছে!'

'ডক্টর আলম!' বলে উঠল আরেক তিব্বতী গাইড। 'বাইরে কী যেন! শুনছেন না, স্যর?'

নীরব হয়ে গেল সবাই। আটকে ফেলেছে শ্বাস। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রত্যেকে শুনল নিচু ধুপ-ধুপ আওয়াজ। সেই সঙ্গে বাড়ছে চাপা গর্জন।

অবাক হয়ে বললেন লিলিয়া, 'হেলিকপ্টার? ...এখানে?'

'এসো,' ঘুরেই গুহার প্রবেশপথের দিকে ছুট দিলেন ডক্টর আলম। পাথরের স্তূপের কাছে এসে ওপরের সংকীর্ণ জায়গাটা দিয়ে বাইরে দেখলেন। কালো হয়ে গেছে আকাশ। দড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন তিনি, পেছনে তাঁর স্ত্রী।

'চাইনিজ মিলিটারি?' জানতে চাইলেন লিলিয়া।

‘ওরা জানবে কী করে যে আমরা কোথায় আছি?’ বললেন আলম। ‘আমরা নিজেরাও তো যিয়াওদং পর্যন্ত জানতাম না কোথায় যাব।’ সরু প্রবেশপথ দিয়ে বেরিয়ে থামলেন চওড়া কার্নিশে। অনেক খারাপ হয়ে গেছে পরিবেশ। হু-হু করে বইছে শীতল হাওয়া। যে-কোনও সময়ে শুরু হবে তুষারপাত।

কিন্তু অন্যদিকে চোখ ডক্টর আলমের। সরাসরি চেয়ে আছেন অগ্রসরমাণ হেলিকপ্টারের দিকে। এদিকে কোথাও নেই তাঁর আর্কিওলজিস্ট বন্ধু।

ডক্টর আলমের পাশে থমকে গেলেন লিলিয়া।

ছুটে আসা হেলিকপ্টার চাইনিজ নয়। গায়ে কোনও মার্কিং নেই। মুছে ফেলা হয়েছে টেইল নাম্বারও। কালচে ধ্‌ যান্ত্রিক ফড়িংটা দেখে দু'জনের মনে হলো, ওটা কোন স্পেশাল ফোর্সের বাহন। কিন্তু তারা কারা?

এয়ারক্রাফট সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না তাঁরা। শুধু বুঝলেন, ওটা প্রকাণ্ড। পেটের ভেতর আঁটবে অন্তত তিরিশজন লোক। ওই যে ককপিটের কাঁচের ওদিকে দুই পাইলট। একইসঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে কী যেন খুঁজছে তারা।

হ্যাঁ, তাঁদেরকেই খুঁজছে তারা!

‘লিলিয়া, আবারও গুহায় ঢোকো!’ স্ত্রীকে বললেন ডক্টর আলম। দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেছে মুখ।

অনেক কাছে চলে এসেছে কপ্টার। নামছে বলে নিচের পাথরের ওপর থেকে উড়তে লাগল তুষারকণা। দেরি না করে স্ত্রীর পর গুহায় নেমে পড়লেন আলম। জানলেন না, আগেই তাঁকে দেখে ফেলেছে দুই পাইলটের একজন।

দানবীয় এলিয়েন পতঙ্গের মত ঘুরে গেল হেলিকপ্টার, নামছে। খুলে গেল পেছনের দরজা। ওখান থেকে নিচে পড়ল দুই কয়েল দড়ি। দুই সেকেণ্ড পর র‍্যাপেল করে পাহাড়ে নামল

কালো পোশাক পরা দু'জন। নামছে আরও লোক। প্রত্যেকের কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল।

গুহার ভেতরের স্তূপ থেকে অসহায় চোখে লোকগুলোকে দেখলেন ডক্টর আলম। তাঁদের এক্সপিডিশনে অস্ত্র বলতে একটি মাত্র হান্টিং রাইফেল। আনা হয়েছিল বুনো পশুকে ভয় দেখিয়ে বিদায় করতে। কিন্তু সেটাও আছে এখন নিচের ওই ক্যাম্পে!

হেলিকপ্টার থেকে নামছে আরও সশস্ত্র লোক!

পিছলে নামতে গিয়ে পাথরের স্তূপ থেকে মেঝেতে হড়কে নামলেন ডক্টর আলম।

'ফেরদৌস! ব্যথা লাগল?' আঁৎকে উঠলেন লিলিয়া। 'বাইরে এসব কী হচ্ছে?'

'মনে হয় না এরা ভাল লোক,' থমথম করছে ডক্টর আলমের মুখ। 'এরই ভেতর নেমে এসেছে অন্তত ছয়জন। সবার সঙ্গে অস্ত্র।'

'হায়, ঈশ্বর! জিম কোথায়?'

'জানি না। ওকে দেখিনি। মন্দিরের ভেতরের ওই দরজা খুলতে হবে, এসো!' সমাধি লক্ষ্য করে ছুট দিলেন লিলিয়া। লাশগুলোর কাছ থেকে আর্টিফ্যাক্ট তুলে নিয়ে পিছু নিলেন আলম।

পাগলের মত ব্যস্ত হয়ে সমাধির দেয়ালের দরজা খুলতে চাইছে তিব্বতীয়রা। কিন্তু কোনও নব বা হাতল নেই। 'না, কিচ্ছু নেই এদিকে!' হতাশ হয়ে বলল রুপম।

গলা কেঁপে গেল ডক্টর আলমের, 'দরজা খোলার হাতল, কোথাও চাপ দেয়ার জায়গা, কোনও চাবির গর্ত— কিছু না কিছু থাকবেই!' করিডোরের দিকে তাকালেন। গুহার ভেতর ঢুকে পড়েছে একটা ছায়ামূর্তি। ঝুপ করে নেমে এল মেঝেতে। তারপর আরেকজন! 'হায়, কপাল! ওরা ঢুকে পড়েছে সুড়ঙ্গে!'

খপ্ করে স্বামীর বাহু ধরলেন লিলিয়া। 'ফেরদৌস!'

ওপরের প্রবেশপথ ব্যবহার করে একের পর এক ছায়ামূর্তি নামছে গুহার মেঝেতে।

পাঁচজন তারা। সশস্ত্র।

স্ত্রীকে নিয়ে গুহার ভেতর আটকা পড়েছেন ডক্টর আলম।

অন্ধকারের কালোকে চিরে দিল লাল রশ্মি। লেসার সাইট। এরপর এল হ্যালোজেন ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো। আঁধার কেটে দিনের মত হয়ে গেল গুহার অভ্যন্তর। সমাধিতে জড়সড় হয়ে গেছে নিরীহ বাঙালি আর্কিওলজিস্টের নিরস্ত্র দল, হতবাক। সরাসরি আলমের চোখে পড়েছে ধাঁধানো আলো। বুঝলেন না কী করা উচিত। কোথাও যাওয়ার নেই। বুকের লেসারের রক্তিম বিন্দু বুঝিয়ে দিচ্ছে, যে-কোনও সময়ে খুন হবেন তাঁরা।

'ডক্টর আলম!'

ডাক শুনে অবাক হলেন আর্কিওলজিস্ট। এরা ওঁর নাম জানল কোত্থেকে?

'ডক্টর আলম!' ভারী কণ্ঠে ডাকল কেউ। যে সুরে ডাকা হয়েছে, তাতে সে সম্ভবত গ্রিক। 'একদম নড়বেন না! কেউ নড়বে না!' এবার বলল ডক্টরের স্ত্রীর উদ্দেশে, 'মিসেস আলম, দয়া করে ছুটে পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

সামনে বাড়ছে ভারী কণ্ঠের লোকটা।

'আপনি কে? কী চান?' জানতে চাইলেন ডক্টর আলম।

আর সবাই থেমে গেলেও ফ্ল্যাশলাইট হাতে এল একজন। তার উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুট। 'আমার নাম ডোনাটি লুক্কা।' মন্দিরে যে আলো, তাতে তাকে পরিষ্কার দেখা দেখলেন ডক্টর আলম। ত্রিকোণ চেহারা। নাক বলে দিল সে রোমান পুরুষ। কপাল থেকে চুল সরিয়ে ব্যাকব্রাশ করেছে। 'বলতে খারাপ লাগছে, ডক্টর, আপনাকেই চাই।'

বিস্ময়-ভয় লুকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লিলিয়া, 'আসলে কী বলতে চান?'

'আমি শুধু বলব, আপনাদেরকে এভাবে আটলান্টিস খুঁজতে দিতে পারি না। এ কাজটা করলে দুনিয়ার ওপর মস্ত বিপদ নেমে আসবে। আমি সত্যিই দুঃখিত।' মাথা নিচু করে ফেলল লোকটা, যেন লজ্জিত। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছিয়ে গেল। 'মনে রাখবেন, ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা ছিল না আমাদের।'

ডক্টর আলম ও তাঁর স্ত্রীর বুকে স্থির হলো লেসারের লাল বিন্দু। মুখ খুললেন আলম, 'একমিনিট...' আর একটা কথাও বলতে পারলেন না, বদ্ধ গুহার ভেতর গর্জে উঠল বেশ কয়েকটা অটোমেটিক রাইফেল। কানে তালা লেগে গেল সবার।

গুলিবিদ্ধ ছিন্নভিন্ন বুক নিয়ে পড়ে থাকল ছয়জন মৃত অভিযাত্রী।

ওদিকে চেয়ে থাকল ডোনাটি লুক্কা। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর একেবারে মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। এবার একের পর এক নির্দেশ দিল লোকটা। 'এই এক্সপিডিশনের সঙ্গে জড়িত যে-কোনও কিছু সরিয়ে নেবে। ম্যাপ, নোট— সব! নাযিদের লাশও সার্চ করবে। সন্দেহজনক কিছুই যেন পাওয়া না যায় এখানে! ক্রাউসের দলের লাশ বা নতুন এক্সপিডিশনের লাশ পড়ে থাকুক। ঐতিহাসিক এক রহস্য আগেই চাপা পড়েছিল, এবার সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে দুই রহস্যময় এক্সপিডিশন।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল ডোনাটি লুক্কা। এদিকে লাশ তল্লাসীতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তার লোক।

'ডোনাটি!' একমিনিট পর ডাকল এক লোক। বসে আছে সে ডক্টর আলমের লাশের পাশে।

'কিছু পেলে, অ্যালেকসেই?'

'নিজের চোখে দেখে যাও।'

রাশানের পাশে গিয়ে থামল ডোনাটি লুক্কা। 'মাই গড!'

'সত্যিকারের অরিচালকাম, তাই না?' জানতে চাইল অ্যালেকসেই মিশকিন। একটু আগে ভেলভেট খুলে বের করেছে জিনিসটা। চকচক করছে উজ্জ্বল আলোয়। কমলাটে ঝিলিক পড়ছে মিশকিন ও লুক্কার চোখে-মুখে।

'হ্যাঁ, ওই জিনিসই। তবে আগে কখনও আস্ত কোনও আর্টিফ্যাক্ট দেখিনি। আগের সবই ছিল ছোট ছোট টুকরো।'

'দারুণ সুন্দর। দাম হবে কোটি কোটি ডলার!'

'তা তো হবেই।' দীর্ঘক্ষণ আর্টিফ্যাক্ট দেখল ডোনাটি লুক্কা, তারপর হঠাৎ করেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'কিন্তু লুকিয়ে ফেলতে হবে মানুষের চোখ থেকে।' কোট থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে সমাধির দেয়াল পরীক্ষা করতে লাগল সে। কোথাও এমন কোনও চিহ্ন নেই যে মনে হবে, এখানে কোনও গোপন দরজা আছে। প্রাচীন দেবতার বেদির ওপর স্থির হলো হাতের আলো। দ্রুত পড়ল লিপিবদ্ধ অক্ষর। 'গ্লোয়েল... কিন্তু কিছুই লেখেনি আটলাণ্টিস সম্পর্কে।'

'আমাদের উচিত সমাধি ঘুরে দেখা,' পরামর্শের ভঙ্গিতে বলল অ্যালেকসেই মিশকিন। সময় নিয়ে আটলাণ্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট দেখে নিয়ে সাবধানে মুড়িয়ে রাখল ভেলভেটে।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল ডোনাটি লুক্কা, 'না। এখানে কিছুই নেই। লুঠ হয়েছে আগেই। আমার ধারণা ছিল, আটলাণ্টিস আবিষ্কারের ব্যাপারে অনেক এগিয়ে গেছে আলম দম্পতি। কিন্তু এটাও ছিল কানা গলি। ঝড়ের আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।' ঘুরে গটমট করে গুহার প্রবেশদ্বারের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

তার পেছনে চট্ করে কাঁধের ওপর দিয়ে চারপাশ দেখল মিশকিন। কেউ চেয়ে নেই। পুরু জ্যাকেটের পকেটে লুকিয়ে

গেলল সে ছোট্ট আর্টিফ্যাক্ট।

আকাশে চক্কর কাটছে হেলিকপ্টার, ওটার দিকে কার্নিশ থেকে জ্বলন্ত ফ্লেয়ার নাড়ছে ডোনাটি লুক্কা। যান্ত্রিক ফড়িং নেমে আসছে দেখে ঘুরে দাঁড়াল সে, চোখ রাখল অভিশপ্ত এক্সপিডিশনের জীবিত সদস্যের চোখে। 'আপনি ঠিক কাজই করেছেন।'

হুডের আড়ালে আছে আর্কিওলজিস্টের মুখ। 'কাজটা করে গর্ব বোধ করছি না। ওরা আমার বন্ধু ছিল। এবার ওদের মেয়ের কী হবে?'

'ওর বাবা-মাকে খুন না করে উপায় ছিল না,' বলল ডোনাটি লুক্কা। 'ব্রাদারহুড চায় না কেউ খুঁজে বের করুক আটলান্টিস।' ভুরু কুঁচকে ফেলল সে। 'বিশেষ করে লোভিস ডেনিয়েলসন যেন না পায় ওই সাইট। আলম দম্পতির মত আর্কিওলজিস্টদের ফাণ্ড দিচ্ছে সে। ভাল করেই জানে, আমরা চোখ রেখেছি তার ওপর।'

'মিস্টার ডেনিয়েলসন যদি বোঝেন আপনার হয়ে কাজ করেছি?' নার্ভাস সুরে জানতে চাইল বিশ্বাসঘাতক লোকটা।

'তাকে বুঝিয়ে দেবেন, দুর্ঘটনা হয়েছে পাহাড়ে। কেউ জানবে না, কপ্টার থেকে যুয়োলাওড্যাঙের এক কিলোমিটার দূরে নামিয়ে দেব আপনাকে। কোনও ঝুঁকি নেই তাতে। ওখান থেকে হেঁটে পৌঁছবেন গ্রামে। ডেনিয়েলসনকে ফোনে বলবেন দুঃখজনক দুর্ঘটনার কথা। বরফ বা পাথরের ওই অ্যাভালাঞ্চে আপনি ছাড়া কেউ বাঁচতে পারেনি।' হাত বাড়িয়ে দিল ডোনাটি লুক্কা। 'রেডিয়ো কই?'

প্যাক থেকে নিয়ে তার হাতে ট্র্যান্সমিটার দিল লোকটা। ওই যন্ত্রের কারণে জানাতে পেরেছে, ঠিক কোথায় আসতে হবে। 'আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে

হবে। চাইনিজ কর্তৃপক্ষ... ইউ.এস. এম্বাসি...

'গল্প গুছিয়ে নেবেন, তারপর সরবেন না ওই গল্প থেকে, তাতেই হবে। আমেরিকায় পৌঁছতেই পাবেন পারিশ্রমিক। চোখ-কান খোলা রাখবেন। ডক্টর আলমের মত কেউ আবারও ওই পথে পা বাড়ালে, দেরি করবেন না জানাতে।'

'সেজন্যেই টাকা দেন,' মিইয়ে যাওয়া স্বরে বলল বেঈমান লোকটা।

শীতল হাসল লুক্কা। চোখ সরিয়ে নিয়ে দেখল, আঁধার আকাশে ন্যাভিগেশন বাতি জ্বেলে নামছে কপ্টার।

পাঁচ মিনিট পর আবারও ফিরতি পথে রওনা হলো ওটা। বেশ কয়েকটা লাশ ছাড়া কিছুই পড়ে থাকল না পাহাড়ের বদ্ধ গুহায়।

দুই

নিউ ইয়র্ক, চার বছর পর।

বড় করে দম নিয়ে কালো কাঁচ বসানো দরজার সামনে থামল ডক্টর লাবনী আলম— বিদূষী, সুন্দরী ও লাজুক মেয়ে। ওর বাবা-মা বেঁচে থাকলে গর্বিত হতেন। কালো কাঁচে একবার দেখে নিল নিজেকে। সবসময় সাধারণ পোশাক পরে, কিন্তু আজ পরনে আনুষ্ঠানিক ড্রেস— সোয়েটশার্ট ও কার্গো প্যান্টের বদলে নীল ট্রাউযার সুট। পনিটেইল না হয়ে কাঁধে বিছিয়ে আছে কালো চুল। জরুরি মিটিঙে এসেছে লাবনী। সবাইকে চেনে, তবুও

চাইছে প্রথম দর্শনেই বোঝা যাক ও সত্যিকারের পেশাদার আর্কিওলজিস্ট। কালো কাঁচে আরেকবার মুখ দেখল, জাবড়ে যায়নি লিপস্টিকের রং। বাবার কাছ থেকে পাওয়া চৌকো লকেট স্পর্শ করল গলার কাছে। ওটা ওর কাছে কবচের মত। যেদিন ভুল করেছিল পরতে, সেদিনই মারা যান ওর বাবা-মা। এরপর কখনও হাতছাড়া করেনি ওটা। কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল, মানসিকভাবে তৈরি হয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল লাবনী।

ঘরের পেছনে পুরনো, ভারী ওক কাঠের কালো ডেস্কের ওদিকে তিন প্রফেসর, চোখ তুলে দেখলেন লাবনীকে।

বামে মোটা প্রফেসর ফিলবি, হাসিখুশি, সদয় মানুষ। ক্যাম্পাসে শোনা যায়, সাধারণ সব এক্সপিডিশনে ফাণ্ড দিতেও আপত্তি করেন না। সহজেই তাঁকে নিজ পক্ষে টানতে পারবে, ভাবছে লাবনী।

কিন্তু সমস্যা করবেন বদমেজাজী মহিলা প্রফেসর ট্রিপ। কেন যেন প্রথম থেকেই লাবনীকে পছন্দ করেন না। অবশ্য তাতে অখুশি নয় ও। ক্যাম্পাসে গুজব আছে, তরুণী যে-কোনও সুন্দরী মেয়েকে দেখলেই রেগে যান ওই হিংসুটে মহিলা।

ডেস্কের ডানদিকে আছেন প্রফেসর করেলি, পারিবারিক বন্ধু। তাঁর ওপর ভরসা করছে লাবনী। বাবা-মার মৃত্যুর সংবাদ তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন ওকে।

আসলে তাঁর ওপরেই নির্ভর করছে ও ফাণ্ড পাবে কি না।

ভোটাভুটি হবে নির্ঘাত।

প্রফেসর ফিলবি ফাণ্ড দিতে রাজি হবেন, মানা করে দেবেন প্রফেসর ট্রিপ, আর তখন প্রফেসর করেলির ভোট লাবনীর দিকে পড়লে আর চিন্তা নেই। তবুও বুকের ভেতর ঢিব-ঢিব করছে ওর।

'ডক্টর আলম,' মুখ খুললেন করেলি, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং,' মিষ্টি করে হাসল লাবনী। সাহস এল প্রফেসর ফিলবিকে হাসতে দেখে। ক্ষুধার্ত শকুনের দৃষ্টিতে ওকে দেখছেন প্রফেসর ট্রিপ।

প্যানেলের সামনে একমাত্র চেয়ারে বসল লাবনী।

'হ্যাঁ, তোমার সাবমিট করা খসড়া নিয়ে আলাপ করেছি আমরা,' বললেন প্রফেসর করেলি। 'অত্যন্ত অস্বাভাবিক, আগে এই ডিপার্টমেন্টে এমন প্রস্তাব আনেনি কেউ।'

'আমার মনে হয়েছে সত্যিকারের চমৎকার প্ল্যান,' বললেন প্রফেসর ফিলবি। 'অনেক ভেবেচিন্তে করেছে ও এই দুঃসাহসী পরিকল্পনা। ওয়েলডান! আমি সবসময় চাই সাধারণ অভিযানের বদলে এমনই দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজে নামবে ছেলে-মেয়েরা।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্রফেসর, আমি এব্যাপারে একমত নই,' রুঠা সুরে বললেন প্রফেসর ট্রিপ। আরও কঠোর হলো কণ্ঠ: 'মিস আলম...' "ডক্টর" পদবি কেটে ফেলে দিয়েছেন। মনে মনে "বুড়ি ডাইনী" বলে গালি দিল লাবনী। 'আমার ধারণা ছিল, তুমি ডক্টরেট করেছ আর্কিওলজির ওপর, মিথোলজির ওপর নয়। ওই আটলান্টিস পৌরাণিক কাহিনি ছাড়া কিছুই নয়।'

'আগে যেমন ভাবা হতো উবার, ট্রয় বা মহাবালিপুরামের সাত প্যাগোডা নেই— তেমন?' পাল্টা খোঁচা দিল লাবনী। ভাবছে, প্রফেসর ট্রিপ যখন আগেই ঠিক করেছে কী সিদ্ধান্ত নেবে, তো লড়াই না করে হারব কেন!

মাথা দোলালেন করেলি। 'সেক্ষেত্রে আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে চাইব তোমার থিয়োরি।'

'অবশ্যই,' ঘরের প্রজেক্টরে ওর পুরনো অ্যাপল ল্যাপটপের সংযোগ দিল লাবনী। পর্দায় এল মেডিটারেনিয়ান সাগর ও আটলান্টিকের পশ্চিম এলাকার মানচিত্র।

‘আটলান্টিস ছিল হাজার হাজার বছর ধরে কিংবদন্তী, তবে অল্প কয়েকটি উৎস থেকে জানা গেছে তার বর্ণনা,’ বলল লাবনী। ‘তার ভেতর প্রধান তথ্য প্রবাহ প্লেটোর ডায়ালগ্স্। যদিও প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতা থেকেও জানা যায়, মেডিটারেনিয়ান এলাকায় ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এক রাজ্য। এসব আটলান্টিয়ানদের ব্যাপারে ছড়িয়ে আছে অনেক গল্প। বলা হতো তাদেরকে সাগরের মানুষ। হামলা করত উপকূলবর্তী এলাকায়। আক্রান্ত হয়েছে মরোক্কো, আলজিরিয়া, লিবিয়া ও স্পেন। তবে ওই সভ্যতার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি বর্ণনা এসেছে প্লেটোর টিমেউস ও ক্রিটিয়াস থেকেই...’

‘এগুলো সামান্য গল্প তা সবাই জানে,’ বাধা দিয়ে বললেন প্রফেসর ট্রিপ।

‘এজন্যেই ব্যাখ্যা দেব আমার থিয়োরির প্রথম অংশের,’ বিতর্ক হবে আগেই জানে লাবনী। ‘কেউ বুকে হাত রেখে বলতে পারবে না, প্লেটোর ডায়ালগ্স্— অর্থাৎ টিমেউস ও ক্রিটিয়াসের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নেই। হ্যাঁ, অবশ্যই আশ্রয় নেয়া হয়েছে কিছু কল্পনার, কিন্তু তা করা হয়েছে সেসময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতি বোঝাতে। এ কারণেই হ্রাস করা হয়েছে সময়কে। সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে চরিত্রগুলোকে। কিন্তু সামান্য কল্পনাশ্রয়ী গল্প লেখার জন্যে ডায়ালগ্স্ সৃষ্টি করেননি প্লেটো। আর এ কারণেই তাঁর লিখিত সাহিত্যকে ঐতিহাসিক দলিল বলে মেনে নিয়েছেন ইতিহাসবিদরা। অন্য দু'লেখায় যেহেতু আটলান্টিস এসেছে, সেক্ষেত্রে কেন তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে?’

‘তো ধরে নিয়েছ আটলান্টিস বিষয়ে প্লেটো যা লিখেছেন, তা সবই সত্যি?’ জানতে চাইলেন প্রফেসর করেলি।

‘আমার ধারণা: যা লিখেছেন, নিজেও তা বিশ্বাস করতেন

তিনি। তাঁর দাদা ক্রিটিয়াস দ্য এল্ডারের কাছে শোনা কাহিনি লেখেন ক্রিটিয়াসে। ক্রিটিয়াস দ্য এল্ডার আবার আটলাণ্টিস সম্পর্কে জানতে পারেন সোলোনের কাছ থেকে ছোটবেলায়। সোলোন আবার শুনেছিলেন মিশরীয় পুরোহিতদের কাছ থেকে। পুরো বিষয়টি "চাইনিজ হুইসপার" বা বলতে পারি "হেলেনিক হুইসপার"-এর মত।' কৌতুক শুনে হেসে ফেললেন প্রফেসর ফিলবি। 'বারবার বর্ণনার সময় বদলে যেতেই পারে সত্যিকারের ঘটনা। পাল্টে যেতে পারে মূল বক্তব্য। হাতের লেখা থেকে কপি করে তারপর সেই কপি থেকে আবারও কপি করলে যা হয়। বিশেষ করে সংখ্যা টুকে নেয়ার সময় বেশি হয় এই ভুল। আমার ধারণা, ক্রিটিয়াস লেখার সময়েও এমন সংখ্যাগত ত্রুটি ঘটে। আর এ কারণেই আটলাণ্টিসের যে ভুল বর্ণনা দিয়েছেন প্লেটো, তা চট্ করে ধরা পড়বে বুদ্ধিমানের চোখে।'

'আমাদের চোখে তো পড়ল না, কী সেই ত্রুটি?' ভুরু কুঁচকে লাবনীর কাছে জানতে চাইলেন প্রফেসর ফিলবি।

'মোটেও নিখুঁত নয় প্লেটোর দেয়া আটলাণ্টিসের পরিমাপ। সবই হিসাব কষা হয়েছে গ্রিসের অঙ্কে। যেমন তিনি লিখেছেন, আটলাণ্টিসের রাজধানী দৈর্ঘ্যে তিন হাজার স্টেডিয়া, চওড়ায় দু' হাজার। প্রথমেই লেখা হয়েছে, নিখুঁত পরিমাণের জমির কথা। দ্বিতীয়ত, তা ঠিক গ্রিকদের পরিমাপের অঙ্ক অনুযায়ী। ওটা সত্যিকারের মিশরীয় হিসাব ছিল না।' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল লাবনী, 'কিন্তু আটলাণ্টিয়ানদের ব্যবহৃত স্টেডিয়ার পরিমাপ হবে মিশরীয় পরিমাপে— বা হতে পারে গ্রিকদের সবচেয়ে বড় পরিমাপ অনুযায়ী।'

ঠোঁট মুচড়ে ফেললেন প্রফেসর ট্রিপ। 'ইণ্টারেস্টিং,' যদিও কণ্ঠ বুঝিয়ে দিল তার উল্টো। 'কিন্তু এ থেকে কী করে খুঁজে বের করবে আটলাণ্টিস? তুমি তো জানোই না ওই সভ্যতার

মেযারমেন্ট কী ছিল। কেউ জানে না তা।'

চাপা দম নিল লাবনী। এবার যা বলবে, সেটা ওর থিয়োরির সবচেয়ে দুর্বল অংশ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখছেন তিন প্রফেসর। এখন কোথাও ভুল হলে খালিহাতে ফিরতে হবে ওকে।

নিজের সব আত্মবিশ্বাস জড় করে বলল লাবনী, 'আর এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক নিয়ে ভাবতে হয়েছে আমাকে। সহজ কথায়, প্লেটো যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে একেকটি স্টেডিয়া দৈর্ঘ্যে এক শ' পঁচাশি মিটার, বা প্রায় ছয় শ' সাত ফুট। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, প্রকাণ্ড ছিল আটলাণ্টিস দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে অন্তত তিন শ' সত্তর মাইল, প্রস্থে আড়াই শ'। অর্থাৎ, আকারে ছিল ইংল্যাণ্ডের চেয়েও প্রকাণ্ড।' পর্দার মানচিত্র দেখাল লাবনী। 'এমন কী পানির নিচেও অত বড় জায়গার লুকিয়ে থাকা কঠিন।'

'মদিরা?' ম্যাপ দেখালেন প্রফেসর ফিলবি, আফ্রিকা উপকূল থেকে চার শ' মাইল দূরে পর্তুগালের ওই দ্বীপপুঞ্জ। 'হতে পারে না ওসব দ্বীপ তলিয়ে যাওয়া আস্ত আটলাণ্টিসের টুকরো?'

'প্রথমে তা-ই ভেবেছি, কিন্তু টপোগ্রাফি মেলেনি। আসলে, প্লেটোর বর্ণনা অনুযায়ী অমন কোনও দ্বীপই নেই আটলাণ্টিক মহাসাগরে।'

নিজেকে বিজয়িনী ধরে নিয়ে নাক দিয়ে বিদঘুটে ঘোঁৎ শব্দ ছাড়লেন মহিলা প্রফেসর। বিপদ হতে পারে জেনেও একবার জ্বলন্ত চোখে তাঁকে না দেখে পারল না লাবনী, তারপর চট্ করে নজর দিল মানচিত্রে। 'আর তাই আরও মনোযোগী হয়েছি থিয়োরি নিখুঁত করতে। প্লেটো লিখেছেন: আটলাণ্টিস ছিল আটলাণ্টিক মহাসাগরে। অর্থাৎ পিলার্স অভ হেরাকেল্স্, বা বর্তমানে যাকে সবাই চেনে স্ট্রেইট অভ জিব্রাল্টার বা মেডিটারেনিয়ানের মুখ বলে, তার বাইরে ছিল আটলাণ্টিস দ্বীপ।

প্লেটো আরও যা হিসাব দিয়েছেন, সে অনুযায়ী ওটা ছিল দৈর্ঘ্যে প্রায় চার শ' মাইল। এ থেকে মনে হবে, ওখানে বুঝি ছিলই না ওই দ্বীপ, নইলে সঠিক নয় তাঁর পরিমাপ।'

নীরবে মাথা দোলালেন প্রফেসর করেলি।

তাঁর মনোভাব ধরতে পারছে না লাবনী। হঠাৎ ওর মনে হলো, তিনি ঠিক করে ফেলেছেন কী সিদ্ধান্ত নেবেন।

'তো কোথায় ছিল আটলান্টিস?' জানতে চাইলেন করেলি।

ঠিক যেন জানতেই চাওয়া হয়নি। লাবনী ভেবেছিল, ব্যাখ্যা দেয়ার শেষে নাটকীয়ভাবে জানাবে নিজের ধারণা। তা হবে না বুঝে দমে গেল ওর মন। স্ট্রেইট অভ জিব্রাল্টারের এক শ' মাইল পশ্চিম সাগরে আঙুল তাক করল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ওটা আছে আমার ধারণা গালফ অভ কেডিয-এ।'

'তোমার *ধারণা?*' টিটকারির হাসি ঝুলছে মহিলা প্রফেসরের ঠোঁটে। 'আর আমি ভেবেছি উপযুক্ত প্রমাণ হাতে পেয়ে কাজে নামতে চাইছ। তুমি তো দেখি আন্দাজে ভর করে মুখ চালাচ্ছ।'

'আশা করি ব্যাখ্যা দিতে দেবেন, কেন ওই ধারণা করছি, প্রফেসর ট্রিপ,' শান্ত স্বরে বলল লাবনী। 'আমি বোঝাতে পারব কী কারণে পৌঁছেছি ওই উপসংহারে। আমার থিয়োরির মূলে প্লেটোর বর্ণনা। ঠিকই লিখেছিলেন তিনি, সত্যিই ছিল আটলান্টিস। তাঁর ভুল ছিল শুধু পরিমাপে।'

'লোকেশন নিয়ে না ভেবে পরিমাপকে গুরুত্ব দিচ্ছ?' বললেন প্রফেসর ফিলবি। 'বর্তমান থিয়োরি অনুযায়ী, অতীত আটলান্টিস ছিল ক্রেটের সামান্য বাইরের স্যানটোরিনি, আর আটলান্টিয়ান সভ্যতা ছিল আসলে মিনোয়ানে।'

'হতেই পারত। প্রাচীন আমলের গ্রিকরা মিনোয়ানের কথা জানত। যদিও সময়কাল মেলে না। অগ্ন্যুৎপাতে স্যানটোরিনি ধ্বংস হয় সোলোনের আমলের নয় শ' বছর আগে। কিন্তু

আটলান্টিস তলিয়ে গেছে তারও অন্তত নয় হাজার বছর আগে।'

'দশ সংখ্যা নিয়ে যে ভুল করেন সোলোন, এ নিয়ে প্রায় সবাই একমত,' বললেন মহিলা প্রফেসর। 'আর এ কারণেই গল্প তৈরি হয়েছে মিনোয়ান আর আটলান্টিসকে ঘিরে।'

'কিন্তু মিশরীয়দের শতক ও হাজারের চিহ্ন কিন্তু একেবারে আলাদা,' মহিলাকে বলল লাবনী, 'অন্ধ না হলে ভুল করবে না কেউ। প্লেটো লিখেছেন টিমেউসে, আটলান্টিস ছিল আটলান্টিকে, মেডিটারেনিয়ান সাগরে নয়। তিনি কিন্তু ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। পশ্চিম থেকে পুবকে আলাদা করতে পারবেন না, এমন হওয়ার কথা নয়। আমার ধারণা, আটলান্টিয়ানদের কাছ থেকে গল্প গেছে মিশরীয়দের কাছে, আর তার কমপক্ষে নয় হাজার বছর পর ওই গল্প মিশরীয় পুরোহিতের মুখে শুনেছেন সোলোন। তাঁর কাছ থেকে ক্রিটিয়াসের কাছে, এরপর ওই গল্প শুনেছেন প্লেটো। সে আমলে উল্টেপাল্টে গেছে সংখ্যার পরিমাপ।'

'উল্টেপাল্টে গেছে?' ভুরু উঁচু করলেন প্রফেসর করেলি।

'আমি হয়তো ঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম, কিন্তু সমস্যার সমাধান দিতে পারব। ফুট, স্টেডিয়া ইত্যাদি পরিমাপের নাম একই রয়ে গেলেও নানান সভ্যতায় ছিল ভিন্ন পরিমাপের একক। এক সভ্যতা থেকে আরেক সভ্যতায় গল্প গিয়ে বদলে গেছে আসল পরিমাপ। আর এজন্যেই আজ জানার উপায় নেই কেমন বা কত বড় ছিল আটলান্টিস সভ্যতা। শুধু আঁচ করতে পারি, আটলান্টিয়ানরা যে এককই ব্যবহার করে থাকুক, তা ধরে নেয়া হয়েছিল স্টেডিয়া হিসেবে। আর বাস্তবে হেলেনিক পরিমাপের চেয়ে ছোট ছিল তাদের ব্যবহৃত সংখ্যার পরিমাপ।'

'তুমি মেয়ে তো দেখছি একেবারে কল্পনায় ভর করে কথা

বলছ,' ভুরু কুঁচকে বললেন প্রফেসর ট্রিপ।

'আমি শুধু যৌক্তিক কথা বলছি,' রাগ চেপে বলল লাবনী। 'ক্রিটিয়াস আটলান্টিসের যে মাপ দিয়েছেন প্লেটোকে, তার ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আটলান্টিয়ান দুর্গ ঘিরে রাখা খাল।'

গোঁফ মুচড়ে মন্তব্য করলেন প্রফেসর করেলি, 'যেখানে ছিল পসেইডন ও ক্লেইটো দেবতাদের মন্দির।'

'জী। প্লেটো লিখেছেন, খালের ভেতর ওই দ্বীপের ব্যাসরেখা ছিল পাঁচ স্টেডিয়া। কিন্তু আমরা যদি গ্রিক হিসাব ব্যবহার করি, ওই দ্বীপ বড়জোর আধমাইল চওড়া। এখন যদি আটলান্টিয়ান স্টেডিয়া এতই ছোট হবে, তা কত? কারণ ক্রিটিয়াসের কথা অনুযায়ী: বহু কিছু ছিল ওই দ্বীপে। পসেইডন দেবতার মন্দির ছিল সবচেয়ে বড়, দৈর্ঘ্যে পুরো এক স্টেডিয়া। কিন্তু ওখানে তো আরও সব দেবতার মন্দিরও ছিল। এ ছাড়া, প্রাসাদ ও অসংখ্য বাথহাউস... সেক্ষেত্রে ধরতে হবে, ওই দ্বীপ গিজগিজ করছিল ম্যানহাটানের মত।'

'এসব থেকে আটলান্টিয়ান স্টেডিয়া কতটা ছোট বা বড়, তা বুঝবে কী করে?' জানতে চাইলেন প্রফেসর ফিলবি।

'ধরে নেব, তাদের ছোট স্টেডিয়া গ্রিক ইউনিটের তিনভাগের দু'ভাগ,' বলল লাবনী, 'অর্থাৎ চার শ' ফুট। সেক্ষেত্রে ওই লেক দিয়ে ঘেরা দুর্গ-শহর ছিল একমাইলের চারভাগের তিনভাগ আকারের। সেক্ষেত্রে ওখানে এঁটে যাবে পসেইডনের মন্দির বা আর সব।'

নোট খাতায় ঘস-ঘস করে অঙ্ক কষতে লাগলেন প্রফেসর ফিলবি। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'এই পরিমাপ অনুযায়ী ওই দ্বীপ হবে... দেখি...'

মনে মনে হিসাব কষে ফেলেছে লাবনী, চট্ করে বলে দিল,

'ওই পরিমাপ অনুযায়ী আটলান্টিস দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ছিল দু' শ' চল্লিশ মাইল, চওড়ায় এক শ' ষাট।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর একই ফলাফল পেলেন প্রফেসর ফিলবি। 'হুম। তো ওটা কেডিযের উপসাগরে আঁটবে না।'

'কিন্তু হিসাবের অন্যান্য ভুলও মাথায় রাখতে হবে,' বলল লাবনী। 'প্লেটো লিখেছেন, ওই দ্বীপ ছিল আন্দাজ তিন হাজার বাই দু'হাজার স্টেডিয়া। মানুষকে বিশ্বাস করাতে গিয়ে বাড়িয়ে কথা বলা বা লেখা হয়। ওই কাজ হয়তো করেননি প্লেটো, কিন্তু কে বলবে তা করেননি মিশরীয় পুরোহিত? হয়তো চেয়েছিলেন সোলোনকে মুগ্ধ করতে। ধরে নিয়েছি, শতকরা পনেরো ভাগ ভুল হয়েছে বা বিশ ভাগ।'

'আবারও আন্দাজ, মিস আলম?' খুশিতে চকচক করছে মহিলা প্রফেসরের চোখ।

'বিশভাগ ভুল হলেও ওই দ্বীপ ছিল কমপক্ষে এক শ' নব্বুই মাইল লম্বা,' বললেন প্রফেসর ফিলবি।

'এ ছাড়া, নানান নিউমেরিকাল বেস থেকে তৈরি ভুল হিসাব...' বলতে গিয়ে লাবনী টের পেল, হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছে সুযোগ। 'বলব না আমার সব হিসাব ঠিক, আর সত্যি বলতে এ-কারণেই এখানে এসেছি... আমার কাছে আছে ডেটার সঙ্গে মেলে এমন থিয়োরি... আর... সুযোগ পেলে...'

খুব আত্মতুষ্টি নিয়ে জানতে চাইলেন প্রফেসর ট্রিপ, 'সম্পূর্ণ কেডিয সাগর সোনার সার্ভে করা বহু টাকার ব্যাপার, তোমার কি উচিত হবে স্রেফ আন্দাজে ভর করে ইউনিভার্সিটির কাছে এত টাকা চেয়ে বসা?'

'কিন্তু আমার থিয়োরি সত্য হলে, ওটা হবে ট্রয়ের পর সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার,' বলল লাবনী।

'আর তোমার ভুল হলে? এই ডিপার্টমেন্ট হারাবে মিলিয়ন

মিলিয়ন ডলার। কীসের জন্যে? কারণ তুমি বিশ্বাস করেছ সামান্য এক পৌরাণিক কাহিনি বা রূপকথা!'

'আমিও আপনার মতই চাই না এই ডিপার্টমেন্টের ফাণ্ড ফালতু খরচ হোক!' সত্যিই রেগে গেছে লাবনী। 'এই থিয়োরি প্রমাণ করে দেয়ার মত যথেষ্ট ডকুমেন্টেশন আর ঐতিহাসিক রেফারেন্স আছে আমার হাতে। পুরো দু'বছর প্রতিদিন বারো ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় করেছি এই রিসার্চে। সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে আপনাদের কাছে আসিনি।'

'কেন এসব করছ, লাবনী?' জানতে চাইলেন প্রফেসর করেলি।

নরম সুরে জানতে চাওয়া হয়েছে বলে অবাক হলো লাবনী। 'আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন, প্রফেসর?'

'বলতে চাইছি, এ কি আসলে নিজের জন্যে, না তোমার বাবা-মার স্মৃতিরক্ষায় করছ?' প্রফেসর করেলির চোখে-মুখে আন্তরিক সহানুভূতি।

জবাব দিতে চাইল লাবনী, কিন্তু গলায় আটকে গেল স্বর।

'আমি ফেরদৌস আর লিলিয়াকে খুব কাছ থেকে চিনতাম,' বললেন করেলি। 'দারুণ ভাল ক্যারিয়ার পেত, যদি না ছুটত পৌরাণিক গল্পের পেছনে। গত বেশ কয়েক বছর ধরে তোমাকে দেখছি ভালভাবে লেখাপড়া করতে, আর সত্যিই তোমার বেশ কিছু কাজ চমৎকার হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, তুমি তোমার বাবা-মার চেয়েও প্রতিভাবতী। কিন্তু ওদের মত বিপদের পথে পা বাড়ালে ভাল কিছুই পাবে না।'

'প্রফেসর জিম করেলি!' কষ্ট, অপমান আর রাগে গলা চড়ে গেল লাবনীর, চোখে জমেছে দু' ফোঁটা অশ্রু।

'আমি দুঃখিত, কিন্তু বলব, সব ছুঁড়ে ফেলে বুনো হাঁসের পেছনে ছুটলে নিজের সুনাম নষ্ট করবে, লাবনী।'

'আমি সুনাম চাই না, স্যর,' আড়ষ্ট স্বরে বলল মেয়েটা।

পাতলা ঠোঁটে একচিলতে হাসি নিয়ে বললেন প্রফেসর ট্রিপ, 'শুধু তোমার সুনাম নয়, এর সঙ্গে জড়িত ইউনিভার্সিটির সুনাম।'

'ক্যাথেরিন,' তাঁকে সতর্ক করে ঘুরে লাবনীকে দেখলেন প্রফেসর ফিলবি। 'ডক্টর... তোমার বাবা-মার মৃত্যু হয়েছে ওই আটলান্টিস খুঁজতে গিয়েই। আর ওই একই পরিণতি হতে পারে তোমার। কেন নেবে এমন ঝুঁকি? নিজেকে জিজ্ঞেস করো... রূপকথা কি জীবনের চেয়েও বেশি?'

এদের কথা যেন লাথি হয়ে লেগেছে লাবনীর পেটে। কয়েক সেকেণ্ড পর ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল ও, 'তা হলে কি ধরে নেব প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে আমার প্রস্তাব?'

নীরবে পরস্পরকে দেখলেন তিন প্রফেসর। তারপর আবার ফিরলেন লাবনীর দিকে। সরাসরি ওর চোখে চোখ রেখে বললেন করেলি, 'দুঃখিত, তোমাকে ফাণ্ড দিতে পারব না আমরা।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম।' প্রজেক্টর থেকে ল্যাপটপ খুলে নিল লাবনী। কালো হয়ে গেল পর্দা। থমথমে মুখে বলল অপমানিত মেয়েটা, 'সেক্ষেত্রে বলব, মূল্যবান সময় দেয়ায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ।'

'কিছু মনে নিয়ো না, লাবনী, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়, এটা স্রেফ প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত,' বললেন করেলি। 'বুদ্ধিমতী মেয়ে, ঠিকই বুঝবে প্রফেসর ট্রিপ কী বলেছেন। সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস ইতিহাস ও মিথোলজি। তোমার ট্যালেন্ট আছে, ভুল কাজে নষ্ট করবে না সময়।'

কয়েক সেকেণ্ড নিষ্পলক চোখে লোকটাকে দেখল লাবনী, তারপর তিক্ত সুরে বলল, 'উপদেশ দেয়ায় ধন্যবাদ, প্রফেসর।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। পেছনে ধুপ্ আওয়াজে

বন্ধ হলো দরজা।

মহিলাদের বাথরুমে ঢুকে পুরো দশ মিনিট লুকিয়ে থাকল লাবনী, তারপর শান্ত হলো মন। প্রথম পাঁচ মিনিট ভেবেছে, কীভাবে মুখ দেখাবে সবাইকে। তারপর বুকে জমল রাগ। প্রফেসর জিম করেলি কোন্ সাহসে ওর বাবা-মাকে এসবের ভেতর টেনে আনল?

হ্যাঁ, বাবা-মা মারা যাওয়ায় পাশে থাকার চেষ্টা করেছে লোকটা, খোঁজখবর নিয়েছে ওর লেখাপড়ার। কিন্তু তার মানেই এটা নয়, যা খুশি বলবে! অসহায় রাগে কিউবিকলের দেয়ালে ঘুষি বসাল লাবনী।

'ডক্টর আলম?' পাশের স্টল থেকে এল পরিচিত কণ্ঠ। প্রফেসর ক্যাথেরিন ট্রিপ।

মরুক কুত্তীটা!

দড়াম করে দরজা খুলে রেস্টরুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে প্রধান দালান ত্যাগ করল লাবনী, চারপাশে ব্যস্ত ম্যানহাটান। বুঝতে পারছে না, এবার কী করবে। একটু আগেও ভাবতে পারেনি ওরা এভাবে মানা করে দেবে ওকে।

বাড়ি ফিরব? ভাবল, এ ছাড়া উপায়ই বা কী? বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদব? না!

চারপাশ দেখল লাবনী। রাস্তার ওদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে এক লোক, পরনে চামড়ার কালো জ্যাকেট। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর চেহারা। পড়ছে না চোখের পলক, চেয়ে আছে সরাসরি। নির্ঘাত ডাকাত, নইলে খুনি। শিরশির করে উঠল লাবনীর বুক। পাত্তা দেব না ভেবে নিয়ে চোখের কোণে তাকে দেখল ও। চোখ সরায়নি সে!

ট্যাক্সির জন্য অস্বাভাবিক জোরে হাত নাড়ল লাবনী। পাশে একটা ক্যাব থেমে যেতে চট্ করে উঠে পড়ল পেছনের সিটে।

গাড়ি রওনা হয়ে যেতে আস্তে করে দম নিল। একবার ঘুরে দেখল পেছনে। যাক, ভাল, নীল একটা বাসের ওপাশে হারিয়ে গেছে লোকটা।

ওর অ্যাপার্টমেন্ট ইস্ট ভিলেজে, তৃতীয়তলায়। বাড়ি ফিরে ল্যাপটপ রেখে বসে পড়ল সোফায়। বুকের লকেটটা চোখের সামনে তুলে ভাবল, তাবিজ-কবচে তো কোনও কাজ হলো না! একবার মন চাইল খুলে ফেলবে ওটা। তাই করত, কিন্তু তখনই বেজে উঠল ল্যাণ্ড ফোন।

পাশের ছোট টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল লাবনী। 'হ্যালো?'

'ডক্টর লাবনী আলম?' পুরুষ কণ্ঠ।

নির্ঘাত সেলসম্যান। কঠোর সুরে বলল লাবনী, 'হ্যাঁ, কী চাই?'

'আমি হেণ্ড্রিক ড্রেক, কাজ করি ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনে।' চুপ হয়ে গেল লোকটা।

মাথা কাজ করছে লাবনীর।

ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশন? মানব-হিতৈষী সংস্থা। গরীবের জন্যে তৈরি করে নানান ওষুধ ও টিকা। এ ছাড়া, বৈজ্ঞানিক রিসার্চ করবার জন্যে আছে বিশাল তহবিল... আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনেও খরচ করে বিপুল টাকা।

একবার ঢোক গিলে বলল লাবনী, 'জী, বলুন?'

'শুনলাম ভার্সিটি থেকে বাতিল করে দিয়েছে আপনার প্রস্তাব,' বলল ড্রেক। 'বোকার কাজ করেছে।'

'আপনি জানলেন কী করে?' ভুরু কুঁচকে গেল লাবনীর।

'ভার্সিটিতে আমাদের ফাউণ্ডেশনের ওয়েল উইশার আছে। মূল কথায় আসি, ডক্টর আলম। প্রফেসররা আটলাণ্টিসের বিষয়ে নিরুৎসাহী হলেও আমরা আগ্রহী। স্বয়ং মিস্টার ডেনিয়েলসন

আমাকে বলেছেন, যেন আপনাকে জানিয়ে দিই, আজ লাঞ্চে আপনার সঙ্গে বসতে চান তিনি। আলাপ করবেন আটলান্টিস বিষয়ে।'

কথা শুনে ধক্ করে বুকের ভেতর মস্ত এক লাফ দিল লাবনীর হৃৎপিণ্ড। নরওয়ের লোভিস ডেনিয়েলসন? ওর ঠিক মনে নেই, দুনিয়া-সেরা দশ বড়লোকের লিস্টে এখন কত নম্বর তিনি। তবে পাঁচজনের মধ্যেই থাকবেন। নিজেকে সামলে শান্ত স্বরে বলল লাবনী, 'ও, তাই? বেশ। কখন আর কোথায় লাঞ্চ?'

'আপাতত ওশোনোগ্রাফিক সার্ভের এক এক্সপিডিশন নিয়ে আলাপ করছেন তিনি, তারপর বসবেন আপনার সঙ্গে। ধরুন, দুপুর দুটো? আমি আপনাকে তুলে নেব পৌনে একটার সময়।'

'আমার আপত্তি নেই।'

'তিনি বুঝতে চাইবেন আপনার থিয়োরি ঠিক কি না।'

'নিশ্চয়ই!'

'সঠিক সময়ে তুলে নেব।'

'আমার ঠিকানা...'

'জানি কোথায় থাকেন। আপনার মিটিং ফাউণ্ডেশনের নিউ ইয়র্ক অফিসে। জরুরি সব নোট সঙ্গে নেবেন।'

'কোনও সমস্যা নেই।' লাবনী আরও কিছু বলার আগেই কেটে গেল লাইন। ক্রেডলে রিসিভার রেখে এক লাফে উঠে দাঁড়াল লাবনী, নাচতে লেগেছে খুশিতে। বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন! এবার বুঝি পেয়েই যাবে দরকারী ফাণ্ড! ঠোঁটে লকেট তুলে চুমু দিল। 'সত্যিই, তুই সৌভাগ্য এনে দিস!'

তিন

আধঘণ্টা আগে নিজের সেরা পোশাক পরেছে লাবনী, তারপর থেকে চলছে পায়চারি। একটু পর পর দেখছে হাতঘড়ি। কখন আসবে হেণ্ড্রিক ড্রেক? লোকটা আসছে না কেন! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ভাগ্য। সত্যিই দেখা করবেন লোভিস ডেনিয়েলসন? আলাপ করবেন আটলান্টিস সম্পর্কে ওর থিয়োরি নিয়ে? পায়চারি করতে করতে প্রতিটি পয়েন্ট মুখস্থ করছে। একবার জানালার পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিল নিচে। আর তখনই চমকে গেল।

ব্লকের কোণে এই দালান, রাস্তার ওদিকে চট্ করে সরে গেল এক লোক। পরনে চামড়ার কালো জ্যাকেট। আজকে যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোকটাকে দেখেছে, তার পরনেও ওই একই ধরনের জ্যাকেট ছিল!

জানালার আড়াল থেকে ফুটপাথে চোখ রাখল লাবনী। হেঁটে যাচ্ছে লোকজন। ওই কালো জ্যাকেটকে আর দেখা গেল না।

না, ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয়, ভাবল লাবনী। নিউ ইয়র্ক মস্ত শহর। কত জ্যাকেটওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে কার খোঁজ রাখে!

চোখের কোণে দেখল বিশাল এক রুপালি গাড়ি। ওটা আসছে ওদের দালানের দিকেই। চট্ করে ঘড়ি দেখল লাবনী। দুপুর বারোটা বেয়াল্লিশ মিনিট।

দামি গাড়ি থেকে নেমে অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে ঢুকল এক লোক। কয়েক সেকেণ্ড পর বেজে উঠল ইন্টারকম।

এক পা সরে রিসিভার তুলে নিয়ে বলল লাবনী, 'হ্যালো?'

'ডক্টর আলম, আমি হেণ্ড্রিক ড্রেক।' লোকটার কণ্ঠের সঙ্গে মিশে আছে রাস্তা থেকে আসা আওয়াজ।

'নামছি!' একবার আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে, প্রিন্টআউট ভরা ফোল্ডার হাতে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল লাবনী।

নিচতলায় অপেক্ষা করছিল হেণ্ড্রিক ড্রেক। তার কণ্ঠ থেকে লাবনী বুঝতে পারেনি, সে কেমন লোক। তবে সুরে টেক্সাসের টান। প্রথমবার দেখেই মনে মনে প্রশংসা করল লাবনী। লম্বা সে, সুঠামদেহী, পরনে দামি নীল সুট ও সাদা শার্ট। পায়ে গুচ্চি শ্যু। চোখের কোণে ভাঁজ। বহু দিন কাজ করেছে রোদে। হাত বাড়িয়ে দিল লাবনীর দিকে। 'ডক্টর আলম, দেখা হওয়ায় খুশি হলাম।'

হ্যাণ্ডশেক করল লাবনী। 'আমিও।' লোকটার হাতের ত্বক খসখসে।

লাবনীর কণ্ঠের কাছে ঝুলন্ত লকেট দেখল সে। এক সেকেণ্ড পর দেখল ওর হাতে রাখা ফোল্ডার। 'সব নোট নিয়েছেন তো?'

'জী। আশা করি এতেই সন্তুষ্ট করতে পারব মিস্টার ডেনিয়েলসনকে।' নার্ভাস হাসল লাবনী।

'বেশ, চলুন, যাওয়া যাক।' গাড়ির দিকে পা বাড়াল ড্রেক।

প্রথমে ওই গাড়িটা রোলস-রয়েস বলে ভেবেছিল লাবনী, কিন্তু পরে দেখল ওটা আসলে পনেরো সালের বেন্টলি ফ্লাইং স্পার। যেমন বিলাসী, তেমনি দ্রুতগামী।

'দারুণ গাড়ি,' প্রশংসা না করে পারল না।

'মিস্টার ডেনিয়েলসন সবসময় সেরা জিনিস কেনেন,' গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল ড্রেক। হাতের ইশারা করল

চাপে পড়তে।

জীবনে প্রথমবারের মত এত দামি গাড়িতে চাপল লাবনী, নরম সিটে ডেবে গেল আধহাত। নাকে এল নতুন গাড়ির দারুণ সুন্দর মায়াবী গন্ধ। ড্রাইভিং হুইলের পেছনে এক লোক। লাবনীর পাশের দরজা বন্ধ করে সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠল ড্রেক। হাতের ইশারা করল ড্রাইভারের উদ্দেশে। ইঞ্জিনের বিন্দুমাত্র আওয়াজ ছাড়াই যেন ভাসতে ভাসতে বাঁকের দিকে চলল গাড়ি। বরাবরের মতই চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে লাবনী। আর তখনই আবারও চমকে গেল। রাস্তার উল্টো দিকে ওই সেই খুনি লোকটা! সেল ফোনে কথা বলছে। দৃষ্টি ওর ওপরেই! আঁৎকে উঠে শ্বাস আটকে ফেলল লাবনী।

'কোনও সমস্যা, ডক্টর?' ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওকে ড্রেক।

'না...' বাঁক পেরিয়ে গেছে বেন্টলি। পেছনে আড়াল হয়েছে ওই লোক। লাবনী একবার ভাবল, ওই লোকের কথা মিস্টার ড্রেককে বলবে কি না। তারপর ঠিক করল, না বলাই ভাল। ওই লোক সত্যি ঝামেলা করলে, তা সামলানোর দায়িত্ব পুলিশের। তা ছাড়া, বলতে গেলে চেনেই না ও হেণ্ড্রিক ড্রেককে, কিছু বললে কী না কী ভাববেন ভদ্রলোক। 'ভেবেছিলাম পরিচিত একজনকে দেখতে পেয়েছি।'

একবার মাথা দুলিয়ে অন্য দিকে তাকাল ড্রেক। আবারও বাঁক নিল বেন্টলি, চলেছে পশ্চিমে।

তাতে অবাক হলো লাবনী। একঘণ্টা আগেই ইণ্টারনেটে দেখেছে, কোথায় আছে ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের নিউ ইয়র্ক হেডকোয়ার্টার। ওই অফিস ইউনাইটেড নেশন্স-এর কার্যালয়ের একটু পুবে। সবচেয়ে সহজে যেতে চাইলে পুবে, সোজা ফার্স্ট অ্যাভিনু্য হয়ে...

কোনও প্রশ্ন না তুলে আপাতত অপেক্ষা করবে, ভাবল

লাবনী। বেন্টলিতে আছে স্যাটালাইট ন্যাভিগেশন সিস্টেম। হতে পারে, পুবে জ্যাম বলে আপ-টাউনে গিয়ে অন্য কোনও পথে পৌঁছুবে গন্তব্যে।

কিন্তু আরও দুই ব্লক পেরিয়ে গেলেও ওরা চলল পশ্চিমেই...

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' চাপা ভয় নিয়ে জানতে চাইল লাবনী।

'ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনে,' বলল হেণ্ড্রিক ড্রেক।

'ওটা না পুবে?'

রিয়ারভিউ মিররে ড্রাইভারের চোখে দুশ্চিন্তা দেখল লাবনী।

'আমরা যাওয়ার পথে একটু ঘুরে যাব,' বলল ড্রেক।

'এখন কোথায় চলেছেন?'

'সময় লাগবে না, দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'আপনি বলছেন না কেন কোথায় যাচ্ছেন!'

চট্ করে পরস্পরকে দেখল লোকদুটো।

'ঠিক আছে...' কর্কশ স্বরে বলল ড্রেক, 'ভেবেছি আগে ওখানে নিয়ে গিয়ে... হলো না!' সিটে ঘুরে গেল সে, জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটানে বের করল পিস্তল।

বিস্ফারিত হলো লাবনীর চোখ। 'এসব কী করছেন, মিস্টার ড্রেক?'

'বুঝছেন না? এমনি এমনি দিয়েছে ওরা ডক্টরেট?'

'মিস্টার...'

'চুপ!' আরেক হাত বাড়িয়ে দিল ড্রেক। 'কাগজপত্রগুলো দেখি!' পিস্তল তাক করেছে লাবনীর বুকে। নীরবে তার দিকে ফোল্ডার বাড়িয়ে দিল হতভম্ব মেয়েটা। 'কপাল খারাপ যে সঙ্গে করে ল্যাপটপ আনেননি! আপনার ব্যবস্থা করে ফিরে গিয়ে সব সরিয়ে ফেলতে হবে!'

'কী বলছেন এসব...' গলা কাঁপছে লাবনীর। ধড়ফড় করছে

গ্যক। বুঝে গেছে, কী করবে এ। 'হায়, আল্লা! আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

'আর উপায় কী!'

ত্রস্ত হরিণীর মত চারপাশ দেখল লাবনী। পালাতে হবে! দরজার হ্যাণ্ডেল টেনে বেরিয়ে যেতে চাইল। সম্ভব নয়। চাইল্ড লক। এক সেকেণ্ড পর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদিকের দরজায়। খুলল না ওটাও। পড়ে গেছে ফাঁদে! আঁকড়ে এল বুক। ভয়ে বিস্ফারিত হলো দু'চোখ। জন্মের আতঙ্ক নিয়ে দেখল হেণ্ড্রিক ড্রেককে।

কিন্তু ভীষণ বিস্ময় লোকটার চোখে। ওর দিকে চেয়ে নেই। দেখছে পেছনের কাঁচ।

জোরালো 'ধুম!' শব্দ শুনল লাবনী, আরামদায়ক সিট থেকে উঠে গেছে শূন্যে। এইমাত্র বেন্টলির পেছনে গুঁতো দিয়েছে আরেকটা গাড়ি! বেকায়দা ভঙ্গিতে ড্যাশবোর্ডে আছড়ে পড়েছে ড্রেক। এক সেকেণ্ড পর সামলে নিয়ে পিস্তল তাক করল পেছনের কাঁচে। ভীষণ ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেল লাবনী।

'সেই হারামজাদা!' খেঁকিয়ে উঠল ড্রেক।

'ব্যাটা জানল কী করে আমরা এখানে?' জানতে চাইল ড্রাইভার।

'জানি না! ঠেলে রাস্তা থেকে নামিয়ে দাও! তারপর গতি বাড়াও!'

কাত হয়ে সরে গেল বেন্টলি। মসৃণ চামড়ার সিটে পিছলে গেল লাবনী। ধুপ্ করে মাথা লাগল দরজার হাতলে। ওর ওপর দিয়ে বাইরে পিস্তল তাক করেছে ড্রেক।

তখনই আবারও এল গুঁতো!

এবারের ধাক্কা একপাশ থেকে। টলমল করে সরে গেল দুই টনি বেন্টলি। কর্কশ আওয়াজ তুলে ছিঁড়ল ধাতব পাত। জানালা

দিয়ে বড়, কালো এক এসইউভি দেখল লাবনী। কানের পাশে হুঙ্কার ছাড়ল ড্রেকের পিস্তল।

ভীষণ ভয়ে দু'হাতে কান চেপে ধরেছে বেচারি লাবনী। এইমাত্র চুরচুর হয়েছে পাশের জানালার কাঁচ। চাকার বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ তুলে পিছিয়ে গেল কালো এসইউভি। ভাঙা জানালা দিয়ে হু-হু করে এল হাওয়া।

ড্রেক আরও দু'বার গুলি করতেই পেছনের কাঁচ মেশানো প্লাস্টিক উইণ্ডশিল্ড ঝরঝর করে ঝরল উপুড় লাবনীর ওপর। ব্যস্ত হয়ে হর্ন বাজাচ্ছে একের পর এক গাড়ির ড্রাইভার। পিছনে পড়ছে আওয়াজ। গতি বাড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটছে বেণ্টলির ড্রাইভার। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। বারবার এদিক-ওদিক সরছে, সামনে বাড়তে দেবে না পেছনের গাড়িকে। সিটে পিছলে যাচ্ছে লাবনী।

'সোজা ওদিকে যাও!' ধমক দিল ড্রেক।

মাত্র সামলে নিচ্ছে লাবনী, এমন সময়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল বেণ্টলি। ক্রিচ-ক্রিচ আর্তনাদ ছাড়ছে চাকার টায়ার।

'যা-স্লা!' বলে উঠল ড্রাইভার। ধুপ্ করে কী যেন লাগল সামনে। লাবনী বুঝল, চাপা পড়ছে কেউ! শোনা গেল আর্তচিৎকার। গাড়ির হুডে উঠে এসেছে দেহটা। গতি-হ্রাস না করেই উল্টে এক্সেলারেটর দাবাল ড্রাইভার। হুড থেকে ছিটকে পড়ে গেল আহত লোকটা।

আরও দু'বার গুলি করল ড্রেক।

পেছনের গাড়িটার ইঞ্জিনের জোরালো গর্জন শুনল লাবনী। ওর মাথার ছয় ইঞ্চি ওপর দিয়ে পিস্তল তাক করেছে ড্রেক। সুযোগ পেয়ে দু'হাতে তার হাত নিচে টানল লাবনী, পরক্ষণে দাঁত বসিয়ে দিল কব্জিতে।

'ওরেব্বাপরে... শালী!' বেমক্কা কামড় খেয়ে চমকে গেছে

ড্রেক, তর্জনীর চাপ পড়ে গেল ট্রিগারে।

লাবনীর মাথা থেকে তিন ইঞ্চি দূরে সিট ফুটো করল বুলেট। তালা লেগেছে ওর কানে। আগুনের কমলা ঝিলিকে দৃষ্টি ঝাপসা। কী করবে বুঝছে না।

হ্যাঁচকা টানে জখমী হাত ছুটিয়ে নিয়েছে ড্রেক।

চোখে বুলেটের ঝিলিক, একটু একটু ফিরছে শ্রবণ-শক্তি, তখনই আরও গুলির আওয়াজ শুনল লাবনী।

কিন্তু ড্রেকের পিস্তল নয়, গুলি আসছে পেছন থেকে।

বুলেট বিঁধল ড্রাইভারের হেডরেস্টে। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল চামড়া ও ফোম। এক সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে ড্রাইভারের মগজে ঢুকেছে বুলেট। ছাত ও সামনের উইণ্ডশিল্ডে ছপাৎ করে লাগল হলদে-ধূসর মগজ ও তাজা লাল রক্ত।

কাত হয়ে গেল ড্রাইভারের লাশ। বাঁক নিয়ে আরেক দিকে চলেছে গাড়ি। ভয় পেয়ে খপ্ করে স্টিয়ারিং হুইল ধরল ড্রেক, সোজা করে নিল গাড়ি। তাতে পিছলে সিটের আরেক দিকে সরে গেল লাবনী।

এমন সময় আবারও ধুম্ করে গুঁতো দিল পেছনের গাড়ি।

কাকে যেন অভিশাপ দিল ড্রেক। ড্রাইভারের লাশের ওপর ঝুঁকে খুলে দিল ওদিকের দরজা। সিট-বেল্ট খুলে রাস্তায় ঠেলে ফেলল লাশ। সেণ্টার কন্সোল পেরিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। তখনই আবারও পেছনে গুঁতো দিল এসইউভি। আগের চেয়েও জোরে। নানান দিকে সরতে চাইছে বেণ্টলি। ওটাকে নিয়ন্ত্রণে এনে বামে বাঁক নিল ড্রেক। ভারী ওজন নিয়ে সরে যাচ্ছে একদিকে, সে-কারণে কর্কশ আওয়াজে আপত্তি তুলছে চাকা।

সিটে হড়কে যাওয়ায় ডানের দরজায় ঠুকে গেল লাবনীর মাথা। ধড়মড় করে উঠে বসল। লোকটা ব্যস্ত ড্রাইভ করতে, ব্যবহার করতে পারবে না পিস্তল...

অন্য গাড়িটা রেঞ্জ রোভার, চলে এসেছে পাশে। হুইলে যে লোক, তাকে আগেও দেখেছে লাবনী। কালো জ্যাকেট পরা ওই খুনে লোকটা...

তার হাতে মস্ত এক রুপালি পিস্তল, তাক করেছে ড্রেকের মাথা লক্ষ্য করে।

'মাথা নিচু করো!' চিৎকার করল সে।

সিটে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ ঢাকল লাবনী। বাইরে শুনল কামান দাগার মত দুই আওয়াজ। মাথা নিচু করে নিয়েছে ড্রেক। বিস্ফোরিত হলো সামনের সেফটি উইণ্ডশিল্ড। ঝোড়ো হাওয়ায় ভেতরে ঢুকল হাজার টুকরো কাঁচ ও প্লাস্টিক।

একহাতে হুইল ধরে বাম কাঁধের ওপর দিয়ে তিনবার গুলি ছুঁড়ল ড্রেক। চাকার তীক্ষ্ণ বিশ্রী আওয়াজ তুলে সরে গেল রেঞ্জ রোভার, আবারও চলে গেছে পেছনে।

চারপাশে হর্নের বিকট আওয়াজ। ভিড়ের ভেতর দিয়ে সাঁই-সাঁই করে গাড়ি নিয়ে চলেছে ড্রেক। কানে তালা লেগে গেল ধাতুর সংঘর্ষে। মুখ তুলে লাবনী দেখল, বিদ্যুদ্বেগে পাশ থেকে পিছিয়ে গেল একটা গাড়ি। ওরা আছে সেভেনটিন্থ ও এইটিন্থ স্ট্রিটের মুখে, সামনে সরাসরি ম্যানহাটানের পশ্চিম দিক। এদিকে এসে চওড়া হয়েছে রাস্তা। শেষমাথায় বরফ-ঠাণ্ডা পানি নিয়ে মন্থর গতির হাডসন নদী।

পিস্তল হাতে ব্যস্ত হয়ে কী যেন করছে ড্রেক, খেয়াল নেই স্টিয়ারিং হুইলের দিকে। লাবনী বুঝে গেল, অস্ত্র রিলোড করতে চাইছে লোকটা...

তার মানে গুলি করতে পারবে না!

ঝট্ করে উঠে বসেই ড্রেকের মুখ লক্ষ্য করে খামচি দিল লাবনী। ওকে ঠেকাতে গিয়ে পিস্তল দিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মারতে চাইল ড্রেক। চট্ করে পিছিয়ে গেছে লাবনী, আবারও

সামনে বেড়ে থাবা মারল মুখে। কী যেন ওর আঙুলের নিচে। নরম!

বদমাসটার চোখ!

মধ্যমার নখ দিয়ে চোখ উপড়ে নিতে চাইল লাবনী। তাতে বিকট এক আর্তনাদ ছাড়ল ড্রেক, অন্ধের মত পিছনে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল মেয়েটাকে।

'গাড়ি থামাও!' তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল লাবনী। চোখ পড়েছে স্পিডোমিটারে। বেন্টলি ছুটছে ষাট মাইল বেগে। আরও বাড়ছে গতি। সামনের রাস্তায় একদঙ্গল গাড়ি। ট্রাফিক বাতি সবুজ হবে বলে অপেক্ষা করছে।

আবারও চিল-চিৎকার ছাড়ল লাবনী। এতই ভয় পেয়েছে যে দু'হাত সরিয়ে নিয়েছে ড্রেকের মুখের ওপর থেকে। অবাক হয়ে দেখল, ওর আঙুল লাল হয়ে গেছে রক্তে। সঠিক সময়ে বিপদ বুঝে ডানে হুইল ঘুরিয়ে দিয়েছে ড্রেক। লাইনের পেছনের গাড়ির কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে ফুটপাথে চেপে বসল বেন্টলি। গুঁতো খেয়ে আকাশে উড়াল দিল কয়েকটা ট্র্যাশ ক্যান। তাতে ভয় কমল না লাবনীর। কারণ সরাসরি পশ্চিমের হাইওয়ে ধরে আসছে দ্রুতগামী সব গাড়ি! তার চেয়েও খারাপ, গতি আরও বাড়াচ্ছে ড্রেক!

ফুটপাথ ছেড়ে ঝড়ের গতি তুলে ওদিকের রাস্তায় নামল বেন্টলি। বডির নিচের অংশ ঘষে গেল অ্যাসফল্টে। সামনে থেকে আসা গাড়ির ড্রাইভাররা সতর্ক করছে হেডলাইট জ্বেলে, ঝটপট সরে যাচ্ছে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে, কষে চেপে ধরছে ব্রেক। কিন্তু থামার আগেই পেছনের গাড়িগুলো ধুপ-ধাপ আওয়াজে গুঁতো মারছে একে অপরকে।

উত্তরদিকের লেন ধরে ছুটছে বেন্টলি। বাড়তি কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই পৌঁছল মেডিয়ান-এ, চলেছে উল্টো পথে। আপ-

টাউন থেকে দক্ষিণ লক্ষ্য করে আসছে অসংখ্য গাড়ি!

'হায়, আল্লা!' আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল লাবনী।

গাড়ি ও ট্রাকের লেনের মাঝ দিয়ে উড়ে চলেছে ওরা। পিছনে পড়ছে দু'পাশের ড্রাইভার, একেবারে শেষসময়ে দেখছে বেন্টলির উন্মাদ ড্রাইভারকে। সামনে-পেছনে আর্তচিৎকার জুড়ে দিয়েছে অসংখ্য গাড়ির হর্ন।

'গাড়ি থামান! নইলে দু'জনই মরব!' আবারও ড্রেকের চোখে হামলা করল লাবনী। কিন্তু এবার তৈরি ছিল লোকটা।

ঠাস্ করে মেয়েটার কপালের একপাশে নামল পিস্তলের নল। তীব্র ব্যথায় অন্ধকার দেখল লাবনী। এলিয়ে পড়ে গেল পেছনের সিটে। রাস্তার বামে সরে গেল ড্রেক, পরক্ষণে ধাতব এক গেট উড়িয়ে সরাসরি চলল হাডসন নদীর একটি পিয়ার লক্ষ্য করে।

ভাঙা সব জানালা দিয়ে হু-হু করে আসছে দামাল হাওয়া। কপালের ভীষণ ব্যথা সহ্য করে মুখ তুলল লাবনী: একপাশে সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ওয়্যারহাউস, অন্য দিকে জং ধরা সব জাহাজের খোল।

সরাসরি সামনে নদী। ওপারে নিউ জার্সি। ভয়ে দম আটকে গেল লাবনীর। বুঝে গেছে, কী করছে হেণ্ড্রিক ড্রেক।

এক সেকেণ্ডের জন্যে ওকে দেখল লোকটা। বুজে গেছে এক চোখ, চারপাশে খামচির দাগ। গাল বেয়ে নামছে রক্ত। পরের সেকেণ্ডে দরজা খুলে ফেলল সে, গড়িয়ে নেমে গেল ছুটন্ত গাড়ি থেকে! বাতাসের ধাক্কা খেয়ে আবারও দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা। গাড়ির ক্রুয কন্ট্রোল চালু আছে বলে মোটেও কমল না গতি। ষাট মাইল বেগে ছুটছে বেণ্টলি। পিয়ারের শেষে অপেক্ষা করছে...

মাত্র একবার চিৎকারের সময় পেল লাবনী, পরক্ষণে পাতলা

তারের বেড়া ছিঁড়ে উড়াল দিল ভারী গাড়ি!

কয়েক সেকেণ্ড পর জোরালো ঝপাস্ আওয়াজ তুলে নামল বেন্টলি কালো পানির ভেতর!

হঠাৎ তুমুল গতি থামতেই ড্রাইভারের সিটের পেছনে আছড়ে পড়েছে লাবনী। ভাঙা জানালা দিয়ে হড় হড় করে ঢুকছে বরফ-ঠাণ্ডা পানি। বেন্টলির সামনের দিক ভারী, নিচে রওনা হতেই পানিতে দেখা দিল একরাশ ফেনায়িত বুদ্বুদ। এক সেকেণ্ড পর অসহায় লাবনীকে সহ নদী-তল লক্ষ্য করে নেমে গেল ওজনদার গাড়ি।

পেছনের জানালা দিয়ে বেরোতে চাইল লাবনী। কিন্তু বাধা হয়ে উঠল পেছনের সিটের উঁচু হেডরেস্ট। রাসায়নিক বর্জ্যে ভরা বিষাক্ত নদীর পানিতে জ্বলছে ওর চোখ। টেনে খুলতে চাইল কাছের দরজার হ্যাণ্ডেল। কিন্তু নড়ল না ওটা।

পাশের জানালা...

ওদিকের কাঁচ ভাঙা। চেষ্টা করলে বেরিয়ে যেতে পারবে হয়তো। জানালার ফ্রেম ধরে অনায়াসেই বের করে আনল কাঁধ, সমস্যা ছাড়াই বেরিয়ে এল বুক...

তার পরই থামতে হলো।

বুলেটে ভাঙা ড্রাইভারের সিটের হেডরেস্টে আটকে গেছে ওর পোশাক।

পেছনে লাথি দিয়ে নিজেকে ছোটাতে চাইল লাবনী। সম্ভব হলো না। ফালতু পোশাকটা ওকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে! দ্বিগুণ জোরে পা নাড়ল। শক্ত হাতে ধরেছে জানালার ফ্রেম। চাইছে ছিটকে বেরিয়ে যেতে। সামান্য ফেঁসে গেল কাপড়, কিন্তু ছিঁড়ল না।

বুক আঁকড়ে আসছে লাবনীর। চিরকৃতজ্ঞ হবে শুধু একটি বার দম নিতে পারলে। কিন্তু এখন শ্বাস নিলেই পানিতে ভরে উঠবে ফুসফুস।

তা হলে ডুবেই মরছি? ভাবল লাবনী। ঠিকই বলেছিল প্রফেসর করেলি? আটলান্টিস খুঁজতে গিয়ে শেষে মরবে...

না, তার কথা মিথ্যা! বাঁচতে হবে যেভাবে হোক!

কিন্তু মৃত্যু ঠেকাবে কী করে?

পানির নিচে আটকা পড়েছে গাড়ির ভেতর!

মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা! যে-কোনও সময়ে হাল ছেড়ে দম নেবে, আর তখনই রওনা হয়ে যাবে মৃত্যুর দিকে!

দম ওকে নিতেই হবে! কিন্তু বাতাস কোথায়?

কে যেন খপ্ করে ধরল ওর কোমর! কুমির নাকি!

এতই অবাক লাবনী, ঠোঁটের কাছে আটকে গেছে নিঃশ্বাস। শক্তিশালী একটা হাত কোমর জড়িয়ে ধরে ওপরে টানছে। আওয়াজ পেল না, কিন্তু লাবনী টের পেল, ছিঁড়ে যাচ্ছে ওর পোশাক। ওকে জানালা দিয়ে টেনে বের করল উদ্ধারকারী, চলেছে ওপরে। নিচের অন্ধকারে হারিয়ে গেল বেন্টলি।

ব্যথা ভরা বুক ও কানের পর্দায় ঢাকের দামামা— সামান্য বাতাসের জন্যে পাগল হয়ে উঠছে লাবনী। মন চাইল জাপ্টে ধরবে লোকটাকে। একটু বাতাস...

একটু... বাতাস...

না! মানুষটাকে জড়িয়ে ধরলে দু'জনই তলিয়ে যাবে!

মরবে!

হঠাৎ চারপাশে ছল-ছলাৎ আওয়াজ শুনল লাবনী। হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ, বুকের বাতাস ছেড়েই দম নিল। মুখে ঢুকল তেলতেলে পানির ছিটে। তা-ই কত ভাল! একহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে তীরের দিকে চলেছে উদ্ধারকর্তা। মৃত্যুভয় ও ব্যথা বিদায় নিতেই মানুষটার দিকে তাকাল লাবনী।

আরে! সেই লোক! ওকেই দেখেছে কালো চামড়ার জ্যাকেট পরে পিছু নিয়েছিল ওর। এখন চোখে হাসি আর কৌতুক!

'সেই আপনি, আবারও?' আঁৎকে উঠে ঢোক গিলল লাবনী।

খুশি মনে নিষ্ঠুর, খুনে লোকটা পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'আহা, কৃতজ্ঞতা আর কাকে বলে!'

'আপনি বাংলা জানেন?'

'আমি বাঙালি।'

ওরা পৌঁছে গেছে পিয়ারের ধারে। জং ধরা মই দেখাল সে। ওটা বেয়ে প্রথম স্তরের কংক্রিটের চাতালে উঠে প্রথম সুযোগেই শুয়ে পড়ল লাবনী। ওর পেছনে উঠেছে লোকটা, ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। 'চমৎকার ড্রেস তো তোমার !'

সন্দেহ নিয়ে নিজেকে দেখল লাবনী। এখন আর নেই ওর স্কার্ট! আছে শুধু সরু, গোলাপি জাঙ্গিয়া!

'হায়, আল্লা!' ধবধবে সাদা উরুসন্ধি দু'হাতে ঢাকতে চাইল লাবনী।

'এ থেকে বোঝা গেল, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ,' মন্তব্য করল বেয়াড়া লোকটা। 'নাও, চলো, ওপরে ওঠা যাক।' হাত বাড়িয়ে লাবনীকে টেনে তুলল। একেবারে পশু নয়, গা থেকে খুলে দিল জ্যাকেট।

ওটা দিয়ে কোমর ও উরু ঢেকে চেন টেনে নিল লাবনী। জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'বলেছি তো, আমি একজন বাঙালি। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে যাওয়া সুন্দরী মেয়েদেরকে তুলে আনায় ডিগ্রি আছে আমার। নামঃ মাসুদ রানা,' হালকা সুরে বলল যুবক।

নামটা শুনে প্রথমে কিছুই ভাবেনি লাবনী। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর চমকে উঠল। মা-মা...সু...দ... মাসুদ রানা? আরে! তা হলে কি এই যুবকই রানা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির চিফ? ওর ধারণা ছিল, সেই লোকের বয়স হবে অন্তত পঞ্চাশ। এর আছে সাগরগামী মস্ত মস্ত সব জাহাজের বিশাল বহর।

বাবার মুখে শুনেছে এর অঢেল প্রশংসা। মেক্সিকো, উরুগুয়ে আর পেরুতে কয়েকবার আর্কিওলজিকাল অভিযানেও বাবার পাশে ছিল এই লোক। শখের আর্কিওলজিস্ট, নামও করেছে। দু'হাতে লাখ লাখ ডলার সাহায্য দেয় দুস্থদের নানান সংস্থায়। কয়েকবার হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করেছে জঙ্গল-পাহাড়-মরুভূমি ও সাগর চুঁড়ে। বহু অভিযানে গেছে বলে তাকে বলা হয়, সত্যিকারের দুঃসাহসী বাঙালি অভিযাত্রী!

এখন ভীষণ লজ্জা লাগছে লাবনীর। মানুষটা আজ উদ্ধার না করলে মরেই যাচ্ছিল! আর কী ভেবেছে ও? বদমেজাজি, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এক ডাকাত বা খুনে...

লাবনীর ফর্সা গাল রক্তিম হতে দেখে কী যেন আঁচ করে নিয়েছে রানা। মিটিমিটি হেসে বলল, 'ভয় কাটল?'

'জ্-জী।'

'তুমি করেই বলতে পারো, তোমার চেয়ে বেশি বড় নই আমি। চলো, এবার ভাগি জানটা হাতে নিয়ে।' আরেক প্রস্থ মই দেখিয়ে দিল রানা।

কয়েক সেকেণ্ডে পিয়ারে উঠে এল ওরা। একটু দূরে, তীরে সেই কালো রেঞ্জ রোভার, এখনও চালু ইঞ্জিন। এরই ভেতর হাজির হয়েছে অনেকে। মাসুদ রানার উদ্দেশে হাততালি দিচ্ছে তারা।

একটু দূরে দুলকি চালে আসছে ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটির মোটা এক লোক। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'অ্যাই! এখানে কী হচ্ছে!'

'কিছুই না,' মিষ্টি হাসল রানা। 'আমরা চলে যাচ্ছি!'

'বললেই হলো? এইমাত্র আমাদের গেট উড়িয়ে দিয়ে ঢুকেছে একটা গাড়ি! এর জন্যে জবাব দিতে হবে!'

'সে-গাড়ি এখন পানির নিচে। জবাব পাবেন সেখানে।'

কিন্তু গার্ড সন্তুষ্ট হয়নি দেখে মাথা দোলাল রানা, হতাশ চেহারায় প্যান্টের বাম দিক থেকে টেনে বের করল ভয়ঙ্কর দর্শন এক দানবীয় পিস্তল। দু'দিন আগে রানা এজেন্সির ছেলেরা উপহার দিয়েছে। লম্বা ব্যারেল ঘুরে তাক হলো মোটকুর বুকে।

ভয় পেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সবাই। মোটকুও।

'আরও কোনও জবাব চাই?' জানতে চাইল রানা।

'না-না! কীসের জবাব!' চেহারা থেকে আতঙ্ক দূর করতে চাইছে মোটকু, সক্ষম হচ্ছে না।

'গুড। সেই গাড়ি থেকে নেমে গেছে খুব খারাপ এক লোক, আপনি বরং দেখুন তাকে ধরতে পারেন কি না। আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি ভদ্রমহিলাকে। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই!' আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল মোটকু।

ডানহাতে পিস্তলটা রেখে সামনে বেড়ে রেঞ্জ রোভারের প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলল রানা। লাবনী উঠে পড়তেই নিজে চাপল ড্রাইভিং সিটে। গাড়ি ঘুরিয়ে কয়েক সেকেণ্ডে গতি তুলল ষাট মাইলে। বেগ স্বাভাবিক হলো পশ্চিমের হাইওয়েতে উঠে। লাবনী শীতে কাঁপছে দেখে রানা চালু করে দিল হিটার।

'আসলে কী হলো, বলুন তো?' বলল লাবনী।

'সংক্ষেপে এই: একদল মন্দ লোক তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। আর আমার মতন ভাল লোকেরা অবশ্যই তোমাকে বাঁচাতে চাইবে। এর বেশি কিছুই না।'

'আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে কেন? আমি কী করেছি?'

লাবনী কী বিষয়ে কাজ করছে, তা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে জেনেছে রানা। তার আগে গত কয়েক দিন রানা এজেন্সির অফিসের সামনে দিয়ে যেতে দেখেছে মেয়েটাকে। প্রথম দিনই লক্ষ্য করেছিল তার সুন্দর চোখদুটো। পৃথিবীতে আর কোনও দেশের মেয়ের চোখ বাঙালি মেয়েদের চোখের মত অত মায়াবী

আর সুন্দর হয় না। রানা এজেন্সির শাখা প্রধান জুয়েল আখন্দও প্রথম দিনই খেয়াল করেছিল, লাবনীকে আগ্রহ নিয়ে দেখছেন মাসুদ ভাই। দ্বিতীয় দিন বলেছে, লাবনীর বাবা বাঙালি এক আর্কিওলজিস্ট ড. ফেরদৌস আলম, চার বছর আগে স্ত্রীসহ মারা গেছেন তিব্বতে। এরপর খুলে বলেছে, লাবনী সম্পর্কে যা জানে।

মেয়েটার বয়স মাত্র পঁচিশ। এত কম বয়সে আর্কিওলজির ওপর ডক্টরেট করেছে শুনে আরও কৌতূহলী হয়েছে রানা। কারণ মেয়েটির মা-বাবাকে ও ভাল করেই চিনত। চতুর্থ দিন, অর্থাৎ আজ সকালে ওর অফিসে কল দিলেন নরওয়ের বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন। ওর বসের সঙ্গে কলেজে পড়তেন। দু'চার কথা শেষ করে এলেন মূল বক্তব্যে। ওকে দিতে চান জরুরি একটা কাজ। চোখ রাখতে হবে এক মেয়ের ওপর। ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে তার। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন তুলেছে রানা: কী কারণে বিপদ হবে?

জবাবে লোভিস ডেনিয়েলসন বলেছেন, বুঝিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু আপাতত রানা নিশ্চিত থাকুক, তিনি কোনও অন্যায় অনুরোধ করছেন না। যোগাযোগ করেছিলেন বিসিআই চিফ, ওর বস মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে। তাঁরও সায় আছে, উনিও চান, রানা চোখ রাখুক ডক্টর লাবনী আলমের ওপর। কাজটা নেবে কি না, তা পরে মিস্টার ডেনিয়েলসনকে জানিয়ে দেবে, বলেছে রানা। ফোন রেখে সরাসরি কল করেছে বসের বাড়ির ল্যাণ্ড ফোনে। তাঁর মুখেই শুনেছে, কী ধরনের বিপদে পড়তে পারে মেয়েটা। ডেনিয়েলসনের অনুরোধ রক্ষার নির্দেশ দেননি বস, কিন্তু একটা দায়িত্ববোধ থেকে এতিম মেয়েটার ওপর চোখ রেখেছে রানা।

'তুমি কী করে বসো, সে-ভয়ে আগেই মেরে ফেলতে

চাইছে,' রাস্তার দূরে চোখ রানার। 'ওই গাড়িতে করে এসেছিল হেণ্ড্রিক ড্রেক। দু'বছর আগেও ছিল ইউ.এস. রেঞ্জার বাহিনীর মেজর। সে-সময় ইউনাইটেড নেশন্সের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিটে একই সঙ্গে কাজ করেছি আমরা। বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, কখন শত্রু হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। এখন দেখছি উল্টোপথে হাঁটছে।'

'আমাকে বলেছিল, কাজ করে ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের মালিক লোভিস ডেনিয়েলসনের হয়ে,' বলল লাবনী।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। 'মিথ্যা কথা।'

'বুঝলেন কী করে?'

'কারণ তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাকে অনুরোধ করেছেন স্বয়ং মিস্টার ডেনিয়েলসন। একই সঙ্গে হেণ্ড্রিক ড্রেককে অনুরোধ করেছেন তোমাকে খুন করতে... এটা হয়? না।' কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল রানা, 'সত্যি দেখা করতে চাও ভদ্রলোকের সঙ্গে?'

মাথা দোলাল লাবনী। 'জী।'

চার

রানার সহজ-সরল আচরণ ও মজার সব কৌতুক শুনে আড়ষ্ট 'আপনি' থেকে সুন্দর 'তুমি' সম্বোধনে নেমে এসেছে ডক্টর লাবনী আলম। কেন যেন ওর মন জানিয়ে দিয়েছে, সুযোগ্য এই দুর্ধর্ষ বাঙালি যুবককে ভয়ের কিছুই নেই। ওর যে-কোনও

বিপদে পাশে থাকবে।

'ও-ই যে ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশন,' বিমানের পোর্টহোলে টোকা দিয়ে লাবনীকে সঠিক দিক দেখিয়ে দিল রানা। 'আর ওই যে ওদিকে ভদ্রলোকের বাড়ি।'

বহু নিচে অদ্ভুত সুন্দর বরফে ঢাকা জমি। আবার কোথাও সম্পূর্ণ ন্যাড়া কালো পাথুরে পাহাড়।

ধূসর আকাশে ধীরে ধীরে নামছে বিমান।

নরওয়ের দক্ষিণ উপকূলে বার্জেন থেকে তিন মাইল দূরে রেইভেন্সফিওর্ড-এ বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসনের বিশাল কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার ও প্রকাণ্ড বাড়ি। মস্ত এলাকা নিয়ে সম্পত্তি। দক্ষিণে অত্যাধুনিক ডিযাইনের সারি সারি অফিস-দালান, যেন প্রকৃতিরই অংশ। ধনুকাকৃতি সরু পথের পর উঁচু সেতু, গিয়ে নেমেছে খাঁড়িতে। ওখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়বে চারপাশ, বিমান থেকেও বুঝল লাবনী। ওই যে দূরে উঁচু এক শৈলশিরার বুকে অদ্ভুত সুন্দর এক শৈল্পিক বাড়ি। রং ও আকার এমনই, যেন প্রকৃতি থেকে আলাদা কিছুই নয়।

'ওটা সত্যিই কারও বাড়ি?' রানার দিকে ফিরল না লাবনী। 'কী বিশাল!'

ওরা যে গাল্ফস্ট্রিম ভি বিযনেস বিমানে আছে, ওটা ব্যবহার করা হয় ডেনিয়েলসন কর্পোরেট অফিসের প্রয়োজনে। ভেতরে নেই ইঞ্জিনের আওয়াজ। ওরা যেন পাখির মত ভেসে চলেছে বহু দূরে। এইমাত্র খাঁড়ি পেরিয়ে এল বিমান। বিলিয়নেয়ারের বাড়ি থেকে পুবে টিলার কোলে একসারি অত্যাধুনিক অফিস-দালান। উত্তরদিকে চলেছে বিমান, দেখল লাবনী। একটু দূরে ব্যক্তিগত এয়ারপোর্ট।

'সবই কি মিস্টার ডেনিয়েলসনের সম্পত্তি?' জানতে চাইল লাবনী, বিস্ময় বাধ মানছে না ওর।

‘তাই তো শুনেছি,’ বলল রানা ‘বাধ্য না হলে নিজ এলাকা ছেড়ে যান না কোথাও।’

অনেক নেমে এসেছে গালফস্ট্রিম, একটু দূরে রানওয়ে।

আরেকবার পোর্টহোল দিয়ে নিচে দেখে সিটে বসে পড়ল লাবনী। ‘থাকার মতই সুন্দর এলাকা, নির্জন। কিন্তু কিছু দিন পর খুব একা লাগবে।’

‘বিলিয়নেয়ার হলে খুলে যায় আস্ত দুনিয়া, ভাবতে হয় না।’

রানওয়েতে নেমে সামান্য দৌড়ে নিয়ে মন্থর গতিতে টার্মিনাল বিল্ডিঙের দিকে চলল বিমান। দু'মিনিট পর ভারী কোট পরে রানার পাশে সিমেন্টের চাতালে নামল লাবনী।

‘বেশি ঠাণ্ডা লাগছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘না, শীতের নিউ ইয়র্কের তুলনায় কিছুই না।’ মাথা নাড়ল লাবনী। আসলে উপকূল থেকে বরফ-ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওকে। মনে মনে নিজের কান মুচড়ে দিল, বলে ফেলেছে এই শীত কিছুই নয়, এখন বাড়তি কোট, জ্যাকেট, চাদর বা কম্বল চাইবে কী করে!

বিমানের পাশে এসে থামল সাদা এক গ্র্যাণ্ড চেরোকি জিপ। ওটা থেকে নামল গণ্ডারের গর্দানের মত মোটা ঘাড়ওয়ালা এক লোক। মাথার ক্রুকাট চুল সোনালি। পরনে কালো সুট, ওটা ফেটে পড়তে চাইছে থোক-থোক মাংসপেশির চাপে।

‘ডক্টর আলম,’ জার্মান সুরে বলল লোকটা, ‘রেইভেন্সফিওর্ডে মিস্টার ডেনিয়েলসনের সিকিউরিটি ফোর্সের প্রধান আমি, নাম অ্যালরিক জ্যাগার। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।’

সে হাত বাড়িয়ে দিতে হ্যাণ্ডশেক করল লাবনী। টের পেল, আলতো হাতে ধরেছে, কিন্তু ইচ্ছে হলেই ওর হাতের সবক'টা হাড় গুঁড়ো করে দিতে পারবে এই লোক। মুখে বলল, ‘পরিচিত হতে পেরে আমিও সুখী।’

লাবনী খেয়াল করল, পরস্পরকে মেপে নিল মাসুদ রানা ও অ্যালরিক জ্যাগার, তারপর হাত মেলাল। জ্যাগারের চোখ-মুখ কঠোর, স্বাভাবিক রানা।

লোকটা হাতের চাপ বাড়িয়ে চলেছে বুঝে কিছুক্ষণ নিষ্ক্রিয় থেকে নিজেও শক্তি প্রয়োগ করল রানা। পাঁচ সেকেণ্ডে দু'জন বুঝে গেল, গায়ের শক্তি কারও কম নয়। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইলে একজনকে পঙ্গু হতে হবে।

'নামটাঃ মাসুদ রানা,' বলল রানা।

'আমার নাম তো আগেই জেনেছেন,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল জার্মান। 'গাড়িতে উঠুন। আসুন, মিস আলম। মিস্টার ডেনিয়েলসন আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

জিপের পেছনে লাবনীর পাশে বসল রানা। ড্রাইভিং সিটে বসে রওনা হয়ে গেল জ্যাগার।

নিচু স্বরে বাংলায় বলল লাবনী, 'লোকটা তোমাকে পছন্দ করেনি।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কারণ কী?'

'ও-ই জানে!'

রানওয়ের পশ্চিমে কয়েকটা হ্যাঙার দেখল ওরা। একটার বাইরে বিশাল এক বিমান, গায়ে কর্পোরেট লোগো— সবুজ এক বৃত্তের ভেতর লাল ত্রিশূল।

'ছোট এয়ারপোর্টে এত বড় বিমান,' বলল লাবনী।

'এয়ারবাস এ-থ্রিএইটি ফ্রেইটার, মিস্টার ডেনিয়েলসনের বিমান বহরে নতুন আমদানী,' মন্তব্য করল রানা।

রানওয়ের পুবের শেষমাথা দেখল লাবনী। ওদিকে পাহাড়ি এলাকা। 'নেমে আসার পর বিমানের ব্রেক কাজ না করলেই...' মাথা নাড়ল ও।

'পশ্চিম আকাশে ফ্লাই করে,' বলল রানা। 'আর নামার পর অর্ধেক রানওয়ে ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই থামতে পারে।'

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সেতু পেরিয়ে পশ্চিমের রাস্তা ধরে কর্পোরেট দালানের দিকে চলেছে ওরা। কিন্তু দু'মিনিট পর আঁকাবাঁকা এক পাহাড়ি পথে টিলার দিকে চলল জিপ। কাছ থেকে দেখতে আরও অনেক সুন্দর বিলিয়নেয়ারের বাড়ি। সামনে জিপ রেখে নামল জ্যাগার, হাতের ইশারা করে রানা ও লাবনীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়িতে।

প্রথম ঘরে ঢুকেই মুগ্ধ হলো লাবনী। একমাথায় সিমেন্টের দেয়ালের বদলে মস্ত কাঁচের দেয়াল বা জানালা। বহু দূরে পাহাড়ি এলাকায় গেঁথে আছে এয়ারপোর্ট, খাঁড়ি থেকে এদিকে অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে কর্পোরেট দালান। পরিষ্কার দেখা গেল উত্তরদিকের সুনীল সাগর।

ওই জানালা একমাত্র দেখার মত জিনিস নয়। এ ঘর একইসঙ্গে বিলাসবহুল লাউঞ্জ ও আর্ট গ্যালারি। সরাসরি রোদ থেকে আড়াল করতে রয়েছে অ্যালকোভ, সেখানে আছে হেনরি মুরের ভাস্কর্য ও পিকাসোর পেইণ্টিং, পল ক্লি'র... ওটা কী বুঝল না লাবনী। এ ছাড়া, রয়েছে আরও সব চিত্র ও ভাস্কর্য। চিনল না অনেকগুলোই, কিন্তু বুঝল প্রতিটি অমূল্য।

'অদ্ভুত সুন্দর ঘর,' নিচু স্বরে বলল লাবনী।

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' মিষ্টি নারীকণ্ঠ শুনে ঘুরল ওরা।

দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী এক মেয়ে ঢুকেছে ঘরে, কাঁধে বিছিয়ে আছে সোনালি চুল। বয়স লাবনীর সমানই। পরনে দামি পোশাক। সাদা টপ কাট আড়াল করেনি নিখুঁত নাভি। নিচে কালো লেদার টাইট জিন্স। পায়ে হাই হিলের বুট। মনে হলো মেয়েটা বুঝতে চাইছে লাবনীর ওজন।

'ডক্টর আলম,' পরিচয় করিয়ে দিল জ্যাগার। 'ইনি মিস্টার

ডেনিয়েলসনের একমাত্র কন্যা সেসিলি ডেনিয়েলসন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' লাবনীর সঙ্গে হাত মেলাল মেয়েটা।

'আমিও খুশি,' বলল লাবনী। অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেছে।

রানার দিকে হাত বাড়াল সেসিলি। 'ওয়েলকাম, মিস্টার রানা।'

হাতটা একটু নেড়ে ছেড়ে দিল রানা।

লাবনীর দিকে ফিরল সুন্দরী। 'বাড়িটা পছন্দ করেছেন বলে ধন্যবাদ। এটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন আমিই করেছি। নাম করা একটা ভার্সিটি থেকে পাশও করেছি ওই বিষয়ে।'

তার ইংরেজিতে সামান্য বিদেশি টান, টের পেল লাবনী। বলল, 'সত্যিই দেখার মত।'

'আপনার বাবা বাসায় নেই?' জানতে চাইল রানা।

'না, উনি আছেন বায়োল্যাবে,' একটু শীতল মেয়েটার কণ্ঠ। 'আমি এসেছি আপনাদেরকে ওখানে নিয়ে যেতে।'

কিছুক্ষণ ধরে অস্বস্তি লাগছিল লাবনীর, এবার মনে পড়ল। 'এক্সকিউয মি, গতবছর না আফ্রিকায় নিউয হয়েছিলেন আপনি? অনেক মেডিকেল যন্ত্রপাতি আর ওষুধ নিয়ে যান ইথিয়োপিয়ায়?'

'হ্যাঁ,' বলল সেসিলি। 'সময় পেলে এ ধরনের কাজও করি।'

'আরও অনেক কিছুই করেন মিস ডেনিয়েলসন,' তথ্য দিল অ্যালরিক জ্যাগার। 'দুনিয়া জুড়ে ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের সমস্ত মেডিকেল প্রোগ্রামের দায়িত্বে আছেন তিনি। গত পাঁচ বছরে চষে বেড়িয়েছেন গোটা পৃথিবী।'

'আমার ভুল না হলে, ডিযিয ইর‍্যাডিকেশন প্রোগ্রামের সঙ্গে আছেন আপনি,' বলল লাবনী।

'হ্যাঁ, পৃথিবীটাকে একটু ভাল করতে সাধ্যমত করছি আমরা

ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে। কাজটা কঠিন, কিন্তু একদিন সত্যি হয়তো স্বর্গের মত হয়ে উঠবে এই পৃথিবী।'

'প্রার্থনা করি তেমনই হোক,' বলল লাবনী।

মাথা দোলাল সেসিলি ডেনিয়েলসন। 'চলুন, যাওয়া যাক বাবার ওখানে।'

বাড়ির নিচতলায় বিশাল গ্যারাজে রানা ও লাবনীকে নিয়ে এল মেয়েটা। সারি দিয়ে রাখা অত্যন্ত দামি সব স্পোর্টস্ কার ও মোটর সাইকেল। আছে পুরনো থেকে শুরু করে একেবারে নতুন সব ইতালিয়ান সুপারকার।

'আমার ব্যক্তিগত কালেকশন,' বলল সেসিলি, 'বাবা অবশ্য পছন্দ করেন না আমার তুমুল গতিতে গাড়ি ছোটানো।'

ফেরারি ৪৮৮ স্পাইডার দেখে মন্তব্য করল রানা, 'চমৎকার গাড়ি।' ওর নিজের যদিও পছন্দ ফেরারি এফ ৪৩০ স্পাইডার কনভার্টিবল। একটু দূরে দেখল লাল গাড়িটা। আরেক দিকে পার্ক করা নীল-রুপালি এক মোটরবাইক।

'সুযুকি জিএসএক্স-আর ১০০০,' বলল সেসিলি, কণ্ঠে গর্ব। 'দুনিয়ার সেরা। আমার প্রিয়। শিডিউলের চাপ না থাকলে ইউরোপ রেসে ওটা নিয়ে নামব। অবশ্য, দেখা যাক ডক্টর আলম আমাকে আটকে ফেলেন কি না।' একবার লাবনীকে দেখে নিয়ে নীল এক মার্সেডিয লিমাযিনের পাশে থামল সে। 'এটা নেব।'

ড্রাইভ করল অ্যালরিক জ্যাগার।

পুবে কল্পকাহিনির মত দেখতে অত্যাধুনিক এক বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। দু'ভাগে ভাগ করা বাড়ি। খাঁড়ির কাছে সমতলে একাংশ। একদিক মাটিতে, অন্যদিক খাড়া টিলার অনেক ওপরে।

'ওদিকে বায়োল্যাব,' দোতলা অংশ দেখাল সেসিলি। 'মাটির নিচে ল্যাবের কন্টেইনমেন্ট এরিয়া। ওখানে এমন সব

বিপজ্জনক স্যাম্পল আছে, ভুল হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে মানবজাতির। অবশ্য, প্রয়োজনে সম্পূর্ণ সিল করে দিতে পারব আমরা ল্যাবোরেটরি।' টিলার গায়ে গেঁথে থাকা বাড়ির ওপরের অংশ দেখাল সে। 'ওখানে বাবার অফিস।'

'কন্টেইনমেন্ট এরিয়ার এত কাছে তাঁর অফিস?' নার্ভাস সুরে বলল লাবনী। নানান রোগের ভয় ঢুকে গেছে মনে।

'নিজ ডিযাইনের ওপর পূর্ণবিশ্বাস আছে তাঁর,' বলল সেসিলি। 'তা ছাড়া, সব চোখে চোখে রাখতে ভালবাসেন।'

র‍্যাম্প বেয়ে উঠল গাড়ি, থামল দালানের নিচের গ্যারাজে। ওখান থেকে এলিভেটরে চেপে উঠল ওরা একটা লবিতে। ঘরে ঘোড়ার নালের আকৃতির স্টিল ও মার্বেলের তৈরি বাঁকা, কালো রঙের এক বড় ডেস্ক। ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরা তিনজন সিকিউরিটি গার্ড, মাথা দুলিয়ে সম্মান জানাল সেসিলিকে।

ডেস্ক পেরিয়ে চওড়া এক ঢালু করিডোর ধরে চলল ওরা। ছাত কাঁচের, ওপরে দেখা গেল ডেনিয়েলসনের অফিস।

লোকজনের ব্যস্ততা দেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এই কমপ্লেক্সে কতজন কাজ করে?'

'কখনও কম, কখনও বেশি,' বলল সেসিলি, 'তবে সবসময় কাজ করছেন পঞ্চাশ থেকে ষাটজন রিসার্চার। এ ছাড়া আছে সিকিউরিটি স্টাফরা।'

করিডোরের শেষমাথায় আরেকটা সিকিউরিটি স্টেশন দেখল রানা। পাশেই কাঁচ ও স্টিলের বড় একটা দরজা। বুঝে গেল, কঠোরভাবে পাহারা দেয়া হয় এই কমপ্লেক্স।

যেন রানার মনের কথা বুঝেই বলল সেসিলি, 'ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের হাতে এমন সব স্যাম্পল আছে, যেগুলো ব্যবহার করা হতে পারে বায়ো-টেরোরিযমে। কাজেই বাধ্য হয়েই সতর্ক

থাকতে হয় আমাদেরকে।'

সামনের দরজায় বায়োহ্যাযার্ড লোগো দেখে প্রায় থেমে গেল লাবনী। 'ইয়ে... আমরা নিরাপদ থাকব তো?'

'অবশ্যই, ভাববেন না,' নিশ্চিন্ত করতে চাইল সেসিলি। 'এসব দরজা এয়ারলকের অংশ। তৈরি করা হয়েছে সিরামিক অ্যালিউমিনিয়াম অক্সিনাইট্রাইড দিয়ে। পারমাণবিক বোমা না পড়লে ভাঙবে না। লক হয়ে গেলে ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না কেউ।' নরওয়েজিয়ান ভাষায় গার্ডদের কী যেন বলল সেসিলি। এক মুহূর্ত পর হিস্ শব্দে খুলে গেল এয়ারলক।

করিডোরে থামতে হলো। বন্ধ হয়ে গেছে পেছনের দরজা। সামনের দরজাও খুলছে না। উজ্জ্বল সাদা আলোয় অপেক্ষা করল রানারা। দেখা গেল লালচে আল্ট্রাভায়োলেট আলো। স্‌স্‌স্ আওয়াজে পরিষ্কার করে নেয়া হচ্ছে করিডোরের বাতাস।

সামনের দরজা খুলে যেতেই সবাইকে পথ দেখাল সেসিলি। এলিভেটরে চেপে ডেনিয়েলসনের অফিসে উঠে এল ওরা। লাবনীর মনে হলো, একটু আগে যে বাড়িতে ছিল, ঠিক ওখানেই আবারও ফিরেছে। চারপাশের সবই যেন আগের মত। অথচ জানালা দিয়ে দেখল টিলার চূড়ায় দূরের ওই বাড়ি।

না, সবই এক নয়, ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন এক ভদ্রলোক। দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ। উচ্চতা ছয় ফুটেরও বেশি। ষাট বছর পেরিয়ে গেলেও দেহটা পেশিবহুল, শক্ত সমর্থ— যদিও মাথার চুল ধূসর।

নরওয়েজিয়ান বিলিয়নেয়ারের চকচকে নীল চোখে তারুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখল রানা।

'স্বাগতম, রেইভেন্সফিওর্ডে,' বললেন ডেনিয়েলসন। একে একে রানা ও লাবনীর সঙ্গে হাত মেলালেন।

'মিস্টার ডেনিয়েলসন...' মুখ খুলল লাবনী।

মাথা নাড়লেন বিলিয়নেয়ার। 'শুধু লোভিস বলে ডাকলেই খুশি হব।' বজ্রের মত গুড়গুড় করে উঠেছে কণ্ঠ। 'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যিই ভাল লাগছে।'

রানার কাছে সবই শুনেছে লাবনী, তাই বলল, 'আপনি মিস্টার রানাকে সতর্ক করেছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে গেছি। সেজন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

মাথা নেড়ে হাসলেন ভদ্রলোক। 'ধন্যবাদটা প্রাপ্য মিস্টার রানারই। আমি কিছুই করতে পারিনি।'

'বলতে পারেন, কেন আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে কেউ?' জানতে চাইল লাবনী।

'বসুন আপনারা, ব্যাখ্যা করে বলছি।' দীর্ঘ এক সোফার দিকে নিয়ে গেলেন ডেনিয়েলসন। সবাই বসবার পর বললেন, 'আটলান্টিস সম্পর্কে যে থিয়োরি তৈরি করেছেন, তাতে শত্রু হয়ে গেছেন এক লোকের। তার নাম ডোনাটি লুক্কা।'

বসের কাছে সংক্ষেপে শুনেছে রানা, বিস্তারিত জানতে প্রশ্ন তুলল, 'কে এই লোক?'

'এক বদ্ধ-উন্মাদ,' মন্তব্য করল অপরূপা সেসিলি।

'সে শুধু উন্মাদ নয়, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এক খুনি নরপিশাচ,' বললেন ডেনিয়েলসন, 'তার দলে শত শত লোক, নিজেদেরকে বলে ওরা ব্রাদারহুড। আমার মতই ডোনাটি লুক্কাও বিশ্বাস করে, সত্যিই ছিল আটলান্টিস। যুবক বয়স থেকেই খুঁজছি, অনেক টাকা খরচ করেছি ওই তলিয়ে যাওয়া দ্বীপ আবিষ্কার করতে। আর প্রতিটি পদে বাধা হয়ে উঠেছে ব্রাদারহুড। ...কেন এসব করছে? সত্যিই জানি না! শুধু বুঝেছি, ওরা চায় গোপন থাকুক আটলান্টিস।' চওড়া কাঁচের জানালা দিয়ে দূরের সাগরে চোখ রাখলেন তিনি। 'এমন কোনও তথ্য নেই যে বুঝব, কোথায় আছে আটলান্টিস। মন থেকে চাই, বিশ্বের আশ্চর্য ওই প্রাচীন

সভ্যতা নতুন করে আবারও উন্মোচিত হোক।' লাবনীর দিকে তাকালেন। 'ডোনাটির ধারণা, আপনার থিয়োরি সঠিক, তাই মেরে ফেলতে চাইছে।'

'আপনি জানলেন কী করে আমার থিয়োরি সম্পর্কে?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'দুনিয়ার প্রায় সব জায়গায় আছে আমাদের ফাউণ্ডেশনের অ্যাকাডেমিক বন্ধুরা,' বললেন ডেনিয়েলসন, 'আটলান্টিস দ্বীপের বিষয়ে নতুন কোনও থিয়োরি নিয়ে কথা উঠলেই তাঁরা যোগাযোগ করেন আমার সঙ্গে। আর তাঁদের কারও কারও মনে হয়েছে আপনার ধারণা সঠিক। আর তা-ই আমি চাই, আপনি হাতে নিন এক্সপিডিশনের দায়িত্ব। টাকা নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'তাই? অবাক সুরে বলল লাবনী, বিশ্বাস হচ্ছে না এই সৌভাগ্য।

'অবশ্যই! শর্ত মাত্র একটা।' হাসলেন বিলিয়নেয়ার।

শ্বাস আটকে জানতে চাইল লাবনী, 'কী সেটা?'

'ভয় পাবেন না, কিছুই চাপিয়ে দেব না আপনার ঘাড়ে। তবে মনে রাখবেন, অনেক বড় এলাকা কেডিযের উপসাগর। আমার টাকা আছে, কিন্তু অফুরন্ত নেই। আপনি ছোট করে আনবেন সার্চের এলাকা।'

'সমস্যা তো ওখানেই,' বলল লাবনী, 'জরুরি তথ্য খুবই কম। সার্চ এরিয়া কমিয়ে আনা কঠিন হবে।'

'তথ্য একেবারেই নেই, তা-ও নয়,' বলল সেসিলি। 'পরে খুলে বলব আপনাকে। আগে ভেবে দেখুন, সত্যিই এই কাজে নামবেন কি না।'

'নিশ্চয়ই নামব!' জোর দিয়ে বলল লাবনী। 'এক শ'বার!'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলালেন ডেনিয়েলসন। 'ঠিক আছে। ডক্টর আলম, এখন থেকে একসাথে আটলান্টিস খুঁজব আমরা।'

মেয়ের দিকে চেয়ে ইশারা করলেন বিলিয়নেয়ার।

ডেস্কের কাছে গিয়ে একটা বাটন টিপল সেসিলি।

ঘরের আকাশে দেখা দিল সোনালি-লালচে কী যেন। ভেসে আছে মাধ্যাকর্ষণকে কাঁচকলা দেখিয়ে।

জীবনে প্রথমবারের মত চোখের সামনে হলোগ্রাম দেখল লাবনী। মনে হলো স্পর্শ করতে পারবে, এতই বাস্তব। 'জিনিসটা কী?' জানতে চাইল।

'ওটার কারণেই কমতে পারে সার্চ এরিয়া,' বললেন ডেনিয়েলসন। 'অন্তত তা-ই বলছে এক লোক। ওটা বিক্রি করতে চাইছে আমার কাছে।'

ভাসমান ছোট এক বেদির দু'ইঞ্চি ওপরে চকচক করছে সোনালি-লালচে জিনিসটা। দৈর্ঘ্যে এক ফুট। চওড়ায় দু'ইঞ্চি। চ্যাপ্টা পাতের মত, কিন্তু নিচ দিকে গোলাকার। ওপরের শেষ মাথায় একটা ঘাট। জিনিসটা সোনার মতই, কিন্তু তাতে আছে লালচে আভা। সবমিলে একটা বড় লকেটের মত।

আনমনে বুকে ঝুলন্ত ধাতব লকেট স্পর্শ করল লাবনী। উঠে গিয়ে উঁকি দিল বেদির নিচে। এদিক থেকে কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হলো।

'ওই লোককে আগে টাকা দিতে হবে, নইলে দেখতে দেবে না ওই আর্টিফ্যাক্ট,' বললেন ডেনিয়েলসন, 'ওটা নাকি পাওয়া গেছে আটলান্টিস থেকে।'

'কত চাইছে?' জানতে চাইল লাবনী।

'দশ মিলিয়ন ডলার।'

চুপচাপ শুনছে রানা।

'ওটার সত্যিকারের মূল্য হয়তো আরও অনেক বেশি,' মুখ খুলল লাবনী। ভাসমান বেদির ওপর জিনিসটা স্পর্শ করতে চাইলেই বাধা পেল লেসার বিম। অদৃশ্য হলো আর্টিফ্যাক্টের

সামান্য অংশ। 'ওই লোক কি বলেছে, এটা অরিচালকাম?'

'হ্যাঁ।' কাঁচে ঘেরা সোনালি-লালচে ছোট একটা টুকরো দেখালেন ডেনিয়েলসন। 'হলোগ্রামের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আর্টিফ্যাক্টের অংশ। মেটালার্জিকাল টেস্ট করিয়েছি। সোনা ও তামার অ্যালয়। এর ভেতরে আছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ও সালফার। এ কারণেই এমন হয়েছে রং।'

'প্লেটোর বক্তব্য অনুযায়ী ওই অরিচালকাম পাওয়া যেত আটলান্টিসের খনিতে,' বলল লাবনী, 'সোনার মতই মূল্যবান। তবে সত্যি ওই আর্টিফ্যাক্ট আসল হলে তার দাম সোনার চেয়ে লাখ গুণ বেশি। আগে কখনও পাওয়া যায়নি আটলান্টিসের কোনও আর্টিফ্যাক্ট। ওটা হয়তো প্রমাণ করবে, সত্যিই ছিল আটলান্টিস।'

মাথা দোলালেন লোভিস ডেনিয়েলসন।

বাটন টিপে হলোগ্রাম অদৃশ্য করে দিল সেসিলি।

'ওটা যার কাছে আছে, সে কোথায় থাকে?' জানতে চাইল লাবনী।

'বিক্রি করবে এক রাশান লোক, নাম অ্যালেকসেই মিশকিন,' বললেন বিলিয়নেয়ার। 'আগে সে ছিল ডোনাটি লুক্কার লোক। সরে যেতে চাইছে ব্রাদারহুড থেকে। সেজন্যেই তার চাই এত টাকা। অনেক দূরে কোথাও লুকাতে না পারলে ওকে মেরে ফেলবে ব্রাদারহুড। এক দালালের মাধ্যমে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে হলোগ্রাম ও আর্টিফ্যাক্টের টুকরো। ওই ঘড়েল দালাল জাতিতে ইরানি। নাম আরাশ খানসারি।'

ভুরু কুঁচকে বলল লাবনী, 'আমি আগেও শুনেছি ওই নাম।'

'অবাক হচ্ছি না। বেআইনীভাবে প্রাচীন পারস্যের আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করে।'

'সোজা কথায় কবর-লুটেরা,' তিক্ত সুরে বলল লাবনী।

'তাই ছিল আগে, তবে আজকাল আর নষ্ট করে না নিজের হাত,' বললেন ডেনিয়েলসন, 'দেশের সম্পদ অন্যদেশের সংগ্রাহকের কাছে বিক্রি করে বড়লোক হয়ে গেছে। এতই বেশি, এখন তার পকেটে থাকে ইরানি সরকারের বড় বড় সব অফিসার।'

'নিজের শত্রুদের ধরিয়ে দেয়,' মন্তব্যের সুরে বলল রানা। 'এ কারণে সরকার তার ওপর খুশি। কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কিন্তু তাকে চেনে এমন লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে। নিজের বদনাম টিকিয়ে রাখতে পয়সা খরচ করতে আপত্তি নেই আরাশ খানসারির।'

'ওই আর্টিফ্যাক্ট গোপনে বিক্রি করবে, আবার ডোনাটি লুক্কা থেকেও লুকিয়ে রাখবে মিশকিনকে,' বললেন ডেনিয়েলসন। 'এ কারণেই মনে হচ্ছে, ওই আর্টিফ্যাক্ট আসল। অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণ না পেলে ওর হাতে তুলে দেব না দশ মিলিয়ন ডলার। ...আর সত্যি বলতে, এখানেই আসছে আপনার ভূমিকা, ডক্টর আলম।'

চোখ পিটপিট করল লাবনী। 'আমি?'

'হ্যাঁ, আপনি। পরীক্ষা করে দেখবেন মিশকিনের আর্টিফ্যাক্ট আসল কি না।'

'আপনি চান আমি ইরানে যাই?' ঢোক গিলল লাবনী। 'তা কী করে যাব! ওই দেশে তো মেয়েরা ঘর থেকে বেরোতেই...'

হাত তুলে ওকে বাধা দিলেন ডেনিয়েলসন। 'এবার বলছি, কে যাবেন আপনার সঙ্গে, মিস আলম,' বলেই চট্ করে মাথার ইশারায় রানাকে দেখালেন তিনি। 'আপনাকে নিরাপদে ইরান থেকে ঘুরিয়ে আনবেন মাসুদ রানা।'

বিরক্তি চেপে বলল রানা, 'মিস্টার ডেনিয়েলসন, আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। অনুরোধ করেছেন বলে মিস আলমের সঙ্গে এখানেও এসেছি; কিন্তু তার মানে এ-ই নয় যে,

তাঁকে নিয়ে কোথাও যাব।'

হাসলেন বিলিয়নেয়ার। 'আগে থেকেই জানি কী বলবেন, মিস্টার রানা, তাই যোগাযোগ করেছি আপনার বসের সঙ্গে। খুলে বলেছি, কী পেতে পারি, আর কেন চাই আপনাকে এ অভিযানে।'

'কেন চান?' জানতে চাইল রানা।

'আমার দলে আপনার মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বহু গুণ বাড়াবে সফলতার সম্ভাবনা।' কাঁধ ঝাঁকালেন ডেনিয়েলসন। 'আজও জরুরি অনেক ওষুধ আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি, যেগুলো শুধুই স্বপ্ন— এই অভিযানে হয়তো পাব সেসব।' কোটের পকেট থেকে স্যাটালাইট ফোন নিয়ে বাটন টিপে কানে ঠেকালেন। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'হ্যাঁ, রাহাত? যেজন্য তোমাকে ফোন করা। এখন আমার সামনে তোমার প্রিয় এজেন্ট।' চুপ করে কী যেন শুনছেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, মানা করে দিয়েছেন।' একবার দেখে নিলেন রানাকে। 'দেব?' তিন সেকেণ্ড পর রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন স্যাটালাইট ফোন। স্পিকারটা অন করে দিলেন।

ওটা নিয়ে কানে ঠেকাল রানা। শুনল জলদ-গম্ভীর কণ্ঠ, 'হ্যাঁ, রানা, ভাল?'

'জী, স্যর। ...আপনি?'

'ভালই।' চুপ হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। কয়েক সেকেণ্ড খুক-খুক করে কেশে নিয়ে বললেন, 'আপাতত তোমার কাজ নেই বিসিআই-এ। ভেবে দেখতে পারো ওর প্রস্তাব। এ অভিযানে প্রয়োজনীয় কোনও ওষুধ, ধাতু বা কেমিকেল পাওয়া গেলে, বা তা থেকে টাকা এলে, তার শতকরা পঁচিশভাগ পাবে তুমি।'

'অনেক প্যাঁচঘোঁচ আছে বলে মনে হচ্ছে আমার, স্যর। আর

আপনি তো জানেনই, টাকার জন্যে কাজ করি না। আর পেলেও ও দিয়ে কী করব আমি?'

ব্রিটেনের খ্যাতনামা এক কলেজে লেখাপড়া করেছেন বিসিআই চিফ ও নরওয়েজিয়ান বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন। ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিলের পার্টিতে রাহাত খান ও তাঁকে দু'একবার দেখেছে রানা। ওঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন, বাস করেন দুনিয়ার দু'প্রান্তে, কিন্তু যোগাযোগ একেবারে নেই, তা-ও নয়।

গতকাল ডেনিয়েলসনের আমন্ত্রণে নরওয়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে বসের সঙ্গে ফোনে আলাপ করেছে রানা। তখন তিনি বলেছেন: 'ক'দিন আগে শুনেছি অদ্ভুত এক গুজব। মস্ত বিপদ নাকি ঘনিয়ে আসছে। একদল ধনী লোক দখল করে নিতে চাইছে পুরো দুনিয়া। সেজন্য প্রায় তৈরি। আমাদের কাছে এ ব্যাপারে সলিড কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই, তবে তুমি তো চলেছ ডেনিয়েলসনের সঙ্গে দেখা করতে। পৃথিবীর অন্যতম ধনী লোক সে। নিজেরই আছে সিক্রেট সার্ভিসের মত দক্ষ সশস্ত্র দল। সম্ভবত এ কারণেই সে জানে, তুমি জড়িত বিসিআই-এর সঙ্গে। তোমার-আমার সম্পর্কও অজানা নয়। তার নিজের লোকজন খোঁজখবর রাখছে দুনিয়ার নানানদিকে। ...আমি চাই, যদি যাও, তুমি খোলা রাখবে চোখ-কান।'

আজ বসের আরেকটি মূল্যবান বক্তব্য শুনেছে রানা।

বুড়ো বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই জটিল অভিযান সফল হলে হয়তো আর্থিকভাবে লাভবান হবে ও, অর্থাৎ বাংলাদেশ।

'স্যর,' ফোনে বলল রানা, 'আমার হাতে সত্যিই জরুরি কোনও কাজ নেই। কিন্তু কারও আদেশে বা নির্দেশে...'

'আদেশ-নির্দেশ নেই, রানা,' ইংরেজিতে উত্তর দিলেন মেজর জেনারেল। 'বিসিআই-এ তোমার অবস্থান সম্পর্কে এরা

জানে না, তাই ভেবে নিয়েছে আমি হুকুম দিলেই তুমি ওদের অভিযানে অংশ নিতে বাধ্য। ওরা কী করে জানবে, পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে আমাকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে এনে তুমিই আবার চিফ বানিয়েছ। আর...'

'স্যর, স্যর, প্লিজ!' অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল রানা। চিফের এই কথায় লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশে গেছে ও। 'আপনি যদি এভাবে...'

'ঠিক আছে,' এবার বাংলায় বললেন তিনি, 'তোমার ইচ্ছে না হলে যেয়ো না। আমিও এর ভেতর জটিলতা দেখতে পাচ্ছি। আমি শুধু এইটুকু বলব, তুমি না গেলেও যতই বিপদ থাকুক না কেন, মেয়েটাকে ওরা পাঠাবে ইরানে।'

খট্ করে কেটে গেল লাইন।

কথা শেষ করে চোখ তুলে দেখল রানা হাঁ হয়ে গেছে লাবনীর মুখ, চোখ বড় করে দেখছে ওকে। বাংলা কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি মোটেও।

'গুড!' স্যাটালাইট ফোন ফিরিয়ে নিয়ে ডেনিয়েলসন বললেন, 'বাংলায় রাহাত খান কী বললেন তা বোঝা গেল না, কিন্তু ইংরেজিতে যা বললেন, তাতে আমাদের বোধোদয় হয়ে গেছে। বুঝেছি কারও হুকুমের চাকর নন আপনি। আমাদের তরফ থেকে যদি আপনাকে কোনওভাবে অসম্মান করা হয়ে থাকে, সবার হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' রানাকে উশখুশ করতে দেখে বললেন, 'আপনি নিজেও তো একজন বিখ্যাত সৌখিন আর্কিওলজিস্ট, বলা যায় না, সত্যিই হয়তো পেয়ে যাবেন কিংবদন্তীর সেই হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস। আমি অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে সাহায্য করুন; ঘুরে আসুন ইরান থেকে।'

লাবনীর দু'চোখে অনুনয়।

'আপাতত হাতে কাজ নেই, ইরান থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারি মিস আলমকে। কিন্তু সেজন্যে সাহায্য লাগবে আমার পরিচিত একাধিক লোকের। তাদের খরচ দেবেন আপনি, আহত বা নিহত হলে ক্ষতিপূরণও দেবেন। আমাকে টাকা সাধতে পারবেন না।'

'খরচের টাকা কোনও সমস্যাই নয়, মিস্টার রানা,' বললেন ডেনিয়েলসন, 'আপনি উপযুক্ত লোক জোগাড় করুন। আমিও চাই তারা যেন হয় দুনিয়া-সেরা। আমার নিজের মেয়েও যাবে আপনার সঙ্গে। নানানদিক থেকে সাহায্য করতে পারবে।'

চট্ করে রূপসী, স্বর্ণকেশী সেসিলিকে দেখল রানা। আগেও দেখা হয়েছে পার্টিতে। মেয়েটাকে খুব ডাঁটিয়াল বলে মনে হয়েছে ওর। তাতে অবশ্য দোষ ধরবে না ও। গর্ব হতেই পারে সুন্দরীর, হাজার হাজার কোটি ডলারের মালিক তার বাবা!

'আপনি কি ভাবছেন ওঁর দায়-দায়িত্বও চাপিয়ে দেবেন আমার ওপর?' জানতে চাইল রানা। 'সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে...'

'ঠিক তা নয়,' মাথা নাড়লেন ডেনিয়েলসন। 'ওর কথা ভাবতে হবে না আপনাকে।'

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, মিস্টার রানা,' গর্বিত কণ্ঠে বলল সেসিলি। যদিও তাচ্ছিল্যের ভাব দূর হয়েছে বেমালুম।

'সেক্ষেত্রে কি ধরে নেব আপনার মিলিটারি কমব্যাট ট্রেনিং আছে?' জানতে চাইল রানা।

'যে-কোনও আর্মি কমাণ্ডো ট্রেনিঙে হাসতে হাসতে পাশ করব,' বলল মেয়েটা, 'চাইলে পরীক্ষা নিতে পারেন।'

'আমার পরীক্ষা করার দরকার নেই,' বলল রানা, 'আমার ঘাড়ে না চাপলেই হলো। আমার ধারণা, ওখানে গুরুতর বিপদ হবে।'

'ঠিক আছে, জরুরি কথায় ফেরা যাক,' বললেন ডেনিয়েলসন। তাকালেন লাবনীর দিকে। 'আপনি রাজি তো, মিস আলম?'

'কিন্তু ওখানে গিয়েও যদি বুঝতে না পারি, তা হলে?' ভীত স্বরে বলল লাবনী।

'আপনি না প্রাচীন ভাষায় এক্সপার্ট?' বলল সেসিলি।

'নিজেকে এক্সপার্ট বলব না,' আপত্তি লাবনীর কণ্ঠে। 'ও নিয়ে লেখাপড়া করেছি, কিন্তু বিশেষজ্ঞ নই।'

'অনেকেই বলেছেন, আপনি সেরাদের একজন,' বললেন ডেনিয়েলসন। 'আপনি আপনার মার চেয়েও ভাল জানেন গ্লোযেল ভাষা।' তাঁর দিকে বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে লাবনী। 'আপনার বাবা-মাকে খুব ভাল করেই চিনতাম। আসলে তিব্বতের ওই এক্সপিডিশনের খরচ আমিই দিয়েছিলাম।' লাবনীর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন বিলিয়নেয়ার। 'ওঁদের ওই আকস্মিক মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক, অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে আর্কিওলজির।'

'তাঁরা কখনও বলেননি এক্সপিডিশনের ফাণ্ড আপনিই দিয়েছিলেন,' বলল লাবনী।

'আমিই অনুরোধ করি, যেন এসব প্রকাশ না পায়। আপনি নিজেও এখন জানেন, কত ভয়ঙ্কর লোক ডোনাটি লুক্কা। এ কারণেই পরবর্তী সময়ে আমার চারপাশে ব্যবস্থা করি নিশ্ছিদ্র প্রহরার। যেহেতু আটলান্টিস আবিষ্কারে ফাণ্ড দিচ্ছি, আমার ওপর হামলার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। বহু দেশেই আছে লুক্কার ক্ষমতাশালী সব বন্ধু।'

নিরাপদে থাকব তো ইরানে? ভাবল লাবনী। পরক্ষণে চিন্তা করল, একই ঝুঁকি নেবে বিলিয়নেয়ারের মেয়েও। ইরানে না গিয়ে ফিরতে পারে নিউ ইয়র্কে। কিন্তু তারপর? যখন তখন খুন

হবে ওই ডোনাটি লুক্কার লোকের হাতে!

'আমরা কবে যাচ্ছি?' জানতে চাইল লাবনী।

'মিস্টার রানা সব গুছিয়ে নিলেই আগামী কয়েক দিনের ভেতর,' বললেন ডেনিয়েলসন।

'এগারো হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছে আটলান্টিস, আর বোধহয় তাকে দেরি করিয়ে দেয়া ঠিক নয়,' বিড়বিড় করল লাবনী। একবার তাকাল বাঙালি যুবকের দিকে।

দেখল, মাসুদ রানার চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

পাঁচ

একটু আগে কৃষ্ণসাগর ও তুরস্ক পেছনে ফেলেছে, এখন ইরানের দিকে চলেছে গালফস্ট্রিম জেট বিমান। নরওয়ে থেকে সরাসরি না এসে একবার থেমেছে প্রাগ-এর এয়ারপোর্টে। ওখান থেকে তুলে নেয়া হয়েছে আরেক যাত্রীকে। সেসিলি ও লাবনীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রানা এরপর কোলের ল্যাপটপ থেকে আর চোখ তোলেনি সেসিলি।

কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারের সিটের মত নয় প্রাইভেট জেট বিমানের আসন, রানা-লাবনীর মুখোমুখি বসেছে জ্যাঁ মউরোস। তার কথা শুনে বুঝেছে লাবনী, এই ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি ও রানা বহু পুরনো বন্ধু।

খস-খস করে ডানবাহু চুলকে নিল লাবনী। 'খুব জ্বলছে!'

মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে, নানান বিপজ্জনক

রোগ থেকে রক্ষা করতে ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের বায়োল্যাবে অ্যান্টিসেপটিক পরিবেশে টিকা দেয়া হয়েছে ওদেরকে।

'ওদিক থেকে মন সরালে অস্বস্তি কাটবে,' পরামর্শ দিল রানা।

'নিভেয়া ক্রিম মেখে দাও, জ্বলুনি কমবে,' বলল মউরোস।

'তোমার ব্যাগে থাকলে দাও ওকে।'

ব্যাগ ওপরে তুলে ওটা থেকে ছোট এক কৌটা নিভেয়া ক্রিম নিয়ে লাবনীর দিকে বাড়িয়ে দিল মউরোস।

নীল কৌটো নিয়ে জানতে চাইল লাবনী, 'আপনি কি আগে ফ্রেঞ্চ আর্মিতে ছিলেন?'

'ছিহ্, আমাকে অতই বাজে লোক বলে মনে হলো আপনার?' আঁৎকে উঠল মার্সেনারি, কুঁচকে ফেলেছে অভিজাত চেহারা।

'সরি,' বলে চুপ হয়ে গেল লাবনী। মলমের মত করে বাহুতে ক্রিম লাগিয়ে ফেরত দিল কৌটা। রানার দিকে তাকাল। 'ইরানে কী ধরনের বিপদ হতে পারে?'

'আশা করি কোনও সমস্যা হবে না,' বলল রানা। 'সহজ কাজ। আরাশ খানসারির সঙ্গে দেখা করে বুঝে নেবে আর্টিফ্যাক্ট আসল কি না, তারপর টাকা ট্র্যান্সফার করবে সেসিলি। রওনা হব ফিরতি পথে।'

'কিন্তু যদি ঝামেলা হয়?'

'মউরোস, সেসিলি আর আমি সামলাব সেদিকটা।'

'টুং' শব্দ তুলল ল্যাপটপ। স্ক্রিনে চোখ সেসিলির। একবার অবাক, নীল চোখে লাবনীকে দেখে নিয়ে আবারও পড়ল স্ক্রিনের লেখা। ক'সেকেণ্ড কী যেন টাইপ করল, তারপর এণ্টার কি টিপে বন্ধ করল ল্যাপটপ।

'কোথাও কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল লাবনী।

'না, ফারের ব্যক্তিগত ই-মেইল। আমার জন্যে ভাল খবর। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।' প্রথমবারের মত লাবনীর দিকে চেয়ে হাসল সেসিলি। ঝিকঝিক করছে সুন্দর, নিখুঁত দাঁত। 'আমি বোধহয় ভাল অতিথিসেবিকা নই। আসলে এত ব্যস্ত ছিলাম অন্যান্য কাজে... সেজন্য সত্যিই দুঃখিত।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, দেখছিই তো ক'দিন ধরে ছুটোছুটি করছেন,' বলল লাবনী।

'আর নয়, এখন থেকে পুরো সময় দেব এই মিশন আর আপনার জন্যে। আশা করি আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'ধন্যবাদ,' মিষ্টি করে হাসল লাবনী।

পাশে বসে থাকা মউরোসের দিকে সন্দেহ নিয়ে তাকাল সেসিলি। 'আপনি কি আমার...'

হাতে রয়ে যাওয়া আধখাওয়া আপেল ভুলে বিভোর হয়ে সুডৌল স্তনই দেখছিল মউরোস, এবার হেলান দিয়ে বসে বলল, 'আমি যদি সবই দেখি, ইরানের লোকও দেখবে। ওরা আবার সেক্সি ড্রেস পছন্দ করে না। তাই মনে হচ্ছে, আপনার উচিত নেমে পড়ার আগেই রাখা-ঢাকা পোশাক পরে নেয়া।'

সেসিলির পরনে টাইট সাদা টপ ও লেদার জিন্স। মাথা দোলাল মেয়েটা। 'ঠিকই বলেছেন। কপাল ভাল, এজন্য তৈরি হয়ে এসেছি।'

'ডক্টর লাবনীর পোশাক নিয়ে আপত্তি তুলবে না কেউ,' বলল মউরোস। 'মনে হচ্ছে দাদীর আমলের জিনিস।'

'সরি?' মুখ কালো করল কোট পরা ফর্সা লাবনী।

খুক-খুক করে কেশে নিয়ে বন্ধুকে রক্ষা করতে চাইল রানা, 'ফ্যাশনেবল দাদী!'

ফিক্ করে হেসে ফেলল সেসিলি। 'লাবনী, আপনার নামে মিথ্যা বলছেন মিস্টার রানা! কোনও ড্রেস লাগলেই আমাকে

বলবেন, পেছনের কেবিনে চেস্ট-অভ-ড্রয়ারে অনেক পোশাক।' সিট ছেড়ে ব্যক্তিগত কেবিনের দিকে পা বাড়াল সে।

'লক্ষ্মী-ট্যারা চোখদুটো সামলে, প্রেমিক-প্রবর,' মউরোসকে বলল রানা। এতে ওর নাক লক্ষ্য করে ছিটকে এল আধখাওয়া আপেল। খপ্ করে ধরে ফিরতি পথে ওটা পাঠিয়ে দিল রানা, লাগল গিয়ে বন্ধুর কপালে। ঝট্ করে কাত হয়ে পড়ে গেল মউরোস। এ থেকে বুঝে নিতে হবে, সে আপাতত মৃত।

'আপনারা সবসময় এমন দুষ্টুমি করেন?' হাসছে লাবনী।

'আমি করি না, ও করে,' নালিশ জানাল মড়া লাশ।

রানা চট্ করে দেখল হাতঘড়ি। 'আপাতত পড়েই থাকো। বিশ্রাম দরকার তোমার। আধঘণ্টা পর নেমে পড়ব।'

চোখ সামান্য খুলে আবারও বুজে ফেলল মউরোস। উদাস সুরে বলল, 'তারপর দুনিয়ার সেরা মসৃণ পথে ছুটব ঝড়ের গতি তুলে।'

উল্টো কথা বলা হয়েছে, তা একঘণ্টা পর বুঝল লাবনী। এয়ারপোর্ট থেকে ওদেরকে বের করে যে ল্যাণ্ড রোভারে তোলা হয়েছে, ওটার বয়স আন্দাজ করা মুশকিল, তবে মনে হয় সত্তরের কম হবে না। শক-অ্যাবযর্বার বলতে কিছুই নেই। আর থাকলেও মোটেও কাজ করত না মঙ্গল-গ্রহের এই পাহাড়ি রাস্তায়।

ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় ছোট শহর ইস্পাহানের এয়ারপোর্টে গালফস্ট্রিম নামতেই কাস্টমস এরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদেরকে। কোনও ঝামেলা ছাড়াই বিদায় দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর কারণ, দু'হাজার তিন সালের ভূমিকম্পে ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে ইরানি সরকারকে দেয়া হয়েছিল লাখ লাখ ডলারের ত্রাণ। ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে রওনা হওয়ার পর দু'চারজন মহিলা ড্রাইভারকে রাস্তায় দেখেছে লাবনী। তাদের

পরনে পুরু কাপড়ের বোরখা। ওর কাজে এসেছে সেসিলির চেস্ট-অভ-ড্রয়ার। এখন পরনে ফ্যাকাসে বাদামি কোট, নেমে এসেছে হাঁটু পেরিয়ে। নিজে সেসিলি পরেছে গোড়ালি সমান সুন্দর এক সাদা কোট। ওটা দেখে হিংসেই হয়েছে লাবনীর। আইন মেনে চলছে সেসিলি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আকর্ষণীয় সুঠাম দেহের প্রতিটি বাঁক। এয়ারপোর্টে ছিল মাথায় স্কার্ফ, গাড়ি শহরে ঢোকার পর ফেলে দিয়েছে ওটা।

ল্যাণ্ড রোভার ড্রাইভ করছে যে-লোক, তাকে পুরনো বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রানা। ওর চেয়ে কমপক্ষে বিশ বছরের বেশি বয়স তার। নাম, হাজি মারাদেসিয়া। গণ্ডারের মত গাঁট্টাগোট্টা। থুতনিতে মাপা চার ইঞ্চি মেহেদি রঙা দাড়ি। ঠোঁটের দু'পাশ বাদামি। চেইন স্মোকার। অন্তত আরও একঘণ্টা এর সঙ্গে থাকতে হবে শুনে বিমর্ষ হয়ে গেছে লাবনী।

'হ্যাঁ, এবারের কাজটা কী, রানা?' মারাদেসিয়া কথা বলছে ইংরেজি ভাষায়। 'আগের মতই পয়সা ছাড়া কাজ?'

তার পাশেই প্যাসেঞ্জার সিটে রানা। 'হ্যাঁ, আগের মতই।'

নাক কুঁচকে ফেলল বয়স্ক ইরানি। 'আহা রে, টাকার অভাবে মরবে এই বেচারার বউ-বাচ্চা!'

'তুমি আবার বিয়ে করলে কবে!' খপ্ করে ধরল রানা।

'না, মানে... ওটা একটা কথার কথা।'

গাড়ির পেছনের সিটে সেসিলি আর মউরোসের মাঝে চিঁড়ে চ্যাপ্টা অবস্থা লাবনীর।

'জীবনে প্রথম এ দেশে এলেন, মিস ডেনিয়েলসন? তা হলে তো জানেনই না, বর্তমান সরকারের প্রায় সবাই আসলে কত বড় খচ্চর!' ব্যস্ত রাস্তায় বারবার মাথা ঘুরিয়ে সেসিলিকে দেখছে লোকটা, ঝড়ের গতি তুলে ছুটছে গাড়ি। ভয়ে বারবার গাল কুঁচকে ফেলছে লাবনী। ভাবছে, গাধাটা স্রেফ খুন করবে

সবাইকে! 'কোনও সরকার ভাল কোনও কাজ ধরলে, তারপর কী হবে জানেন? পরের নির্বাচনেই পোঁদে লাথ্ খেয়ে গদি থেকে গিয়ে পড়বে গোবর ভরা আস্তাবলে! একে বলে গণতন্ত্র? ছিহ্! এত ছাগল হয় মানুষ?' নাক দিয়ে যে বিদঘুটে আওয়াজ বেরোল, তা রহস্যময় হাসি, নইলে খেঁকশেয়ালের কাশি। চট্ করে দেখে নিল রানাকে। 'তবুও বলব, তোমাকে দেখে আমি খুশি, রানা।'

'আগেও ইরানে এসেছ, রানা?' জানতে চাইল লাবনী।

'না আসার মতই,' বলল রানা।

নিরীহ চেহারা করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মউরোস।

তার কুখ্যাত হাসি-কাশি দিল মারাদেসিয়া। 'মিস, বহুবার এসেছে। কিন্তু শেষবারে হয়েছিল কী...'

'কিছুই হয়নি,' বলল গম্ভীর রানা।

'ঠিক আছে, স্বৈরাচারীর মত বুজে দিচ্ছ আমার মুখ, কিছুই বলব না।' খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে নিয়ে কটুগন্ধী সিগারেটের ধোঁয়ায় বুক ভরল মারাদেসিয়া। 'ধরে নিলাম, তুমি রাতের কোনও পিশাচ। কিন্তু এবার হাজির হয়েছ দিনে। আর তাই তোমার কথামতই গাড়ির পেছনে দরকারী সেই বাক্সও এনেছি।'

পেছনের সিটের ওদিকে হাত দিয়ে নোংরা জুতোর বাক্সের মত ধাতব একটা বাক্স তুলে আনল মউরোস। 'আরে, পাতালের গভীর থেকে পাওয়া জিনের পাহারা দেয়া আজব দৌলত!' খুলে ফেলেছে ঢাকনি, ভেতর থেকে বের করল কালো একটা অটোমেটিক পিস্তল, কয়েকটা ম্যাগাযিন আর একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড। জিনিসগুলো দেখে হাঁসের ডিমের মত বড় হয়ে গেল লাবনীর চোখ। ওর হাতে গ্রেনেড ধরিয়ে দিতে গেল মউরোস। 'নিন, ধরুন তো!'

বোবার মত অস্ফুট আওয়াজ বেরোল লাবনীর মুখ থেকে।

ভয়ঙ্কর লোকটা সত্যিই ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে তাজা বোমা!

নিজ কাজে ব্যস্ত মউরোস, পরীক্ষা করে দেখল পিস্তল, তারপর লোড করে রেখে দিল জ্যাকেটের ভেতর পকেটে।

ঘুরে লাবনীকে দেখল রানা।

হাঁ হয়ে আছে মুখ, বিস্ফারিত চোখে গ্রেনেড দেখছে মেয়েটা।

'ভয় পাওয়ার কিছুই নেই,' নরম সুরে বলল মউরোস। লাবনীর হাত থেকে নিল গ্রেনেড। 'এভাবে টেনে পিন খুলে না ফেললে...'

পিন খুলে ফেলেছে ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি!

চেঁচিয়ে উঠল লাবনী।

'পাঁচ সেকেণ্ডের ফিউয,' বলল মউরোস, 'একদম ভাববেন না! আগে চাপ সরিয়ে নিতে হবে এদিকের এই চামচের ওপর থেকে, নইলে ফাটবে না।' আগের জায়গায় পিন গেঁথে দিল, তারপর গ্রেনেডের একপাশের বাঁকা, ধাতব চামচের ওপর থেকে সরিয়ে নিল আঙুলের চাপ। 'বুঝলেন তো এবার?'

'আপনারা আমার সঙ্গে এসব কী করছেন?' দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলল লাবনী। 'আগে জানলে...'

'মউরোস!' গম্ভীর সুরে ধমক দিল রানা। 'খবরদার! এসব আর চলবে না, মনে থাকে যেন!'

'ইয়েস, বস্! কক্ষণও হবে না!' কাঁচুমাচু চেহারা করল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি। আবারও লাবনীর হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিল গ্রেনেড, পরক্ষণে দাঁত দিয়ে জিভ কাটল। 'ভেবেছিলাম এটা দেখে আশ্বস্ত হবেন ডক্টর আলম।'

'হাতে একটা আইপড ধরিয়ে দিলেও কথা ছিল!' ফুঁসে উঠল লাবনী। একঘণ্টা চলার পর ওর মনে হলো, আসলেই আইপড থাকলে কাটত সময়।

চারপাশে বিশাল উঁচু পর্বত, কিন্তু চোখ পরিশ্রান্ত হয়ে গেল অসংখ্য বাদামি রঙের চূড়া দেখে। একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা কঠিন। সেই কখন ফুরিয়ে গেছে গর্তভরা হাইওয়ে, এখন যে ভয়ানক বন্ধুর পথে চলেছে, এর তুলনায় আগের সেই রাজপথ ছিল রূপকথার জাদুকরের আকাশী-কার্পেটের মতই মসৃণ। আর এখন রাস্তাই বা কোথায়? ধুলো ও গর্ত ভরা খাড়া সব ঢাল বেয়ে ঝোড়ো গতি তুলে ছুটছে ল্যাণ্ড রোভার। উপত্যকার নিচে রেললাইন, কালো ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে পুরনো আমলের এক ডিজেল লোকোমোটিভ। লেজে নিয়ে চলেছে তেল ভরা সব ট্যাঙ্কার ট্রাক। কে জানে পাশাপাশি কোথায় চলেছে দু'জোড়া স্টিলের লাইন!

আরও কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একমাইল দূরে দেখা গেল এক রেলস্টেশন।

'আর কত দূর, হাজি?' জানতে চাইল রানা।

'সামান্য বাকি,' উপত্যকার মাঝে আঙুল তাক করেছে মারাদেসিয়া, 'রেলস্টেশন পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই।'

নিতম্বের ব্যথা সহ্য করতে করতে বলল লাবনী, 'কেন যে লোকটা এত দূরে দেখা করতে চাইল! ইচ্ছে করলে তো আসতে পারত তেহরান হিলটন হোটেলে!'

'খুবই সতর্ক লোক,' বলল মারাদেসিয়া।

'আমাদেরও সতর্ক থাকতে হবে,' বলল রানা।

'বিপদ হবে ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পলাতক এক রাশানের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস নিয়ে ইরানের প্রত্যন্ত, পাহাড়ি এলাকায় দশ মিলিয়ন ডলার পাবে ভেবে আসছে কুখ্যাত এক কবর-লুটেরা; আর তার কাছ থেকে চোরাই আর্টিফ্যাক্ট কিনতে এসেছেন আপনি। আপনার কি মনে হচ্ছে না কোনও বিপদের সম্ভাবনা

থাকতে পারে?'

'বুঝতে পেরেছি, কী বোঝাতে চেয়েছেন,' বলল সেসিলি।

আরও পাঁচ মিনিট জোর গতিতে লাফিয়ে চলার পর পরিত্যক্ত এক খামারবাড়ির সামনে থামল মারাদেসিয়ার ল্যাণ্ড রোভার। উপত্যকার বাঁকে পাহাড়ি এক সুড়ঙ্গে সেঁধিয়ে গেছে দু'জোড়া রেললাইন। খামারবাড়ির পেছনে ধুলোভরা উঁচু ঢালু জমি, ওখানে জন্মেছে অসংখ্য বুনো ঝোপঝাড়। প্রায় খাড়া হয়ে নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে ঢালের একপাশ। আশপাশে কোনও মানুষের চিহ্ন দেখল না ওরা।

'বাড়ির পেছনদিক দেখবে, জ্যাঁ,' বলল রানা। 'আপাতত ডক্টর আলম আর মিস ডেনিয়েলসনের সঙ্গে থাকছ তুমি, হাজি। কোনও ঝামেলা দেখলেই গাড়ি নিয়ে উধাও হবে।'

'আপনি কোথায় চলেছেন?' জানতে চাইল সেসিলি।

'বাড়ি খালি কি না দেখব,' ল্যাণ্ড রোভার থেকে নেমে পড়ল রানা। পকেট থেকে বের করেছে শক্তিশালী লেড ফ্ল্যাশলাইট। মারাদেসিয়াকে বলল, 'দু'মিনিটের ভেতর বেরিয়ে না এলে, যা বোঝার বুঝে নেবে।'

মাথা দোলাল ইরানি।

ডাবল মার্চ করে খামারবাড়ির দিকে চলল রানা ও মউরোস।

ভাঙা দালানে ঢুকে যাওয়ার দু'মিনিট পেরোবার আগেই আবারও বেরিয়ে এল রানা, থামল ল্যাণ্ড রোভারের পাশে। 'ওখানে ঝামেলা নেই। মাত্র দুটো ঘর আস্ত, লুকিয়ে নেই কেউ।'

একটু পর ফিরল মউরোস। 'পেছনে কেউ নেই। ঢোকার বা বেরোবার একমাত্র পথ এটাই। কেউ এলে অনেক আগেই সাবধান হতে পারব।'

'ওরা সড়ক পথে আসছে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল রানা।

'তাই?' ভুরু কুঁচকে গেল মউরোসের। কয়েক সেকেণ্ড পর তিক্ত হলো চেহারা। 'যাহ্! দুঃস্বপ্নের জিনিস! মরুক শালারা!'

'কী হয়েছে?' গাড়ির দরজা খুলে রানার পাশে নামল লাবনী। প্রথমবারের মত শুনল ধুপ-ধুপ আওয়াজ।

আসছে হেলিকপ্টার! উঁচু পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে জোরালো প্রতিধ্বনি তুলছে ভারী ইঞ্জিন।

'একবার খুব বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছিল জ্যাঁর,' বলল রানা। 'তখন থেকে ওর ধারণা, ওই জিনিস নির্ঘাত খুন করবে ওকে।'

'মিথ্যা না!' আপত্তির সুরে বলল মউরোস। 'উন্মাদের মত সাঁই-সাঁই করে ঘোরে পাখা! বুদ্ধি থাকলে যে-কেউ বুঝবে খুবই বিপজ্জনক!'

'মাথা নিচু করে রাখবে,' পরামর্শ দিল মারাদেসিয়া।

'খানসারি মাটিতে নামলেই অস্ত্র তৈরি রেখো,' বলল রানা।

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল মউরোস। 'তা আর বলতে?'

পেছনের ঢালু, উঁচু জমির ওপর দিয়ে খামারবাড়ির উদ্দেশে এল হেলিকপ্টার। ওটা কী, চিনে ফেলল রানা। গোটা দুনিয়া জুড়ে ওটার নাম বেল জেট রেঞ্জার, অসামরিক ভারী কপ্টার। একবার চক্কর কাটল খামারবাড়ির ওপর, তারপর নামল ল্যাণ্ড রোভার থেকে এক শ' ফুট দূরে।

রোটরের গতি কমার পর ওদিকে পা বাড়াল রানা। পাইলট এবং আরাশ খানসারি ছাড়াও কপ্টারে আছে আরও তিনজন। হাঁটার গতি বাড়িয়ে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিল রানা। জ্যাকেটের ভেতর হোলস্টারে রানা এজেন্সির ছেলেদের দেয়া উপহার: ওয়াইল্ডি .৪৫ উইনচেস্টার ম্যাগনাম। প্রয়োজনে ঝড়ের বেগে বের করবে।

হেলিকপ্টারের পেছন দরজা খুলে যেতেই লাফিয়ে মাটিতে নামল দাড়িওয়ালা দুই প্রকাণ্ডদেহী লোক। চারপাশ দেখে নিল,

তারপর চোখ রাখল রানার চোখে। পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে ওরা। চোখ সরিয়ে নিল না কোনও পক্ষ। বুঝে গেল, হারবে না কেউ। রানা টের পেয়েছে, আগে আর্মিতে ছিল এরা। তবে স্পেশাল ফোর্সের নয়, সাধারণ সৈনিক।

দু'জনের একজন হেলিকপ্টারের দিকে ঝুঁকে কী যেন বলল ফার্সিতে। খুলে গেল দরজা, এবার নামল আরাশ খানসারি। গার্ডদের মত নয়, পরনে আরবদের জোব্বা। সঙ্গীদের মতই চোখে কালো সানগ্লাস। অবশ্য, তারটা অনেক দামি।

খানসারির পর কপ্টার থেকে নামল আরেক লোক, শ্বেতাঙ্গ। তারকাঁটার মত খাড়া চুল। মুখে কয়েক দিনের না-কাটা দাড়ি।

রানা আঁচ করল, এই লোকই অ্যালেকসেই মিশকিন।

'আপনি মাসুদ রানা?' জানতে চাইল খানসারি।

'হ্যাঁ।'

'মিস ডেনিয়েলসন কোথায়?'

'আর্টিফ্যাক্ট এনেছেন?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল রানা।

ওকে কড়া চোখে দেখে নিয়ে জেট রেঞ্জারের ভেতর হাত পাঠাল খানসারি। তিন সেকেণ্ড পর রানা দেখল, তার হাতে ঝুলছে কালো চামড়ার ছোট এক ব্রিফকেস।

একবার মাথা দুলিয়ে ল্যাণ্ড রোভারের দিকে চলল রানা।

'এখানে হাওয়া বা ধুলোর ভেতর নয়, ব্যবসা হবে বাড়ির ভেতর, ঠিক আছে?' গলা উঁচিয়ে বলল খানসারি।

সতর্ক হয়ে উঠল রানা। থেমে গেছে রোটর। ধুলো বা হাওয়া কোথায়? চারপাশে চোখ বোলাল ও। শত্রুপক্ষের কোনও চিহ্ন নেই। আধমিনিট পর পৌঁছে গেল ল্যাণ্ড রোভারের পাশে।

'কী বুঝলেন?' জানতে চাইল সেসিলি।

'আশপাশে আর কাউকে দেখছি না, কিন্তু সতর্ক থাকবেন,' বলল রানা।

'তুমি লোকটাকে বিশ্বাস করছ না?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'মরলেও না।' মারাদেসিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'এখানেই অপেক্ষা করবে, হাজি। কোনও ঝামেলা দেখলেই হর্ন বাজাবে।'

'ঠিক আছে।' ড্যাশবোর্ডের তলা থেকে রিভলভার বের করে কোলে রাখল ইরানি।

'অস্ত্রের ব্যবহার হবে... ভয় লাগছে,' রানাকে বলল লাবনী।

'আশা করি ঝামেলা হবে না,' বলল রানা।

'চলুন,' খামারবাড়ির দিকে পা বাড়াল সেসিলি।

ছোট বাড়িটার সদর দরজায় থেমেছে খানসারি। রানা লক্ষ করল, সেসিলির ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না লোকটা। ব্রিফকেস ধরা হাতে ইশারা করল, যাতে আগে ভেতরে ঢোকে মেয়েটা।

কিন্তু নিজের সরু ব্রিফকেস দিয়ে পাল্টা ইশারা করল সেসিলি। 'আগে আপনি ঢুকুন।'

একমাত্র জানালা দিয়ে আসছে দিনের আলো। আবছা অন্ধকার খামারবাড়ির ভেতরটা। পরিত্যক্ত হওয়ার আগে সরিয়ে ফেলা হয়েছে প্রায় সব। কিন্তু ঘরের মাঝে রয়েছে অদক্ষ হাতে তৈরি লম্বা এক টেবিল।

পকেট থেকে বড় একটা গ্লো স্টিক নিয়ে ওটার কাঁচ ভেঙে ফেলল মউরোস। ভেতরের কেমিকেল মিশে যেতেই দপ্ করে জ্বলে উঠল কমলা উজ্জ্বল আলো। কমপক্ষে পনেরো মিনিট জ্বলবে। আশা করা যায়, তার আগেই শেষ হবে ব্যবসায়িক লেনদেন।

সবার ভেতর কাজ করছে অস্বস্তি ও সন্দেহ।

বুকের ভেতর কাঁপছে লাবনীর। মনে হচ্ছে, ওর কাজটা সবচেয়ে কঠিন। সামান্য সময়ের ভেতর বুঝে নিতে হবে, জিনিস আসল কি না, নইলে পানিতে পড়বে ডেনিয়েলসনের দশ

মিলিয়ন ডলার। সেক্ষেত্রে মুখ দেখাতে পারবে না ও নিজে।

ভুল করার উপায় নেই!

টেবিলের একমাথায় দাঁড়াল খানসারি, তার দু'গার্ড ও রাশান লোকটা। আরেক দিকে রানা, মউরোস, লাবনী ও সেসিলি। রাশানের সরাসরি সামনে লাবনী। ওর মনে হলো, লোকটা খুব চিন্তিত। বারবার মটকাতে চাইছে আঙুল।

'আপনি টাকা ট্র্যান্সফারের জন্যে তৈরি?' সেসিলিকে জিজ্ঞেস করল খানসারি।

'জিনিসটা দেখার পর টাকা ট্র্যান্সফারের কথা উঠবে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সেসিলি। 'ডক্টর লাবনী আলম আগে নিশ্চিত হবেন ওটা আসল কি না।'

'আলম?' চমকে গেছে মিশকিন। লাবনী লক্ষ করল, ওর দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না লোকটা। 'ডক্টর ফেরদৌস আর লিলিয়া আলমের আত্মীয় আপনি?'

'হ্যাঁ, তাঁরা আমার বাবা-মা। কেন?'

জবাব দিল না অ্যালেকসেই মিশকিন।

লাবনী আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তাড়া দিল আরাশ খানসারি, 'জিনিসটা আসল। এই যে।' টেবিলে ব্রিফকেস রেখে কমবিনেশন লক খুলে ডালা মেলল সে।

লাবনী দেখল লোকটার ডান পাঞ্জা নেই। ওখানে স্টিলের হুক। ড্যাবড্যাব করে দেখছে ও।

'আপনি কি ভাবছেন আমি চোর?' শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল খানসারি।

'ইয়ে... না... আসলে...'

'আপনারা বিদেশিরা সবসময় পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়ে বাস করেন,' বামহাতে ব্রিফকেসের ভেতর দিক দেখাল খানসারি। 'আমি চোর নই, হাত গেছে মোটরবাইক অ্যাক্সিডেন্টে।'

'না, যা শুনেছি, আপনি সাধারণ চোর নন,' মন্তব্য করল রানা।

কড়া চোখে ওকে দেখল খানসারি। 'আপনি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছেন, মিস্টার রানা?'

'না। অপমান করলে টের পেতেন।'

'এবার আর্টিফ্যাক্ট দেখা যাক,' বলল সেসিলি।

কয়েক মুহূর্ত রানাকে দেখে নিয়ে মাথা দোলাল খানসারি। ব্রিফকেস ঠেলে দিল সামনে।

কমলা আলোয় দেখা গেল, ফোমের ভেতর শুয়ে আছে ওই আর্টিফ্যাক্ট। একপলক দেখেই লাবনী বুঝল, ওটা অরিচালকাম। অন্যকিছু হলে এভাবে লালচে ঝিলিক দিত না। পলিশ করা। চকচক করছে। আঙুলের কোনও ছাপ নেই। খুঁত বলতে একমাথায় সামান্য খুবলে নেয়ার দাগ। ওখান থেকে ধাতুর নমুনা নিয়েছে মিশকিন। হলোগ্রামে যা দেখা গেছে, ঠিক সেই একই জিনিস।

পুরোটা দেখতে পাচ্ছে লাবনী। সামনে বেড়ে থাকা অংশের নিচে, ছোট এক খাঁজ। ওখানকার দাগ...

'আমি একটু হাতে নিতে পারি?' খানসারির কাছে জিজ্ঞেস করল লাবনী। কথা বলেছে প্রায় ফিসফিস করে।

'অবশ্যই।'

ল্যাটেক্স সার্জিক্যাল গ্লাভ্স্ পরে নিয়ে সাবধানে ফোম থেকে আর্টিফ্যাক্ট তুলল লাবনী। যা ভেবেছে, জিনিসটা তার চেয়েও ভারী। তামার তুলনায় সোনার পরিমাণ বেশি। তীরের ফলা ও দু'পাশের ছোট চিহ্ন দেখার পর অক্ষরের দিকে মনোযোগ দিল লাবনী। কয়েক মুহূর্ত পর জানালা দিয়ে আসা আলোয় উল্টে দেখল।

'অক্ষর কী ধরনের?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

‘গ্লোয়েল, বা ওই ধরনেরই ভাষা। অন্তত বেশিরভাগ তাই।’ গ্লাভ্স্ পরা তর্জনী দিয়ে চিহ্ন দেখাল লাবনী। ‘কিন্তু আরও কিছু আছে। এটা সম্পূর্ণ অন্য অক্ষর।’

‘চিনতে পেরেছেন?’

‘পরিচিত লাগছে, কিন্তু চট্ করে মনে আসছে না। সাধারণ গ্লোয়েল অক্ষর নয়। অন্য এলাকায় প্রচলিত অক্ষর হতে পারে। হয়তো আগের বা পরের সময়ের। বুঝতে হলে দেখতে হবে আমার রেফারেন্স।’

‘যা লাগবে, তাই পাবেন,’ বলল সেসিলি, ‘কিন্তু বুঝতে পেরেছেন, এটা সত্যিই আসল কি না?’

উল্টেপাল্টে আর্টিফ্যাক্ট দেখল লাবনী।

হলোগ্রামে যা দেখেছে, এখানেও তা-ই— ওপরে শেষমাথায় একটা ঘাট। ওটা ছাড়া আর কোনও বাড়তি অংশ নেই। গোলাকার অংশে বুলিয়ে দেখল আঙুল। মনে পড়ল স্মৃতি। ঠিক এমনই একটা জিনিস আছে ওর...

‘ডক্টর?’ লাবনীর বাহু স্পর্শ করল সেসিলি। বুঝতে পেরেছে, মনের গভীরে ডুব দিয়েছে মেয়েটা। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল ও, ‘এটা কি আসল?’

‘হ্যাঁ? হ্যাঁ। তাই তো মনে হচ্ছে। তবে নিশ্চিত হতে হলে মেটালার্জিকাল অ্যানালাইসিস করতে হবে।’

‘দুঃখিত, সঙ্গে স্পেকট্রোগ্রাফ নেই,’ হাসল সেসিলি। ‘এখন সব নির্ভর করছে আপনার মন্তব্যের ওপর।’

‘ও...’ বড় করে দম নিল লাবনী। শুকিয়ে গেছে গলা। দশ মিলিয়ন ডলার বহু টাকা। তার চেয়েও বড় কথা, কয়েক জীবনেও এত টাকা দেখতে পাবে না। ‘এটা যদি নকল হয়, সেক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানে তৈরি। তাতেও লেগেছে অনেক টাকা। খুব কম মানুষ চেনে গ্লোয়েল অক্ষর।’

'পড়তে তো পারছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোনও কোনও অংশ, হ্যাঁ,' নির্দিষ্ট কিছু অক্ষরের ওপর আঙুল বোলাল লাবনী। '"উত্তর থেকে", "মুখে", "নদীর"। বা এই যে লাইন, এখানে লিখেছে...' আর্টিফ্যাক্টের একধারে আঙুল রাখল লাবনী। 'এটা কোনও মানচিত্র বা এ-ধরনের কিছুর অংশ। দিক নির্দেশনা দিতে চেয়েছে।'

চকচক করছে সেসিলির চোখ। কয়েক সেকেণ্ড পর পাকা ব্যবসায়ীর মত বলল, 'যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর কিছু লাগবে না। মিস্টার খানসারি, আপনার জিনিসটা কিনছি আমি।'

'চমৎকার!' সেসিলির চোখের মতই চকচক করছে ইরানি চোরের চোখ। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'তা হলে এবার টাকাগুলো ট্র্যান্সফার করুন!'

লাবনীকে ফোমে আর্টিফ্যাক্ট রাখতে ইশারা করল সেসিলি। জিনিসটা ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে দেখে নিয়ে বন্ধ করে দিল ডালা। জ্বলজ্বলে অরিচালকাম আর দেখতে পাবে না ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল লাবনীর। টেনে নিজের কাছে ব্রিফকেস সরিয়ে নিল রানা। নিজের ব্রিফকেস খুলল সেসিলি।

থাক্ থাক্ ডলারের বাণ্ডিল দেখবে, ভেবেছে লাবনী। অবাক হয়ে গেল ব্রিফকেসে পাম পাইলটের মত এক ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার দেখে। ওটার পাশে সংযুক্ত টেলিফোন হ্যাণ্ডসেট। ফোন তুলে নিয়ে ওটার মাথার দিকে মোটা অ্যান্টেনা বড় করল সেসিলি। কানে ঠেকাল রিসিভার।

ওদিক থেকে বলা হয়েছে কিছু।

'ট্র্যান্সফার,' বলল সেসিলি। কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে আবারও বলল, 'ট্র্যান্সফার, অ্যাকাউন্ট নাম্বার ২৫৬২-৭৮৩ থেকে অ্যাকাউন্ট নাম্বার ৮৭৬১-১২৪৯-এ। আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে, অথোরাইযেশন কোড: থ্রি-যিরো-থ্রি-ওয়ান-টু।

েয়া হবে দশ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।' চুপ হয়ে গেল মেয়েটা। একই কথা ওদিক থেকে বলা হচ্ছে। ওদিকের লোকটা থেমে গেলে সেসিলি বলল, 'ইয়েস, আই কনফার্ম।' ডিভাইসের কালো স্ক্রিনে ডান হাতের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করল। চোখ তুলে মাথা দোলাল আরাশ খানসারির উদ্দেশে।

হাসল লোকটা। হুক পরা হাত দেখাল লাবনীকে। 'আমার ব্যবহার করতে হবে বাম বুড়ো আঙুল।'

তার আঙুলের ছাপের কনফার্মেশনের জন্যে অপেক্ষা করল সেসিলি, তারপর আবারও লোকটার দিকে চেয়ে মাথা দোলাল।

খুশি মনে হলো ইরানিকে। ঘুরে মিশকিনকে বলল, 'কাজ শেষ। অবসরে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাবে সাত মিলিয়ন ডলার।'

'ত্রিশ পার্সেণ্ট আপনি নেবেন?' আঁৎকে উঠল মউরোস। 'আপনি তো ভাই চোর নন, সত্যিকারের ডাকাত!'

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল খানসারি। কোনও কথা বলল না। ঘুরে দেখল সেসিলিকে। 'তো বাকি থাকল মাত্র একটা কাজ। মিস ডেনিয়েলসন...'

'জানি,' অধৈর্য সুরে বলল মেয়েটা। আবার মন দিয়েছে ফোনের দিকে। 'রেডি ফর ফাইনাল সিকিউরিটি চেক।' একবার লাবনীকে দেখে নিয়ে রিসিভারে বলল: '"*In the temple they placed statues of gold; there was the god himself standing in a chariot, the charioteer of six winged horses, and of such a size that he touched the roof of the building with his head.*"'

ক্রিটিয়াস থেকে নেয়া ওই কথাগুলো, চট করে বুঝল লাবনী। ভাবল: কেন কে জানে, তবে নিশ্চয়ই ওই পাসওয়ার্ড দরকারী। আঙুলের ছাপ দিলেও লেগেছে ওই কোড।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল সেসিলি, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' অ্যান্টেনা

গুটিয়ে নিয়ে দেখল, অবাক হয়ে চেয়ে আছে লাবনী। সেসিলি বলল, 'ওটা ভয়েসপ্রিন্ট অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস সিস্টেম। আমার গলা স্বাভাবিক না থাকলে বাতিল হয়ে যেত ট্র্যান্সফার অর্ডার।'

'কিন্তু কোনও ঝামেলা ছিল না,' বলল খানসারি। 'অনেক ধন্যবাদ, মিস ডেনিয়েলসন।' দু'সেকেণ্ড ছাতের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল সে, 'আমাদের ব্যবসা সাফল্যের সঙ্গে খতম।' ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

কিন্তু তখনই ঝট্ করে তার মাথায় ওয়াইল্ডি তাক করল রানা। 'এক মিনিট, খানসারি!'

পাথরের মূর্তি হয়ে গেল কবর-দস্যু। তার বডিগার্ডদের দিকে অস্ত্র তাক করেছে মউরোস।

'কী হচ্ছে, বলুন তো?' অবাক সুরে বলল খানসারি।

'মিস্টার রানা? কী ব্যাপার?' জানতে চাইল সেসিলি।

'গুবরে পোকাটা কোথায়?' কড়া সুরে বলল রানা, 'আমাদের কথা শুনছিল কেউ!'

'কী বলছেন...' আবারও রানার দিকে ফিরল লোকটা।

'আর একটা মিথ্যা বললেই উড়িয়ে দেব খুলি!' কড়াৎ আওয়াজে ওপরে উঠল ভয়ঙ্কর অস্ত্রের হ্যামার।

রানাকে দেখল খানসারি। 'ওটা আছে কড়িবর্গার ওপর।'

বন্ধু মাথার ইশারা করতেই টেবিলে উঠল মউরোস, হাত বোলাল কড়িবর্গার ওপরে। কয়েক সেকেণ্ড পর নেমে এল ছোট একটা কালো বাক্স হাতে। 'ট্র্যান্সমিটার।'

অবাক হয়ে সব দেখছে লাবনী। 'কী হচ্ছে আসলে?'

'টাকা লেনদেন হয়ে যাওয়ায় ফাঁদ পেতে আমাদেরকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছে এই লোক,' বলল রানা। 'এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, আর্টিফ্যাক্ট নকল নয়। নিজের কাছে রেখে দিত।' মাথার ইশারায় খানসারিকে বাইরের দিক দেখাল ও। 'ওদিকে তোমার

কয়জন লোক?'

'শুধু আমার পাইলট,' নাক কুঁচকে ফেলেছে ইরানি লুটেরা।

কিন্তু রানা কিছু বলা বা করার আগেই ওর বুকে স্থির হলো লাল একটা বিন্দু। পরক্ষণে আরেকটা!

লেসার তাক হয়েছে জানালা থেকে।

বাইরে ধুপ-ধাপ আওয়াজ হলো পায়ের।

টিটকারির ভঙ্গিতে হাসছে আরাশ খানসারি। 'পাইলট একা, কিন্তু হাজির হয়েছে আমার বন্ধু ইরানিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন মোসাব্বিযুল, সঙ্গে তার বিশজন সৈনিক!'

দড়াম করে দরজা খুলে যেতেই ভীষণ ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল লাবনী।

রাইফেল হাতে তেড়ে এল চারজন সৈনিক।

খানসারির দিকে চেয়ে বিড়বিড় করল মউরোস, 'তুমি শালা দেখছি মায়ের পেট থেকে না, বাপের পোঁদ দিয়ে বেরিয়েছ!'

চুপ করে কী যেন ভাবছে রানা।

ছয়

স্থানীয়ভাবে তৈরি জার্মান হেকলার অ্যাণ্ড কচ রাইফেলের নকল সৈনিকদের হাতে। অস্ত্রের মুখে সব কেড়ে নেয়ার পর, দেরি না করে বাইরে আনা হলো রানাদের। হাতে আর্টিফ্যাক্টের ব্রিফকেস নিয়ে পেছনে খানসারি, থলথলে মুখে আনন্দের হাসি।

বন্দি রানা দেখল, দরজা-খোলা ল্যাণ্ড রোভারের পাশে

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে হাজি মারাদেসিয়া, মাথার পেছনে দু'হাত। তাকে পাহারা দিচ্ছে দু'জন সৈনিক। গোটা খামারবাড়ি ঘিরে ফেলেছে তাদের দলের লোকজন। রানা বুঝল কী হয়েছে— খামারবাড়ির পেছনের ঢালু, উঁচু জমির ওদিকে লুকিয়ে ছিল সৈনিকরা, ডাক পড়তেই দড়ি বেয়ে নেমে এসেছে উপত্যকার মেঝেতে।

সৈনিকদের কয়েকজনের হাতে রাশান ড্র্যাগুনভ স্নাইপার রাইফেল, সঙ্গে লাগানো লেসার সাইট আর টেলিস্কোপ। এ কারণেই সতর্ক করতে পারেনি মারাদেসিয়া। বুকে তাক করা ছিল লাল বিন্দু। টুঁ শব্দ করলেই মরত।

'মাফ করো, রানা,' হতাশ সুরে বলল মারাদেসিয়া। 'ওরা অনেক।' তার পাঁজরে কষে লাথি দিল ডানদিকের গার্ড। কাত হয়ে মাটিতে পড়ল মাঝবয়সী মানুষটা। ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখ।

'ভুল হতেই পারে,' বন্ধুকে সান্ত্বনা দিল রানা। মস্ত বিপদে পড়ে ভাবছে, ওর উচিত নিজেকেই চাবকে দেয়া। জানত না, এত ক্ষমতাশালী লোক খানসারি, হাসতে হাসতে ডেকে আনবে আর্মি। দূরে চোখ গেল ওর। ধুলোময় চড়াই পথে গুড়-গুড় শব্দে উঠছে বাদামি ট্রাক। চোখের আড়ালে ছিল, মিশন সফল হওয়ার পর আসছে সৈনিকদের তুলে নিতে।

এক অফিসারের দিকে চলেছে খানসারি। হাতের হুকে ঝুলছে আর্টিফ্যাক্টের ব্রিফকেস। অফিসারের সঙ্গে করমর্দন করল বামহাতে। 'ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল! আসুন, আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই!'

লম্বা দাড়িওয়ালা লিকলিকে লোক ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল, রানাদের দেখে এক কান থেকে আরেক কানে পৌঁছে গেছে তার হাসি। 'খুব খুশির কথা! খানসারি, বলুন তো, এদের নিয়ে কী

করা উচিত?'

'সোনালি চুলের মেয়েটা, আর রাশান লোকটাকে সঙ্গে নেব আমি।'

নির্লজ্জ, লোভী দৃষ্টিতে সেসিলিকে দেখল ক্যাপ্টেন। বদলে পেল শীতল দৃষ্টি। 'ওই রাশান শালাকে নিয়ে কী করবেন জানি না, কিন্তু ওই আদরের পুতুলকে নিয়ে কী খেলা খেলবেন, তা বেশ বুঝতে পারছি।'

'আরে না, ওসব না! যদিও মনটা চায়...' সেসিলিকে দেখে নিয়ে উদাস হয়ে গেল খানসারি। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও তাকাল ক্যাপ্টেনের চোখে। 'যাক গে, অন্যদের কী হবে, সেটা আপনিই ঠিক করুন। ওরা আমার পেছনে না এলেই হলো।'

'আসবে না। বিদেশিরা আমাদের দেশের সম্পদ চুরি করছে বলে খেপে আছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। এদের একেকজনের জেল হবে কমপক্ষে বিশ বছর; অবশ্য যদি জান নিয়ে পৌঁছাতে পারে আদালত পর্যন্ত!'

'যা ভাল বোঝেন, করবেন,' নিজের গার্ডদের দিকে চেয়ে তুড়ি বাজাল খানসারি। মাথার ইশারায় দেখাল সেসিলি ও মিশকিনকে। 'এদের হাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে দাও!'

'সেসিলিকে কোথায় নেবে?' জিজ্ঞেস করল গম্ভীর রানা। জবাবও পেল। পিঠে নেমে এসেছে এক সৈনিকের রাইফেলের বাঁট। প্রচণ্ড ব্যথায় মাটিতে ধড়াস করে পড়ে গেল ও।

'আমার বাড়িতে নেব। চিন্তা কোরো না। ওর কিছুই হবে না। ওর বাপ মেয়ের জন্যে আমার সঙ্গে চুক্তি করলেই হলো।'

'মুক্তিপণ?' অবাক হয়ে বলল সেসিলি। খানসারির এক গার্ড হ্যাঁচকা টানে ওর দু'হাত পেছনে নিয়ে আটকে দিল হ্যাণ্ডকাফে। ক্লিক আওয়াজ তুলল তালা।

'আরও দশ মিলিয়ন দাবি করা কি খুব বেশি হয়ে যায়?'

মেয়েটাকে পাত্তা না দিয়ে রানাকে দেখছে খানসারি। 'আমার যদি এমন সুন্দরী মেয়ে থাকত, বাধ্য হয়েই আলোচনার টেবিলে বসতাম।' নিচু হলো তার কণ্ঠ, 'নইলে যে আর সুন্দরী থাকবে না মেয়েটা!'

'মস্ত ভুল করলে,' উঠে বসল রানা, 'মরবে, কিন্তু তার আগে ভুগতে হবে তোমাকে।'

'এর চেয়ে আর ভাল হুমকি পেট থেকে বেরোল না?' ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল খানসারি। 'তুমি বিশ বছর পর জেল থেকে বেরোলে ভাবব, তোমাকে নিয়ে কী করা যায়।'

'মিস্টার রানা, সম্ভব হলে লাবনীর দিকে খেয়াল রাখবেন,' বলল সেসিলি। পেছন থেকে জোরে ঠেলে হেলিকপ্টারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। আরও কয়েক পা গিয়ে খানসারিকে বলল, 'ওটাতে মাত্র পাঁচটা সিট। কিন্তু আমরা ছয়জন। নাকি ভাবছ, হুক আটকে স্কিড থেকে ঝুলবে?'

'তুমি বসবে মিশকিনের কোলে,' খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল খানসারি। 'দু'জন একটু মৌজ করে নাও, ক্ষতি কী? এমনিতেই তো ওকে বিক্রি করে দেব ডোনাটি লুক্কার কাছে!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রাশানের মুখ। 'কী? কী বললে? নাহ্! খানসারি! আমরা না চুক্তি করেছি!'

'অনেক ভাল চুক্তি করবে ডোনাটি লুক্কা। তিন মিলিয়ন ডলারে সন্তুষ্ট হব কেন, যখন দশ মিলিয়নই নিতে পারি? তা ছাড়া, আর্টিফ্যাক্ট সহ তোমাকে ফিরে পেলে সেজন্যেও বাড়তি টাকা দেবে সে।'

'না-না!' চেঁচিয়ে উঠল মিশকিন। হ্যাণ্ডকাফ পাত্তা না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের গার্ডের ওপর। সেসিলিকে ছেড়ে দিয়েই ঘুরল দ্বিতীয় গার্ড, কিন্তু পেটে খেল খচ্চরের ছোঁড়া লাথির মত মারাত্মক এক কিক। ভয়ে পাগল হয়ে গেছে রাশান, এক লাফে

টপকে গেল ধরাশায়ী গার্ডকে, এঁকেবেঁকে ছুটছে খামারবাড়ির দিকে। পুরো পাঁচ সেকেণ্ড পর হুঁশ হলো সৈনিকদের, শত্রুর বুক লক্ষ্য করে তুলল অস্ত্র।

'খবরদার! কেউ গুলি করবে না!' চিৎকার ছাড়ল খানসারি। দু' সেকেণ্ড পর একই নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল।

থমকে গেছে সৈনিকরা, আর ওই এক সেকেণ্ড নিজের কাজে ব্যয় করল রানা। কাছের সৈনিকের রাইফেলের ব্যারেল খপ্ করে ধরেই কেড়ে নিল অস্ত্র, পরক্ষণে ট্রিগারে চেপে বসল ওর তর্জনী। অন্য হাতে তপ্ত অনুভূতি, ইস্পাতের নল দিয়ে ছিটকে বেরোচ্ছে বুলেট। বিস্ফোরিত হলো সামনের সৈনিকের বুক, টকটকে লাল রক্ত ও ছেঁড়া ফুসফুসের টুকরো গিয়ে লাগল ল্যাণ্ড রোভারে।

সৈনিকরা প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই রাইফেলের সিলেক্টর সুইচ ফুল অটোতে নিয়েছে রানা। নল ঘুরিয়ে ড্র্যাগুনভধারী সৈনিকদের লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করেছে। কাটা কলাগাছের মত ধুপ-ধাপ মাটিতে পড়ল ঝাঁঝরা লোকগুলো। দলের অন্যদের গায়ে লাগবে বলে গুলি ছুঁড়তে পারছে না সৈনিকরা।

'লাবনী!' চিৎকার করল রানা। হতভম্ব হয়ে ওকে দেখছে মেয়েটা, যেন হুঁশ নেই। খপ্ করে তার বাহু ধরতে গেল রানা, কিন্তু ওর চেয়ে দ্রুত নড়ে উঠল সৈনিকদের একজন, ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিল লাবনীকে। মেয়েটা আহত হবে, সে ভয়ে লোকটাকে গুলি করতে পারল না রানা।

কৌশল পাল্টে নিল। হাঁক ছাড়ল, 'জ্যাঁ!' মাথা কাত করে দেখিয়ে দিল ল্যাণ্ড রোভার। কাজে নেমে পড়েছে মউরোস, হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিতে চাইল এক সৈনিকের রাইফেল।

কিন্তু ওর মাথার পেছনে নামল আরেক সৈনিকের রাইফেলের বাঁট। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে ধড়াস্ শব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল ফ্রেঞ্চ

মার্সেনারি।

কাতরে ওঠার শব্দে ঘুরে চাইল রানা। উঠে দাঁড়াচ্ছিল মারাদেসিয়া, কিন্তু এক লাথিতে তাকে মাটিতে ফেলেছে এক সৈনিক। তার সঙ্গী জিথ্রি তাক করছে রানার দিকে...

ল্যাণ্ড রোভারের পেছন সিটে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। প্রায় একই সময়ে বন্ধ করল দরজা। পরক্ষণে চুরমার হলো জানালার কাঁচ। বুলেটের আঘাতে খুবলে গেল জিপের অ্যালিউমিনিয়াম পুরু চামড়া।

'রানা!' আর্তচিৎকার ছাড়ল লাবনী। এইমাত্র মাটি থেকে ওকে টেনে তুলেছে এক সৈনিক, ছেঁচড়ে নিয়ে চলল দূরে। ধস্তাধস্তি করছে লাবনী, কিন্তু ওই লোকের গায়ের জোরের কাছে হার মানতে হচ্ছে। আরও দু'সৈনিক মাটিতে গেঁথে ফেলেছে মউরোসকে।

এদিকের সৈনিক খালি করল তার ম্যাগাযিন। ঝাঁঝরা করতে চেয়েছে জিপগাড়ি। গুলি থামলে নিশ্চিন্ত মনে ছিঁড়েখুঁড়ে যাওয়া দরজা টেনে খুলল সে।

ল্যাণ্ড রোভারে কেউ নেই। দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল লোকটার মুখে। তখনই শুনল আবছা আওয়াজ। ঝট্ করে তাকাল মেঝের দিকে। এইমাত্র রিয়ার ফুটওয়েলে গড়িয়ে এসে থেমেছে হ্যাণ্ড গ্রেনেড!

বিরাট হাঁ করল সে, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না চিৎকার। তাকে পিছনে ছিটকে দিল বিস্ফোরিত গ্রেনেড— শ্র্যাপনেলের কারণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মৃত লোকটার মুখ-বুক-পেট।

শ্র্যাপনেলের ঝড়ে ভীষণভাবে আহত হয়েছে মউরোসকে গেঁথে রাখা দু'সৈনিক। একই অবস্থা মারাদেসিয়ার সৈনিকের। মাথার ওপর দিয়ে শ্র্যাপনেল গেছে বলে পুরো সুস্থ বন্দিরা।

ল্যাণ্ড রোভারের ওদিকে পেছন চাকার কাছে রানা, দু'হাতে

চেপে ধরে রেখেছে কান। দেখেছে, বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কবজা ছিঁড়ে উড়ে গেছে দরজা। যেন চারকোনা প্রকাণ্ড ফ্রিসবি! উপত্যকার দূরের ঢালু জমিতে গিয়ে নামল ওটা।

গাড়ির তলা দিয়ে দেখল রানা, কাছের সৈনিকরা আহত বা মৃত। কিন্তু বিস্ফোরণের শব্দ সামলে নিচ্ছে দূরের সৈনিকরা। দলে তারা এখনও কমপক্ষে দশজন, সম্পূর্ণ সশস্ত্র!

খেপে গেছে তারা।

হেলিকপ্টারের কাছে সেসিলির সাদা কোট দেখল রানা। খানসারির এক গার্ড ধরে রেখেছে মেয়েটাকে। পিস্তল হাতে কাভার দিচ্ছে ইরানিয়ান ক্যাপ্টেন, গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিল নিজ লোকদেরকে।

লাবনী...

ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল যে সৈনিক, সে এখন ভালুকের মত মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে পিছিয়ে যাচ্ছে। রানা বুঝে গেল, গুলি করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া, ওর জিথ্রি রাইফেলে আছে আর বড়জোর কয়েকটা গুলি।

ঝড়ের বেগে ভাবছে রানা। স্থির করতে চাইল কী করবে।

আপাতত নিরাপদ লাবনী, যদিও বন্দি। খানসারি আর ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল ইংরেজি জানে। শুনেছে, সেসিলি ওকে বলেছে, 'মিস্টার রানা, সম্ভব হলে লাবনীর দিকে খেয়াল রাখবেন।' লাবনীকে জিম্মি করতে পারে ইরানিয়ানরা, সেক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করতে হবে। চাইলেও লড়ে জিতবে না। শত্রু অনেক বেশি। এখন একমাত্র কাজ হওয়া উচিত সরে যাওয়া। পরে স্থির করবে, কীভাবে ছুটিয়ে নেবে দলের সবাইকে।

ল্যাণ্ড রোভার ঘিরে ঘন ধূসর ধোঁয়া। ওই কাভার নিয়ে জিথ্রি রাইফেল হাতে কুঁজো হয়ে পিছাতে লাগল রানা। বেশ কয়েক কদম পিছিয়ে ব্রাশ ফায়ার করল। খালি হয়ে গেছে ম্যাগাযিন।

গুলি করেছে মাথার ওপর দিয়ে, যাতে লুকিয়ে পড়ে সৈনিকরা। ঘুরেই ঝেড়ে দৌড় দিল রানা নিচের উপত্যকার উদ্দেশে।

পিছনে আবার শুরু হয়েছে গুলিবর্ষণ। টের পেয়ে গেছে সৈনিকরা।

ঢালু জমিতে উড়ে চলেছে রানা। দূরে, নিচের উপত্যকায় একজোড়া রেললাইন, গিয়ে ঢুকেছে পাহাড়ি এক সুড়ঙ্গে। 'হিস্' শব্দে ওর কানের পাশ দিয়ে গেল বুলেট। শকওয়েভের কারণে ঝাঁকি খেল মাথা। সামনের জমি বোধহয় আরও খাড়া। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে ঢালু অংশটা পেরোল রানা, ভেবেছিল লাফিয়ে নামবে নিচের জমিতে। কিন্তু পা পড়ল ল্যাণ্ড রোভারের দরজার ওপর!

ঢালু জমিতে ধুলো-পাথরে পিছলে রওনা হয়ে গেল ওটা। টলমল করতে করতে টিকে থাকতে চাইল রানা। গতি বাড়ছে দরজার। যেন দ্রুতগামী স্লেড। তাতে অখুশি নয় ও, বেশিক্ষণ ছুটবে না জিনিসটা। ঢালু অংশ বেশি পাথুরে। তাতে কী, একটু এগিয়ে যাওয়াও এখন কম নয়। সৈনিকরা এদিকে আসার আগেই সরে যেতে হবে ওকে।

টিলার গায়ে নাক উঁচু এক বোল্ডার লক্ষ্য করে সরাসরি ছুটছে দরজা। পাথর থেকে পাঁচ গজ আগেই নেমে পড়ল রানা, আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভারসাম্য রাখতে। প্রচণ্ড গতি নিয়ে পাথরের বুকে গুঁতো দিল দরজা, পরক্ষণে তুবড়ে গেল কার্ডবোর্ডের মত। ঢালু জমিতে দু'পায়ে ব্রেক কষতে চাইছে রানা, কিন্তু গতি ঢের বেশি। পায়ে পা বেধে পড়তেই খাড়া টিলা থেকে শুরু হলো পতন। গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে, কাঁকর ও ছোট পাথর লাগছে মুখে, অন্ধ করে দিচ্ছে। ওপর থেকে এল গুলির আওয়াজ।

ঠাস্ করে কী যেন লাগল গালে। বুলেট নয়, গাছের কাণ্ড। কর্কশ ঘাস আর বুনো ঝোপঝাড়ের ভেতর গড়িয়ে নেমে চলেছে

রানা। ধরেই নিল, প্রায় নেমে এসেছে উপত্যকার মেঝের কাছে। ধুলোবালির ঝড়ের ভেতর জোর করে চোখ মেলল, পরক্ষণে কেঁপে গেল ওর আত্মা।

এবার সত্যিকারের পতন!

যেন পড়ছে গভীর কোনও গর্তে!

'যাহ্!' বলে উঠল অসহায় রানা।

চোখ কুঁচকে ফেলেছে এক সৈনিক। 'ওফ্! ওই শালা যা ব্যথা পাবে না!' তর্জনী তাক করেছে নিচে। ওদিকে রেললাইন গিয়ে ঢুকেছে সুড়ঙ্গে। টিলার এদিকে বেড়ে আছে পাথুরে ছাত।

যত বড় কমাণ্ডোই হোক, অত উঁচু থেকে বেকায়দাভাবে পড়লে মারাত্মক আহত হবে, মরেও যেতে পারে পলাতক লোকটা।

সৈনিকের পাশের জন বলল, 'শুয়োরের বাচ্চার উপযুক্ত শাস্তি!'

সৈনিকদের পাশে থেমে নিচে তাকাল ইরানিয়ান ক্যাপ্টেন। পরিষ্কার দেখল কোন্ পথে গেছে রানা। বাতাসে এখনও উড়ছে ধুলো, ধীরে ধীরে নামছে সুড়ঙ্গের দিকে। 'দড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে দেখে এসো,' নির্দেশ দিল সে। 'তিনজন যাবে। কুকুরটা মরে গিয়ে থাকলে নিয়ে যাবে রেলস্টেশনে। আর হারামজাদা বেঁচে থাকলে...' রাগে বিকৃত হলো তার চেহারা। 'ওর লাশ নেবে রেলস্টেশনে।'

'জী, স্যর!' স্যালিউট দিল সৈনিকরা। টিলা বেয়ে নামবে বলে তৈরি হতে লাগল তাদের তিনজন।

আবারও আরাশ খানসারির সামনে গিয়ে থামল ক্যাপ্টেন। ধরে আনা হয়েছে রাশান লোকটাকে। অন্যান্য বন্দির পাশে দাঁড় করিয়ে পাহারা দিচ্ছে সৈনিকরা। 'সব দোষ আপনার!'

খানসারির বুকে আঙুল তাক করল ক্যাপ্টেন। 'আপনি বলেননি ওই লোক প্রশিক্ষিত আততায়ী!'

'আমি নিজেও জানতাম না!' রাগ চেপে বলল খানসারি। 'ভেবেছি ওই নরওয়েজিয়ান মেয়ের সঙ্গে এসেছে তার ছেলে বন্ধু! আমি জানব কী করে যে সে এমন ভয়ঙ্কর...' সেসিলির দিকে হাতের ইশারা করল সে।

'আমার চারজন সৈনিক খুন হয়েছে! তিনজন আহত! ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এর কী ব্যাখ্যা দেব আমি? হ্যাঁ?'

নার্ভাস হয়ে নিচের ঠোঁট চাটল খানসারি। শীতের হাওয়ার ভেতরও ঘেমে উঠছে। 'এখন... নিহত বা আহত সৈনিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেব... এ ছাড়াও, কমাণ্ডিং অফিসারের যদি কিছু পাওনা হয়, তা-ও। আপনি কী বলেন?'

খানসারির দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচাল ক্যাপ্টেন, 'কত দিতে হবে, তা জানিয়ে দেব।' চুপ হয়ে গেল সে। আরও নার্ভাস হয়ে উঠছে খানসারি। 'কয়েক লাখ ডলারের কমে হবে না।'

'বাড়ি ফিরলেই ব্যবস্থা করব,' স্বস্তির শ্বাস ফেলল খানসারি।

'দেরি করলে জীবনটা সহজ হবে না আপনার জন্যে,' শীতল সুরে বলল ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল।

'কথা দিচ্ছি, কাজেই ভাববেন না।' কঠোর চোখে সেসিলিকে দেখল কবর-লুটেরা। 'এবার আমাকে যেতে হয়। পড়ে আছে জরুরি কাজ। তা ছাড়া, চাই না এই দুঃখজনক দুর্ঘটনার এলাকায় আপনার সঙ্গে আমাকে দেখুক কেউ।'

আপত্তি সত্ত্বেও মাথা দোলাল ক্যাপ্টেন। তার নির্দেশে লাবনী, মউরোস ও মারাদেসিয়াকে সরিয়ে নিল সৈনিকরা। ওদিকে মিশকিন ও সেসিলিকে নিয়ে কপ্টারে উঠল খানসারি। এতই ভয় পেয়েছে, চুপ হয়ে গেছে মিশকিন, বসল পেছনের সিটের মাঝখানে। দু'দিকে খানসারির দুই বডিগার্ড। রাশানের

কোলে বসতে বাধ্য করা হলো সেসিলিকে। পেছনে হ্যাণ্ডকাফে আটকানো ওর দুই হাত, বাধা দেয়ার উপায় নেই। কোমরে আটকে দেয়া হলো সিট বেল্ট। মিশকিনের সঙ্গে আটকা পড়েছে সে।

কো-পাইলটের সিটে বসল খানসারি। ঘুরে ধরল সেসিলির থুতনি। 'আহা, মিস ডেনিয়েলসন, এভাবে মুখ কালো করে রাখবেন না! আপনার সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার করা হবে না। অনেক বেশি মূল্যবান আপনি। আপনার বাবা সহায়তা করলেই ছাড়া পাবেন। কিন্তু আপনার বাবা তেড়িবেড়ি করলে...' কর্কশ হাসল সে।

ঝটকা দিয়ে থুতনি সরিয়ে নিল সেসিলি। 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করছ, খানসারি।'

'তাই নাকি?' আরও চওড়া হলো কবর-দস্যুর হাসি 'ভয় দেখাবেন না। আরাম করে উপভোগ করুন যাত্রা। আর বেচারা মিশকিনকে একটু শিথিল করতে চাইলে...' রাশানের ছাইরঙা চেহারা দেখল খানসারি। 'মোচড়া-মুচড়ি বন্ধ করুন। ফুর্তি আসবে মিশকিনের মনে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের শেষ আনন্দ, কী বলেন?' তার হাসি হয়ে গেল শীতল। 'কিন্তু অতিরিক্ত ঝটকা-ঝটকি করলে আমার বডিগার্ডরা ধরে নেবে, ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সেক্ষেত্রে ভুল করে গুলিও করে দিতে পারে।' সেসিলির পাঁজরে মাযলের গুঁতো দিয়ে বুঝিয়ে দিল দুই বডিগার্ডের একজন, তার বস্ মিথ্যা বলছে না।

'কথাটা মনে থাকবে,' অন্য দিকে চেয়ে বলল সেসিলি।

'গুড!' পাইলটকে বলল খানসারি, 'এবার রওনা হও।'

অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে আছে ভীতা লাবনী। এইমাত্র আকাশে উঠে ফিরতি পথ ধরল হেলিকপ্টার মনে পড়ল, মাত্র তিন দিন

আগেও ছিল ও নিউ ইয়র্কে, আর আজ শত্রুদেশ ইরানে বন্দি! এ কী খেলা খেলছে নিষ্ঠুর নিয়তি?

মুক্তিপণের জন্যে ধরে নিয়ে গেছে সেসিলিকে।

আর রানা...

সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না লাবনী। কিন্তু তাদের ধীরস্থির ভঙ্গি বলে দিচ্ছে, মারা গেছে মাসুদ রানা। নিজের এই বিপদের মাঝে বড় করে একটা শ্বাস ছাড়ল ও... মানুষটা অনেক করেছে ওর জন্যে। কেন যেন দোষী মনে হচ্ছে নিজেকে। বাবার পর আরেক হৃদয়বান মানুষ পেয়েছিল, হারিয়ে ফেলল তাকেও।

খামারবাড়ির সামনে থেমেছে বড়সড় এক মিলিটারি ট্রাক। জ্যাঁ মউরোস, হাজি মারাদেসিয়া আর ওকে ঠেলে তুলে দেয়া হয়েছে ট্রাকের পেছনে। ভীষণ কান্না আসছে ওর।

বড় করে দম নিয়ে মনকে শান্ত রাখতে চাইছে রানা। পাহাড়ি কিনারা থেকে পড়ে যাওয়ার দু' সেকেণ্ড আগে, গা মুচড়ে ডানহাতে আঁকড়ে ধরেছিল ছোট এক পাথর। ওটা উপড়ে আসেনি। এই মুহূর্তে পাপেটের মত ঝুলছে ও। প্রায় একমিনিট লেগেছে বামহাত ওপরে তুলে পাথর ধরতে। আপাতত পড়ে যাওয়ার ভয় নেই।

কিন্তু তাতে যে উপকার হবে, এমন নয়।

ঝুলছে রেললাইনের অনেক ওপরে। ওর পা থেকে কমপক্ষে আঠারো ফুট নিচে ওই ইস্পাতের রেললাইন।

কমাণ্ডো ট্রেনিঙে সতর্ক করা হয়: উঁচু থেকে লাফ দেয়াকে মোটেও সহজ ভাববে না। আসলে এত ওপর থেকে নামতে গিয়ে যখন তখন ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা।

কিন্তু নেমে না পড়ে উপায়ও নেই ওর। শুনছে সৈনিকদের

চিৎকার। দড়ি বেয়ে নামছে কয়েকজন। ঝরঝর করে পড়ছে ছোটবড় পাথর। লোকগুলো একবার চলে এলে...

হাত ছেড়ে দাও, নিজেকে বলল রানা।

এক সেকেণ্ড পর দু'কানের পাশে শুরু হলো হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ। পতন সামলে নিতে তৈরি। প্রায় ভাঁজ করে নিয়েছে দু'হাঁটু। পরক্ষণে ওর মনে হলো, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি দেয়া হলো পায়ের হাড়ে। কাত হয়ে শরীর গড়িয়ে দিল রানা। পাঁজরে লেগেছে রেললাইনের পাত।

যন্ত্রণা সহ্য করে ক্রল করবে, কিন্তু তার আগে অবস্থা বুঝে নিতে একটু থামল। দু'পায়ে ভীষণ ব্যথা। মচকে গেছে বাম গোড়ালি। চোট লেগেছে পাঁজরে। পুরু কাপড়ের কোট না থাকলে চিড় ধরত হাড়ে। আর সবই ঠিক আছে। ব্যথার তোড় কমাতে কয়েকবার বড় করে দম নিল রানা, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখল খাড়া টিলা। তখনই শুনল জোরালো আওয়াজ। আকাশে উঠছে খানসারির হেলিকপ্টার। কয়েক সেকেণ্ড পর টিলা পেরিয়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িং। ওটাতে আছে হুকওয়ালা কবর-লুটেরা, সঙ্গে নিচ্ছে সেসিলি ডেনিয়েলসনকে। মেয়েটার বাবার কাছ থেকে আদায় করবে মুক্তিপণ।

এবার কী? ভাবল রানা। প্রথম কাজ হওয়া উচিত লাবনী, মউরোস ও মারাদেসিয়াকে উদ্ধার করা। একটু আগে যে ট্রাক ও দেখেছে, ওটাতে করে ওদেরকে নিয়ে গেলে, যেতে হবে রেলস্টেশনের পাশের রাস্তা ধরে।

রেলস্টেশন...

ওখানে গিয়ে জোগাড় করতে হবে যানবাহন। সেক্ষেত্রে পিছু নিতে পারবে ওই ট্রাকের। আর সঠিক সময়ে ছুটিয়ে নেবে দলের সবাইকে। গোড়ালি ও পাঁজরের টনটনে ব্যথা উপেক্ষা করে রেলস্টেশন লক্ষ্য করে ছুটল রানা।

সাত

'দুশ্চিন্তা করবেন না, আপনার খারাপ কিছুই হবে না,' লাবনীকে বলল মউরোস। ধুলোবালি ভরা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে চলেছে ট্রাক।

'বাঁচব কী করে?' কবজি তুলে হ্যাণ্ডকাফ দেখাল লাবনী। 'গ্রেফতার করেছে। কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে সেসিলিকে। আর রানা মৃত!'

ঘোঁৎ করে আওয়াজ বেরোল মউরোস ও মারাদেসিয়ার নাক থেকে। আপত্তি আছে ওদের। 'এর চেয়ে অনেক বড় বিপদেও কিছুই হয়নি রানার,' বলল মারাদেসিয়া।

'এর চেয়ে খারাপ আর কী হবে? গুলি করেছে ওকে, পড়েও গেছে পাহাড় থেকে।'

'তা হলে শুনুন, ক' দিন আগে, রানা আর আমি...' মুখ খুলল মউরোস, কিন্তু ফার্সি ভাষায় ধমকে উঠেছে এক সৈনিক। অস্ত্রের নল দিয়ে গুঁতো দিল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারির পেটে। ব্যথা সহ্য করে বলল মউরোস, 'ছাগলটা চাইছে না আমরা কথা বলি।'

'তোমরাই ছাগল!' ইংরেজিতে ধমক দিল সৈনিক। 'আমি ইংরেজি জানি!'

'তা হলে, শালা, এবার বল্ দেখি ফ্রেঞ্চ?' মাতৃভাষায় বলল মউরোস। 'তারপর কি হলো জানেন...'

ইয়াজদাহা এক ধমক দেয়া হলো ওকে। আবারও গুঁতো এল

েপটে।

'থাক, কিছু বলতে হবে না আপনাকে,' বলল লাবনী।

চুপ হয়ে গেছে ওরা।

মউরোসের দিকে চেয়ে আছে লাবনী। ভুলেও দেখবে না মেঝের দিকে। ওখানে পড়ে আছে কয়েকজন সৈনিকের লাশ।

আরও কিছুক্ষণ পর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে থামল ট্রাক। হ্যাঁচকা টানে নামানো হলো লাবনীকে। অন্ধ হয়ে গেছে উজ্জ্বল আলোয়। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওরা আছে প্রায় পরিত্যক্ত এক রেলস্টেশনে। দু'জোড়া রেললাইন গেছে প্রধান লাইনে। কাছেই খাটো এক ডিজেল চালিত লোকোমোটিভ, লেজে তিনটে প্যাসেঞ্জার কার। পাশের লাইনে সাপের মত দীর্ঘ এক ফ্রেইট ট্রেন। ওটা থেকে এল ভেড়া ও ছাগলের ডাক।

বন্দিদের সামনে থামল ক্যাপ্টেন, কোমরে দু'হাত।

'এবার কোথায় নেবেন?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'বিচারের সামনে দাঁড়াবেন, কারণ আপনারা খুন করেছেন ইরানিয়ান সৈনিক,' বলল ক্যাপ্টেন। 'দোষ প্রমাণ হলেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।'

'কী বলছেন!' চমকে গেল লাবনী, 'আমরা তো কিছুই করিনি!'

'এই লোক চরম দুর্নীতি-পরায়ণ, খামোকা নিজের সময় নষ্ট করছেন,' বলল মউরোস। 'তর্ক না করে... পিঠে নামল এক সৈনিকের রাইফেলের বাঁট, প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়ে মাটিতে পড়ে গেল মউরোস।

'তোদের কপাল ভাল, গুলি করে মারছি না,' দাঁত খিঁচিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'আদালতে বলতে পারতাম, পালাতে গিয়ে মরেছিস।' মনে হলো কাজটা করবে কি না ভাবছে। কয়েক সেকেণ্ড পর কী যেন নির্দেশ দিল। ঠেলে নিয়ে লাবনী ও

মারাদেসিয়াকে রেলগাড়ির সামনের কার-এ তুলে দিল ক'জন সৈনিক। আরও দু'সৈনিক মউরোসকে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলল বগির মেঝেতে। ব্যথা পেয়ে মুখ কুঁচকে ফেলেছে ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি।

সেকেলে ডিযাইনের বগি। একপাশে সরু করিডোর, আরেকদিকে আটজনের একের পর এক কম্পার্টমেন্ট। পেছনের কম্পার্টমেন্টে ঠুসে দেয়া হলো মউরোস ও মারাদেসিয়াকে। ওখানে ওদেরকে পাহারা দিতে থাকল চারজন সৈনিক। লাবনীকে ওদিকেই নিয়ে যাচ্ছিল এক সৈনিক, কিন্তু আপত্তির সুরে তাকে কী যেন বলল ক্যাপ্টেন মোসাব্বিযুল। তাতে নোংরা হাসি হাসল সৈনিক। করিডোরের সামনের কম্পার্টমেন্টে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। একসময় এদিকটা ছিল ফার্স্ট ক্লাস সেকশন, কিন্তু বহু আগেই যৌবন গেছে বগির। সিট সব ছেঁড়া ও নোংরা।

'বসো,' গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। লাবনীর পেছনে এসে ঢুকেছে কম্পার্টমেন্টে।

আপত্তি তুলবে ভেবেছিল লাবনী, কিন্তু তখনই ঠেলে ওকে বসিয়ে দেয়া হলো জানালার পাশের এক সিটে। বেরিয়ে গিয়ে দরজার সামনে পাহারায় থাকল সৈনিক। সরু কাচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাকে।

চুপ করে ভাবছে লাবনী, এবার কথা আরম্ভ করবে ইরানি ক্যাপ্টেন। কিন্তু তা না করে বসল মুখোমুখি সিটে। তার চোখ চাটছে যুবতী নারীদেহ। আনমনে কপালের কাছে চুল স্পর্শ করল লাবনী। ওই নড়াচড়া দেখেই ওর মুখের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন।

ভীষণ ভয় লাগছে লাবনীর, কাঁপছে মৃদু মৃদু। ভাবছে, ও এখানে একা। এখন যদি লোকটা ওকে রেপ করে? বাধা দেবে না বাইরের সৈনিক। আরও খারাপ কিছুও হতে পারে। এরা

হয়তো দু'জন মিলে ওকে... হায়, খোদা, রক্ষা করো এই মস্ত বিপদ থেকে!

ওর কম্পন টের পেয়ে গেছে মোসাব্বিযুল। বাঁকা হাসল। চোখে লোভ। তখনই ঝাঁকি খেয়ে রওনা হলো ট্রেন। লাবনীর নেলপলিশ করা লাল নখ দেখে বুকের ভেতর কেমন শিরশির করছে তার, পেলব হাত তুলে নিল নিজের হাতে, চোখে কীসের এক নেশা।

জীবনে বহুবার মাইলের পর মাইল দৌড়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা। তখন সহ্য করতে হয়নি এমন ব্যথা। প্রতি পঞ্চাশ গজ গেলে একবার করে ঘুরে দেখছে। সৈনিকরা সুড়ঙ্গের কাছে নেমে আসার আগেই সরে এসেছে প্রায় চার শ' গজ। তারপর থেকে কমছে দু'পক্ষের ব্যবধান।

সৈনিকরা পরিশ্রান্ত নয়, আহতও নয়।

এখনও জিথ্রি রাইফেলের কার্যকর রেঞ্জের বাইরে আছে রানা। সাধারণ ইরানিয়ান সৈনিকদের যে ট্রেনিং দেয়া হয়, তাতে আপাতত গুলি লাগবে, সে সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পর আসবে সত্যিকারের মহাবিপদ। তার আগেই রেলস্টেশনে পৌঁছে যেতে হবে ওকে।

এখনও জানে না, ওখানে পৌঁছে কী করবে।

দূরে সাইডিঙে এক মালগাড়ি, পাশেই ছোট যাত্রীবাহী ট্রেন। শেষেরটার পাশেই আর্মির ট্রাক। ওটা দেখে নতুন করে উপলব্ধি করল রানা, আগেও চোখে পড়েছে ওই ট্রাক। খামারবাড়ির দিকে গিয়েছিল। সৈনিক ও বন্দিদের এনেছে এখানে। তার মানে, বন্দিদের তুলে দেয়া হবে ট্রেনে।

ছুটতে ছুটতে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে দেখল রানা। তেড়ে আসছে তিন ইরানি সৈনিক। এখনও দু' শ' গজ দূরে।

কমিয়ে আনছে মাঝের দূরত্ব। অর্থাৎ, প্রায় একই সময়ে রেলস্টেশনে পৌঁছবে ওরা। তার আগেই আরম্ভ হবে গুলি!

এরই ভেতর নড়ছে যাত্রীবাহী লোকোমোটিভ! পাহাড়ি বাতাসে ভাসল ডিজেল ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ। চিমনি দিয়ে ভক-ভক করে আকাশে ছুঁড়ল নোংরা ধোঁয়া।

অনেক দেরি করে ফেলেছে ও!

টিলার কাঁধে যে রাস্তা, ট্রাক চুরি করে ওখানে উঠে ধাওয়া করলেও ট্রেনের পাশে পৌঁছুতে পারবে না। লাবনী, মউরোস ও মারাদেসিয়াকে উদ্ধার করতে চাইলে খুঁজতে হবে অন্য কোনও পথ।

খুব ধীর গতিতে যাত্রীবাহী লোকোমোটিভ চলেছে পয়েন্টের দিকে। একবার ওগুলো পেরিয়ে মেইন লাইনে উঠলেই বাড়বে গতি। এক এক করে বাঁক পেরিয়ে যাচ্ছে বগি।

যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ফেলেছে রানা, বাড়িয়ে দিল দৌড়ের গতি। বুঝে গেল, না, আর গিয়ে উঠতে পারবে না ট্রেনে!

রেলস্টেশনের একদিকের পয়েন্ট-এর কাছে যাওয়ার আগেই আরেক মাথা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ট্রেন। গতি বাড়ছে বলে গর্জন তুলছে ইঞ্জিন। ওটার পিছু নিতে চাইলে দখল করতে হবে ট্রাক, অথবা মালগাড়ি।

ট্রাকের পেছনে দাঁড়িয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ঢ্যাঙা এক সৈনিক, রেলস্টেশন ছেড়ে গেছে ক্যাপ্টেনের ট্রেন। এক সেকেণ্ড পর পেছনের পাথরে শুনল বুটের আওয়াজ। ঘুরে দেখতে চাইল কে এল। আর তখনই বুকে লাগল জোরালো লাথি। কাত হয়ে পড়ছে সৈনিক, একই সময়ে উপহার পেল গালে শক্তিশালী ঘুষি। নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারিয়ে পাথরের বিছানায় শুয়ে পড়ল সে।

রাইফেলটা তুলে নিয়ে চট্ করে পেছনের লাইন দেখল রানা। তেড়ে আসছে তিন সৈনিক। দেরি না করে মালগাড়ির কাছে পৌঁছতে ছুট লাগাল রানা। পেছন থেকে বগির বডিতে লাগল প্রথম বুলেট। আওয়াজটা এল এক সেকেণ্ড পর। ভয় পেয়ে ডেকে উঠল কয়েকটা ছাগল। বগির পাশে শুয়ে পড়ে শরীর গড়িয়ে ওদিকে চলে গেল রানা। কাভার পাবে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, কিন্তু রেলগাড়ি ঘুরে আসতে সময় নেবে লোকগুলো।

একটু দূরে তামাটে রঙের ইস্পাতের নোংরা লোকোমোটিভ, পেছনে দুটো ক্যাব, তারপর মালটানার বগি। কিন্তু ওখানে যাওয়ার আগে জরুরি কাজ আছে। ক্যাবের পেছনে পৌঁছল রানা। যা ভেবেছে, তা-ই। বগির কাপলার সাধারণ 'নাক্ল্' ডিযাইনের। লিভার টেনে খুলতেই ভারী, ধাতব আওয়াজ হলো। এবার ইঞ্জিন রওনা হলে পেছনে পড়ে থাকবে জন্তু ভরা দীর্ঘ ফ্রেইট বগি।

পেছনে চোখ বোলাল রানা। বগির বাম থেকে আসছে দুই সৈনিক। অর্থাৎ, ডানে মাত্র একজন। কাপলারে উঠে বগির আরেক পাশে সরল রানা, হাতে তৈরি অস্ত্র। কোনা থেকে দেখল, ওর দিকে ছুটে আসছে তৃতীয় সৈনিক।

বাম হাঁটুতে বসে ট্রিগার স্পর্শ করল রানা। পর পর দুটো গুলি বুকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পাথরের বেডে পড়ল মৃত সৈনিক।

দ্বিতীয়বার ওদিকে তাকাল না রানা, কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল লোকোমোটিভের সামনে। এইমাত্র খোলা দরজা দিয়ে মাথা বের করেছে ড্রাইভার। বুঝেও গেছে কী ঘটছে।

'শুভসন্ধ্যা,' ফার্সিতে বলল রানা, হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। হাতের অস্ত্রের নল স্থির হলো চালকের বুকে। 'দুঃখিত, আপনার ইঞ্জিনটা ধার নিতে হচ্ছে।'

ভীষণ ভয় ফুটে উঠল ড্রাইভারের চোখে-মুখে। দু'হাত

তুলেছে মাথার ওপর। বার কয়েক এদিক ওদিক তাকাল, তারপর বিদঘুটে এক আর্তনাদ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঞ্জিনের আরেক পাশে।

'আমি তো কেবল অনুরোধ করেছি,' বিড়বিড় করে বলে ধাপ বেয়ে ক্যাবে উঠল রানা। ভেতরে কেউ নেই। দূরের সিগনাল কেবিনের দিকে ছুটছে চালক। অলস ভঙ্গিতে ধুক-ধুক আওয়াজ তুলছে ইঞ্জিন। কণ্ট্রোল প্যানেলের সবচেয়ে বড় লিভারটাই সম্ভবত থ্রটল। তার পাশের বড়টা ব্রেক।

পরীক্ষা করতে থ্রটল লিভার সামনে ঠেলল রানা। তাতে হোঁচট খেল ক্যাব। বেড়ে গেছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। ক্যাব থরথর করে কাঁপলেও কাজ করছে ব্রেক।

যেটাকে ব্রেক লিভার বলে ভাবছে রানা, পিছিয়ে নিল ওটা। ফলে আরম্ভ হলো ধাতব ক্যাচকোঁচ আওয়াজ। দুলে উঠে পেছনে দুটো বগি নিয়ে রওনা হলো ইঞ্জিন। থ্রটল লিভার সামনে ঠেলল রানা। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল ইঞ্জিন। কণ্ট্রোল লিভারের গেজের লাল অংশে পৌঁছল কয়েকটা কাঁটা। এসব পাত্তা না দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে চেয়ে আছে রানা।

পেছনে রয়ে গেছে ট্রেনের অবশিষ্ট অংশ। দু'সৈনিক পৌঁছে গেছে প্রায় সামনের বগির কাছে। জিথ্রি রাইফেলের মায্‌ল্‌ ওদিকে ঘোরাল রানা, সুইচ নিল ফুল অটোতে, পরক্ষণে গুলি করল লোকোমোটিভের পাশ থেকে।

ধুপ্‌ করে পড়ল এক সৈনিক, ক্ষত-বিক্ষত বুক থেকে ছিটকে বেরোল রক্তের ঝর্না। বগির মাঝের ফাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার সঙ্গী। ইঞ্জিনের বডির কারণে তাকে আর দেখতে পেল না রানা। নতুন করে মনোযোগ দিল কণ্ট্রোল প্যানেল ও সামনের ট্র্যাকে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে প্রথম সেট পয়েন্ট।

আগেও রেলগাড়ি ড্রাইভ করেছে, রানা পরিষ্কার বুঝল

আপাতত ওর উচিত গতি কমিয়ে আনা। কিন্তু এ মুহূর্তে তা অসম্ভব। যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে হবে সামনের ট্রেনের কাছে। দু'হাতে কন্ট্রোল প্যানেল ধরে তৈরি থাকল রানা। অনেক বেশি গতি তুলে পয়েন্ট পেরোচ্ছে ট্রেন। ফলে চলছে ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ভয়ঙ্কর কর্কশ সংঘর্ষ। ইঞ্জিনের পেছনের ছয় চাকাও উঠে এল সুইচ-এর ওপর। আরেক ঝাঁকি খেয়ে সোজা হলো ইঞ্জিন। কিন্তু একটু দূরেই পরের সেট পয়েন্ট। অতিরিক্ত জোরে ছুটছে ইঞ্জিন।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর নতুন করে আরম্ভ হলো ধাতুর বিকট সংঘর্ষ। দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকল রানা। বসে পড়েছে ড্রাইভারের সিটে। তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে ট্রেন। কিছুই পাত্তা না দিয়ে আরও সামনে থ্রটল ঠেলল ও।

মাত্র এক সেট পয়েন্ট বাকি, তারপর সরাসরি মেইন লাইনে উঠবে ইঞ্জিন, ধাওয়া করবে সামনের ট্রেনকে। লোকোমোটিভের সমস্ত শক্তি খরচ করবে রানা। বাড়তি বগি নেই বলেই ওর গতি হবে বেশি। কিন্তু সামনের ধাতব পাতে আলোর ছটা!

বদলে দেয়া হয়েছে শেষ সেট পয়েন্ট।

মাথা ঘুরিয়ে দেখল রানা, সিগনাল কেবিনের জানালায় ভীত দুই মুখ। পরক্ষণে তাদের পেরিয়ে এগিয়ে গেল লেজকাটা ইঞ্জিন। সিগনালম্যানকে বলে দিয়েছে ড্রাইভার, যাতে একই লাইনে না যায় দুই রেলগাড়ি। পাশের লাইনে ছুটবে রানার ইঞ্জিন।

তার খারাপ দিক হচ্ছে, ওদিক থেকে কোনও ট্রেন এলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে!

ওরা যা খুশি করুক, হাল ছাড়ব না, ভাবল রানা।

পয়েন্টের বেড়ে থাকা পাতের শেষাংশ পেরিয়ে বজ্রের মত আওয়াজ তুলে মূল লাইনে উঠে এল ইঞ্জিন। আরও সামনে থ্রটল

ঠেলে দিল রানা। গেজ কাউন্টারে আবারও লাফ দিল সব কাঁটা। পাত্তা দিল না রানা। ওর নজর শুধু স্পিডোমিটারে। ক্রমেই বাড়ছে গতি। চল্লিশ কিলোমিটার... পঞ্চাশ কিলোমিটার...

পাহাড়ি অঞ্চলে এঁকেবেঁকে গেছে ট্র্যাক। এখনও সামনে দেখা যাচ্ছে না কোনও ট্রেন। অবশ্য বেশি দূরে থাকার কথা নয় ওটার।

ক্যাপ্টেনের ট্রেনের কাছে পৌঁছে যাওয়াই রানার একমাত্র চিন্তা নয়। বড় সমস্যা হবে ওটার ওপর ওঠা। কাজটা সহজ না-ও হতে পারে।

পরস্পরকে দেখল মউরোস ও মারাদেসিয়া। দু'জনই কাজ করেছে মার্সেনারি দলে বা আর্মিতে। সতর্ক চোখে দেখছে সৈনিকদের। তারা ক্লান্ত, কোনও দিকেই বিশেষ নজর নেই। পাহারা দিতে হলে এমনই বিরক্ত হয় বেশিরভাগ মানুষ। বিশেষ করে যখন জানে, সংখ্যায় তারা বেশি। তাদের চারজনের বিরুদ্ধে মাত্র দু'জন বন্দি। প্রথম যখন ওদেরকে এ কম্পার্টমেন্টে আনা হলো, সৈনিকরা তাক করে রেখেছিল অস্ত্র। এখন কাঁধে ঝুলছে রাইফেল। প্রয়োজন পড়লে মাত্র তিন সেকেণ্ডে আবারও হাতে তুলে নেবে অস্ত্র। কিন্তু জানে না, প্রথম দুই সেকেণ্ডই মউরোস ও মারাদেসিয়ার জন্যে যথেষ্ট।

এখন সঠিক সময়ের অপেক্ষায় আছে ওরা।

ক্যাপ্টেন মোসাব্বিযুলকে যতই উপেক্ষা করছে লাবনী, দ্বিগুণ মনোযোগ দিচ্ছে লোকটা। চোখ দিয়ে যেন গিলে ফেলবে। হাত ছুটিয়ে নিয়ে জানালার নোংরা কাঁচের ওদিকে দেখছে ও। কখনও খুব কাছে চলে আসছে উঁচু সব পাহাড়, আবার লাইনের কারণে সরে যাচ্ছে বহু দূরে।

নড়েচড়ে বসল ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল।

চট্ করে ওকে দেখল লাবনী। আত্মা কেঁপে গেল লোকটার হাতে রানার ওয়াইল্ডি দেখে।

'তুমি বা তোমার বন্ধুরা পালাতে চাইলে অনেক সহজ হতো আমার জীবন,' বলল লোকটা। 'সেক্ষেত্রে গুলি করে মারতে পারতাম। পেপার ওঅর্ক কমত। একবার কথা বলেই মেনে নিত সুপিরিয়র অফিসাররা। কে জানে, শহরে পৌঁছে যাওয়ার আগেই হয়তো মেরে ফেলব তোমাদেরকে। কাজ কমবে তাতে।' ধীরে ধীরে লাবনীর দিকে তাক হলো ভয়ঙ্কর পিস্তল। সিটে গেঁথে যেতে চাইল বেচারী। 'কিন্তু তুমি বদলে দিতে পারো আমার এই বিরূপ মনোভাব। রক্ষা করতে পারো তোমার বন্ধুদে ।'

'কী করে?' ঢোক গিলল লাবনী। বুঝে গেছে. বলতে চায় লোকটা।

'তুমি ভাল করেই জানো,' ঝুঁকে এল ক্যাপ্টেন। চকচক করছে তার লোভী চোখ।

'আপনি মানসিক রোগী।'

কপট হাসল ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল। 'আমি অযৌক্তিক মনের লোক নই।' দেখে নিল হাতঘড়ি। 'ভাবতে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাকে। যদি ঠিক করো মানবে না আমার কথা...' পৈশাচিক নীরব হাসি দিল সে। 'প্রথমে খুন করব তোমার বন্ধুদেরকে। তারপর কী করব জানো? তোমাকে তুলে দেব আমার লোকের হাতে। বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ওরা আবার মোটেও... যাকে বলে আমার মত সভ্য নয়।'

ভয়ে নিজেকে অবশ মনে হচ্ছে লাবনীর। বুকে কেমন এক ব্যথার অনুভূতি। লোকটার কাছ থেকে একটু সরে বসল ও। মন চাইল কেঁদে ফেলতে। বড় একা ও। বড় অসহায়

সত্তর কিলোমিটার বেগে ছুটছে ট্রেন। গতি আরও বাড়ছে। গম্ভীর মুখে সামনে চেয়ে আছে রানা। খুব কাছেই থাকবে যাত্রীবাহী ট্রেনটা। হয়তো এই দীর্ঘ বাঁক পেরিয়ে গেলেই চোখে পড়বে।

হ্যাঁ, ওই তো!

আধমাইল সামনে। কমছে মাঝের ব্যবধান। আর বড়জোর দু'মিনিট, তারপর শত্রু ট্রেনের ঘাড়ে শ্বাস ফেলবে ওর ইঞ্জিন।

পঞ্চাশ মাইলের চেয়েও বেশি গতি তুলে ছুটছে দুই ট্রেন। দু'জোড়া লাইনের মাঝে দশ ফুট ফাঁক। কিন্তু দুই রেলগাড়ির বডির মাঝের ব্যবধান আরও কম। বেশি হলে পাঁচ ফুট। সহজেই লাফিয়ে চলে যেতে পারবে পাশের ট্রেনে। হয়তো।

থ্রটল অ্যাডজাস্ট করল রানা। একটু পর পাশাপাশি ছুটবে ওর ট্রেন। আর তখনই পাশের ট্রেনে লাফিয়ে চলে যাবে ও। ডানের দরজা খুলে ঝুঁকে গেল রানা। বুঝে নিতে চাইছে ঝোড়ো হাওয়ার তোড়। আর তখনই কাঁধে নামল প্রচণ্ড এক আঘাত। অবশ হয়ে গেল কাঁধ। ধড়াস্ করে দরজার ওপর পড়েছে রানা। কোমর বেরিয়ে গেছে বাইরে।

এইমাত্র পেছনের ক্যাব থেকে এসেছে তৃতীয় সৈনিক!

তীব্র ব্যথার ভেতর ভাবল রানা, এই লোক এল কোত্থেকে?

একেবারে শেষ সময়ে উঠে পড়েছে ট্রেনে!

মুখের কাছেই রেললাইনের পাথর দেখছে রানা। ঠেলে ওকে দরজা দিয়ে ফেলতে চাইছে সৈনিক। কোনও কাজেই আসছে না রানার অবশ হাত, অন্য হাতে খপ্ করে ইঞ্জিনের বাইরের দিকের হ্যাণ্ডরেল ধরল ও। আর ওটা ধরেছে বলেই প্রায় বেরিয়ে যেতে হয়েছে ক্যাবের ভেতর থেকে।

আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেল ওর। একই লাইনে ছুটে আসছে আরেকটা লোকোমোটিভ!

সতর্ক করতে হেডলাইট জ্বেলেছে ড্রাইভার দুই দানব

চাইলেও এখন গতি কমাতে পারবে না!

সামনে ঝুঁকে দু'হাতে রানার গলা টিপে ধরেছে সৈনিক। বাধ্য করছে ফুটপ্লেট থেকে পেছাতে।

দম নিতে লড়ছে রানা, শ্বাসনালীতে চেপে বসেছে লোকটার দু'বুড়ো আঙুল। ফেটে যেতে চাইছে বুক। শুধু হ্যাণ্ডরেল ধরে রাখতে গিয়েই ফুরিয়ে যাচ্ছে সব শক্তি। বামহাত ঝুলছে মরা সাপের মত।

চোখের কোণে দ্রুতগামী ট্রেনের উজ্জ্বল হেডলাইট দেখছে রানা। দেখতে না দেখতে আরও বড় হয়ে উঠছে ওটা!

আট

রানার ওপর ঝুঁকে পড়েছে ইরানি, দাঁত বের করে গালি দিল, 'মর্! আমেরিকান কুকুরের বাচ্চা!'

'আমেরিকান? দুশ্‌শালা! আমি বাংলাদেশি!' প্রিয় দেশের কথা মনে পড়তেই কোত্থেকে যেন একরাশ শক্তি ফিরে পেল রানা। মুঠো করা হাত উঠে ধুপ করে লাগল ইরানির মুখে। আঘাতটা হাতুড়ির বাড়ির মত। চুরমার হয়ে গেছে সৈনিকের নাকের কার্টিলেজ। শিথিল হলো গলা টিপে রাখা হাত। ব্যথায় পিছিয়ে গেছে লোকটা।

রানার ভাঁজ করা হাঁটু খটাস্ করে গিয়ে লাগল তার পাঁজরে। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ল সৈনিক, আর এ সুযোগে ক্যাবে উঠে এল রানা। কানের কাছে শুনল রেলগাড়ির হুইস্‌ল্।

সোজা হয়েই জানালা দিয়ে তাকাল রানা। ব্রেক কষলেও একই গতি তুলে আসছে সামনের লোকোমোটিভ! চাকা থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে সাদা-কমলা-লাল-নীল স্ফুলিঙ্গ। পেছনে সাধারণ বগির বদলে দীর্ঘ, সাদা সব ট্যাঙ্কার ট্রাক। ভেতরে ফিউয়েল বা কেমিকেল!

ক্যাব থেকে লাফিয়ে পড়ল ড্রাইভার। রানার মনে হলো, কামানের গোলার মত আসছে ট্রেন। সাদা আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে হেডলাইট।

রানার ট্রেন প্রায় পৌঁছে গেছে যাত্রীবাহী ট্রেনের পাশে, একটু সামনে ওটার পেছনের বগি। ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই রানার, উঠতে গিয়ে হাত ফস্কে গেলেই মরবে।

উঠে বসেছে ইরানি সৈনিক। জানালার ওদিকের দৃশ্য দেখে বিস্ফারিত হলো তার চোখ। বিকট আর্তনাদ বেরোল গলা চিরে।

ওই একই সময়ে পাশের ট্রেনের উদ্দেশে উড়াল দিল রানা। পড়ে যেতে গিয়েও ধরে ফেলল পেছনের খোলা প্ল্যাটফর্মের গার্ডরেল।

তার মাত্র তিন সেকেণ্ড পর পাশের লাইনে মুখোমুখি গুঁতো খেল দুই ট্রেন। রানার ছেড়ে আসা ট্রেন গেঁথে গেল দীর্ঘ রেলগাড়ির মাথার ভেতর, পরক্ষণে রওনা হলো আকাশে। ধাতব হাজার টুকরো হচ্ছে সামনের লোকোমোটিভ। এক সেকেণ্ড পর পুরু লোহার দুই চেসিস লাগল বিকট আওয়াজে। রানার ছেড়ে আসা লোকোমোটিভের ওজন ছিল কমপক্ষে এক শ' টন, কিন্তু গতির কারণে আঘাতটা লাগল কয়েক হাজার টন ওজনের। অন্তত ষাট মাইল বেগে লোহার দেয়ালের মতই আছড়ে পড়েছে সামনের লোকোমোটিভে।

ওদিক থেকে আসা লোকোমোটিভের কয়েকটা বগিও উঠে গেছে আকাশে। এক মুহূর্তের জন্যে আকাশে ভেসে থেকে নামল

ভারী ইঞ্জিনের ওপর, পরক্ষণে উল্টে পড়ল পেছনে। পাথুরে জমির সঙ্গে সংঘর্ষে কোটি টুকরো হলো ইঞ্জিন-বগি সব। ছিটিয়ে পড়ল শত শত গ্যালন ডিজেল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল দাউ-দাউ আগুন।

প্রথম ট্যাঙ্কারে ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক জিনিস: দাহ্য অকটেন। একের পর এক বগি কাত হয়ে পড়তেই ছিটিয়ে যেতে লাগল তেল নানান দিকে।

'তোমাকে দেয়া সময় শেষ,' বলল ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল। ঝুঁকে এল লাবনীর দিকে। ঠোঁটে লোভী হাসি। হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটার প্যান্টের বোতামের দিকে।

ভয় পেয়ে পা টেনে নিল লাবনী। কিন্তু কোথাও যাওয়ার উপায় নেই ওর। 'ক্যাপ্টেন, আপনি এসব...'

পাশের লাইনে ঝড়ের মত চলে গেল একটা লোকোমোটিভ। চট্ করে ওটাকে দেখল ক্যাপ্টেন, তারপর আবারও চোখ ফেরাল লাবনীর দিকে। হাঁ করল কী যেন বলতে, কিন্তু স্বর বেরোল না— কীসের এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ থরথর করে কাঁপিয়ে দিল বগি!

কাছ থেকে এক হাজার পাউণ্ডের লেসার গাইডেড বোমার বিস্ফোরণ নিজ চোখে দেখেছে রানা, কিন্তু সে তুলনায় ট্যাঙ্কার ট্রেনের প্রথম কার যেভাবে বিস্ফোরিত হলো, ওর মনে হলো ওটার ভেতর ছিল লাখ পাউণ্ডের বোমা। আপাতত যে ট্রেনে ঝুলছে ও, সেটা ছুটছে ষাট মাইল গতি তুলে। পেছনে পড়ছে তেলবাহী ট্যাঙ্কারের কান ফাটানো সব ডেটোনেশন সব ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রকাণ্ড এক কমলা আগুনের বল। সাঁই-সাঁই করে তেড়ে আসছে এদিকের ট্রেনটাকে গিলে নিতে। মুহূর্তে পুড়ে

গেল রানার হাতের ছোট রোমগুলো।

পরক্ষণে আরম্ভ হলো ভয়ানক এক দানবীয় গোঙানি। প্রথম ট্যাঙ্কারের পেছনে গিয়ে লেগেছে পরের ট্যাঙ্কার! আবার তৈরি হলো ছোট এক পাহাড়। রানার শরীর থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে রেললাইন থেকে ছিটকে পড়েছে শেষ ট্যাঙ্কার ট্রাক। ওই ট্রেন যেন মেরুদণ্ড ভাঙা কোনও প্রকাণ্ড সাপ!

প্রচণ্ড শব্দের ভেতর হলো আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ! লাখ-কোটি টুকরো হয়ে আকাশে উঠল দ্বিতীয় ট্যাঙ্কার ট্রাক! পরক্ষণে তৃতীয়টা!

চেইন রিঅ্যাকশনে বিস্ফোরিত হচ্ছে একের পর এক ট্যাঙ্কার ট্রাক। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে লেলিহান আগুন। এই ট্রেনের চেয়েও অনেক বেশি বেগে ধেয়ে আসছে নীল আগুন!

দশ সেকেণ্ডের ভেতর নিরাপদ আশ্রয় না পেলে ছাই হবে, বুঝে গেল রানা। টনটন করছে দু'হাত। এক লাফে হ্যাণ্ডরেল টপকে সামনে ছুটল। ভয়ঙ্কর সব বিস্ফোরণের আওয়াজে তালা লাগছে কানে। পোড়া চুলের কথা মনেও নেই, তাপ লাগছে শরীরে, সব ভুলে এক দৌড়ে পৌঁছল সামনের দরজায়, মুচড়ে খুলতে চাইল হ্যাণ্ডেল।

লক করা দরজা!

বিস্ফোরণের আগুন ধেয়ে আসছে ওর দিকে!

আগুনের লাল-কমলা বলের আগে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত ধেয়ে এল পোড়া বাতাস। দরজায় বুক ঠেকিয়ে একবার চারপাশ দেখল অসহায় রানা। না, কোথাও যেতে পারবে না...

কিন্তু তখনই হুড়মুড় করে বগির মেঝেতে পিছলে পড়ল ও। মাথা তুলে দেখল, এইমাত্র দরজা খুলেছে এক সৈনিক।

শরীর গড়িয়ে সরে গেল রানা। হাঁ করে ওকে দেখছে লোকটা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, তাদের ট্রেনের পেছনে ছুটে

আসছে তরল আগুনের নীল স্রোত!

চিৎকার করারও সময় পেল না সে, দরজা দিয়ে ঢুকল শেষ ট্যাঙ্কারের আগুনের লকলকে জিভ। চারকোনা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে চাটছে চারপাশ। দাউদাউ আগুনে পুড়ে বিকট এক আর্তনাদ ছাড়ল সৈনিক, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রানার পাশেই। ছটফট করছে জবাই করা খাসির মত।

রানার দু'ফুট ওপর দিয়ে গেছে নীল আগুনের গনগনে হলকা, গড়াতে গিয়ে একপাশে সরে গেল ও। ঝরঝর করে সৈনিকের ওপর পড়ল জ্বলন্ত তেল। শোঁ-শোঁ শব্দ তুলে দমকা হাওয়া তৈরি করে ঝট করে পিছিয়ে গেল নীল হলকা। ওদিকে না চেয়ে উঠেই দৌড় লাগাল রানা। শত্রুদের হাত থেকে ছুটিয়ে নিতে হবে দুই বন্ধু ও লাবনীকে।

প্রথম বিস্ফোরণে হতভম্ব হয়েছে ক্যাপ্টেন মোসাব্বিযুল, পরক্ষণে আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেছে তার। এত কাছে এসব বোমা ফাটছে কেন? ঘনিয়ে এসেছে সেই কেয়ামত? লাবনীর কথা ভুলে লাফ দিয়ে উঠেই কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলল ক্যাপ্টেন, হাঁক ছাড়ল গলা ফাটিয়ে।

কী হচ্ছে কিছুই জানে না লাবনী, কিন্তু ওর মনে হলো বোমা পড়ছে ট্রেনে! ভাবল, এসবের সঙ্গে মাসুদ রানার সম্পর্ক আছে? তা-ই বা হয় কী করে! যা খুশি হোক, ঘাড়ের কাছ থেকে সরে গেছে ইরানিয়ান ক্যাপ্টেন। এবার প্রথম সুযোগে পালিয়ে যেতে হবে।

আরেকবার পরস্পরকে দেখল মউরোস ও মারাদেসিয়া। দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়েছে সৈনিকরা, হতভম্ব। বগির সামনের কম্পার্টমেন্ট থেকে এল ক্যাপ্টেনের কর্কশ স্বরের নির্দেশ।

তৈরি হয়ে গেল মউরোস ও মারাদেসিয়া।

এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর!

ভারী স্লাইডিং ডোর খুলেই সামনে সরু করিডোর দেখল রানা। টের পেল, কপাল খুলছে ওর। প্রথম কম্পার্টমেন্টে কেউ নেই। এদিকে সৈনিক থাকলে মস্ত বিপদে পড়ত।

বগির সামনে বুটের ধুপ-ধাপ আওয়াজ, ছুটছে সৈনিকরা। দড়াম করে খোলা হলো সামনের কানেকটিং ডোর। রানা আগেই বুঝে গেছে, এবার আসছে সত্যিকারের সমস্যা।

এক লাফে কাছের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল ও, একই সময়ে ঝটকা দিয়ে বন্ধ হলো কানেকটিং ডোর। পাশের করিডোর ধরে ছুটে গেল পাঁচ সৈনিক। নোংরা কাঁচের জানালায় উঁকি দিয়ে রানা দেখল, মাত্র দু'ফুট দূরেই ওর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক সৈনিক।

'স্‌স্‌স্‌!'.

পিছনে সাপের ফোঁস শুনে ঝটকা দিয়ে ঘুরে তাকাল লোকটা, চোখে-মুখে বিস্ময়। চেহারার মানচিত্র পাল্টে গেল প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে। অচেতন সৈনিককে কম্পার্টমেন্টের ভেতর টেনে নিয়ে গেল রানা। আরও নিশ্চিত হতে একটা রদ্দা বসাল ঘাড়ের পাশে। এবার সহজে ভাঙবে না এর ঘুম। তার কাঁধ থেকে স্লিংসহ খুলে নিল জিথ্রি রাইফেল, ফুল অটোতে দিল সুইচ। আবার ফিরে এল করিডোরে। পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরছে সৈনিকরা, বুকে-মুখে বুলেট লেগে ধুপ-ধাপ পড়ল করিডোরে।

খালি ম্যাগাযিন খুলে আবারও আগের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল রানা, অচেতন রাজকুমারের কাছ থেকে সংগ্রহ করল স্পেয়ার ম্যাগাযিন। নতুন করে ভরে নিল রাইফেলে। এবার খুঁজে বের করবে লাবনী, মউরোস ও মারাদেসিয়াকে।

এরই ভেতর কম্পার্টমেণ্ট ছেড়ে গেছে এক সৈনিক। এবার কাজে নামতে হবে, ভাবল মউরোস ও মারাদেসিয়া। ঠিক করেছে প্রথম সুযোগেই দেখবে কী ঘটছে রেলগাড়ির পেছনে। গুলির আওয়াজ হতেই চমকে গেছে অন্য তিন সৈনিক। ওসব গুলির শব্দ অটোমেটিক রাইফেলের তৈরি।

পুরনো বন্ধুর চোখে চোখ রাখল মউরোস। নিচু স্বরে বলল, 'এবার!'

কথাটা শেষ করেই এক লাফে সিট ছাড়ল ও, হ্যাণ্ডকাফের চেইন ব্যবহার করে পেঁচিয়ে ধরল ডানের সৈনিকের অস্ত্র ও কবজি। ওর বুটের ডগা খটাস্ করে লাগল বামের সৈনিকের মুখ ও নাকে। এমনই কিক, চুর-চুর হয়ে ভাঙল শত্রুর আট-দশটা দাঁত। বিকট এক আর্তনাদ ছেড়ে মুখ চেপে ধরল সে। একই সময়ে মউরোসের সরাসরি সামনের সৈনিকের পাঁজরে লাথি বসাল মারাদেসিয়া। লোকটার কাঁধ থেকে আকাশে উঠল রাইফেল। স্লিং ধরে হ্যাঁচকা টানে অস্ত্রটা হাতে নিল ইরানি মার্সেনারি।

ঝড়ের গতিতে চলছে দু'বন্ধুর হাত-পা। সোজা হয়েই ডানের সৈনিকের গলায় বিদ্যুদ্গতি কনুই নামাল মউরোস। টের পেল, শত্রুর গলার ভেতর কুড়-মুড় শব্দে ভেঙেছে কী যেন।

মউরোস ঘুরছে, এমন সময় তৃতীয় সৈনিকের হাঁটুর বাটির ওপর নামল মারাদেসিয়ার বুটের হিল। কড়াৎ আওয়াজে ফাটল বাটি। মারাত্মক ব্যথায় নেকড়ের মত দীর্ঘ একটা চিৎকার ছাড়ল লোকটা। সামনে বেড়েই তার অস্ত্র কেড়ে নিল মারাদেসিয়া, বাঁটের জোর এক গুঁতো বসাল লোকটার মাথার পেছনে। মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ল সৈনিক, অজ্ঞান।

অন্য দু'সৈনিকের অবস্থাও করুণ। তাদের অচেতন দেহ

দেখল মারাদেসিয়া। মাথা দুলিয়ে বলল, 'চমৎকার কাজ।'

'তুমিও কম নও।'

'চার নম্বর লোকটাকেও সামলে নিতাম।'

'তা তো বটেই, বুড়ো হারামির হাড়ে এখনও অনেক জোর।' হাসল মউরোস। 'এবার দেখি এদের কাছে হ্যাণ্ডকাফের চাবি পাই কি না!'

এক দৌড়ে দ্বিতীয় বগিতে পৌঁছল রানা, পাশের টয়লেট পেরিয়ে কোনা ঘুরে করিডোরে পা রেখেই চমকে গেল। সামনে থেকে তেড়ে আসছে চার সৈনিক, হাতে উদ্যত রাইফেল!

ঝট্ করে পিছিয়ে এসে পরমুহূর্তে আবারও কোনা ঘুরল রানা। ঘুরেই গুলি করল এক পশলা। একটা চিৎকার ওকে জানিয়ে দিয়েছে, লক্ষ্যভেদ করেছে গুলি। বাকি সৈনিকদের পাল্টা গুলিতে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল প্যানেলিং করা করিডোরের কাঠ। তুষারের মত চারপাশে উড়ছে কাঠের কুচি।

গুলি থামতেই চারপাশ দেখল রানা। জিথ্রি রাইফেলের ব্যারেল অতিরিক্ত দীর্ঘ, কোনা থেকে করিডোরে গুলি করতে চাইলে করতে হবে অন্ধের মত। অনায়াসেই কম্পার্টমেন্টে আশ্রয় নেবে দলে ভারী সৈনিকরা, আটকে রাখবে ওকে। এদিকে সাহায্য করতে হাজির হবে তাদের দলের অন্যরা।

আরেকটা ভাবনা আসতেই ধক্ করে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। সৈনিকরা ওকে এখানে আটকে রাখলেই ও শেষ। কিছুই করতে পারবে না, এদিকের করিডোরে একটা গ্রেনেড পড়লেই সাক্ষাৎ মৃত্যু।

এক সেকেণ্ড পর ফার্সিতে চেঁচিয়ে উঠল এক সৈনিক। 'গর্তে আগুন দে!'

গুলি বন্ধ করেছে সৈনিকরা, গ্রেনেডের লিভারের স্প্রিং

খোলার ধাতব 'ক্লিং' আওয়াজ শুনল রানা। আবারও পেছনের ভারী কানেকটিং ডোর খুলে ওদিকের করিডোরে ফিরতে চাইলে ওর চাই ক'সেকেণ্ড বাড়তি সময়। কিন্তু তার আগেই বিস্ফোরিত হবে গ্রেনেড।

পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করল না রানা। দু'হাতে রাইফেলের ব্যারেল ধরে তৈরি হয়ে গেল। অস্ত্রের বাঁট ওর ক্রিকেট ব্যাট। বুক কাঁপছে ভয়ে, পারব তো বাংলাদেশি ক্রিকেট দলের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়দের মত ছক্কা মারতে, নাকি চিরদিনের জন্যে হয়ে যাব আউট?

ঝট্ করে আড়াল থেকে বেরোল রানা. দেখল ফুলটস বলের মত আসছে গাঢ় সবুজ গ্রেনেড। এক সেকেণ্ড পর খটাস্ করে ব্যাটে বলে এক হতেই ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল বোমা।

ক্ষিপ্র বাঁদরের মত আগের জায়গায় ফিরেছে রানা। পরের সেকেণ্ডে বিস্ফোরিত হলো করিডোরের প্রতিটি কাঁচের জানালা। নানান দিকে ছিটকে গেল শ্র্যাপনেলের মত কাঁচের টুকরো। শুধু তা-ই নয়, অতি খুদে হাজারখানেক স্টিলের বল বেয়ারিং ছিটে লেগেছে ক্যারিজের চার দিকে।

দ্রুতগতি রেলগাড়ির ভেতর ঝোড়ো দমকা হাওয়ায় উধাও হলো ধূসর ধোঁয়া। সাবধানে মুখ বের করে করিডোর দেখল রানা। পড়ে আছে কয়েকজনের অবশিষ্ট দেহ। তাদের ভেতর ক্যাপ্টেন মোসাব্বিরুল নেই। সে বোধহয় আছে বন্দিদের সহ সামনের ক্যারেজে।

আবারও গ্রিপে হাত রেখে ঠিক দিকে রাইফেল ঘুরিয়ে নিল রানা, ব্যস্ত পায়ে চলল রেলগাড়ির সামনের বগি লক্ষ্য করে।

'ট্রেনের ভেতর গ্রেনেড মারছে কোন্ শালা!' বিড়বিড় করল হাজি মারাদেসিয়া।

'তাই তো!'

'রানা?'

'বোধহয়,' হ্যাণ্ডকাফের তালা খুলে ফেলেছে মউরোস। 'তুমি তৈরি?'

'সবসময়!'

'তো বেরোও!'

উদ্যত অস্ত্র হাতে করিডোরে বেরিয়ে এল ওরা, রক্ষা করবে পরস্পরের পিঠ। বগির পেছনে চোখ রেখেছে মউরোস। সামনে দেখার দায়িত্ব মারাদেসিয়ার।

করিডোরের কাঠের দেয়াল ছাড়া কিছুই নেই দেখার মত।

'ঠিক আছে, রওনা...' বলতে শুরু করেও থামল মউরোস। এই মাত্র ওর পেছনে কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠেছে দুটো রাইফেল। প্রথম অস্ত্রটা মারাদেসিয়ার, আর করিডোরের সামনে থেকে এসেছে অপর রাইফেলের গুলি।

টাল সামলে নিতে গিয়ে পিছিয়ে এল মারাদেসিয়া, ওর পিঠ ধাক্কা দিল মউরোসকে। কী হয়েছে টের পেল মউরোস।

লাবনী ও ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুলের কম্পার্টমেণ্টের বাইরে ছিল এক সৈনিক, এইমাত্র গুলি করেই কাভার নেয়ার জন্যে ঢুকে পড়েছে ছোট ঘরে। তার কানের পাশে কাঠের প্যানেলে লেগেছে হাজির বুলেট।

বামহাতে বন্ধুর পতন ঠেকাল মউরোস, টেনে নিয়ে গেল করিডোরের বাঁকের ওদিকে। আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিল মারাদেসিয়াকে।

উরুর ক্ষত থেকে গলগল করে বেরোচ্ছে রক্ত। বামহাতে গর্ত চেপে ধরেছে ইরানি মার্সেনারি। 'শালার কপাল! সিফিলিস ধরা এক ঘেয়ো মেয়েলোকের হারামখোর ছেলে গুলি করেছে!'

অভিজ্ঞতা থেকে মউরোস জানে, এমন ক্ষতে মরতে হবে না

মারাদেসিয়াকে— অবশ্য যদি ঝটপট চিকিৎসা দেয়া হয়। 'গুলি করতে পারবে?' জানতে চাইল ও।

একহাতে রাইফেল তুলে দেখাল মারাদেসিয়া। 'দেখতেই পাচ্ছ মরিনি! ওই হারামজাদার বিচি উড়িয়ে না দিয়ে মরবও না! যাও, সাহায্য করো রানাকে!'

সাহসী মানুষটার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ভারী কানেকটিং দরজা খুলল মউরোস।

বগিতে পায়ের আওয়াজ, সামনে থেকে আসছে কেউ! ঝট্ করে সবচেয়ে কাছের কম্পার্টমেন্টে ঢুকে দম আটকে ফেলল রানা। পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড। পদশব্দ খুব কাছে পৌঁছে যেতেই সামনে বেড়ে রাইফেল হাতে করিডোরে বেরিয়ে এল ও। মাত্র দশ ফুট দূরেই মউরোস, সরাসরি অস্ত্র তাক করেছে রানার বুকে।

'জ্যাঁ, আমি!' তাড়াতাড়ি করে বলল রানা। 'গুলি কোরো না!

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি। 'রানা! ওফ্!'

'ভেবেছিলাম উদ্ধার করব তোমাদের,' বলল রানা।

'দেরি করছ বলে নিজেরাই বিরক্ত হয়ে ব্যবস্থা করে নিয়েছি।'

'খবরদার, নড়বে না কেউ!' রানার পেছন থেকে খেঁকিয়ে উঠল এক রুক্ষ কণ্ঠ।

সরাসরি মউরোসের চোখে চেয়ে আছে রানা। এক সেকেণ্ড পর নিচু হলো ফ্রেঞ্চ মার্সেনারির চোখের পাপড়ি। জবাবে খুবই মৃদু মাথা দোলাল রানা।

'অস্ত্র ফেলে দা...'

ভারী পাথরের মত মেঝেতে পড়ল রানা। ওর মাথার মাত্র

কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে গেল মউরোসের বুলেট। করিডোরের পেছনে কেঁউ করে উঠল কে যেন। পরের সেকেণ্ডে ধুপ করে আওয়াজ হলো। ঘুরে রানা দেখল, পেছন দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত এক সৈনিক, নিষ্প্রাণ হাত থেকে খসে পড়েছে অস্ত্র।

'সাহায্য করতে এসে বিপদে পড়েছ, আর সত্যিকারের উদ্ধার করল কে?' ভুরু নাচাল মউরোস।

'মর্, শালা!' উঠে দাঁড়াল রানা। 'লাবনী কই?'

গম্ভীর হয়ে গেল মউরোস। 'জানি না। তবে ওকে আরেকটা কম্পার্টমেন্টে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাপ্টেন। হাজি আহত।'

'কোথায় লেগেছে?'

'উরুতে।'

'আছে কোথায়?'

ঘুরে দাঁড়াল মউরোস। 'একটু সামনেই।'

দেরি না করে প্রথম বগিতে ঢুকল ওরা। এখনও মেঝেতে বসে আছে মারাদেসিয়া। অস্ত্র হাতে কাভার দিচ্ছে সামনের করিডোর।

'যাক, রানা!' ব্যথা সহ্য করতে গিয়ে মুখ কুঁচকে গেল ইরানি মার্সেনারির। 'এলে কোত্থেকে?'

'ওই যে অনেক বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলে, তখনই...'

'বুঝতে পেরেছি, উড়ে এসে জুড়ে বসেছ এই রেলগাড়িতে। তারপর থেকে গোলমাল করে বেড়াচ্ছ।'

'বলতে পারো লাবনী কোথায়?' কাজের কথায় এল রানা।

রাইফেলের মাযল দিয়ে করিডোরের শেষমাথা দেখাল মারাদেসিয়া। 'শেষ কম্পার্টমেন্টে, আমার ধারণা। কিন্তু যে কুকুর আমাকে গুলি করেছে, ওই হারামজাদা কাভার দিচ্ছে করিডোর। ওদিকেই আছে শালার বাচ্চা ক্যাপ্টেন

মোসাব্বিয়ুল।'

পকেট থেকে ছোট একটা স্টিলের আয়না বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল মউরোস। 'করিডোরের ওদিক দেখতে চাইলে কাজে আসবে।'

নির্দিষ্ট অ্যাংগেলে ধরে আয়নাটা করিডোরে তাক করল রানা। দেখবে করিডোরের প্রতিচ্ছবি। যা ভেবেছে, এদিকে নড়াচড়া দেখে গুলি করল এক সৈনিক। চট করে হাত পিছিয়ে নিল রানা। 'ঠিক আছে, একজন। শেষ কম্পার্টমেন্টে কুঁজো হয়ে বসেছে দরজার কাছে।' মউরোসের দিকে মাথা দোলাল রানা। 'তুমি তৈরি?'

'সামনের দিক আমি কাভার করব,' বলল মউরোস।

মাথা নাড়ল রানা। 'সম্ভব নয়। আগের লোকটাকে নিয়েছ। এবার ঝুঁকি নেয়ার পালা আমার।' ঠিক করেছে করিডোরের একপাশে ফায়ারিং পযিশনে থেমে গুলি পাঠাবে। কিন্তু তাতে ওকেই সবচেয়ে আগে দেখবে শত্রু।

'জানতাম ঝুঁকি নিতে চাইলে বিপদ কমবে,' ডাহা মিথ্যা বলল মউরোস। শক্ত হাতে ধরেছে রাইফেল। 'রেডি, রানা?'

'হুঁ,' বলল রানা।

'ঠিক আছে।'

হাত বাড়িয়ে পাশে ঝুলন্ত ব্রেক কর্ডে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। ইমার্জেন্সি ব্রেক ভয়ঙ্কর ঝাঁকি দিল গোটা রেলগাড়িকে। নিচ থেকে এল লোহার সঙ্গে লোহার তীব্র সংঘর্ষের আওয়াজ। দৃঢ়পায়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা। কিছুক্ষণের ভেতর থামবে রেলগাড়ি। হোঁচট খেয়ে কমছে গতি।

'জ্যা?' গলা উঁচু করে বলল রানা।

করিডোরের কোনা থেকে অস্ত্র তাক করেছে মউরোস। এত দ্রুত বেগ কমছে দেখে বেসামাল সৈনিক, দেখল করিডোরে

সশস্ত্র এক শত্রু। নিজেও সে কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েই গুলি পাঠাল। কিন্তু আগেই করিডোরের আরেক পাশের দেয়ালে সরে গেছে রানা। নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে সব মনোযোগ।

একই সময়ে গর্জে উঠল রানা ও মউরোসের রাইফেল।

দ্বিতীয়বার সুযোগ পেল না সৈনিক, ফুটো কপাল নিয়ে কম্পার্টমেন্টের দরজার ওদিকে গিয়ে পড়ল ছেঁড়া পুতুলের মত।

ওখান থেকে ভেসে এল লাবনীর আতঙ্কিত চিৎকার।

'চলো!' ঝেড়ে দৌড় দিল রানা।

ওর পিছু নিল মউরোস।

সরু করিডোরে হাওয়ার বেগে ছুটছে দুই বন্ধু।

কম্পার্টমেন্টের দরজা জুড়ে পড়ে আছে মৃত সৈনিক। দৌড়ের গতি না কমিয়ে ডাইভ দিয়ে দরজা পেরিয়ে গেল রানা। শরীর গড়িয়ে সরে গেছে আরেক দিকের দেয়ালের কাছে। ওর মাথার দু'ইঞ্চি দূরের জানালা ফুটো হলো পিস্তলের বুলেটে।

ডাইভ দেয়ার সময় কম্পার্টমেন্টের ভেতর চোখ বুলিয়েছে রানা, লাফিয়ে উঠেই হাতের ইশারা করল মউরোসকে।

ঘরে লাবনী একা জিম্মি, আর ওর দিকে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছে কেউ।

নীরবে সংখ্যা গুনল রানা ও মউরোস।

এক, দুই... তিন...

দরজার দু'পাশ থেকে রাইফেলের নল ভেতরে ভরল রানা ও মউরোস, পেয়েও গেল টার্গেট।

কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক লোক ক্যাপ্টেন মোসাব্বিযুল। হ্যাঁচকা টানে নিজের সামনে এনেছে লাবনীকে। বামহাতে দরজার দিকে বেকায়দা ভঙ্গিতে ধরেছে পিস্তল। ডানহাতে রানার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া ওয়াইল্ডি তাক করেছে লাবনীর চাঁদি লক্ষ্য করে।

'রানা!' কাঁপা গলায় ডাকল লাবনী।

‘অস্ত্র ফেলো!’ হুঙ্কার ছাড়ল ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুল। ‘তিন গুনব। এর ভেতর হাত খালি না করলে মরবে এই মেয়ে...’

ঝড়ের গতিতে পরস্পরকে দেখে নিয়েছে রানা ও মউরোস।

‘তিন!’ বলেই কাজে নামল রানা।

দুই বুলেটের আঘাতে ক্যাপ্টেন মোসাব্বিয়ুলের কপালে তৈরি হলো পাশাপাশি দুটো ফুটো। ফেটে পেছনে ছিটিয়ে গেল তার করোটি। তাজা রক্ত ও ধূসর মগজে মেখে গেল জানালার কাঁচ। হাঁটু গেড়ে বসেই পরক্ষণে ভেজা ‘থ্যাপ্’ শব্দে চিত হয়ে লাবনীর পায়ের পাতার কাছে পড়ল লাশ।

‘বেশি কথা বলত,’ বলল মউরোস। ‘অ্যামেচার।’

লাবনীকে দেখছে রানা।

পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে মেয়েটা।

‘লাবনী?’ ডাকল রানা।

ওকে ফাঁকা চোখে দেখছে সুন্দরী আর্কিওলজিস্ট।

‘লাবনী!’

কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ পিটপিট করল মেয়েটা। ‘কী?’

‘আমার চোখে তাকাও,’ বলল রানা।

‘কেন? তাকাতে হবে কেন?’ থরথর করে কাঁপছে লাবনী, চোখে অবিশ্বাস।

‘তাকালে ক্ষতি কী,’ বলল রানা। পরক্ষণে সামনে বেড়ে লাবনীর কোমর জড়িয়ে ধরে কম্পার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে এল ও। টপকে গেছে সৈনিকের লাশ। ‘আসলে, চাইনি খুলি উড়ে যাওয়া লাশ দেখতে হোক, আর কিছু না!’

সৈনিকের লাশ দেখল লাবনী। করিডোরে বেরিয়ে আছে ওই লোকের এক পা। ‘রক্তাক্ত বুক নিয়ে কম্পার্টমেণ্টের মেঝেতে পড়ল যে, তার সঙ্গে খুলি উড়ে যাওয়া লোকটার কী তফাৎ?’ জানতে চাইল লাবনী।

মাথা নাড়ল রানা। 'নাহ্, এর জবাব আমার কাছে নেই।'

তখনই আপত্তি তুলল লাবনী, 'হায়, আল্লা!' এইমাত্র বুঝেছে কী ঘটেছে। 'ওই লোক আমার মাথায় পিস্তল ধরেছিল, আর তখন তাকে গুলি করেছ! যদি তার আঙুলে খিঁচ ধরত? আমি তো খুন হয়ে যেতাম! হায়, আল্লা!'

কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে মউরোস। রানার হাতে ধরিয়ে দিল ওয়াইল্ডি। সংগ্রহ করা চাবি দিয়ে খুলল লাবনীর হ্যাণ্ডকাফ। নরম সুরে বলল, 'আসলে ওই ধরনের দুর্ঘটনা খুব কম হয়।'

'বিশেষ করে মাথায় গুলি করলে,' সায় দিল রানা। 'শরীরে লাগলে তখন সমস্যা। হাইড্রোস্ট্যাটিক শক... মাসল স্প্যাযম... কিন্তু মগজে গুলি ঢুকলে প্রায় কখনোই...'

বুম!

তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ছাড়ল আতঙ্কিত লাবনী।

'ধুৎ!' বিরক্ত চোখে কম্পার্টমেন্টের দিকে তাকাল মউরোস। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ক্যাপ্টেনের পিস্তলের নলের ডগা দিয়ে। 'ব্যাটা মরেও শান্তি দিল না! উচিত ছিল অন্য পিস্তলটাও সরিয়ে ফেলা!'

জ্বলন্ত চোখে রানাকে দেখল লাবনী। রাগ ও ভয়ে লাল হয়ে গেছে ফর্সা গাল।

'বলেছি, মগজে বুলেট ঢুকলে প্রায় কখনোই খিঁচ ধরে না,' দ্রুত হাতে পিস্তল চেক করল রানা। 'তা ছাড়া, ওয়াইল্ডির ট্রিগার টিপে দেয়াও অত সহজ নয়। ...চিন্তা কোরো না। এখন আমাদের প্রথম কাজ এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।'

'কী করে যাব, কোথায় যাব?' কবজির ব্যথাভরা দাগ ডলছে লাবনী, গলা কান্নাভেজা। 'আমরা আটকা পড়েছি ইরানের প্রত্যন্ত এলাকায়! তা ছাড়া, কী হবে সেসিলির? ওকে ফেলেই পালাব আমরা?'

‘এসব নিয়েই ভাবছি,’ মেঝেতে পড়ে থাকা মৃত সৈনিকের লাশ দেখল রানা। মউরোসের কাছে জানতে চাইল, ‘এই লোকের কাছেই না ছিল আমাদের সব জিনিস?’

মাথা দোলাল মউরোস। লাশের কোমর থেকে খুলে নিল মাঝারি এক থলি। ‘যা কিছু, সব এখানেই আছে।’

থলি নিয়ে ভেতরে হাত ভরল রানা, ঘেঁটে পেয়ে গেল মোবাইল ফোন। ‘এবার দেখা যাক ব্যাটারির চার্জ আছে কি না।’

‘কী করবে, রানা?’ জিজ্ঞেস করল লাবনী।

মৃদু হাসল রানা। ‘ফোন করব।’

নয়

হেলিকপ্টারে করে আসার সময় সেসিলি দেখেছে আরাশ খানসারির বাড়ি। ওটা সাধারণ কোনও বাড়ি নয়, য্যাগরোস পর্বতমালার চূড়ায় মস্ত বড় দুর্গ বা প্রাসাদ। ওখানে পৌঁছুতে ব্যবহার করতে হবে একটিমাত্র সরু, আঁকাবাঁকা, পাহাড়ি রাস্তা, অথবা সরাসরি অবতরণ করতে হবে হেলিকপ্টারে করে হেলিপ্যাডে। কপ্টার থেকে ছাতে পা রাখতেই একের পর এক সরু ও চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে ওকে এই ছোট্ট গারদ-ঘরে এনেছে গার্ডরা। তারপর থেকে বিশ্রাম না নিয়ে পায়চারি করছে সেসিলি।

দুনিয়ার বেশিরভাগ দুর্গের মতই এখানেও আছে পাতাল

বন্দিশালা বা ডানজন। তবে এটা মেডিইভেল আমলের নয়। সত্যিকারের স্থাপত্য কাকে বলে বোঝাতে গিয়ে বারোটা বাজিয়ে দেয়া হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে অতিরিক্ত কারুকাজ করা এই প্রাসাদ বা দুর্গের সৌন্দর্য। যে দাম্ভিক লোক তৈরি করিয়েছে এই প্রাসাদ, তার পয়সার অভাব ছিল না, কিন্তু মূল সমস্যা ছিল রুচির। ক্যাম্প ডেভিডের মতই করতে গিয়ে সবমিলে হয়েছে আধখাপচা এক দুর্গ বা দালান। এ কারণেই সেসিলি ধারণা করছে, আগে এই স্থাপনার মালিক ছিল ইরানের বদমেজাজি শাহ্।

অতীতে যে-কাজেই ব্যবহার করা হোক এই দুর্গ, এখন এটা আরাশ খানসারির আস্তানা। সেসিলির ধারণা, এই পাতাল-কারাগারে আগেও ওর বা মিশকিনের মত আরও অনেককে বন্দি করেছে লোকটা।

পাশের সেলেই আছে অ্যালেকসেই মিশকিন। তার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে, সেটা হওয়ার নয়। খানসারি বিশ্বাসঘাতকতা করতেই আতঙ্কের গভীর এক সাগরে ডুবে গেছে লোকটা। কেউ ডোনাটি লুক্কার কথা তুললেই ভয়ে প্যাণ্ট নষ্ট করার মত অবস্থা হচ্ছে তার।

আবারও আরাশ খানসারির কথা ভাবল সেসিলি। মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে সে। মোটেও উচিত হয়নি মুক্তিপণ চেয়ে বসা। ফলে জানটা যেতে পারে তার। দরকার পড়লে ওর বাবা স্বর্গ-নরক উল্টে ফেলবে ওকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে, কিংবা ওর কিছু হয়ে গেলে চরম প্রতিশোধ নিতে। এখন যদি ওকে ছেড়েও দেয়, একদল দুর্ধর্ষ লোক আসবে এদেশে খানসারিকে খুন করতে।

সেসিলি এখনও জানে না, কতক্ষণ পর ডাক পড়বে খানসারির দরবারে। মনে হয় এই মুহূর্তে ডোনাটি লুক্কা আর ওর

বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে লোকটা। টাকার কুমির সে নিজেই, কিন্তু আরও টাকা চাই তার।

ভাবছে সেসিলি, নিজ যোগ্যতায় কীভাবে বেরোবে এখান থেকে। 'এক্সকিউয মি,' কুঠুরির শিকের দরজায় এসে থামল ও। একটু দূরেই টুলে বসা এক প্রহরী। 'একটু সাহায্য করুন।'

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল গার্ড। 'কী চাই?'

'আমাকে একটু যেতে দিতে হবে... বুঝতেই তো পারছেন,' সামান্য কোমর দোলাল সেসিলি, পেছনে হ্যাণ্ডকাফে দু'হাত আটকে রাখা।

'গিয়ে কী করবে?'

'সন্দেহ হলে আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যান টয়লেটে।'

দরজার সামনে এসে থামল গার্ড, লোলুপ চোখে দেখল দুর্দান্ত সুন্দর মেয়েটার লোভনীয় দেহ। ঊরু, কোমর, বুকের একেকটা বাঁক যেন হুর পরীর সৌন্দর্যকেও হার মানাবে।

'প্লিয?' করুণ সুরে বলল সেসিলি। কণ্ঠে অসহায় ভাব।

দাড়িওয়ালা গার্ড নাক কুঁচকে বলল, 'আগেই জানি, এমনই করবে। বলবে, যেন খুলে দিই তোমার কোট। তারপর টাইট প্যান্ট। আর তখন সোনালি চুলের রূপসী মেয়ের দারুণ শরীরের লোভে মাথা এতই গরম হবে, বেমালুম নির্দেশ ভুলব গর্দভ এই ইরানি প্রহরী। তুমি কাতর সুরে অনুরোধ করবে হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিতে। আর আমিও তাই করব, কারণ আমার তো তখন হুঁশই নেই। আর ঠিক তখনই মার্শাল আর্টের কোনও এক কঠিন প্যাঁচে অজ্ঞান করবে আমাকে। পালিয়েও যাবে। ...ঠিক বলেছি না?'

তিক্ত দৃষ্টিতে দাড়িওয়ালাকে দেখল সেসিলি। 'আপনি শুধু "না" বললেই বুঝতাম।'

হাসিমুখে আবারও টুলে গিয়ে বসল গার্ড। 'এত বেতন এমনিতেই দেয় না, মেয়ে, আমার মগজে কিছু আছে। চেষ্টা

করে তো দেখলে।'

বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল সেসিলি। ভাবছে, সত্যি যখন টয়লেটে যাওয়া জরুরি হয়ে উঠবে, তখন কী হবে? একটু একটু তো লাগছেই!

মারাদেসিয়ার ঊরুর ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ করেছে রানা, এখন আহত বন্ধুকে নিয়ে পরিত্যক্ত রেলগাড়ি ছেড়ে সরে যাচ্ছে মউরোস আর ও।

লাবনীকে জানানো হয়নি, কোথায় চলেছে ওরা। তাই ভাবছে ও, এই বিরান পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় কই? বেশ কিছুক্ষণ আগে মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা সেরেছে রানা। তারপর ফোন রেখে বলল, কিছুক্ষণের ভেতর ফোর্স পাঠাবে ইরানিয়ান আর্মি, তার আগেই সরে যেতে হবে।

যে পাহাড়ি এলাকায় আরাশ খানসারির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক সমতল এদিকটা। তবুও উঁচু-নিচু জমি পেরোতে গিয়ে সময় লাগছে। এর বড় কারণ, ওদের বয়ে নিতে হচ্ছে আহত মারাদেসিয়াকে। কপাল ভাল, চারপাশে জন্মেছে ঝোপঝাড় ও বড় গাছ। লুকিয়ে পড়তে সমস্যা হবে না। রেললাইন থেকে আধমাইল সরার পর প্রথমবারের মত অগ্রসরমাণ হেলিকপ্টারের গুঞ্জন কানে এল ওদের।

'আমরা আসলে যাচ্ছি কোথায়?' রানার কাছে জানতে চাইল লাবনী। 'ফোনে যার সঙ্গে কথা বললে, সে তোমার কেমন ধরনের বন্ধু? পুলিশ বা আর্মির হাতে ধরিয়ে দেবে না তো? ওই লোক আমাদেরকে খুঁজে পাবে কী করে? আমরা আছি পাহাড়ের অনেক গভীরে!'

রানা জবাব দেয়ার আগেই মুখ খুলল মারাদেসিয়া, 'রানার বন্ধুর অভাব নেই।' নিদারুণ ব্যথা সহ্য করেও হাসছে। 'দুনিয়া

জুড়ে আছে ওরা।'

চট্ করে রানাকে দেখল লাবনী। 'তুমি যে বলেছিলে, এ দেশে না আসার মতই এসেছিলে?'

'জনপ্রিয় লোক তো, ওকে ভুলতে পারে না কেউ,' রানার হয়ে জবাব দিল মউরোস। 'নাম-ডাকও ছড়িয়ে গেছে।'

'বন্ধুর প্রশংসা রেখে বলুন তো, আপনারা কী করবেন এই অবস্থায়?'

'প্রথম কাজ যানবাহন জোগাড় করা,' বলল রানা। 'দক্ষিণে একমাইল দূরে সরু রাস্তা, ওখানে আমাদেরকে তুলে নেবে একজন।'

চারপাশের পাহাড়ি এলাকায় চোখ বোলাল লাবনী। 'তোমার বন্ধু আমাদেরকে খুঁজে পাবে কী করে? আমরা নিজেরাই তো জানি না কোথায় আছি!'

'পাহাড়ের চূড়ার আকার-আকৃতি বা রং— এসব বলেছি ওকে। ম্যাপে সহজেই এসব খুঁজে নেয়া যায়।'

'তাই?' অবাক হলো লাবনী।

'হুঁ। এখান থেকে বেরিয়ে উদ্ধার করতে যাব সেসিলি ডেনিয়েলসনকে,' বলল রানা।

'রানা, তুমি কি জানো কোথায় নিয়েছে ওই মেয়েকে?' জিজ্ঞেস করল মউরোস।

'এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে আরাশ খানসারির প্রাসাদ আছে, ওখানে গিয়ে দেখা করব।'

'শুনেছি ওই দুর্গের কথা, সাবধান,' বলল মারাদেসিয়া। 'ভেতরে ঢোকা বা বেরোনো প্রায় অসম্ভব।'

'ওর চেয়েও খারাপ জায়গা থেকেও ঘুরে এসেছি আমরা,' বলল মউরোস। 'যেমন, কঙ্গোর...'

'জ্যাঁ,' আপত্তি তুলল রানা।

মুখ গোমড়া করে মাথা দোলাল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি। 'কিছুই বলা যাবে না? তা হলে বেঁচে থেকে কী লাভ!'

'বেঁচে থাকার সঙ্গে বাড়তি কথার কীসের সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল লাবনী, 'তোমাদের মিশন ছিল এমন এক দেশে, যেখানে রানা প্রায় যায়নি বললেই চলে?'

'ঠিক তাই,' বলল গম্ভীর রানা।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছে ওরা। কিছুক্ষণ পর হালকা হয়ে গেল গাছের ভিড়। সামনেই পড়ল ধুলোবালির সরু রাস্তা।

'এ পথেই যেতে হবে?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'হ্যাঁ, ঠিক জায়গায় এসেছি,' চারপাশ দেখছে রানা. 'পাশেই থাকবে উচ্ছল ঝর্না...' একটু দূরের টিলা দেখাল। 'ওই যে, ওদিকে। ঝর্নার ধারে আসবে জাবাইরাহ্।'

'কোনও ইরানিয়ান মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'ডক্টর, জেলাস হয়ে গেলেন রানার বান্ধবীর কথা শুনে?' হাসল মারাদেসিয়া। 'একজন না, ডজন ডজন আছে সবাই মুগ্ধ ওর ভদ্র আচরণে।'

'এই কথা শুনে চিরচির করে ফেটে গেল আমার অন্তরটা. নাটকীয় ভঙ্গিতে বুকে হাত রাখল বিরক্ত লাবনী।

'সত্যি কি না কে জানে!' বিড়বিড় করল মউরোস

ব্যথা সহ্য করে মুচকি মুচকি হাসছে মারাদেসিয়া

পাথরের মত চেহারা করে সবাইকে নিয়ে ঝর্নার দিকে চলেছে রানা। কয়েক মিনিট পর একঝাড় গাছের নিচে ওরা দেখল তোবড়ানো এক সাদা ভ্যান। আড়াল থেকে বেরোল না রানা, সবাইকে বলে দিল সতর্ক থাকতে। 'একটু পর আসছি,' বলে হারিয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

পিস্তল বের করেছে মউরোস, লড়তে তৈরি। মারাদেসিয়ার

হাতে চোরাই রাইফেল।

'কোনও বিপদ হতে পারে, তাই,' লাবনীকে পিস্তল দেখাল মউরোস।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল বেশ কয়েক মিনিট, তারপর রানাকে হাতছানিতে ডাকতে দেখে অস্ত্র কোমরে গুঁজল মউরোস। 'তার মানে সমস্যা নেই।'

'কেউ যদি রানাকে অস্ত্রের মুখে বন্দি করে থাকে?' জানতে চাইল লাবনী।

'তা হলে হাতের বুড়ো আঙুল তালুতে গুঁজে চার আঙুলে ডাকত রানা,' জানাল মউরোস।

'আপনাদের নানান কোড বা কৌশল আছে, তাই না?' বলল লাবনী। ঠিক প্রশ্ন নয়।

'এ কারণেই আজও বেঁচে আছি আমরা,' বলল মারাদেসিয়া।

মউরোসকে সাহায্য করল লাবনী, দু'জন বয়ে নিয়ে চলল ইরানি মার্সেনারিকে। ভ্যানের কাছে গিয়ে দেখল, ক্যাবে বসে আলাপ করছে রানা। ওদেরকে দেখে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই, আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জাবাইরাহ্ আহদি. আর এরা মউরোস, মারাদেসিয়া আর ডক্টর লাবনী আলম।'

ইরানি মেয়েটির বয়স বড়জোর পঁচিশ। ভ্যান থেকে নেমে সবার উদ্দেশে সালাম দিল। খুব কমনীয় চেহারা, কিন্তু মস্ত বড় পেট বলে দিল, যে-কোনও দিন সন্তান প্রসব করবে।

'ভাবতেও পারিনি, বাপরে,' নিচু স্বরে বলল মউরোস। 'রানা, গতবার এ দেশে এসে কিছু করেছিলে, কিন্তু আমাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলে... ব্যাপারটা এমন নয় তো?'

'তোমার তো মনে থাকার কথা জ্যাকে,' বিরস মুখে মেয়েটাকে বলল রানা। 'ওই যে, সেই ফ্রেঞ্চ ছাগল, যেটার

ভদ্রতা বলতে কোনও কিছু কোনও কালেও ছিল না।'

মিষ্টি হাসল জাবাইরাহ্। 'হ্যাঁ, মনে আছে। তবে তখন তার কালো একটা গোঁফ ছিল।'

'ওটা বিদায় দেয়ায় সভা করে ওকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম আমরা বন্ধুরা,' তিক্ত সুরে বলল রানা। 'সেজন্যে হোটেল হিলটনে ডিনারও খাওয়াতে হয়েছে ওকে।'

'হ্যাঁ,' মেয়েটার দিকে চেয়ে হাসল আন্তরিক মউরোস, 'কংগ্র্যাচুলেশন্স! শেষবার তুমি বিবাহিত ছিলে না!'

'তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল মানুষটাকে খুঁজে পেলাম,' খুশি মনে বলল জাবাইরাহ্।

কেন যেন রানার মনে হলো, কথাটা শুনে স্বস্তি পেয়েছে লাবনী। আগের চেয়েও সতর্ক হয়ে গেল ও নিজে। জড়িয়ে যাওয়া চলবে না লাবনীর জীবনে।

'আর, মারাদেসিয়া, আপনার ডাকনাম না...' শুরু করেছিল জাবাইরাহ্।

কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল মারাদেসিয়া, 'বন্ধু নামের ভয়ঙ্কর সব শত্রুরা ওই নোংরা নামে ডাকে আমাকে। আমাকে হাজি বলে ডাকলেই খুশি হব।'

'আর, রানা, তুমি তো বলোনি এত মিষ্টি এক মেয়েকে বিয়ে করেছ?' রানা ও লাবনীকে পালা করে দেখছে জাবাইরাহ্।

'আমরা বিবাহিত নই,' আপত্তির সুরে বলল লাবনী।

'বিবাহিত হলে ভাল হতো,' অন্তর থেকে বলল ইরানি ললনা।

'আমি এসেছি ওদের একটা মিশনে সাহায্য করতে,' বলল রানা।

'এমন সুন্দরী মেয়েকে নেবে আরাশ খানসারির ওখানে?' মাথা নাড়ল জাবাইরাহ্। 'তা হলে তো আরও আগেই ওকে বিয়ে

করে ফেলা উচিত ছিল তোমার, রানা।'

'আমি ওকে খানসারিরি ওখানে নিচ্ছি না,' বলল রানা। 'একটু আগে বদমাসটার বন্ধুদের হাত থেকে ছুটে এসেছি। কিন্তু আমাদের দলের আরেক মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে সে। তাকে ছুটিয়ে আনতে হবে।'

'একঘণ্টা লাগবে ওই দুর্গে পৌঁছুতে,' বলল জাবাইরাহ্। 'একটু দেরিও হতে পারে। ভ্যানে রেডিয়ো স্ক্যানার আছে, আশপাশে হাজির হয়েছে একদল পুলিশ আর সামরিক দলের লোক।' রানার দিকে সন্দেহ নিয়ে তাকাল। 'তোমার কাজ?'

'দুটো ট্রেনের সংঘর্ষ হয়েছে,' অপরাধ স্বীকার করল রানা।

'তাই?' ভুরু কুঁচকে ফেলল জাবাইরাহ্। 'মস্ত বিপদে আমার পরিবারকে সাহায্য করেছ, মনটাও মস্ত বড় তোমার, কিন্তু প্রতিবার আমাদের দেশে এসে কোটি কোটি টাকার জিনিসপত্র কেন ভাঙতে হবে তোমার, তা বুঝি না!'

'আজ পর্যন্ত দেখেছ রানার দোষে সাধারণ কোনও নাগরিক আহত বা নিহত হয়েছে?' বন্ধুর পক্ষ নিল মারাদেসিয়া। 'খোঁজ নিলে হয়তো দেখবে উল্টো দিকের রেলগাড়ির ড্রাইভারও সুস্থ।'

আরেকবার মাথা নেড়ে লাবনীর দিকে ফিরল জাবাইরাহ্। 'এখনও বাচ্চাদের মত যা কিছু পায়, সব ভাঙে রানা।'

'আমি একমত,' দুষ্টুমি ভরা কণ্ঠে বলল লাবনী। ইরানি মেয়েটাকে ভাল লেগেছে ওর। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কীভাবে চিনলে রানাকে? ও তো বলে ইরানে প্রায় কখনও আসেইনি।'

'বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে আমার পরিবারের পুরুষরা, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাই আমরা। আমাদের নামে হুলিয়া জারি করে সরকার, আর তখন বিসিআই নামের এক বাংলাদেশি সংস্থার দুর্ধর্ষ এক গুপ্তচর সাহায্য করে আমাদেরকে। তার সঙ্গে ছিল মউরোস ছাড়াও আরও কয়েকজন বন্ধু। ওরা

হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেয়, আমাদের আসলে কোনও দোষ নেই। আর এভাবেই বন্ধুত্ব হয় আমাদের সঙ্গে রানার।'

'অনেক গল্প হয়েছে, এবার চলো মারাদেসিয়াকে পৌঁছে দিই ডাক্তারের কাছে,' তাড়া দিল রানা। 'ভ্যানের পেছনের সিটে তুলব ওকে। জাবাইরাহ্, মেডিকেল কিট এনেছ? ...গুড!'

গারদের শিকের দরজার ওদিক থেকে নতুন এক গার্ডের দিকে চেয়ে আছে সেসিলি। এবারের গার্ডের কাঁধে ঝুলছে এমপি-ফাইভ সাবমেশিনগান।

লোকটা সহজ সুরে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন জনাব আরাশ খানসারি।'

সেসিলির দিকে চেয়ে একগাল হাসল পুরনো গার্ড। 'কপাল ভাল হলে টয়লেটে যেতে দেবে খানসারি। কে জানে, নিজ হাতেই হয়তো খুলে দেবে তোমার কাপড়-চোপড়!'

জবাবে চুপ থাকল সেসিলি। অপেক্ষা করছে, খোলা হবে দরজার তালা।

পাহাড়ি রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে ভ্যান রেখেছে জাবাইরাহ্। আঙুল তাক করেছে পাহাড়ের চূড়ায়। 'ওই যে!'

মাথা তুলে ওপরে তাকাল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'এমন কিছু দেখব ভাবিনি।'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করেছে লাবনী। খাড়া ঢালের অনেক উঁচুতে বিদঘুটে এক বিশালাকার দুর্গ বা প্রাসাদ। না বলে পারল না ও, 'হায়, আল্লা, এই মাল কে তৈরি করল? ওয়াল্ট ডিযনি?'

'শেষ ইরানিয়ান শাহ্-র সৃষ্টি,' তথ্য দিল জাবাইরাহ্। 'তার গ্রীষ্মকালীন অবকাশের জন্য তৈরি প্রাসাদের একটা। মাত্র কয়েকবার এসেছে, তারপর কান ধরে তাকে গদি থেকে নামিয়ে

দিয়েছে খোমেনি। তখন থেকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী একদল মোল্লা এসে মদ-মেয়েমানুষ-জুয়ার আখড়া বানিয়ে মৌজ মারছিল, কিন্তু তাদের কপালেও এত ফুর্তি সইল না, টাকার দাপট দেখিয়ে আগের সরকারের কাছ থেকে ওটা কিনে নিয়েছে আরাশ খানসারি।'

'কারও আঁকা কার্টুনের দুর্গের মত,' মন্তব্য করল লাবনী। আসলেই পারস্যের অদ্ভুত চেহারার এক প্রাসাদ, ওপরে একের পর এক মিনার ও গম্বুজ। 'শাহ্-র রুচি বলতে কিছুই ছিল না।'

বিনকিউলার দিয়ে অনেক ওপরের দুর্গ দেখছে রানা।

'ঢুকব কী করে?' চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল মউরোস।

'যেতে চাইলে ব্যবহার করতে হবে সরু এক রাস্তা, অথবা হেলিকপ্টারে করে নামতে হবে ছাতে,' বলল জাবাইরাহ্।

কপ্টারের কথা শুনে মুখ কালো করল মউরোস। 'কেবল কার নেই?'

'না। সর্বক্ষণ পাহারা দেয় ওই রাস্তা। নিচে একটা গেট। রাস্তার পাশে রয়েছে টিভি ক্যামেরা। রাস্তার শেষে আরেকটা গেট। রানার ফোন পেয়ে গত দু'দিন ধরে খানসারির প্রাসাদের ওপর চোখ রাখছি। সবসময় চারজন সশস্ত্র লোক পাহারা দেয় দুই গেট। এ ছাড়া, আছে ইলেকট্রিক তারকাঁটার বেড়া।'

বিনকিউলারে টিলা দেখছে রানা। 'জাবাইরাহ্, পাওয়ার লাইন উড়িয়ে দেয়া বা ইলেকট্রিসিটি বন্ধের উপায় আছে?'

'আবারও কিছু ধ্বংস করতে চাও?' মাথা নাড়ল জাবাইরাহ্। 'না, উপায় নেই, দুর্গের আছে নিজস্ব জেনারেটর।'

'তাই থাকবে ভেবেছি,' বিনকিউলার নামিয়ে ফেলল রানা, ভাবছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তুমি বলেছ, দুর্গে যেতে হলে মাত্র দুটো পথ। এ ছাড়া, আর কোনও পথ নেই?'

'আছে,' কাঁধের ওপর দিয়ে লাবনীকে দেখল জাবাইরাহ্।

'লাবনী, আমাকে দাও তো ওই নীল রাকস্যাক।' ভ্যানের পেছনে অন্যান্য জিনিসের ভেতর থেকে বের করে জাবাইরাহ্‌র হাতে ব্যাগটা দিল লাবনী। ওটায় হাত ভরে কী যেন ঘাঁটছে সন্তান-সম্ভবা মেয়েটা। বেরোল প্রায় স্বচ্ছ, পাতলা কাগজের আর্কিটেকচারাল ব্লুপ্রিন্ট। 'বিপ্লবের আগে এগুলো জোগাড় করেছিলেন আমার দাদা। ইচ্ছে ছিল দুর্গে ঢুকে খুন করবেন শাহ্‌কে। কিন্তু আগেই রাজাসন হারাল বেয়াড়া লোকটা।' ব্লুপ্রিন্টের নিচে টোকা দিল ও। 'দুর্গের সার্ভিস বেজমেন্ট থেকে ওপরে গেছে এক শাফট। তৈরি করেছিল নর্দমার ময়লা পানি নদীতে ফেলতে।'

নাক কুঁচকে ফেলল লাবনী। 'সুয়েরেজ? এহ্-ছিহ্! ওসব কেউ সরাসরি ফেলে নদীতে?'

'মানুষের খাবার পানি নষ্ট করছে,' বলল জাবাইরাহ্।

'ময়লা ফেলার পাইপে ঢুকে পৌঁছতে পারব ওই শাফটে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। কিন্তু একটা গুরুতর সমস্যা আছে।'

মাথা নাড়ল মউরোস। 'সমস্যা তো থাকবেই! পুরো দুনিয়া জুড়ে লাখো-কোটি সমস্যা।'

'ওই পাইপ,' কাঁধ ঝাঁকাল জাবাইরাহ্, 'ওটা খুব সরু। রানা, মারাদেসিয়া বা মউরোস যেতে পারবে না ওটার ভেতর দিয়ে।'

'তাতে আমি খুশি,' বলল মউরোস। 'পাইপ ভরা মানুষের বর্জ্যের ভেতর দিয়ে যেতে কারই বা ভাল লাগে? তা ছাড়া, নতুন এই টি-শার্টটা নষ্ট করতে পারব না।'

'তার মানে মউরোস বা আমি ঢুকতে পারব না?' গম্ভীর হয়ে গেছে রানা। 'হাজি বা তোমার যে অবস্থা, ওই কাজ করতে বলাই অনুচিত, কিন্তু...' হঠাৎ ওর মুখে কেমন এক রহস্যময়

হাসি দেখা দিল। 'হ্যাঁ, লাবনী...' মেয়েটার দিকে তাকাল ও।

'কী?' বলেই পরক্ষণে লাবনী বুঝল কেন হাসছে রানা। সবাই আগ্রহ নিয়ে দেখছে ওকে। 'নাহ্! অসম্ভব!'

'তুমি ছাড়া কেউ নেই যে বাঁচাবে সেসিলিকে,' বলল রানা। 'অবশ্য তুমি চাইলে ওকে ফেলেই...' নিরীহ মুখে লাবনীকে দেখল ও।

'তা একেবারেই অসম্ভব,' বলল লাবনী। 'ও আমাদের দলের একজন।'

'কাজেই বুঝতে পারছ, কী করতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নেই,' জোর দিয়ে বলল মউরোস, 'আপনি শুধু বুকে বাঘিনীর মত দুর্দান্ত সাহস রাখুন!'

দুর্গের বাইরের দিক থেকে অনেক জাঁকালো করে ভেতর দিক সাজিয়ে নিয়েছে আরাশ খানসারি। গারদ থেকে বের করে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেসিলি ও মিশকিনকে। চারপাশ দেখছে সেসিলি। বুঝল, প্রাচীন পারস্যের অমূল্য সব সম্পদ চুরি করে এত বড়লোক হয়েছে দুর্নীতি-পরায়ণ লোকটা। আসবাবপত্র, কল, দরজার কবজা বা নব ইত্যাদিতে ব্যবহার করেছে খাঁটি সোনা। লাভের বড় এক অংশ গেছে এসবে। অথচ সব মিলিয়ে বোঝা যায়, রুচি বলতে কিছুই নেই খানসারির।

দুর্গের সবচেয়ে বড়, উঁচু মিনারের ওপরে আরাশ খানসারির বৃত্তাকার অফিস। ঘরে ঢুকে পলিশ্‌ড্ মার্বেলের মেঝেতে হাই-হিলের ঠক-ঠক শব্দ তুলে হাঁটছে সেসিলি, চোখ খানসারির চোখে। ঘরের পেছনে মার্বেল, হাতির দাঁত ও সোনার কারুকাজ করা প্রকাণ্ড এক অর্ধবৃত্তাকার টেবিলের ওদিকে বসেছে লোকটা। পেছনের দেয়ালে দশ ফুটি প্লাযমা স্ক্রিন। একটু নিচে হাঙরের

চোখের মত কালো এক খুদে ভিডিও ক্যামেরা দেখছে চারপাশ।

'মিস ডেনিয়েলসন! মিশকিন!' গম্বুজের ভেতর গমগম করল খানসারির কণ্ঠ, তাতে আন্তরিকতা। 'খুবই খুশি হলাম দেখা করতে এসেছেন!'

'ফালতু প্যাঁচাল বাদ দিন, খানসারি,' খুব ঠাণ্ডা সুরে বলল সেসিলি। 'বলে ফেলুন কী চান।'

ভুরু কুঁচকে অভিমানী ভঙ্গি নিল কবর-লুটেরা। 'ঠিক আছে, আপনি যখন তা-ই চান। ...একটু পর আপনার বাবার সঙ্গে বসব ভিডিও কনফারেন্সে। তাঁকে জানাব আসলে আমি কী চাই। ব্যস্ত মানুষ দেখা পাওয়াও কঠিন, কিন্তু যোগাযোগ হয়েছে তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে। আরেকটু হলে বিরক্ত হয়ে যেতাম।'

'নানান জরুরি কাজে খুবই ব্যস্ত থাকেন তিনি।'

'তা ঠিকই বলেছেন। প্রায় একইরকম ব্যস্ত তাঁর প্রতিপক্ষ মিস্টার ডোনাটি লুক্কাও।'

'তুমি লুক্কার সঙ্গে কথা বলেছ?' হাঁ হয়ে গেল মিশকিন।

'সামনা-সামনি দেখা হয়নি, তবে এবার হবে। বুঝতেই পারছ, খুবই দরকারী কাজে তার সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।' ডেস্কে রাখা ভেলভেট থেকে আটলাণ্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট নিল খানসারি। ধাতু থেকে ঝিলিক দিচ্ছে লালচে আভা। যেন আগুন পড়েছে তার মুখে। 'কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে সে।'

'ওই আর্টিফ্যাক্টের জন্যে যা দিতে চাইবে লুক্কা, তার চেয়ে বেশি দেবেন আমার বাবা,' বলল সেসিলি।

'তা-ই বোধহয়, কিন্তু দুঃখের কথা, আর্টিফ্যাক্ট আর মিশকিন বিক্রি হবে একই দামে। জিনিসটা আর গাধাটাকে হাতের মুঠোয় পেতে দুনিয়া তোলপাড় করতেও আপত্তি নেই ডোনাটি লুক্কার।'

'প্লিয, মিস ডেনিয়েলসন,' কাতর সুরে বলল মিশকিন, 'আমাকে সাহায্য করুন! লুক্কা খুন করবে আমাকে!' তার চোখ

খানসারির হাতের আর্টিফ্যাক্টে। 'ওটার ব্যাপারে আরও বহু তথ্য দিতে পারব। লুক্কা এসবের কিছুই জানে না। আমি পুরো চার বছর কাজ করেছি ওর হয়ে। জানি গোপন অনেক তথ্য। আপনি...'

এইমাত্র তুড়ি বাজিয়ে এক গার্ডের দিকে চেয়েছে খানসারি।

সামনে বেড়ে মিশকিনের মাথায় খটাস্ শব্দে পিস্তলের বাঁট বসাল গার্ড। রাশানের হাত পেছনের হ্যাণ্ডকাফে, পিছলে মার্বেলের মেঝেতে হুড়মুড় করে পড়ল সে।

'আপাতত এতেই হবে,' মাথা দোলাল খানসারি। "টিং!" আওয়াজ হলো তার ডেস্কের কমপিউটারে। স্ক্রিনে মনোযোগ দিয়ে হাসল সে। 'মিস ডেনিয়েলসন, আপনার বাবা কল করেছেন। দয়া করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান।' ঠেলা দিয়ে সেসিলিকে সামনে বাড়াল গার্ড, দাঁড় করিয়ে দিল ঠিক জায়গায়। 'থ্যাঙ্ক ইউ।' আরেক গার্ড ময়দার বস্তার মত মিশকিনকে ছেঁচড়ে সরিয়ে ফেলল আরেক দিকে।

কমপিউটারে ট্যাপ করে আরামদায়ক লাল চামড়ার সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল খানসারি। ঘুরে গেল প্রকাণ্ড স্ক্রিনের দিকে। এক সেকেণ্ড পর দেখা গেল, বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসনের রেইভেন্সফিওর্ডের অফিস।

নিজের স্ক্রিনে মনোযোগ দিয়ে চমকে গেছে বিলিয়নেয়ার। 'সেসিলি!'

'মিস্টার ডেনিয়েলসন,' মেয়েটা কিছু বলার আগেই বলল খানসারি, 'খুশি হলাম, শেষপর্যন্ত পরিচিত হয়েছি আপনার সঙ্গে। ভাবছিলাম, ব্যবসা আপনার মেয়ের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' সন্তুষ্ট মুখে মুচকি হাসল সে।

রাগ নিয়ে তাকে দেখছে বিলিয়নেয়ার। 'সেসিলি, তুমি ঠিক আছ তো? ...কোনও অপমান করছে না তো এই বাঁদর?'

'আপাতত ঠিকই আছি,' বলল সেসিলি। 'তবে কতক্ষণ...'

'আর্টিফ্যাক্ট আর ডক্টর আলম কোথায়?'

'বেআইনী ইরানি অ্যান্টিকুইটি সরিয়ে ফেলার অপরাধে ডক্টর আলমকে গ্রেফতার করেছে ইরানিয়ান আর্মি,' মাঝ থেকে বলল খানসারি। 'এ ছাড়া, কয়েকজন সৈনিকের খুনের সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে সে। আর ওই আর্টিফ্যাক্ট? ওটা আর পাবেন না আপনারা।'

'ওটার জন্যে কত চাই তোমার, খানসারি?'

চেয়ারে হেলান দিল কবর-লুটেরা। 'সরাসরি ব্যবসার কথায় এসেছেন, ভাল। আপনার মেয়েকে নিরাপদে ফিরে পেতে আমাকে আপনি দেবেন দশ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।'

'আর আর্টিফ্যাক্টের জন্যে যে দশ মিলিয়ন দিয়েছি, ওটার কী হবে?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ডেনিয়েলসন।

'নিজ স্বার্থেই আরও দশ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার ট্র্যান্সফার করবেন আমার ওই একই অ্যাকাউন্টে,' আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলল খানসারি।

'আর আর্টিফ্যাক্ট?'

'ওটা আর বিক্রি হবে না

'আরও বাড়তি দশ মিলিয়ন পেলে?'

পেরিয়ে গেল দীর্ঘ সময়। খানসারির চোখে-মুখে লোভ। ভাবছে, বাতিল করবে কি না আগের পরিকল্পনা। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পর মাথা নাড়ল। কণ্ঠে কষ্ট নিয়ে বলল, 'না, তবুও বিক্রি হবে না ওটা।'

'পনেরো মিলিয়ন।'

গাল কুঁচকে ফেলল খানসারি। চেয়ারে অর্ধেক ঘুরে তাকাল সেসিলির চোখে। 'মিস্টার ডেনিয়েলসন, ওই ধাতুর টুকরোর চেয়ে নিজের মেয়েকে কমদামি বলে মনে হচ্ছে আপনার?'

'আমি হলে বিশ মিলিয়নই দিতাম,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল সেসিলি।

মেয়ের কথা শুনে গর্বের ছাপ পড়ল বিলিয়নেয়ারের চোখে, তবে পরের সেকেণ্ডে আগের মতই পাথুরে হয়ে গেল চেহারা। 'ঠিক আছে, সেসিলির কথা মতই, দেব বিশ মিলিয়ন ডলার।'

হতবাক হয়ে গেছে খানসারি। একবার দেখছে সেসিলিকে, আরেকবার স্ক্রিনে ডেনিয়েলসনকে। কয়েক সেকেণ্ড পর চেয়ার ঘুরিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকাল সে। 'না, কোনও মূল্যেই ওই আর্টিফ্যাক্ট দেয়া হবে না আপনাদের হাতে! মাত্র একটা চুক্তি হবে, আর তা আপনার মেয়ের ব্যাপারে। আপনাকে দিতে হবে দশ মিলিয়ন ডলার। মেয়েকে বাঁচাতে চাইলে একঘণ্টার ভেতর আমাকে কনফার্ম করবেন, টাকা ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। মনে রাখবেন, সময় ঠিক একঘণ্টা!' আবারও ঘুরে কমপিউটারের বাটন টিপল সে। বিলিয়নেয়ার কিছু বলার আগেই শেষ হয়ে গেল ট্র্যান্সমিশন।

'খানসারি, তোমার প্রশংসা না করে পারছি না!' নকল তারিফ করল সেসিলি। 'খুব কম মানুষ আমার বাবার সামনে এমন কঠোর ভাষায় কথা বলতে পারে। বিশেষ করে যখন হাতে আসবে পুরো বিশ মিলিয়ন ডলার।'

ডেস্ক ছেড়ে সেসিলির সামনে এল খানসারি। বারকয়েক ঢোক গিলে কফ পরিষ্কার করে বলল, 'বিশ মিলিয়ন! ওই এক টুকরো লাল ধাতুর দাম?' আর্টিফ্যাক্টের দিকে হুক পরা হাত তাক করল। 'জিনিসটা কী? এত দাম কেন?'

'ওটা অদ্ভুত এক রহস্যময় চাবি— অতীত ও ভবিষ্যতের,' বলল সেসিলি, নেশাগ্রস্ত চোখে দেখছে খানসারিকে। 'তুমি হতে পারো এসবের বড় এক অংশীদার, খানসারি। আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করে দাও আমাদের কাছে, বদলে কথা দেব, তোমার বিরুদ্ধে

কোনও ব্যবস্থা নেবেন না আমার বাবা। শুধু তা-ই না...'

'আরও কী,' জিজ্ঞেস করল খানসারি, চোখে সন্দেহ ও লোভ।

'মন থেকে মাফ করে দেব তোমাকে। আগের মতই থাকবে আমাদের সম্পর্ক।' কোটের ভেতর কোমর ও কাঁধ নেড়ে নিয়ে সামান্য সরল সেসিলি। 'আমার বাবার সামনে যেভাবে সাহস দেখালে, তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। সত্যি বলতে তুলনা নেই তোমার।'

প্রশংসা পেয়ে একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল খানসারি। 'তাই? তা হলে কি আমরা দু'জন ঘুরে আসতে পারি বেড়...'

'স্যর,' বাধা দিল সেসিলির দাড়িওয়ালা কড়া গার্ড। 'যে-কোনও সময়ে কল দেবে ডোনাটি লুক্কা। সেজন্যে তৈরি থাকতে হবে আপনাকে।'

বিরক্তি ও রাগ দেখা দিল খানসারির চেহারায়। অবশ্য সামলে নিল নিজেকে। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। অপেক্ষা করা উচিত।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'মেয়েটাকে ওদিকে নিয়ে গিয়ে পাহারা দাও। একঘণ্টার ভেতর ওর বাবা কল দেবে। ...আর, তুমি,' অন্য গার্ডের উদ্দেশে ভুঁড়ি বাজাল সে। 'এখানে এনে দাঁড় করাও মিশকিনকে।'

'ভালই চেষ্টা, বেগম ডাইনী,' সেসিলির কানে ফিসফিস করল ওর গার্ড।

চুপ থাকল সেসিলি। অন্তত চেষ্টা করেছে, এটাই সান্ত্বনা। ওর জানার আগ্রহ জন্মেছে, কেন বিশ মিলিয়ন ডলারের লোভ সামলে নিল খানসারি। তা হলে কি আরও বেশি দেবে লুক্কা?

'কাজটা একেবারে পাগলামি বলে মনে হচ্ছে,' বলল লাবনী।

জাবাইরাহ্ দক্ষ নার্স, বুলেটের ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ

করে অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিয়েছে মারাদেসিয়াকে। আশপাশের এলাকায় ভাল কোনও বিশ্বস্ত ডাক্তার নেই বলে, ওকে আপাতত ভ্যানে রেখে এসেছে ওরা। সাহায্যে আসছে না বলে হতাশ সে, আবার একই সঙ্গে আনন্দিত।

এ মুহূর্তে সরু নদীর তীরে আছে রানা, মউরোস, জাবাইরাহ্ ও লাবনী। একটু দূরেই ওদিকের পাড়ে তিরিশ ফুট খাড়া দেয়ালের মত পাথুরে পাহাড়। আরও ওপরে ইলেকট্রিক বাহিত কাঁটাতারের উঁচু বেড়া। পুরো দুর্গ ঘিরে রেখেছে ওটা।

খুবই স্রোতস্বিনী নদী, কিন্তু অগভীর। অনায়াসেই পেরিয়ে যেতে পারবে ওরা। জুতো খুলে কোট উঁচু করে নদীতে নামল জাবাইরাহ্, সাবধানে ওকে ওপারে নিল রানা ও মউরোস মিলে। নিজেদের বুট খোলেনি ওরা। খুব অস্বস্তি নিয়ে নদী পার হলো লাবনী।

জাবাইরাহ্কে চারকোনা এক পাথরের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'লাবনী, তোমাকে যথেষ্ট ফিট মনে হচ্ছে।'

'চুপ করো তো,' ধমক দিল মেয়েটা। গোপন মিশন সফল করতে পরনে কালো ওয়েট সুট। কী করতে হবে শোনার পর থেকেই তিরতির করে কাঁপছে বুকের ভেতর। 'তোমরা শিয়োর, নিজেরা ঢুকতে পারবে না পাইপের ভেতর?'

'নিজেই তো দেখছ,' বলল জাবাইরাহ্। একটু দূরেই পাথুরে পাহাড়ি দেয়াল থেকে নদীর কাছে থেমেছে লোহার পাইপ। ওটার ভেতর থেকে সামান্য পানি গিয়ে পড়ছে নদীতে। বুক ভরা আশা নিয়ে লাবনী ভেবেছিল, হালকা-পাতলা মউরোস ঢুকতে পারবে ওই পাইপের ভেতর। তারপর ওর কল্পনা হয়ে উঠল দুঃস্বপ্ন। পাইপের ভেতরের অংশ বড়জোর আঠারো ইঞ্চি বৃত্তাকার। রানা বা মউরোস আঁটবে না ওটার ভেতর। নিজেও যে ঢুকতে পারবে, সে ব্যাপারেও পুরো নিশ্চিত নয় লাবনী।

'অনায়াসেই ঢুকতে পারবে,' মনে হলো ওর মনের কথা পড়ছে রানা। 'মাঝপথে আটকে যাবে না।'

'রাখো তো এসব কথা!' আরও রেগে গেল লাবনী। বলে কী নিষ্ঠুর লোকটা, সত্যি যদি ভেতরে ঢুকে...

ভ্যান থেকে আনা ব্যাগ খুলল রানা। 'এই যে দরকারী জিনিস। টর্চ, টু-ওয়ে রেডিও আর হেডসেট। খুব শক্তিশালী রেডিও নয়, কিন্তু ঠিকই যোগাযোগ করতে পারবে। মনে রেখো, বন্ধ করবে কাঁটাতারের বেড়ার ইলেকট্রিসিটি। ওখানে আলাদা সুইচ থাকবে। সঙ্গে অস্ত্র বলতে...'

'জীবনেও ব্যবহার করিনি, করবও না।'

'কাজে আসতে পারে।' ব্যাগ থেকে ক্যানভাস হোলস্টার ও ছোট এক অটোমেটিক পিস্তল নিল রানা। হোলস্টারে পিস্তল রেখে লাবনীর কোমরের পেছনে বেঁধে দিল স্ট্র্যাপ। 'থাকল পিস্তল, বিপদে পড়লে প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।'

'আমি আসলে জানি না...'

রানা বুঝে গেছে, যে-কোনও সময়ে বেঁকে বসবে লাবনী। তাই দেরি না করে ওর বেল্টে ওয়াকি-টকি গুঁজে দিল, মাথায় পরিয়ে দিল হেডসেট। নরম সুরে বলল, 'আমার ধারণা, দুর্গে কারও সঙ্গেই দেখা হবে না তোমার। তবুও দেখা হয়ে গেলে, নিজেকে ভেবে নেবে মডেস্টি ব্লেইয। দেরি না করে গুলি করবে।' লাবনীর কণ্ঠে ঝুলন্ত লকেট দেখল। 'আপাতত আমার কাছে রেখে যেতে চাও?'

মাথা নাড়ল লাবনী। 'না, তবে বলার জন্যে ধন্যবাদ। এটা সৌভাগ্য এনে দেয় আমাকে।'

ভুরু উঁচু করল রানা। 'আজ সকাল থেকে যা ঘটেছে, তার পরেও তোমার মনে হচ্ছে, সৌভাগ্য এনে দিয়েছে ওই জিনিস?'

'যতই বিপদ আসুক, মরে তো যাইনি; কম কথা?'

‘কথা ঠিক,’ মেনে নিল রানা।

লকেট একবার স্পর্শ করে গলা পর্যন্ত ওয়েট সুটের চেইন আটকে নিল লাবনী। মৃদু হাসছে রানা।

‘আসুন, দেখিয়ে দিই আসল স্বর্গের রাস্তা,’ লাবনীকে বলল মউরোস, দুষ্টুমিতে চকচক করছে চোখ।

কাছে গিয়ে খয়েরি-হলদেটে থকথকে কাদার দিকে ঝুঁকে পাইপ দেখল লাবনী, পরক্ষণে বিকৃত করে ফেলল মুখ। ‘হায়, আল্লা! বাপরে! কী ভয়াবহ দুর্গন্ধ!’

‘আর কী আশা করো?’ নাক স্বাভাবিক রানার।

‘মানুষের কাজ মানুষ করেছে, ছেড়ে দিয়েছে মাল; তাই বলে নিজের কাজে হাল ছেড়ে দেয়া কি আপনার শোভা পায়?’ উৎসাহ দিল মউরোস।

গলার কাছে বমি চলে আসছে লাবনীর। করুণ সুরে বলল, ‘খুব অসুস্থ লাগছে! না, মনে হচ্ছে না আমি এই কাজ করতে পারব!’

ওর বাহুতে হাত রাখল রানা। ‘জানি, তুমি পারবে। মনে রেখো, তুমি একজন আর্কিওলজিস্ট।’

‘হাজার বছর আগের নোংরা সব মানুষ, জীবনে একবারও যারা স্নান করেনি, সেইসব মানুষের “ইয়ে” ঘাঁটা আপনাদের জন্যে অত্যন্ত পবিত্র জরুরি কাজ,’ সাহস দিতে চাইল মউরোস, মুখে তৃপ্তির হাসি।

‘তা... ইয়ে... হ্যাঁ... কিন্তু...’ হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে রানাকে দেখল লাবনী, ‘তুমি নিজেও তো শখের আর্কিওলজিস্ট...’

‘আমিও তো তাই বলছি,’ চট্‌ করে সায় দিল রানা, ‘পারলে এত সাধাসাধি লাগত না, করেই ওই পাইপের ভেতর দিয়ে চলে যেতাম!’

‘কিন্তু...’

'পাইপ কিন্তু বেশি দূরে যায়নি,' বলল রানা, 'বড়জোর পঞ্চাশ ফুট, তারপর সামনেই শাফট। মই বেয়ে উঠবে। কোনও সমস্যা হবে না তোমার।'

'কিন্তু ওপরে ওঠার পর কেউ যদি দেখে ফেলে?'

'লাবনী, চিন্তা কোরো না, আমার ওপর ভরসা রাখো,' বলল রানা, 'যদি ভাবতাম সত্যিই বিপদ হবে, যেতে দিতাম না।'

'তবুও আমার কোমরে গুঁজে দিয়েছ পিস্তল,' সন্দেহ নিয়ে বলল লাবনী। 'বিপদের কথা চিন্তা...'

'শোনো, লাবনী, আসলে পৃথিবীটা ভয়ঙ্কর জায়গা... চারপাশে মারাত্মক সব বিপদ। কিন্তু থাকতে হবে এখানেই। এখান থেকে যে পালিয়ে বাঁচবে সে উপায় নেই। একটি মুহূর্তের জন্যেও পুরো নিরাপদ নয় কেউ।' এই ক'দিনে রানা বুঝেছে, খুবই ভীতু মেয়ে ও। 'তুমি একবার তারকাঁটার বেড়ার বৈদ্যুতিক কারেন্টটা অফ করলে, ঠিক পাঁচ মিনিটে ওই দুর্গে ঢুকে পড়ব মউরোস আর আমি। এর পরের কাজ সহজ, সিনেমার নায়কের মত খানসারির নাকে-মুখে গোটা কয়েক ঘুষি মেরে সেসিলিকে নিয়ে বেরিয়ে আসব। ব্যস, কাজ শেষ।'

আরও রেগে গেল লাবনী, 'কারও নাকে-মুখে ঘুষি মেরে দেয়া তোমার জন্যে খুব সহজ কাজ, তাই না, রানা?'

হাসল রানা। 'মাঝে মাঝে এটা বেশ কাজে আসে। পুরো পথে যোগাযোগ রাখব রেডিয়োতে। দুর্গের আর্কিটেকচারাল প্ল্যানও আমাদের হাতে। তোমাকে জানিয়ে দেব কোথায় যেতে হবে, আর কাজটা শেষ হলেই কোথায় লুকিয়ে পড়বে। কোনও বিপদ হবে না। ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই বিপদ বাড়ে।'

খুবই যত্ন করে চুল বেঁধে, মুখে ভীষণ আপত্তি নিয়ে থকথকে নোংরা ভরা পাইপে মাথা ঢোকাতে গেল লাবনী। 'আমার আর উপায় নেই, তাই না?'

'আছে। সেক্ষেত্রে মরবে সেসিলি। তুমি চাইলে...'

আর কথা না বাড়িয়ে সাপের মত বুকে ভর করে এগোল ও।

নিজের রেডিয়োর সুইচ অন করে বলল রানা, 'রেডিয়ো টেস্ট করে নাও।' লাবনীর পা ধরে ঠেলা দিতে চাইল ও।

খড়-মড় শব্দের পর এল ওয়েট সুট পরিহিত লাবনীর কণ্ঠ, 'হয়েছে, হয়েছে! আমার পা ধরতে হবে না! আমি এমনিতেই যাচ্ছি।'

একহাতে ফ্ল্যাশলাইট রেখে এগোল লাবনী। ঢালু পাইপ গেছে ওপরে। কেমন বদ্ধ পরিবেশ। আটকে আসছে দম। বাজে গন্ধে কুঁচকে আছে নাক। সামনে আলো ফেলে দেখে নিল, দূরে শুধু নিকষ কালো আর কালো।

'মডেস্টি ব্লেইয এভাবে পাইপে ঢুকে সাঁতার কেটেছে মানুষের বর্জ্যে?' মনে মনে বলল লাবনী। জানে, রানার দোষ নেই, তবুও মন চাইছে ওকেই দোষী করতে! 'এটা কেন? আমি কি ভালবেসে ফেলছি ওকে?' নিজেকে ধমক দিল লাবনী, 'ওর ব্যাপারে সাবধান, লাবনী! যা জেনেছি, কখনও জালে আটকা পড়বে না ওই মুক্ত-বিহঙ্গ!' ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে ও, কাজটা কষ্টকর।

সেসিলি গভীর মনোযোগে দেখছে, ডোনাটি লুক্কার জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে ক্রমেই আরও বিরক্ত হয়ে উঠছে আরাশ খানসারি নির্দিষ্ট তালে টোকা দিচ্ছে টেবিলে। এমন এক লোক, যে জানে না ধৈর্য রাখতে।

'আরাশ,' মুখ খুলল সেসিলি। 'আমাকে একটু বাথরুমে যেতে হবে। প্লিয?'

'আবারও!' আপত্তির সুরে বলল ওর গার্ড। কিন্তু হাতের ইশারা করে তাকে দরজা দেখিয়ে দিল খানসারি।

বিজয়িনী ক্লিওপেট্রার মত গার্ডকে দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সেসিলি।

'আমি কিন্তু খুলে দেব না হ্যাণ্ডকাফ,' বলল লোকটা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল দু'জন।

'কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা। কড়-কড় আওয়াজ হচ্ছে স্ট্যাটিকের।

'খুবই ভাল,' তিক্ত মনে বলল লাবনী, 'এই দারুণ অভিজ্ঞতা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অভ আর্কিওলজির জন্যে না লিখে পারব না। সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ!'

'ভাল এগোতে পারছ,' বলল রানা, 'পাইপের শেষমাথা দেখা যায়?'

ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো সামনে ফেলল লাবনী। 'হ্যাঁ... মনে হয়! যেন লম্বা কোনও কুয়ার ভেতর আছি!' কেমন এক আওয়াজ পেল। হিসহিস করছে কিছু। তারপর গুড়-গুড় আওয়াজ হলো। আরে, পাইপের ভেতর দিয়ে পানি আসছে নাকি! 'হায়, আল্লা! মানুষের হাগুমুতু আসছে! রানা! কীসের মধ্যে ফেললে আমাকে!'

মৃদু এক আহাজারির মত দুর্বল গোঙানি বেরোল লাবনীর কণ্ঠ চিরে। আর তখনই কয়েক গ্যালন শীতল পানি, সেই সঙ্গে আরও কী যেন ওর ঘাড়-মাথা-গাল ভিজিয়ে-মাখিয়ে দিয়ে হড়-হড় করে চলে গেল নদী কলুষিত করতে। 'ওফ্! হায়, আল্লা! ওহ্! অসহ্য!' রাগে কেঁদে ফেলল ল্যাবনী। অসভ্য-বেয়াদব-বেতমিজ রানাটার জন্যেই এই করুণ পরিণতি আজ ওর!

দশ সেকেণ্ড পর সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেল রানা, 'ওরা যে ফ্লাশ করে, সেজন্যেও ওদেরকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

'মর্, গুখোর শয়তান!'

‘পেটের মাল নেমে যাওয়ায় আগের চেয়ে ভাল লাগছে?’ গার্ডের সঙ্গে সেসিলিকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুচকি হাসল খানসারি।

‘তোমার লোকের আচরণ খুব খারাপ,’ নাক কুঁচকে বলল সেসিলি। ‘আশা করি ডোনাটি লুক্কার সঙ্গে তোমার মিটিং মিস করিনি?’

‘না, যে-কোনও সময়ে কল করবে। সঠিক সময়ে ফিরতে পেরেছ।’ খানসারি হাতের ইশারা করায় সেসিলিকে একটা লাউঞ্জারে বসিয়ে দিল গার্ড। অসহায় চোখে মেয়েটাকে দেখল রাশান, মুখে কিছুই বলল না।

‘আমার বাবার প্রস্তাবটাও মাথায় রেখো,’ বলল সেসিলি। ‘লুক্কা যা দিতে চাইবে, তার চেয়ে বেশি দেবেন তিনি।’

‘টিং’ আওয়াজ তুলল কমপিউটার। আঙুল তুলে সেসিলিকে দেখাল খানসারি। ফলে মেয়েটার মুখে হাতচাপা দিল গার্ড।

মুখ বুজে যাওয়ায় স্ক্রিনে মন দিল সেসিলি।

জীবনে প্রথমবারের মত ডোনাটি লুক্কাকে দেখল সেসিলি। এর আগে দেখেছে শুধু ছবিতে। তা-ও তখন অনেক কম ছিল লোকটার বয়স। এখন পাক ধরেছে ব্যাকব্রাশ্‌ড্‌ চুলে। কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে গাল-কপালে। কিন্তু আগের সেই বাজপাখির মতই তীক্ষ্ণ তার চোখ।

‘মিস্টার খানসারি,’ বলল লুক্কা। মনে হলো ইরানিয়ান কবর-লুটেরার সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে বলে সে বিরক্ত।

‘মিস্টার লুক্কা,’ খুশি মনে বলল খানসারি, ‘আমি আনন্দিত যে শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি।’

‘শুনলাম আমার কাজে আসবে এমন কিছু তোমার কাছে আছে, তেমনই বলা হয়েছে আমাকে— জিনিসটা কী?’ অধৈর্য কণ্ঠে বলল ডোনাটি লুক্কা।

'সত্যি বলতে, আপনার জন্যে আছে দুটো জিনিস,' প্রথমেই আটলান্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট ক্যামেরার সামনে ধরল খানসারি। 'সামান্য জিনিস, তবে কাজে লাগতে পারে আপনার। ওটা আপনার এক লোক মিশকিনের কাছ থেকে এসেছে আমার কাছে।'

'ধ্বংস করো ওটা,' বলল ডোনাটি লুক্কা। 'গলিয়ে ফেলো। কাজটা ভিডিও ক্যামেরার সামনে করলে তোমাকে দেয়া হবে পনেরো মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।'

'ধ্বংস করে দেব?' হতভম্ব হয়ে গেল খানসারি। 'তা না হয় করলাম, কিন্তু...' বিস্ময় নিয়ে মাথা নাড়ল সে। 'আমার এই ফ্যাসিলিটিতে ধাতু তরল করতে পারব, কিন্তু আপনি কি ঠিক তাই চাইছেন?'

'গলিয়ে ফেলো! সোনা বা অন্য ধাতু রেখে দিতে পারো। কিন্তু পুরোপুরি ধ্বংস করবে জিনিসটা। এরই ভেতর অনেক সমস্যা করেছে ও জিনিস।'

ডেস্কে আর্টিফ্যাক্ট রেখে নিজেকে সামলে নিল খানসারি। 'ঠিক আছে, ধ্বংস করে দেব। তার মানে আপনি দিচ্ছেন পনেরো মিলিয়ন ডলার?'

ডোনাটি লুক্কার মস্ত বড় ইমেজ মাথা দোলাল।

ভীষণ চমকে গেছে সেসিলি। সত্যি জানোয়ারটা নষ্ট করবে ওই আর্টিফ্যাক্ট? সেক্ষেত্রে হয়তো আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথায় ছিল আটলান্টিস!

খুব অস্বস্তি নিয়ে পাইপ থেকে বেরিয়ে চারপাশ দেখল লাবনী। ছয় বাই আট ফুটের এক শাফটে আছে। ওপর থেকে নেমে এসেছে একের পর এক পাইপ। মেঝেতে ভয়ানক নোংরা পানি।

'আমি শাফটে,' হেডসেটে বলল লাবনী। আলো ফেলল

চারপাশে। এক দিকের দেয়ালে গেঁথে আছে স্টিলের মই।

'গুড,' নানান শব্দের ভেতর দিয়ে এল রানার কণ্ঠ। 'এবার মই বেয়ে ওঠো। আর যা-ই করো...'

'কী?'

'পিছলে পোড়ো না।'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। তুমি হয়তো লোকটা অত খারাপ নও।' বিভিন্ন পাইপ থেকে টপটপ করে ওর ওয়েট সুটে পড়ছে পানি। মই বেয়ে উঠতে লাগল লাবনী। দু'মিনিট পর মাথার ওপরের টিনের ঢাকনি সরিয়ে পা রাখল পাথরের মেঝেতে। 'উঠে এসেছি।'

'তুমি আছ ছোট একটা ঘরে। একটা মাত্র দরজা।'

'ঠিক।'

'দরজা খুললে দেখবে কেউ নেই, তখন যাবে বামদিকে। করিডোরের শেষমাথায় আরেকটা দরজা। ওটা পেরিয়ে যাবে।'

ভীষণ ভয় নিয়ে দরজা সামান্য খুলে উঁকি দিল লাবনী। সামনে পাথুরে করিডোর। জ্বলছে মৃদু আলোর বাতি। কোথা থেকে যেন আসছে মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন। এ ছাড়া সব থমথমে। করিডোরের শেষমাথায় চোখ রাখল লাবনী। ওখানে সরু একটা সিঁড়ি গেছে ওপরে। প্রায় ফিসফিস করল, 'আশপাশে কেউ নেই।'

'ঠিক আছে, উঠে যাও।'

ভিজে যাওয়া স্নিকার খুলে ফেলল লাবনী, পায়ের ছাপ রাখতে চায় না। হালকা পায়ে চলে গেল করিডোরের শেষমাথায়। ওপরের তলায় উঠে নিচু স্বরে বলল, 'মস্ত বিপদে পড়েছি!'

'কী হয়েছে?' চিন্তিত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'সামনে দুটো দরজা। কোন্‌টা দিয়ে ঢুকব?'

'প্ল্যানে দরজা মাত্র একটা। অন্যটা পরে তৈরি করেছে। দুটোর যে কোনওটার ওপাশে আছে জেনারেটর রুম। দুই দরজাই খুলে দেখো।'

ওই দুই দরজাতেই বিদ্যুতের সিম্বল লেখা: হাই ভোল্টেজ!

এ থেকে কিছু বোঝা যাবে না। ডানদিকের দরজা প্রথমে খুলল লাবনী। কপাল ভাল, ঘরে কোনও টেকনিশিয়ান নেই। সিকিউরিটি স্টেশনও নয়। যেন কোনও ইউনিভার্সিটির আইটি ডিপার্টমেন্ট। এক দেয়ালে কমপিউটার সার্ভার ইকুইপমেন্ট। নিজেরই বোধহয় সিকিয়োর ইন্টারনেট লিঙ্ক আছে খানসারির। একটা কমপিউটার ও কালো এক স্ক্রিনের সঙ্গে সংযুক্ত বেশ কয়েকটা কালো বাক্স।

কৌতূহলের কারণে কয়েক পা ফেলে মাউস নাড়ল লাবনী। স্ক্রিন সেভার মোড থেকে জেগে উঠল মনিটর। দেখা গেল কাজ করছে কয়েকটা উইণ্ডো। তার একটার ওপর চোখ আটকে গেল ওর। ওই উইণ্ডো দু'ভাগে ভাগ করা। মনে হলো চলছে ভিডিও কনফারেন্স।

দু'লোকের একজনকে চেনে না লাবনী, কিন্তু অন্যজন...

আরাশ খানসারি!

'লাবনী,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'কী করছ?'

'আমি আছি একটা কমপিউটার রুমে।'

'ওটা ছেড়ে অন্য রুমে যাও।'

পরের ঘরে মস্তবড় এক জেনারেটর দেখল লাবনী। সর্বক্ষণ গুঞ্জন তুলছে যন্ত্রটা। পাশের দেয়ালে কয়েকটা ফিউয বক্স ও সার্কিট ব্রেকার।

'আরেকটা সমস্যায় পড়েছি,' জানাল লাবনী, 'সবকিছু লেখা রয়েছে ফার্সিতে!'

'ঘরে মিশকিনকেও দেখছি,' মন্তব্য করল ডোনাটি লুক্কা।

'ডোনাটি!' ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যালেকসেই মিশকিন। আবারও তার ঘাড়ে পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনবে গার্ড, এমন সময় মাথা নাড়ল খানসারি। ভীত সুরে বলল মিশকিন, 'প্লিয! আমি লজ্জিত! জানি, অন্যায় করেছি! দয়া করে মাফ করে দাও আমাকে!'

মাথা নাড়ল লুক্কা। 'মিশকিন, তোমাকে বিশ্বাস করে কী পেলাম? বিশ্বাসঘাতকতা করলে! শুধু আমি নই, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুরো ব্রাদারহুড! কী কারণে? টাকা দরকার তোমার! বলতে আমাকে!' আবারও মাথা নাড়ল লুক্কা। 'দরকার হলে যে কোনও পরিমাণ টাকা দিতে পারে ব্রাদারহুড। তুমিও তা জানতে। তবুও লোভ করলে। আমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়ছি, তাদের মতই লোভী হয়ে গেলে!'

'প্লিয, ডোনাটি!' কাতর অনুরোধ করল মিশকিন। 'জীবনেও আর...'

'চুপ করো, অ্যালেকসেই,' ধমকের সুরে বলল লুক্কা। চোখ খানসারির ওপর। 'খানসারি, মনে করি না তোমার বা আমার কোনও কাজে আসবে ও। ওকে খুন করলে সঙ্গে সঙ্গে পাবে পাঁচ মিলিয়ন ডলার। কাজেই দেরি কোরো না।'

'পাঁচ মিলিয়ন?' হাঁ হয়ে গেল খানসারি।

মাথা দোলাল ডোনাটি লুক্কা।

মুখ বিকৃত হয়ে গেছে মিশকিনের, হাউমাউ করে উঠল, 'ডোনাটি! প্লিয! মাফ করে দাও...'

'চুপ করো, বেঈমান!'

ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গেল রাশান।

ডেস্কের একপাশের ড্রয়ার টেনে খুলেছে খানসারি, ওটার ভেতর থেকে রুপালি এক রিভলভার নিয়েই মিশকিনের বুকে

গেঁথে দিল গুলি।

'ঠিক আছে, ওয়্যারিং দেখছ,' আবারও বলল রানা, 'সামনেই পাবে উঁচু তিনটে প্যানেল। ওখানকার বড় সুইচ ক'টা নামিয়ে দেবে নিচে।'

'হ্যাঁ, আছে,' বলল লাবনী।

'মাঝের প্যানেলের তিন, ছয় আর সাত নম্বর সুইচ নামিয়ে দাও।'

ধাতব জোরালো 'ক্লং' আওয়াজ তুলল তিন সুইচ। 'এবার কী?' জানতে চাইল লাবনী।

'আর কিছু লাগবে না, লুকিয়ে পড়ো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

রেডিও অফ হয়ে যাওয়ায় চলছে স্ট্যাটিক।

'একমিনিট, রানা!'

হতবাক হয়ে মিশকিনের রক্তাক্ত লাশ দেখছে সেসিলি। এমন কী গার্ডরাও লোকটাকে এভাবে খুন হতে দেখে হতভম্ব। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সেসিলি, 'মাই গড!'

ওই কণ্ঠ শুনে চমকে গিয়ে বলল ডোনাটি লুক্কা, 'খানসারি! তোমার সঙ্গে কে?'

লাশ দেখছিল খানসারি, স্ক্রিনের দিকে ফিরল। 'আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর মেয়ে এখন আমার হাতে বন্দি। নাম সেসিলি ডেনিয়েলসন।'

'সেসিলি ডেনিয়েলসন?' তিন সেকেণ্ড পর বলল লুক্কা, 'ওকে দেখতে দাও আমাকে!'

নদীর পাড় থেকে প্রায় খাড়া পাহাড়ে উঠে তারকাঁটার বেড়ার

কাছে পৌঁছে গেল রানা-মউরোস। রানার হাতে ওয়্যার কাটার। ওটা ব্যবহার করলেও কোনও স্ফুলিঙ্গ তৈরি হলো না তারে। থেমে গেছে বৈদ্যুতিক প্রবাহ।

'যাও!' মউরোসকে চাপা স্বরে বলল রানা। তারকাঁটার বেড়ার নিচের দিক কেটে ফেলেছে। তুলে আনল ওপরে। অনায়াসেই ভেতরে ঢুকতে পারে যে কেউ।

তারকাঁটার বেড়া পেরিয়ে ওপরের দুর্গ দেখল ওরা। প্রায় খাড়া রাস্তা গেছে ওপরে। শেষমাথায় গেট, আর তারপর দুর্গের আঙিনা। কোথাও দেখা গেল না প্রহরী। কিন্তু জাবাইরাহ্‌র কথা অনুযায়ী, এ রাস্তায় আছে কমপক্ষে চারজন সশস্ত্র প্রহরী।

নিজের অস্ত্র ছাড়াও জিথ্রি রাইফেল এনেছে মউরোস। রানার কাছে ওয়াইল্ডি ও জাবাইরাহ্‌র পুরনো উযি সাব-মেশিনগান। একবার পরীক্ষা করে নিল ওরা অস্ত্রগুলো।

'রানা, হিরো হওয়ার এ-ই সুযোগ,' হাসল মউরোস।

ঝড়ের গতি তুলে ছুট দিল দুই বন্ধু।

•

সার্ভার রুম লুকাবার ভাল জায়গা, বুঝতে দেরি হয়নি লাবনীর। তা ছাড়া, আরেকবার দেখবে ওই কমপিউটার।

পেছনে ঘরের দরজা বন্ধ করে কমপিউটারের ভিডিও কনফারেন্স কলের দিকে মন দিল ও। সামান্য বাড়িয়ে নিল ভলিউম। অন্য লোকটার সঙ্গে কথা বলছে খানসারি...

একটু দূরেই সেসিলি! ওকে পাহারা দিচ্ছে এক লোক। ঠেলে নিয়ে এল স্ক্রিনের মাঝে।

'সেসিলি ডেনিয়েলসন এখানে কী করছে?' কড়া সুরে জানতে চাইল লুক্কা।

'ওর বাবার সঙ্গে কাজ আছে আমার,' জবাব দিল খানসারি। 'আপনার সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'অবশ্যই আছে!' ধমকের সুরে বলল লুক্কা, 'ওকে খুন করো!'

'কী বললেন?' অবাক হয়েছে খানসারি।

'ওকে খুন করো!'

পেটের ভেতর কেমন গড়বড় লাগছে লাবনীর। খানসারির হাতে রিভলভার। লোকটা যদি লুক্কার নির্দেশ মত কাজ করে, খুন হয়ে যাবে বেচারি সেসিলি!

'আপনি কি পাগল নাকি, মিস্টার লুক্কা,' বলল খানসারি। 'ওকে ফেরত পেলে পুরো দশ মিলিয়ন ডলার দেবে ওর বাবা! এরই ভেতর রাজিও হয়েছে টাকা বুঝিয়ে দিতে!'

'আগে আমার কথা শোনো,' বলল ডোনাটি লুক্কা। এত সামনে ঝুঁকে এসেছে যে দখল করে নিয়েছে পুরো স্ক্রিন। 'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এই মেয়ে কতটা বিপজ্জনক! হাজার হাজার বছর ধরে আমরা যা গোপন রাখতে চাইছি, সেটাই চোখের সামনে আনতে চাইছে এর বাবা আর এ! এরা যদি...'

'যা খুশি করুক!' বিরক্ত হয়ে বলল খানসারি। 'এর বাবার কাছে একে তুলে দিলেই, আমি পাব দশ মিলিয়ন ডলার!'

অস্বস্তি ও ভয় ভর করল ডোনাটি লুক্কার কণ্ঠে, 'খানসারি, তুমি একে খুন করলে আমি দেব পুরো বারো মিলিয়ন ডলার!'

'আপনার মাথা ঠিক আছে তো...

'পনেরো মিলিয়ন! খানসারি! যা চাও, তা-ই পাবে! কিন্তু খুন করো সেসিলি ডেনিয়েলসনকে! আমার চোখের সামনে! এখনই!'

দশ

অবাক চোখে মনিটরে চেয়ে আছে লাবনী। স্ক্রিনের অচেনা ওই লোক সত্যিই বলছে সেসিলিকে খুন করতে! যা বলছে তা-ই করবে কবর-লুটেরাটা। বুক-পিঠ নেই লোভী জানোয়ারটার, এতবড় পাপ করেও হাসতে হাসতে পকেটে পুরবে খুনের রক্তাক্ত টাকা।

অথচ, কিছুই করতে পারবে না ও নিজে।

হ্যাঁ, কিন্তু...

'নিচের গেটে ওরা দু'জন,' রানার পাশে ছুটছে মউরোস।

'দেখেছি,' বলল রানা। 'এতটা ওপরে উঠতে ওদের লাগবে কয়েক মিনিট। আপাতত ওদের নিয়ে ভাবব না। ভাবব ওপরের গেটের কথা।'

'বোধহয় গেটের ওপাশে আছে এরা। আমাদের ট্যাকটিক?'

'সাধারণ কৌশল, কিন্তু সূক্ষ্ম।' উযি সাবমেশিনগান উঁচু করে ধরল রানা।

কী করবে বুঝছে না খানসারি। বারবার দেখছে অন্যদের। ওর মন চাইছে এই জটিল সময়ে পরামর্শ দিক কেউ। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর বলল সে, 'পনেরো মিলিয়ন? কেন, মিস্টার লুক্কা? কেন এই মেয়েকে মেরে ফেলা এত জরুরি?'

'বিশ মিলিয়ন!' খেপা ষাঁড়ের মত গর্জন ছাড়ল ডোনাটি লুক্কা, 'এখনই খুন করলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ মিলিয়ন! কেন কী করছি তা জানতে চেয়ো না, যা বলছি...'

কালো হয়ে গেল স্ক্রিন।

দপ্ করে নিভে গেছে ঘরের সব বৈদ্যুতিক বাতি। ধুলোভরা সরু কাঁচের জানালায় সামান্য আলো। তাতে মোটেও দূর হয়নি অন্ধকার।

বিদ্যুৎ অফিসের কর্মচারীদের নিয়মিত ঘুষ দেয়ায় কখনোই বিদ্যুৎ যায় না এ দুর্গে, কাজেই অবাক হয়েছে খানসারি। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে দু'গার্ড। আর তখনই ঝড়ের গতিতে নড়ে উঠল সেসিলি!

কণ্ট্রোল প্যানেলের নিচে মস্ত এক লাল সুইচ দেখেই ওটা অফ করে দিয়েছে লাবনী। সেজন্যে ফার্সি শিখতে হয়নি। 'ক্লং' ধাতব শব্দে সুইচ পড়তেই নিভে গেছে ঘরের সব বৈদ্যুতিক আলো, থেমে গেছে অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

আবারও বিদ্যুৎ চালু করতে যে-কোনও সময়ে এই ঘরে আসবে লোক। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে আঁধার করিডোরে বেরিয়ে দৌড়াতে লাগল লাবনী। একবার দেখল বেল্ট। কোমরের কাছে ঝুলছে হোলস্টারে পিস্তল।

দক্ষিণে পুরু দেয়ালে মিনারের মত উঁচু দুর্গের মেইন গেট। দেয়ালের কোনায় থেমে স্টিলের আয়নায় ওদিকটা দেখল রানা। বন্ধুকে বলল, 'একটু দূরে বামে গেটহাউস, ওখানে দু'জন।'

রাইফেল উঁচু করে ধরল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি। 'তো? কী?'

'সূক্ষ্ম কৌশল,' আয়নায় গেটহাউস দেখছে রানা। তখনই নিভল ওই ছোট দালানের সব বাতি। কালো হয়েছে সিসিটিভির

সব মনিটর, দ্বিধায় পড়ে গেছে গার্ডরা।

'সর্বনাশ!' নিচু স্বরে বন্ধুকে বলল রানা। 'পুরো দুর্গের মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছে লাবনী!'

একটু দূরে উঁচু গলায় কথা বলছে ক'জন গার্ড। তাদের একজন ওয়াকি-টকি ব্যবহার করল।

'মাঠে মারা গেল তোমার অতিসূক্ষ্ম কৌশল!' মাথা নাড়ল মউরোস। 'এবার?'

'লড়াই করে পৌঁছুতে হবে খানসারির কাছে।'

কোণ থেকে বেরিয়ে একইসঙ্গে গেটহাউসের দিকে ছুট দিল দু'বন্ধু। হাতে গর্জে উঠেছে অস্ত্র। গুলি করছে গার্ডদের আস্তানা লক্ষ্য করে।

ঘুরেই দক্ষ ব্যালেরিনার মত সহজ ভঙ্গিতে মেঝেতে এক পা রেখে বসে পড়ল সেসিলি, পরক্ষণে অন্য পা বর্শার মত গিয়ে লাগল দাড়িওয়ালা গার্ডের গোড়ালির পেছনের হাড়ে। কঠিন মার্বেলের মেঝেতে চিৎপাত হয়ে পড়তেই জোরালো খটাং আওয়াজ তুলল লোকটার মাথা।

বলের মত লাফিয়ে উঠেই বুকের কাছে দু'পা নিল সেসিলি, পায়ের পাতার নিচ দিয়ে বের করে নিল আটকানো হ্যাণ্ডকাফ। ওর পা মেঝে স্পর্শ করার আগেই সামনে চলে এসেছে দু'হাত। ঘরের বাইরে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ শুনে বুঝল, পৌঁছে গেছে বিসিআই-এর সেরা রত্ন মাসুদ রানা!

আবছা আলোয় দেখল, ডেস্কের পেছনে আরাশ খানসারি, চোখ এখনও প্লাযমা স্ক্রিনে। তার অপর গার্ড কাঁধ থেকে খুলে নিচ্ছে এমপি-ফাইভ।

খানসারির ডেস্কে উঠেই কাঁচে পিছলে চলল সেসিলি। তখনই চেয়ার ঘুরিয়ে উঠতে গেল লোকটা, ফলে চোয়ালে নিল

জোরালো লাথি। আরামদায়ক চেয়ারে আবারও ধপ্ করে বসে পড়েছে। একই সময়ে তার কোলে পড়ল সেসিলি। ধাক্কা খেয়ে একপাক ঘুরল সুইভেল চেয়ার। ওটার উঁচু পিঠের জন্যে কয়েক সেকেণ্ড সেসিলি ও খানসারিকে দেখতে পেল না গার্ড।

হতভম্ব খানসারি বাধা দেয়ার আগেই তার হাত থেকে রিভলভার ছিনতাই করেছে সেসিলি। মাত্র এক গুলিতে ফুটো করে দিল গার্ডের কপাল। ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল লাশ।

দাড়িওয়ালা গার্ড বুঝেছে পরিস্থিতি, মেঝে ছেড়ে উঠেই অস্ত্র তাক করল সেসিলির বুকে। কিন্তু খানসারিকে স্প্রিংবোর্ডের মত ব্যবহার করে একলাফে মেঝেতে নেমেই নিখুঁত সমারসল্ট করল সেসিলি। ওর পেছন দেয়ালে বিঁধল গার্ডের বুলেট। এদিকে ধাতব জোর আওয়াজ তুলে খানসারিসহ কাত হয়ে পড়েছে চেয়ার।

ঝড়ের বেগে ডিগবাজির মাঝে ট্রিগার টিপে দিয়েছে সেসিলি। বিদ্ধ হলো গার্ডের বুক, উষ্ণ ফোয়ারার মত ছিটকে বেরোল রক্ত। পরের দু'লাফে ডেস্কের পাশে পৌঁছল সেসিলি, শীতল চোখে দেখল মৃত গার্ডকে। বিড়বিড় করে বলল, 'মার্শাল আর্টের ব্যাপারে তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

পেছনে আবছা শব্দ পেয়ে ঘুরল। প্রায় উল্টে পড়া চেয়ার ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরছে খানসারি। ভয় পেয়ে থামল প্লাযমা টিভি স্ক্রিনের দেয়ালের কাছে, ঘুরে দেখল। স্টিলের হুক খড়-মড় শব্দ তুলেছে দেয়ালে। তবুও তার রক্তাক্ত, ফাটা ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি। তখনই নিচের মেঝে সরতেই ঘুটঘুটে আঁধার গিলে ফেলল তাকে। সেসিলি নড়ার আগেই আবারও খুট শব্দে বুজে গেল ট্র্যাপডোর, চারপাশের মার্বেলে শুধু সরু দাগ।

ওখানের মেঝে চাপ দিয়ে দেখল সেসিলি। নড়ল না মার্বেল পাথর। কোথাও আছে ট্র্যাপডোর খোলার লক, অথবা ওটা

টাইমিং মেকানিযম। পলাতকের পিছু নেয়ার উপায় নেই।

হারামজাদা পালিয়ে গেছে!

কিন্তু আটলান্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট?

পাগলের মত ডেস্কের চারপাশ খুঁজতে লাগল সেসিলি।

কোথায় গেল অরিচালকামের টুকরো!

আশপাশে কোথাও নেই!

পিছলে ডেস্কের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বোধহয় পড়েছে খানসারির কোলে, আর ওটা নিয়েই শাহ্-এর গোপন পথে সটকে পড়েছে সে!

বিড়বিড় করে একটা নরওয়েইজিয়ান গালি বকল সেসিলি।

আবার ফিরে গেল দাড়িওয়ালা গার্ডের পাশে। লোকটার প্যান্টের পকেটে হাত ভরে ঘাঁটতে গিয়ে পেয়ে গেল হ্যাণ্ডকাফের চাবি। কয়েক সেকেণ্ডে মুক্ত হয়ে গেল ওর হাত। পকেটে রিভলভার রেখে মৃত গার্ডের এমপি-ফাইভ তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে।

পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছে আরাশ খানসারি। এই ঘর দুর্গের আর সব ঘরের মতই আঁধার। কিন্তু ভাল করেই জানে ও কোথায় কী আছে। বাধ্য হয়ে পালাতে হলে কী চাই, তা ভেবেই এই ঘরে দরকারী সবকিছু জড় করে রেখেছে সে।

কখনও ভাবেনি, যে মেয়ে একটু আগেও ছিল বন্দি, এখন তার কাছ থেকেই পালাতে হবে! ঠিক জায়গায় পেল ব্যাটারি চালিত লণ্ঠন। কপালের দোষ দিল। ডোনাটি লুক্কা ঠিকই বলেছিল। দেখে যা মনে হয়, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি বিপজ্জনক এই সেসিলি ডেনিয়েলসন।

জ্বলে উঠল লণ্ঠনের বাতি। এই ঘরে কখনও আসেনি ওর দলের কেউ। সব আছে আগের মতই। মাঝারি এক থলি তুলে

কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সে, ভেতরে রাখল অরিচালকামের টুকরো। এবার বেছে নিতে হবে প্রিয় অস্ত্র।

একহাত অকেজো বলে বাধ্য হয়েই ছোট আর হালকা অস্ত্র রেখেছে এই ঘরে। কিন্তু তার মানে এ-ই নয় যে, কমে গেছে তার ফায়ার পাওয়ার। প্রায় সাধারণ পিস্তল আকারের ইনগ্রাম এম ইলেভেন নিল সে। প্রতি মিনিটে ওই অস্ত্র উগলে দেবে ষোলো শ' গুলি। এই সাবমেশিনগান কোম্পানিতে অর্ডার দিয়ে নিজের পছন্দ মত তৈরি করিয়ে নিয়েছে সে। বারবার রিলোডের ঝামেলা কমিয়ে আনতে পিস্তলের হ্যাণ্ডগ্রিপের নিচে ম্যাগাযিন, শেষাংশ গেছে একটা ড্রামে। দ্বিগুণ পরিমাণ বুলেট আঁটে।

আরেকটা অস্ত্র বেছে নিল খানসারি। পঙ্গু ডানহাতের ধাতব কাপ থেকে স্টিলের হুক খুলে ওখানে আটকে নিল ভয়ঙ্কর দর্শন আট ইঞ্চি দীর্ঘ করাতের মত খাঁজকাটা একটা ছোরা।

যখন-তখন ইমার্জেন্সি হবে, ইতিমধ্যেই পাইলটকে জানিয়ে দিয়েছে, ফলে চট্ করে আকাশে উঠবে হেলিকপ্টার। কম শত্রু তৈরি করেনি সে। ভাল করেই জানে, মোটেও দুর্গম নয় এই দুর্গ। আগেও এমন মস্ত বিপদে নিজ লোকদের ফেলে উধাও হয়েছে সে। এসব কোনও ব্যাপারই নয়।

কিন্তু আকাশে উড়াল দেয়ায় বাধা আসতে পারে, কাজেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাখছে সে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে নতুন আরেকটা করিডোরে পা রাখল লাবনী। এদিকটা সাজাতে গিয়ে খরচ করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে লাল ভেলভেট। লম্বা সব জানালা দিয়ে আসছে আলো, ফ্ল্যাশলাইটের আলো নিভিয়ে দিল লাবনী। কাছের জানালা দিয়ে দেখল পাথুরে পাহাড়, অন্যদিকের জানালার অনেক নিচে দুর্গের মাঝের প্রকাণ্ড উঠান।

ওখানে গোলাগুলির আওয়াজ। লড়ছে রানা ও মউরোস।

করিডোরের বাঁকে ছুটন্ত পদশব্দ শুনল লাবনী। এদিকেই আসছে কেউ। বোধহয় জেনারেটর রুমে গিয়ে চালু করবে বিদ্যুৎ। সবচেয়ে কাছের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ও। দরজার কবাট বন্ধ করে দেয়ার আগে দেখল, অন্ধকার ঘরটা আসলে বড় একটা লাইব্রেরি। দেয়ালে দেয়ালে বুকশেলফ, বেশিরভাগ বই রেফারেন্সের। আসলে যে ব্যবসা, তাতে আর্টিফ্যাক্টের ওপর প্রচুর পড়াশোনা না করে উপায় নেই আরাশ খানসারির।

লাবনী টের পেল, থরথর করে কাঁপছে ওর হাত। হোলস্টার থেকে বের করে নিল অস্ত্রটা। তাক করেছে দরজার দিকে। পিছিয়ে যাচ্ছে পা-পা করে। খুব কাছেই পায়ের আওয়াজ।

সত্যিই যদি দরজা খোলে, আমি কি সত্যিই ট্রিগার টিপে দিতে পারব? ভাবল লাবনী।

পরীক্ষার ভেতর পড়তে হলো না, দূরে সরে গেল পদশব্দ। লোকটা চলেছে নিচের সিঁড়ি বেয়ে বেজমেন্ট লক্ষ্য করে।

মস্ত শ্বাস ফেলে ঘুরে আবারও ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল লাবনী। দুর্গে লুকাতে হলে ভাল জায়গা এই লাইব্রেরি। আশা করা যায়, এত গোলাগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক রেফারেন্সের জন্যে এখানে এসে ঢুকবে না খানসারির লোক। এখন শুধু চুপচাপ লুকিয়ে থাকলেই হবে, পরে যোগাযোগ করবে রানা...

তখনই বরফের মূর্তির মত জমে গেল লাবনী। হঠাৎ ওর মনে হয়েছে, চারগুণ আলো বেরোচ্ছে ওর ফ্ল্যাশলাইট থেকে!

ভীষণ ভয় নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লাবনী।

এইমাত্র স্লাইডিং বুকশেলফ সরিয়ে পাশের এক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে খানসারি! কাঁধের ফিতায় ঝুলছে শক্তিশালী ব্যাটারি চালিত লণ্ঠন। লোকটা লাবনীর মতই ভীষণ অবাক। এতই চমকে গেছে যে, ভুলে গেছে ওর দিকে অস্ত্র তাক করতে

তবে ক'সেকেণ্ড আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাতের ছোরার একপাশ চেপে ধরল লাবনীর ঘাড়ে। 'আহ্, ডক্টর আলম, খুবই খুশি হলাম আবারও দেখা হওয়ায়!'

দুর্গের আয়তাকার উঠানের দক্ষিণে প্রাচীরের প্রধান ফটক, দু'পাশে তিনটে করে মার্বেলের উঁচু স্ট্যাণ্ডে শতখানেক ফুলের গাছ। একটা স্ট্যাণ্ডের পেছনে কাভার নিয়েছে রানা-মউরোস, দেখে নিচ্ছে চারপাশ।

'ওদিকেই নিচতলায় কারাগার,' সামনে দেখাল রানা।

'ওখানে হয়তো নেই,' বলল মউরোস, 'এসো আলাদা হয়ে যাই।'

'একজন যাব ওপরে, অন্যজন নিচে? খানসারির লোক বসে থাকবে না।'

'জঘন্য এক অপরাধী, সে তো আর কোনও সেনাপতি নয়। ব্যক্তিগত কোনও সেনাবাহিনীও নেই তার।'

যে দরজা দেখিয়ে দিয়েছে রানা, ওখান থেকে ছিটকে উঠানে বেরোল এমপি-ফাইভ সাবমেশিনগান হাতে পাঁচজন লোক।

'সেনাবাহিনী নেই কে বলেছে?' উযি সাবমেশিনগান থেকে একপশলা গুলি পাঠাল রানা। গাছের ভেতর দিয়ে এমথ্রি রাইফেলের ব্রাশ ফায়ার করল মউরোস। ওদের গুলি খেয়ে ধুপ-ধাপ মেঝেতে পড়ল দু'গার্ড। পেছনের দেয়ালে ছিটকে লেগেছে রক্ত। অন্য তিনজন আলাদা হয়ে গেল। তাদের দু'জন ছুটল উঠান পেরিয়ে রানাদের উল্টোদিকের স্ট্যাণ্ড লক্ষ্য করে। একই সময়ে রানা-মউরোসের স্ট্যাণ্ডের ওদিকে ঝাঁপ দিল তৃতীয়জন।

ঝামেলা থেকে বেরিয়ে যেতে মাথা খাটাচ্ছে রানা। একটু দূরেই উঠানের পশ্চিম দেয়ালে মিনার করা কয়েকটা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। ওদিক দিয়ে দুর্গের মূল দালানে ঢুকতে পারবে ওরা।

কিন্তু সেজন্য ঝেড়ে দৌড় দিয়ে পেরোতে হবে কমপক্ষে চল্লিশ ফুট। মাঝে কোনও কাভার থাকবে না।

'এরা আটকে দিলে গেছি! নিচের গেট থেকে এসে পেছন থেকে আমাদেরকে খুন করবে গার্ডরা!'

'কী করবে ভাব...' কথা থামিয়ে দিল মউরোস। গুলি লেগেছে ওর মাথার একটু ওপরে একঝাড় ফুলে, ছিটিয়ে গেল নানান রঙা পাপড়ি। নালিশের সুরে বলল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি, 'রানা? হারামজাদাদেরকে কে বলেছে ফুল ছিটিয়ে দিতে? দোস্ত, ফুল চাই না, এদিকের যে-কোনও জানালাই সই!'

সাবধানে ওদিকে উঁকি দিল রানা। দক্ষিণ দেয়ালে মাত্র দশ ফুট দূরেই বুক-সমান দুটো জানালা, চওড়ায় বড়জোর দু'ফুট। 'বড় বেশি সরু,' বলেই খানসারিরির গার্ডদের উদ্দেশে পাল্টা গুলি করল রানা। এরই ভেতর বুঝে গেছে, একটা প্যাটার্ন নিয়ে গুলি করছে শত্রু। পরপর তিনটে গুলি করে লুকিয়ে পড়ছে। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও...

আরও এক সেকেণ্ড পেরোতে দিয়ে কাভার নেয়া জায়গা থেকে সরে গেল রানা। ঠিকই ধরেছে। উঠানের আরেক দিকে এক লোক লাফিয়ে উঠেই অস্ত্র তাক করেছে ওদের দিকে। রানার উযির মাত্র একটা গুলি মুখে নিয়ে চিৎপাত হয়ে পৃথিবী ত্যাগ করল গার্ড। 'একজন গেল। আরেকজনকে বিদায় করলে পরস্পরকে কাভার দিয়ে যেতে পারব ওদিকের দরজার কাছে।'

আরও কিছু ফুল ঝরে পড়ল রানা-মউরোসের মাথার ওপর। খপ্ করে একটা পাপড়ি ধরেছে মউরোস, শুঁকে নিয়ে বিরক্ত হলো। পাপড়ির সঙ্গে মিশে আছে গানপাউডারের কটু গন্ধ। 'কপাল ভাল যে ওদের কাছে গ্রেনেড নেই।'

'ঠিক, আর কপাল মন্দ যে আমাদের কাছেও নেই! নইলে...' ফার্সিতে সতর্ক করল কে যেন কাকে। 'তোমার

মুখটাই পচা, জ্যা! ভাগো! গ্রেনেড ফেলছে!'

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে গুলি পাঠাল ওরা, পরক্ষণে তাড়া খাওয়া লেজ কাটা শেয়ালের মত ছুটল জানালা লক্ষ্য করে। উঠানের আরেক দিক থেকে উড়ে এল গ্রেনেড, গাছে ভরা নরম মাটিতে 'থুপ্' আওয়াজে পড়ল।

দৌড়াতে দৌড়াতে জানালার কাঁচে গুলি করেই পরক্ষণে সরু ফাঁক দিয়ে ঝাঁপ দিল রানা। ওর পাশের জানালা দিয়ে উড়ে আসছে মউরোস। কাঁচের বৃষ্টির ভয়ে নয়, গ্রেনেড বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে অস্ত্র ফেলে দু'হাতে ঢেকে ফেলেছে মুখ। নরম মাটিতে পড়েই মার্বেল স্ট্র্যাণ্ডের মস্ত এক টুকরো উড়িয়ে দিল গ্রেনেড, অন্তত তিরিশ ফুট ওপরে ছিটকে উঠল মাটি ও গাছ। জানালায় রয়ে যাওয়া ক্ষুরের মত ধারালো ভাঙা কাঁচ ঝরঝর করে ঝরল রানা ও মউরোসের ওপর।

গায়ের ওপর থেকে টুকরো কাঁচ সরিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা। এই ঘর কোনও গ্যালারি, সাজিয়ে রেখেছে একের পর এক পাথরের মূর্তি দিয়ে। মাথার পেছনে কেটে গেছে রানার, এ ছাড়া আর কোনও ব্যথা নেই। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছ তো?'

'আগে এখনকার চেয়ে বেশি সুখী ছিলাম,' গাল কুঁচকে ফেলেছে মউরোস। বাম কনুই উঁচু করে দেখাল, কাঁচে কেটে গেছে মাংসপেশি।

'লড়তে পারবে?'

'মরার আগ পর্যন্ত!' জিথ্রি রাইফেল তুলে নিল সে।

ওর উযিটা খুঁজছে রানা। নেই। জানালার চৌকাঠে লেগে পড়েছে ওপাশে। ওয়াইল্ডি বের করে জানালার পাশ থেকে বাইরে উঁকি দিল রানা। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে ছুটছে দুই গার্ড। একবার দালানে ঢুকলে বাধা দেবে ওদেরকে।

ওয়াইল্ডির একটা গুলি উড়িয়ে দিল ডানদিকের গার্ডের নিচের চোয়াল। ধড়াস করে রাস্তায় পড়ে জবাই করা গরুর মত ছটফট করছে সে। দু'বার গুলি করে দ্বিতীয় গার্ডের বুক ফুটো করল মউরোস। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর ওপর পড়ল মৃত গার্ড। ঝনঝন করে ভাঙল কাঁচ।

'চলো!' তাড়া দিল রানা।

খুঁজে নিতে হবে লাবনী আর সেসিলিকে।

ওরা গ্যালারি ছেড়ে করিডোরে বেরোতেই জ্বলে উঠল বাতি। পরক্ষণে নিভে গিয়ে আবারও জ্বলল।

দুর্গ ছেড়ে পালাতে চায় আরাশ খানসারি, ভাল করেই বুঝছে সেসিলি ডেনিয়েলসন। মেইন গেটে হামলা করেছে রানারা, কাজেই খানসারি ছুটবে হেলিপ্যাডে। উঁচু জায়গাটা দুর্গের উত্তরদিকের ছাতে।

সেসিলি মনে করতে চাইল, কোন্ পথে হেলিপ্যাড থেকে ওকে আনা হয়েছে দুর্গের ভেতরে। গারদ থেকে একতলা ওপরে খানসারির অফিস। ওদিকেই ডানদিকে ছাতে ওঠার সিঁড়ি।

বিদ্যুৎ চালু করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে খানসারির এক গার্ড, ওপরের করিডোরে পা রেখেই দেখল সামনে তার বস্, সঙ্গে অচেনা এক বন্দি মেয়ে। আজ দুর্গে যেন সুন্দরী সব মেয়েদের মেলা বসেছে!

এই মেয়ের দীর্ঘ চুল কুচকুচে কালো। সোনালি চুলের ওই মেয়েটার চেয়ে একটু খাটো। দেখতে খুব মায়াময়ী, কিন্তু এর উচিত গোসল করা। গা থেকে আসছে...

বাজে গন্ধে নাক কুঁচকে গেছে গার্ডের।

'একে নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল খানসারি।

লাবনীর বামকাঁধ খামচে ধরে সামনে বাড়ল গার্ড, অন্যহাতে

এমপি-ফাইভ-এর নল ঠেসে ধরেছে বন্দিনীর পিঠে।

'সেসিলি কোথায়?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইল লাবনী, 'কী করেছ ওর?'

দৌড়ে চলেছে খানসারি, নাকে-মুখে রক্তের দাগ, একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লাবনীকে। 'কী করেছি ওই হারামজাদীর? বরং জিজ্ঞেস করো ওই শালী আমার কী করেছে! আগে যদি বুঝতাম এত ভয়ঙ্কর, হাত-পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে রাখতাম!'

লাবনী কৌতূহলী, কিন্তু সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তীক্ষ্ণ বাঁক নিল করিডোর। একপাশে বড় এক দরজা দিয়ে দেখা গেল পাহাড়। একটু দূরের ছাতে হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার, এরই ভেতর বন-বন করে ঘুরতে শুরু করেছে রোটর।

থেমে দাঁড়িয়ে ফার্সিতে নির্দেশ দিল খানসারি।

পেছনে ফেলে আসা করিডোর দেখল গার্ড।

শত্রু এদিকে এলেই...

লাবনীকে বলল খানসারি, 'তোমার বন্ধুদের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবে!'

'যাতে তোমার লোক গুলি করে মারতে পারে আমাদেরকে?'

ছোরাধরা হাত তুলে লাবনীর চিবুকে মৃদু খোঁচা দিল খানসারি। ভীষণ ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেছে লাবনী। ওকে বলল কবর-লুটেরা, 'কোনও চালাকি না, বন্ধুরা এলেই হাতের ইশারা করবে। একটা কথা বললেই খুন হয়ে যাবে আমার গার্ডের হাতে। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি,' চট্ করে সাবমেশিনগানধারী গার্ডকে দেখল লাবনী। একবার মাথা দুলিয়ে ঘুরে রওনা হয়ে গেল খানসারি।

পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'আরাশ খানসারি, আর্টিফ্যাক্ট কোথায়?'

থলিতে চাপড় দিল কবর-লুটেরা। 'খারাপ লাগছে যে এমন

ঐতিহাসিক জিনিসটা নষ্ট হবে। কিন্তু মিস্টার ডোনাটি লুক্কার পনেরো মিলিয়ন ডলারের কথাও তো ভাবতে হবে!'

'এদিকে সেসিলির জন্যে পাচ্ছ আরও দশ মিলিয়ন,' আপত্তির সুরে বলল লাবনী।

কাঁধ ঝাঁকাল খানসারি। 'মানুষ সেধে দিলে কী-ই আর করার আছে? আজকের দিনটা ব্যবসার জন্যে ভাল।' ভুরু কুঁচকে ফেলল সে। গুলির আওয়াজ আসছে দূরের করিডোর থেকে। 'কিন্তু বাড়িতে আজ খারাপ দিন। পরে বেশকিছু টাকা খরচ হবে ডেকোরেশনের জন্যে। তাতে কী? নিজের শেষকৃত্যের জন্যে যে পয়সা দিতে হচ্ছে না, এ-ই বেশি! গুড বাই, ডক্টর আলম!' দ্রুত পায়ে হেলিপ্যাডের দিকে চলল সে।

অস্ত্রের মুখে লাবনীকে করিডোরের বাঁকের সামনে দাঁড়াতে ইশারা করল গার্ড। ওদিক থেকে কেউ এলেই আগে দেখবে মেয়েটাকে, ওকে নয়।

'শুনছ?' রানার পাশে ছুটছে মউরোস।

'হুঁ, কপ্টার।' জোরালো শব্দ তুলছে জেট রেঞ্জার টারবাইন ইঞ্জিন।

'কপালটা দেখো! আবারও হেলিকপ্টার জুটে গেছে এই পোড়া কপালে!' আফসোস করল মউরোস।

'বোধহয় সামনের বাঁকের ওদিকেই,' বলল রানা।

টি-জাংশনের মত করিডোরে পৌঁছে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল সেসিলি। একটু দুরেই হেলিপ্যাড। শক্ত হাতে এমপি-ফাইভ তুলে ধরল ও...

তখনই বাঁক ঘুরে এল রানা ও মউরোস। ওদের হাতের অস্ত্র সরাসরি তাক করা সেসিলির বুকে!

'ক্রাইস্ট!' আঁৎকে উঠল সেসিলি।
আরেকটু হলে ট্রিগার টিপে দিত মউরোস।
ওয়াইল্ডির নল নিচু করল রানা।
'ডক্টর আলম কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।
'লুকিয়ে থাকার কথা,' জবাব দিল রানা, 'তুমি ঠিক আছ?'
'হ্যাঁ।'
'খানসারি বা ওই আর্টিফ্যাক্ট?'
'পালিয়ে যাচ্ছে ওটা নিয়ে।' মুখ কালো করল সেসিলি।
'তার মানে চাইছে কপ্টারে উঠতে?' মাথা নাড়ল মউরোস।
'হ্যাঁ, চলুন, বাধা দিতে হবে!'
সামনের করিডোর লক্ষ্য করে ঝড়ের গতি তুলে ছুটল তিনজন। সামনে রানা বলল, 'পরের জাংশনের বাঁক পেরিয়ে গেলেই হেলিপ্যাড!'
'ওর সঙ্গে কতজন গার্ড?' জানতে চাইল মউরোস।
'জানি না, তবে ওর দুই বডিগার্ড মরেছে আমার হাতে,' জানাল সেসিলি।
চট্ করে একবার মেয়েটাকে দেখে নিল রানা। করিডোরের সামনের বাঁকে দেখল লাবনীকে।
থমকে গেল ওরা। মৃদু ধমক দিল রানা, 'লাবনী, তোমাকে না বলেছি লুকিয়ে থাকতে?'
করিডোরের বাঁকের ওপাশ থেকে অস্ত্র নেড়ে লাবনীকে বুঝিয়ে দিল গার্ড, এগোতে হবে।
এক সেকেণ্ড পর মাথার ওপর একহাত তুলল লাবনী।
ওদিকে যেতে গিয়েও থামল সেসিলি, শক্ত হাতে কবজি ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে রানা। 'একমিনিট! পিছিয়ে যাও!'
হাতছানিতে ডাকছে লাবনী, কিন্তু ওর ভাঁজ করা বুড়ো আঙুলটা টিপে রাখা আছে হাতের তালুতে।

পেয়ে গেছে রানা জরুরি সঙ্কেত।

পাঁচ সেকেণ্ডে বাঁকের কাছে পৌঁছে গেল রানা, একেবারে শেষ সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঝেতে, হাতে উদ্যত ওয়াইল্ডি।

একই সময়ে এমপি-ফাইভ হাতে এদিকে বেরোল গার্ড, এক সেকেণ্ড পর বুঝল, টার্গেট মেঝেতে, হাতে প্রকাণ্ড এক পিস্তল!

তিনটে গুলি করল রানা।

গার্ডের হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র, বুকে ম্যাগনাম বুলেটের মারাত্মক ক্ষত নিয়ে জানালার কাঁচ ভেঙে নিচের হেলিপ্যাডে গিয়ে পড়ল সে। জানালার কাঁচ নেই বলে অনেক জোরালো শোনাল জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

'তোমার কিছু হয়নি তো?' লাবনীকে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'না, ভাল আছি।'

অবাক করে দিয়ে ছুটে এসে লাবনীকে জড়িয়ে ধরল সেসিলি। 'থ্যাঙ্ক গড, তুমি ভাল আছ!' সামান্য পিছিয়ে গেল, কুঁচকে গেছে নাক। 'গন্ধটা কীসের, বলো তো?'

'কীসের আবার,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল লাবনী। 'সরু সুয়েরেজ পাইপ বেয়ে নিচ থেকে উঠে আসতে হয়েছে আমার। এমন সময় ওপরে কে যেন টয়লেট করে ফ্লাশ করেছে। সব এসে পড়েছে আমার গায়ে!' লাবনী বুঝতে পারল না, কেন কথাটা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সেসিলি। বলল, 'সেই লোকটাকে দোষ দিই না, দোষটা ওর!' ভয়ানকভাবে ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল লাবনী।

নিরীহ চেহারা করে জানালা দিয়ে হেলিপ্যাড দেখল রানা। সাঁই-সাঁই ঘুরছে রোটর। 'আমাদের আর্টিফ্যাক্ট খানসারির কাছে, হেলিকপ্টারে উঠেছে লোকটা!'

প্যাড ছেড়ে ভাসছে যান্ত্রিক ফড়িং।

'ইঞ্জিনে গুলি করে নামিয়ে ফেলা যায় না?' জানতে চাইল

সেসিলি। রানার পাশে এসে থেমেছে।

জবাবে ওর হাত থেকে সাবমেশিনগান নিয়ে হেলিকপ্টারের ককপিট লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করল রানা। একরাশ গুলির আঘাতে চুরমার হলো পাইলটের দরজা। সামনের কাঁচে ছিটকে লাগল লাল রক্ত। সিটে কাত হয়ে পড়েছে মৃত পাইলট। তার হাত থেকে কন্ট্রোল ছুটে যেতেই নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ঘুরতে শুরু করল যান্ত্রিক ফড়িং। জানালার দিকে তেড়ে এল ওটার লেজ। প্রকাণ্ড কোনও বৈদ্যুতিক করাতের মত বন-বন করে ঘুরছে ভার্টিকাল রোটর।

'বসে পড়ো!' বলেই দু'হাতে লাবনী ও সেসিলির কাঁধে চাপ তৈরি করল রানা, নিজেও বসে পড়েছে মেঝেতে।

চোখে ভীষণ ভয় নিয়ে দেখছে হতবাক মউরোস— বাইরে জানালার কাছে ওর যম! এক সেকেণ্ড পর মস্ত এক লাফে পেছনের করিডোরে গিয়ে পড়ল ও। তখনই জানালার চারপাশের পাথুরে দেয়ালে লাগল ঘুরন্ত রিয়ার রোটর, পরক্ষণে নানানদিকে ছিটকে গেল ধাতব ভাঙা টুকরো। এক ফুটি একটা টুকরো ঘ্যাঁচ করে গেঁথে গেল মউরোসের মাথার তিন ইঞ্চি ওপরের দেয়ালে। তাতে মুখ কালো করে বিড়বিড় করল মউরোস: 'শালার অভিশপ্ত যন্ত্র, ঠিকই চিনে নিয়েছে আমাকে!'

টেইল রোটর ভাঙতেই উদ্দাম বেলিডান্সারের মত নাচছে হেলিকপ্টার। বিকট করুণ এক আর্তনাদ ছেড়ে সামনের ডুপ্লিকেট কন্ট্রোল চেপে ধরেছে খানসারি। কিন্তু রিয়ার রোটর নেই বলে নিয়ন্ত্রণে এল না পাগলা ফড়িং! দুর্গের সিমেণ্ট ও পাথরের দেয়ালে লেগে খান-খান হলো মেইন রোটর। একদিকে একেবারে কাত হয়ে প্রচণ্ড ধুম আওয়াজ তুলে হেলিপ্যাডে নামল যান্ত্রিক দানব। ভেঙে গেছে স্কিড দুটো।

লাবনীর ওপর পড়েছে রানা, নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলেছে ওকে। কয়েক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা?'

'আমি বোধহয় মারা গেছি,' গুঙিয়ে উঠল লাবনী।

'তা হলে ঠিকই আছ,' নাক কুঁচকে বলল রানা, 'আসলে মারা পড়েছি আমি। জরুরি ভিত্তিতে গোসল করতে হবে!' ডানে মুখ ফিরিয়ে সেসিলিকে দেখল রানা। 'তুমি? ঠিক আছ?'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'আর্টিফ্যাক্ট! ওটা উদ্ধার করতে হবে!' হেলিপ্যাডে নামার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে।

'এখনও বিপদ হতে পারে!' সতর্ক করল রানা।

'হায় রে, এভাবেই মারা পড়লাম?' দেয়ালে গেঁথে থাকা রোটরের টুকরো দেখছে মউরোস। 'জাহান্নামের হেলিকপ্টারের কারণে!'

'তুমি কিন্তু এখনও মরোনি, জ্যাঁ,' তাড়া দিল রানা। 'ওঠো! কাজ আছে!' নিজে টেনে তুলল লাবনীকে। 'তুমি এখানেই থাকবে। বাইরেটা নিরাপদ না।' ঝড়ের বেগ তুলে সেসিলির পিছু নিল রানা। ওর পেছনে দোয়েলের পুচ্ছের মত লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে মউরোস।

আগুন ধরলে বিস্ফোরিত হবে কপ্টার, এখন পড়ে আছে পায়ের নিচে চেপ্টে দেয়া তেলাপোকার মত। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ফিউয়েলের কড়া গন্ধ। এখনও চলছে ইঞ্জিন। তুবড়ে যাওয়া বডির ছাতে পাঁই পাঁই ঘুরছে ভাঙা, খাটো রোটর। আপাতত ফড়িং আছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাংগেলে, ফাটল ধরা ডিমের মত ভচকে গেছে নাক। ওটার কাছে পৌঁছে গেছে সেসিলি, ঘুরন্ত রোটরের তলা দিয়ে ঢুকে পৌঁছে গেল দরজায়।

'একটু অপেক্ষা করো, সেসিলি!' পেছন থেকে ডাকল রানা, ঝড়ের বেগে নামছে সিঁড়ি বেয়ে। 'সেসিলি! সাবধান!'

'যেভাবেই হোক ওই আর্টিফ্যাক্ট চাই!' চেঁচাল সেসিলি। দু'হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে খুলতে চাইছে দরজা। কাঁচের ওদিকে দেখছে সিটে পড়ে আছে খানসারি, বোধহয় অজ্ঞান। রক্ত নামছে কপাল ও গাল কেটে।

"ক্লিক!" আওয়াজ তুলল হ্যাণ্ডেল। দরজা খুলেই ভেতরে উঠতে গেল সেসিলি, আর তখনই ঝট্ করে সোজা হয়ে বসেই ডানহাতের করাতের মত ছোরা চালাল কবর-লুটেরা। চিরে গেল সেসিলির কোট ও শার্ট, সাদা কাপড়ে ছলকে পড়ল তাজা রক্ত। ব্যথা পেয়ে একহাতে চেপে ধরেছে ক্ষত।

ককপিট ছেড়ে হুড়মুড় করে নামতে চাইল খানসারি। তার ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল সেসিলি। সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর চেপে বসল ডাকাত। হাতের ছোরা ঠেসে ধরেছে সেসিলির গলায়। তার আরেক হাতে এমইলেভেন সাবমেশিনগান। কর্কশ স্বরে রানাকে নির্দেশ দিল, 'অস্ত্র ফেলো, নইলে মরবে ফর্সা এই মেয়েলোক!'

রানা বুঝল, খানসারির মগজে গুলি করেও বাঁচাতে পারবে না সেসিলিকে। লাশ হুমড়ি খেয়ে পড়লে গলা চিরে নামবে তীক্ষ্ণধার ছোরা। উপায় না দেখে ছাতে ওয়াইল্ডি ফেলল রানা। একই কাজ করল মউরোস, হাত থেকে ছেড়ে দিল রাইফেল।

'গুড!' সেসিলির গলায় ছোরা রেখে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল খানসারি, অন্যহাতের সাবমেশিনগান কাভার করছে রানা ও মউরোসকে। 'চাই না বেটি মরুক। কিন্তু তোমাদের...'

গুড়ুম!

ফিউজেলাজের পাতলা শরীরে বিঁধেছে বুলেট। সবাই চোখ তুলে দেখল ভাঙা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে লাবনী, হাতে মৃত গার্ডের এমপি-ফাইভ। 'ওকে ছেড়ে দাও, খানসারি!' কাঁপা সুরে চিৎকার করল মেয়েটা।

'মিস আলম!' চট্ করে বলল মউরোস, 'গুলি করবেন না! বদমাস-শালা লাশ হলে ওর ছোরা চিরে দেবে মেয়েটার গলা!'

'ওকে ছেড়ে দে, শয়তান!'

'আগে কখনও গুলি করোনি, তাই না?' টিটকারির সুরে বলল খানসারি, 'বগলে চেপে অস্ত্র ধরার ভঙ্গি দেখেই বুঝেছি, তুমি আনাড়ি! ভেবেছ, আমি ওকে খুন করার আগেই মারতে পারবে আমাকে?'

'আমি তোর দিকে তাক করিনি,' জবাবে বলল লাবনী।

ভুরু কপালে তুলল মউরোস। দ্বিধা নিয়ে বলল, 'তবে কি মিস ডেনিয়েলসনের দিকেই...'

'তো কোথায় গুলি করেছিলে?' বাঁকা সুরে বলল খানসারি।

'গ্যাস ট্যাঙ্কের দিকে। ওটাতে আগুন ধরে গেছে।'

বিধ্বস্ত এয়ারক্রাফটের দিকে ঘুরে তাকাল সবাই। ইঞ্জিনের কাউলিং থেকে বেরোচ্ছে নোংরা কালো ধোঁয়া, ঘুরন্ত রোটর ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটা চারপাশে।

নতুন এই বিপদ বুঝে গাল কুঁচকে ফেলল খানসারি।

যখন তখন বিস্ফোরিত হবে গোটা হেলিকপ্টার...

এই সুযোগে ঝট্ করে খানসারির হাত ধরেই ছোরা সরিয়ে দিল সেসিলি। খোঁচা খেয়ে কেটে গেল ত্বক, কিন্তু তা সামান্য ছড়ে যাওয়া মাত্র। ডানহাতে খানসারির চোয়ালে বসাল কারাটে চপ। বেকায়দাভাবে পড়ে আছে বলে হাতে জোর নেই, তবুও ওই মারে লোকটার নিচের চোয়াল খটাৎ করে লাগল ওপরের চোয়ালে, লেগে গেল দাঁত কপাটি দাঁতে জিভ কেটে গিয়ে ঠোঁট গড়িয়ে নামল রক্ত। ব্যথা-ভয়ে অস্ফুট আওয়াজ করল লোকটা, পিছিয়ে গেছে নিজের অজান্তেই। এই সুযোগে গড়িয়ে সরে গেল সেসিলি। আর তখনই খানসারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

'অরিচালকাম সরিয়ে নাও!' কবর-লুটেরার সঙ্গে ধস্তাধস্তি

করছে রানা। ওর লক্ষ্য লোকটার ডানহাতের ছোরা সরিয়ে দেয়া। দেখে যা মনে হয়, তার তুলনায় অনেক শক্তিশালী লোক খানসারি, চর্বির নিচে এখনও মাংসপেশি শক্ত। তার একহাতে মারাত্মক ছোরা, অপর হাতে সাবমেশিনগান; রানার হাত খালি!

ধড়মড় করে মেঝে ছেড়ে উঠল সেসিলি, ঘুরন্ত রোটর এড়াতে নিচু করে রেখেছে মাথা। চলে গেল খোলা ককপিটের দরজায়।

'না, সেসিলি!' গলা ফাটাল লাবনী, 'ওটা ওর ব্যাগে!'

ওই কথা শুনে খানসারির কাঁধে থলি খেয়াল করল রানা। আর এ সুযোগে বামহাত ছুটিয়ে নিয়েই ট্রিগার টিপে দিল খানসারি। ছোট ইনগ্রামের নল থেকে উগলে বেরোল লাল আগুন। এতই কাছ দিয়ে গেল বুলেট, বুক ও গলার ত্বক জ্বলে উঠল রানার। বন্ধুর সাহায্যে ছুটে আসছে মউরোস। কিন্তু দিক পাল্টে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল সেসিলিকে। খানসারির আরেকটা গুলি গিয়ে গেঁথেছে হেলিকপ্টারের গায়ে।

শত্রু শেষ করতে অস্ত্র ঘোরাল খানসারি। এবার শেষ করবে মাসুদ রানাকে!

ঝড়ের বেগে ভাবছে রানা, কী করবে। পরক্ষণে ওর কপাল ঠাস্ করে নামল ইরানি কসাইয়ের মুখে। একেবারে চ্যাপ্টা হলো লোকটার নাক। দুই ফুটো দিয়ে গল গল করে বেরোল রক্ত।

ততক্ষণে হেলিকপ্টারের কাউলিং থেকে বেরোচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। ইঞ্জিনের শব্দের ওপর দিয়ে এল লকলকে আগুনের হিস-হিস আওয়াজ!

খানসারির কবজি আটকে রেখেছে রানা, একটানে তাকে দাঁড় করাল। ছুরির তোয়াক্কা না করে হাত বাড়াল ইনগ্রামের দিকে।

ওটাকে রানার নাগালের বাইরে রাখার জন্যে হাত উঁচু করল

খানসারি। পরমুহূর্তে ইনগ্রাম সাবমেশিনগানসহ হাতটা ছিটকে পড়ল দশ হাত দূরে। ভাঙা, ঘুরন্ত রোটরে কাটা পড়েছে ওটা।

ভীষণ অবিশ্বাস নিয়ে কাটা হাতটা দেখল খানসারি। বাইসেপ বেয়ে কুলকুল করে নামছে রক্ত। আবারও তাকাল রানার দিকে। তখনই তার চোয়ালে পড়ল বাঙালি গুপ্তচরের প্রচণ্ড এক ঘুষি। ভারসাম্য রাখতে না পেরে ককপিটের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে পড়ল লোকটা।

আগেই রক্তাক্ত কাঁধ থেকে থলি খুলে নিয়েছে রানা।

খানসারির ভারী ওজনের কারণে আরেক দিকে কাত হলো হেলিকপ্টার। এসব দেখার সময় নেই রানার, মউরোসের পেছনে ছুটছে লেজ তুলে। এখন চাই নিরাপদ কোনও কাভার। ওর পাশেই প্রায় উড়ছে সেসিলি।

হঠাৎ ইঞ্জিনের কাউলিঙে লকলক করে উঠল নীল-লাল-কমলা শিখা, চেটে দিল ভাঙা ফিউজেলাজ। কাত হয়ে কপ্টার শুয়ে পড়তেই কংক্রিটের মেঝেতে গাঁথল রোটর, পরক্ষণে ছিটকে গেল নানানদিকে। মরা গুবরে পোকার মত ঘাড় গুঁজে আছে বিধ্বস্ত যন্ত্রদানব, ফেটে যাওয়া ট্যাঙ্কের তেল গড়িয়ে গেল জ্বলন্ত ইঞ্জিনে...

গায়ে আগুন ধরতেই বিকট চিৎকার ছাড়ল খানসারি, কিন্তু চুপ হয়ে গেল হেলিকপ্টার বিস্ফোরণের পর। মিনার করা সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে পড়েছে মউরোস ও সেসিলি, ওদের কয়েক ফুট পেছনে রানা, একেবারে শেষ সময়ে ঝাঁপ দিয়েছে ও।

নানানদিকে ছিটিয়ে গেল ধাতব আবর্জনা, বেশিরভাগ আঘাত সহ্য করেছে ফিউজেলাজ। বড় টুকরো পড়েছে রানার বেশ কিছুটা পেছনে। অবশ্য ওর পিঠ ও পায়ের পেছনে বিঁধল ছিটকে আসা ছোট কিছু ধাতব টুকরো। তীব্র ব্যথায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ফেলেছে ও।

'রানা!' পাগলের মত ওর দিকে ছুটে এল মউরোস। 'রানা!'

'ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ো না!' ব্যথা সহ্য করে ধমক দিল রানা একহাতে ধরেছে আহত পা। 'মনে হচ্ছে পেছনের পায়ে লাথি মেরেছে ঘোড়া!'

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল লাবনী, চোখ-মুখ ফ্যাকাসে। 'রানা, তুমি ঠিক আছ তো? সেসিলি?'

কৃতজ্ঞ চোখে লাবনীকে দেখল সেসিলি। 'আমি ঠিক আছি।' আরেক দৌড়ে ওরা চলে এল রানার পাশে।

'রানা!' রানার পাশে বসে পড়ল উদ্বিগ্ন লাবনী। 'আরেকটু হলে তো মরেই যাচ্ছিলে!'

'মরার মত লোক বলে আমাকে মনে হলো তোমার?' দুঃখিত চেহারা করল রানা।

'তুমি আর্টিফ্যাক্ট পেয়েছ?' জানতে চাইল সেসিলি।

জ্বলন্ত হেলিকপ্টারের দিকে চেয়ে আছে মউরোস। বিড়বিড় করে বলল, 'কোন্ শালা যে তৈরি করেছিল! ওই জিনিস পাঁচ মিনিটের ভেতর দু'বার আমাকে খুন করতে চেয়েছে! শয়তানের বাহন!'

'জ্যাঁ, মুখ বুজে রাখো, নইলে এখান থেকে দূর হও,' উঠে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গিয়ে মেঝে থেকে ওয়াইল্ডি তুলল রানা।

'ওই আর্টিফ্যাক্ট?' আবারও জানতে চাইল সেসিলি

ওর হাতে থলি ধরিয়ে দিল রানা। 'এবার সন্তুষ্ট হও।'

ব্যাগ খুলে ধাতব জিনিসটা বের করে দেখল সেসিলি। আগুনের শিখা পড়ে ঝিলিক মারছে ওটা। বিড়বিড় করে বলল সে, 'হ্যাঁ, এবার আমরা পেয়ে গেলাম আটলান্টিসের পথ!'

ওর হাত থেকে জিনিসটা নিল লাবনী, মনোযোগ দিয়েছে সিম্বলের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'মন খারাপ করিয়ে দিতে চাই না, কিন্তু আটলান্টিসের খোঁজে যাওয়ার আগে

বেরোতে হবে ইরান থেকে।'

'সেটা খুব কঠিন হবে না,' বলল রানা। 'দরকারী একটা জিনিস দেখে এসেছি।'

এরই ভেতর রানা বুঝে গেছে, খানসারির বেশিরভাগ লোক শেষ, অথবা তারা ঠিক করেছে, মরুক শালার মনিব, জান হাতে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ঢের জরুরি। নিচের উঠানে নেমে আসার পথে একবারও বাধার মুখে পড়ল না ওরা।

দুর্গের উত্তরদিকে প্রকাণ্ড এক দরজা। কবাট টেনে খুলল রানা। 'খানসারির ট্যাক্সি সার্ভিস।' গ্যারাজে দামি সব গাড়ি। 'সেসিলির কালেকশনের মত না হলেও খুব খারাপও নয়। কীসে চেপে এই দেশ ছাড়তে চাও?'

'ফেরারি নিয়ে বেশিদূরে যেতে পারব না,' বলল মউরোস। লোভী চোখে দেখছে হলদে এফ৩৫৫। 'এদিকের রাস্তায় চলবে না। তা ছাড়া, চোখে পড়ে যাব।'

'হামার নিয়ে রওনা হলেও সবাই মনে রাখবে,' বিরক্ত চোখে গাঢ় সবুজ এইচ৩ দেখছে সেসিলি।

'লাবনী, তোমার কোনও প্রিফারেন্স?' জানতে চাইল রানা।

'নেই আমি শুধু চাই গোসল করতে!'

'আহা, বেচারি!' দুঃখিত চেহারা করল মউরোস।

'চুপ করুন!' ধমক দিল লাবনী। 'লজ্জা করে না একটা অসহায় মেয়েকে এভাবে বিপদে ফেলে...'

ধমকের হাত থেকে বন্ধুকে রক্ষা করল রানা, 'এমন গাড়ি চাই, যেটা চট্ করে আমাদেরকে সরিয়ে নেবে দূরে।'

'তো গাড়িটা কী হওয়া উচিত?' জানতে চাইল মউরোস

চকচক করছে রানার চোখ, প্রশংসা নিয়ে দেখছে একটা জিপগাড়ি। 'স্টাইলের সঙ্গে যাওয়া যাবে। কে জানে, আসলে হয়তো অত খারাপ লোক ছিল না আরাশ খানসারি।'

কয়েক মিনিট পর আঁকাবাঁকা, সরু এক পথে ছুটল ওরা রুপালি রেঞ্জ রোভারে চেপে। গম্ভীর গর্জন তুলছে ভি-৮ ইঞ্জিন। আগামী একঘণ্টার ভেতর পাহাড়ি পথ পেরিয়ে পৌঁছবে ইস্পাহান শহরে।

এগারো

গতকাল ইরান ত্যাগ করে রানা, লাবনী, মউরোস ও সেসিলি আপাতত আছে প্যারিসে।

বিলাসবহুল এক হোটেলের পেন্টহাউস সুইটের ব্যালকনিতে রানার সঙ্গে বসে অতিব্যস্ত শহর দেখছে লাবনী। খুব কাছেই ল্যাণ্ডমার্ক নটর-ড্যাম, আর দূরে রাতের আকাশে ফ্লাড লাইটের আলোয় জ্বলজ্বল করছে আইফেল টাওয়ার, মুগ্ধকর দৃশ্য।

শহর ঘুরে দেখার সময় লাবনীর হয়নি, জরুরি কাজ চেপে গেছে কাঁধে। লাবনীর মতই একটু আগে ক্লান্ত হয়ে ব্যালকনিতে এসে বসেছে রানাও। কারও মুখে কথা নেই।

কিছুক্ষণ পর সুইটের দরজায় 'ঠক-ঠক!' শব্দ হতেই উঠে গিয়ে কবাট খুলল রানা, অন্য হাতে ওয়াইল্ডি। তৈরি বিপদের জন্যে।

রানাকে পাশ কাটিয়ে ব্যালকনিতে এল সেসিলি। 'লাবনী, এখন সুস্থ লাগছে?'

'জানি না,' দ্বিধা নিয়ে বলল লাবনী। একবার দেখল সামনের টেবিলে রাখা আটলান্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট। 'বসো।'

ওর পাশের চেয়ারে বসল সেসিলি। 'বুঝলে কিছু?'

দরজা বন্ধ করে এসে আগের চেয়ার দখল করল রানা। ডাঁটিয়াল সেসিলির সঙ্গে ওর সম্পর্ক এখনও কিছুটা আড়ষ্ট।

মেয়েটার দিকে আর্টিফ্যাক্ট ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস বাড়িয়ে দিল লাবনী। 'রানা আর আমি সাধ্যমত করেছি, কিন্তু তা বোধহয় যথেষ্ট নয়। এখনও জানি না বেশকিছু সিম্বলের মানে। ...তোমার বাবা কি অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে?'

অরিচালকাম ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে আস্তে করে মাথা দোলাল সেসিলি, মৃদু হাসছে। 'বাবাকে নিয়ে ভেবো না। প্রয়োজনে আরও সময় নাও, বিন্দুমাত্র বিরক্ত হবেন না তিনি।'

'তাই?' বলল লাবনী, 'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু নার্ভাস না হয়ে পারছি না।'

'নার্ভাস? কেন? আটলান্টিস খুঁজতে গিয়ে যতটুকু এগোতে পেরেছে অ্যাথেনিয়ানরা, তার চেয়ে অনেক কাছে পৌঁছে গেছ তুমি।'

'ভয় লাগছে। ভাবতে পারো, কত বড় বিপদের ভেতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি? ...এখনও আমার চুলের গোড়া থেকে দূর করতে পারিনি ওই ভয়াবহ দুর্গন্ধ।' রাগত চোখে রানাকে দেখল লাবনী।

'থাক, বাদ দাও,' বলল সেসিলি। 'বরং এসো, বাবাকে জানাই তোমরা কতটা এগোতে পেরেছ।'

মেয়েটা উঠতেই ওর পিছু নিয়ে ব্যালকনি ছেড়ে ওদিকের ঘরে এল লাবনী ও রানা। কখন যেন সুইট থেকে বেরিয়ে গেছে মউরোস। লাবনী ভাবল, বাইরের করিডোর পাহারা দিচ্ছে সুরসিক ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি।

ছোট টেবিল ঘিরে তিনটে চেয়ার, ওখানে বসল রানারা। লাবনীর সামনেই টেবিলে দুনিয়া-সেরা ল্যাপটপ কমপিউটার।

‘মেকআপ ঠিক আছে তো?’ বলল সেসিলি। ‘ক্যামেরার সামনে বসছ।’

রানা দেখে নিল লাবনীকে। বাঙালি তরুণীর মুখ, মেকআপ না করলেও অদ্ভুত সুন্দর ও কমনীয়।

‘আমরা ভিডিয়ো কনফারেন্স করব?’ জানতে চাইল লাবনী।

‘সামনা-সামনি আলাপ পছন্দ করেন বাবা, কিন্তু সেটা না পারলে ভিডিয়ো কনফারেন্স,’ বলল সেসিলি। ‘তুমি রেডি তো?’

মাথা দোলাল লাবনী।

কমপিউটারের কি-বোর্ডে টোকা দিল সেসিলি, সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল স্ক্রিন। দেখা গেল চমৎকারভাবে সাজানো অফিসে ডেস্কের পেছনে বসে আছেন বিলিয়নেয়ার ডেনিয়েলসন। ‘ডক্টর আলম! আবারও দেখা হওয়ায় আমি খুশি!’

‘আমি নিজেও খুশি যে, এখনও বেঁচে আছি,’ বলল লাবনী। ‘আরেকটু হলে মরেই যেতাম আমরা সবাই!’

‘শুনেছি। তবে ভরসা ছিল মিস্টার রানার ওপর। ...হ্যালো, মিস্টার রানা, ভাল?’ নিজ স্ক্রিনে রানাকে দেখছেন তিনি।

‘আছি,’ বলল রানা, ‘আশা করি আপনিও ভাল?’

‘হ্যাঁ।’

‘ইরানে বড় কোনও বিপদে পড়িনি, ফার,’ বাবাকে বলল সেসিলি, ‘মিস্টার রানার কন্ট্যাক্ট আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়েছে ইস্পাহান শহরে। সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তারা সার্চ না করেই বিমানে উঠতে দিয়েছে।’

‘আর আরাশ খানসারি?’

‘মারা গেছে।’

মাথা দোলালেন ডেনিয়েলসন। ‘গুড! দুঃখজনক যে নষ্ট হলো দশ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু যা পেলাম, সে তুলনায় ওটা সামান্যই খরচ।’ আগ্রহের ছাপ পড়ল ভদ্রলোকের চেহারায়।

'হ্যাঁ, ডক্টর আলম, বলুন, কী পেলেন ওই অরিচালকাম থেকে?'

মৃদু কাশল লাবনী। 'আটলান্টিসের দিকে সরাসরি পথ দেখিয়ে দেবে না, যদিও বুঝছি ওটা কোনও ধরনের ম্যাপ।' ল্যাপটপের ক্যামেরার সামনে আর্টিফ্যাক্ট তুলে ধরল। 'গ্লোযেল অক্ষর অনুযায়ী একপাশের সরু এই রেখা আসলে নদী। এ ছাড়াও, আছে অন্যান্য চিহ্ন। এখনও পুরোপুরি অনুবাদ করতে পারিনি।' রানা আর ওর তৈরি নোট দেখল লাবনী। '"কোনও এক নদীর উত্তর মুখ... সাত, দক্ষিণ, পশ্চিম। সেইমত যাও শহর..." কিন্তু এপর্যন্ত বুঝেই থামতে হয়েছে। পাত্রের উল্টো দিকের যে চিহ্ন, তাতে বোধহয় বোঝাতে চেয়েছে, নদীর কত শাখা বা উপনদীর পর গেছে পথ গন্তব্যে। চারটে উপনদী বামে, ডানদিকে সাতটা... এইসব।'

কৌতূহলী ডেনিয়েলসন জিজ্ঞেস করলেন, 'ধরে নিলাম, আপনি যে অক্ষর অনুবাদ করতে পারেননি, তা গ্লোযেল নয়।'

'আমারও তা-ই ধারণা। অনেকটা হায়ারোগ্লিফিক্স বা অন্য ভাষার মত। কষ্ট লাগছে অন্য কারণে, কেমন চেনা লাগছে, তবুও বুঝছি না। স্থানীয় কারণে ভাষা বদলে গিয়ে...'

'ইন্টারেস্টিং। সেসিলি, চিহ্নের ফোটো তুলে পাঠাবে? কাছ থেকে দেখতে চাই।'

'অবশ্যই, ফার,' বাবাকে বলল সেসিলি। লাবনীর কাছ থেকে আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে ওটার ছবি তুলতে ব্যস্ত হলো।

কাছ থেকে ছবি দেখল রানা। গ্লোযেল আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে পুরনো ভাষা। ওটা থেকেই এসেছে ভিনকা-টর্ডোস আর বাইবলোস। আর্কিওলজির বিষয়ে আগ্রহ আছে, এ বিষয়ে বেশ কিছু বইও পড়েছে ও।

এইমাত্র কমপিউটারের মাধ্যমে বাবার কাছে ছবির ফাইল পাঠাতে লাগল সেসিলি।

রানার মনে পড়ল, ইউরোপের এক খামারে উনিশ শ' চব্বিশ সালে প্রথমবারের মত পাওয়া যায় গ্লোযেল ট্যাবলেট। আবিষ্কার করে এমিলে ফ্রাদিন নামের এক লোক। পণ্ডিতরা মানতে রাজি হলেন না, ওটা কোনও ভাষা। উড়িয়ে দিলেন ওর কথা। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পর ডেটিং টেকনিক আবিষ্কারের পর নড়েচড়ে বসল সবাই। তখন পণ্ডিতরা স্বীকার করলেন, ওই ট্যাবলেট যিশুর জন্মের অন্তত দশ হাজার বছর আগের। প্রাচীন গ্রিক ভাষাও জন্ম নিয়েছে বহু পরে। আসলে ফিনিশিয়ান, গ্রিক, হিব্রু, রোমান ও ফার্সি ভাষার পিতা এই গ্লোযেল ভাষা।

আরেকবার আর্টিফ্যাক্ট দেখল রানা। লাবনীর দিকে তাকাল। মেয়েটা বিশ্বাস করে, জিনিসটা এসেছে আটলান্টিস থেকে।

'আমাদেরকে বের করতে হবে, আসলে কোথায় ওই নদী,' বলল রানা।

'এখানেই তো সমস্যা,' বলল লাবনী। 'জানিই তো না ওটা কোথায়।' সাতটা বিন্দু দেখাল। 'এগুলো দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ওই নদী কত দূরে, তারপর লিখেছে, "দক্ষিণ" ও "পশ্চিম"।'

মনোযোগ দিয়ে আর্টিফ্যাক্ট দেখছে রানা। গম্ভীর মুখে বলল, 'হয়তো দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে সাত মাইল দূরে। বা সাত দক্ষিণ এবং তারপর পশ্চিমে... কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের জানা নেই, কী ছিল তাদের পরিমাপ বা যিরো পয়েন্ট।'

প্রশংসার চোখে রানাকে দেখল লাবনী।

'ডক্টর আলম,' ভিডিয়ো লিঙ্কে বলে উঠলেন ডেনিয়েলসন। কেড়ে নিয়েছেন সবার মনোযোগ। 'দেখেছি এসব চিহ্ন। ধরে নেয়ার কোনও কারণ নেই যে আপনার চেয়ে বেশি জানি আমি। একটা চিহ্নও বুঝিনি।' লাবনীর দিকে তাকালেন। 'কিন্তু এই আর্টিফ্যাক্টের প্রাচীন ভাষার ওপর জ্ঞান আছে, এমন এক দক্ষ ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল লাবনী। 'ও, তা হলে আর আমাকে লাগবে না আপনাদের? আমি ভেবেছিলাম...'

হেসে ফেলল সেসিলি। 'ভুল ভাবছ, লাবনী! এই মিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তুমিই। সত্যি বলতে, এ মিশনই থাকবে না তুমি না থাকলে।'

'ঠিক বলেছ,' বললেন ডেনিয়েলসন, 'ডক্টর আলম, আপনি ও মিস্টার রানা এই মিশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। ...আমাদের এক্সপার্ট প্যারিসে এসে ডিসাইফার করবে অন্যান্য অক্ষর বা চিহ্ন। আর একবার সঠিক নদীটা পেলেই শুরু হবে ফুল এক্সপিডিশন।'

'ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠালে হতো না?' বলল লাবনী।

'ইরানে গিয়ে যা হলো, এরপর আর ঝুঁকি নেব না,' বললেন ডেনিয়েলসন, 'হাতে রাখব আর্টিফ্যাক্ট আর সব তথ্য। যত কম লোক জানে, ততই ভাল।' রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি কী বলেন, মিস্টার রানা?'

'ঠিক,' সায় দিল রানা।

'ডক্টর আলম,' হাসলেন বিলিয়নেয়ার। 'মন খারাপ করবেন না। আপনি খুবই দক্ষতার সঙ্গে নিজ কাজ করেছেন। আমার ধারণা আটলান্টিসের দিকে বড় এক পা এগিয়ে গেছি আমরা। সেজন্য ধন্যবাদ দেব আপনাকে আর মিস্টার রানাকে।'

প্রশংসা পেয়ে জ্বলজ্বল করে উঠল লাবনীর মুখ, চট্ করে একবার দেখল রানাকে। মুখে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

'আপাতত জরুরি কোনও কাজ নেই, ঘুরে বেড়ান প্যারিস,' বললেন ডেনিয়েলসন। 'নিরাপত্তা নিয়ে ভাববেন না। আপনার সঙ্গে থাকছেন মিস্টার রানা। আপনাকে ঘুরিয়ে শহর দেখাবে সেসিলি। ...পরে আবারও দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে।' কালো হয়ে গেল স্ক্রিন।

হাতঘড়ি দেখল সেসিলি। 'আজ অনেক রাত হয়ে গেল। ...আগে কখনও প্যারিসে এসেছ?'

'খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে, ঘুরে দেখতে পারিনি। খুব খুশি হব দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতে পেলে।'

হাসল সেসিলি। 'আগামীকাল ঘুরতে যাব আমরা।'

পরদিন সকালেই ওরা গেল লুভর জাদুঘরে। ওখান থেকে বেশ কয়েকটা দর্শনীয় জায়গায়।' তারপর আর্ট গ্যালারিতে। ওখান থেকে শপিঙে।

ওরা চরকির মত ঘুরল গোটা শহর।

সেসিলি আগেই বলে দিয়েছে, যত টাকাই খরচ করুক, তা ওদেরকে শোধ দিতে হবে না; আনলিমিটেড ক্রেডিট পাচ্ছে ওরা ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে।

যদিও সেসিলি দেখল, চারআনা বাড়তি পয়সাও খরচ করল না লাবনী, রানা বা মউরোস। লাবনীকে বলল সেসিলি, 'দামি যে-কোনও কিছু কিনতে পারো। কেউ কিছু মনে করবে না।'

জবাবে বলল লাবনী, 'নিজের টাকা নয় বলেই ফালতু খরচ করব কেন!'

'কিন্তু ভেবে দেখো, একবার আটলান্টিস পেলে তুমি পাবে হাজার হাজার কোটি ডলার,' বলল সেসিলি। 'টাকা নিয়ে ভেবো না। আমরা সবসময় আমাদের নিজেদের সবাইকে দরকারী সবকিছু জুগিয়ে দিই।'

'তাই?' অবাক হলো লাবনী। 'থ্যাঙ্ক ইউ!' কথাটা বললেও বুঝল না, আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে মেয়েটা।

ট্যাক্সি ডেকে ফ্রেঞ্চ লাঞ্চ সারতে ল'ওপেরায় গেল ওরা।

দুর্দান্তভাবে সাজানো রেস্তোরাঁয় ঢুকে লাবনীর মনে হলো, বাকি জীবনেও আর সিট পাবে না। চুপ করে থাকল রানা। কিন্তু তখনই খেলা দেখিয়ে দিল সেসিলি। বিলিয়নেয়ারের মেয়ে

হিসেবে ওকে চেনে অনেকে, ওর গ্রুপের সবাইকে নিয়ে গিয়ে আড়ালে রাখা এক টেবিলে বসিয়ে দেয়া হলো। অবশ্য, চেয়ারে না বসে দুঃখ প্রকাশ করে টেবিল ছেড়ে চলে গেল মউরোস। কোথায় গেল, বলেও গেল না কাউকে।

সুন্দরী ওয়েইটারকে ওদের যার যার অর্ডার বুঝিয়ে দিল সেসিলি। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর বলল, 'বড় বেশি ভিড়। আসলে পৃথিবীতে অতিরিক্ত মানুষ, বাড়ছে আরও, অথচ ক্রমেই কমছে সম্পদ। সাত বিলিয়ন মানুষ পোষার তুলনায় এই গ্রহ অনেক ছোট।'

'দুঃখজনক, কিন্তু কিছু করারও নেই,' বলল লাবনী।

'আমরা অবশ্য ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশন থেকে এ বিষয়ে সাধ্যমত করছি,' বলল সেসিলি।

তখনই রাজকীয় খাবার এনে টেবিল সাজিয়ে দিল ওয়েটার।

সে বিদায় নিলে সার্ভ করতে গিয়ে লাবনীকে বলল সেসিলি, 'তোমার বিপদ হতে দেব না।' মুখে কঠোর প্রতিজ্ঞা। 'আমি আসলে ঠিকভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারিনি।'

'কীসের জন্যে?' অবাক হয়েছে লাবনী।

'আমার জীবন বাঁচাবার জন্যে! জীবন বাজি রেখে ঢুকেছ ওই দুর্গে, তারপর খানসারির হেলিকপ্টারে গুলি করেছিলে, নইলে নির্ঘাত মারা পড়তাম।'

লজ্জায় রক্তিম হলো লাবনীর গাল। 'ইয়ে... আসলে হয়েছে কী... খুব ভয় লাগছিল, হেলিকপ্টারে গুলি করলেই দপ্ করে আগুন ধরে যাবে ওটায়, ফলে মারা পড়ব আমরা সবাই!'

হেসে ফেলল সেসিলি। 'অমন হয় শুধু সিনেমায়। অনেক সাহস দেখিয়েছ, আর সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।' লাবনীর হাত ধরে দু'বার ঝাঁকিয়ে দিল। 'তোমার কিছু লাগলে, শুধু একবার বলবে আমাকে।'

কী বলবে বুঝে পেল না লাবনী। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

বয়স্ক এক ওয়েটার এসে কাগজের স্লিপ দিল রানার হাতে। ওটা পড়ে নিয়ে তাকে বিদায় দিল রানা। 'এক্সকিউয মি,' বলে উঠে পড়ল, চলেছে কাউন্টারের দিকে।

এখনও হাত ধরে আছে সেসিলি, লাবনী বলল, 'আমার মত একই সুবিধা পাবে রানা-মউরোস?'

মাথা নেড়ে হাসল সেসিলি। 'না, তা পাবে না।'

'বলেছিলে, তোমাকে কোনও নিরাপত্তা দিতে হবে না কাউকে,' বলল লাবনী, 'সত্যি বেরোতে পেরেছিলে খানসারির খপ্পর থেকে?'

'তখনও সাহায্য করেছিলে!' হাসল সেসিলি। 'বন্ধ করেছিলে বৈদ্যুতিক সংযোগ। তখন সে-সুযোগে মার্শাল আর্ট ব্যবহার করে মুক্ত করি নিজেকে। তুমি যদি মেইন সুইচ অফ না করতে, ডোনাটির লুক্কার কথা মত আমাকে মেরে ফেলত খানসারি।'

'কে এই লোক, ডোনাটি লুক্কা?' ইরানিয়ান দুর্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের কথা মনে পড়ল লাবনীর।

'ওকে দেখেছ কখনও?'

'বেযমেন্টের ঘরে কম্পিউটার স্ক্রিনে।'

ওদের আলাপে বাধা পড়ল, ফিরে এসেছে রানা। কাউন্টার থেকে আসার পথে কয়েক টেবিল দূরে মউরোসের সঙ্গেও দেখা করে এসেছে।

'জরুরি কিছু?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লাবনী। 'হামলা করবে ডোনাটি লুক্কার লোক?'

'না।' সিটে বসে পড়ল রানা।

'তার মানে তুমি এখন জানো, লুক্কা কত ভয়ঙ্কর,' বলল সেসিলি। 'শেষ করে দিতে চায় আমাদেরকে। প্রচণ্ড হিংস্র আর

নির্মম। রাশান লোকটাকে খুন করতে খানসারিকে দিতে চেয়েছিল পাঁচ মিলিয়ন ডলার, আমার চোখের সামনেই খুন হয় মিশকিন। ডোনাটি লুক্কাকে বলতে পারো সাইকোপ্যাথ। এমন বিপজ্জনক মানুষ হয় না। আটলান্টিস আবিষ্কার ঠেকাতে যা খুশি তাই করবে। অবশ্য, মনে হয় আপাতত আমরা নিরাপদ। হাতে আছে আর্টিফ্যাক্ট, তার চেয়েও বড় কথা, তুমি সুস্থ। ঠিকই খুঁজে বের করব আমরা আটলান্টিস।'

খাবারে মনোযোগ দিল ওরা। আধঘণ্টা পর বিল চাইল সেসিলি। অবাক হতে হলো ওকে। ওয়েটার জানিয়ে দিল, মিস্টার রানার বন্ধু ল'ওপেরা রেস্তোরাঁর মালিক কোনও টাকা নেবেন না। তিনি ধন্যবাদ দিয়েছেন, তাঁরা দয়া করে তাঁর রেস্তোরায় পা রেখেছেন বলে।

প্রথম দেখায় রানাকে সাধারণ কর্মচারীর মত ভেবেছিল সেসিলি, নতুন চোখে দেখল আবার একবার। অন্তত দশ হাজার ডলারের সুস্বাদু খাবার ও দামি ওয়াইন ব্যয় করেছে রেস্তোরাঁর মালিক তার বন্ধু ও তার অতিথিদের উদ্দেশে। ব্যাপারটা কম কথা নয়।

বিকেলে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরল ওরা হোটেলে। কষ্টকর ইরান অভিযান শেষ করে প্যারিসে ঘুরে বেড়িয়েছে। গত কয়েক দিন মোটেও বিশ্রাম নেই লাবনীর, ওর মনে হলো বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে পড়বে। সুইটে ঢুকেই রানাকে বলল, 'ডেনিয়েলসনের এক্সপার্টের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে, অন্তত দশ ঘণ্টা ঘুমাব, নইলে মরেই যাব।'

'না মরে বরং ভালভাবে ঘুমিয়ে ওঠো,' মুচকি হাসল রানা। 'আমি বেডরুমের বাইরে লাউঞ্জে আছি। ভয় পেয়ো না।'

বেডরুমে ডাবল বেডে শুয়ে হাজারখানেক চিন্তা এল লাবনীর মনে। ঘুরে ঘুরে এল নিউ ইয়র্কে ওর অ্যাপার্টমেন্টের ফোন

কলের কথা। তারপর ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে চাইল হেণ্ড্রিক ড্রেক। কোনওমতে বেঁচে বিমানে করে গেল নরওয়েতে। তারপর ইরান। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠল লাল-সোনালি আটলান্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট, আর ওটা কেড়ে নেয়ার জন্যে তাড়া করছে ওকে আরাশ খানসারি!

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে লাবনী। সরু এক খালের ভেতর মস্ত এক কুমির ওর ওপর হামলা করতেই আচমকা ভাঙল ঘুম। দু'পা বুকের কাছে তুলে প্রায় বলের মত গুটিয়ে গেছে ও। ভীষণ ভয় নিয়ে বুকে ঝুলন্ত লকেট খামচে ধরেছে। তখনই মনে পড়ল আরেকটা কথা। লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে ডেস্কের কাছে গেল। চিৎকার করল, 'রানা! একটু আসবে, প্লিজ?'

দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ওর পাশে পৌঁছুল রানা, আগেই দেখে নিয়েছে ঘরের চারপাশ। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, লাবনী?'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে আর্টিফ্যাক্ট ধরেছে লাবনী, অন্য হাতে খুলল গলা থেকে লকেট। পাশাপাশি রাখল আর্টিফ্যাক্ট ও লকেট। দুটোর মিল বুঝতে দেরি হলো না। একই জায়গা থেকে এসেছে এই দুই জিনিস!

তখনই বেজে উঠল ইণ্টারকম। দুই আটলান্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট টেবিলে রেখে রিসিভার তুলল লাবনী। 'হ্যালো, বলুন?'

'লাবনী?' বলল উদ্বিগ্ন সেসিলি, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ! ভাল আছি! মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম।' কী পেয়েছে বলবে লাবনী, এমন সময় কথা বলে উঠল সেসিলি।

'মনে হলো যেন চিৎকার করলে?'

'দুঃস্বপ্ন দেখে।'

'তাই? যাক, যে কারণে কল করেছি, পৌঁছে গেছে আমাদের এক্সপার্ট। তুমি রেডি হয়ে আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে চলে এসো লাউঞ্জে।'

আয়নায় চট্ করে নিজেকে দেখল লাবনী। যেদিকে কাত

হয়ে শুয়ে ছিল, তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে চুল। 'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটের ভেতর আসছি রানা আর আমি।'

লাবনী বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই বিড়বিড় করল রানা, 'তুমি ঠিক সাত মিনিট নেবে।'

'তাতে কী?' শুনে হাসল লাবনী।

আট মিনিট পর রানার পাশে লাউঞ্জে ঢুকল ও।

আর্ম চেয়ারে বসে আছে সেসিলি। দরজার পাশের দেয়ালে হেলান দিয়েছে মউরোস।

ঘরের মাঝে এক লোক। চমকে গেল লাবনী।

'হ্যালো, লাবনী,' বললেন প্রফেসর জিম করেলি।

'আপনি এখানে কী করছেন?' একটু দ্বিধা নিয়ে জানতে চাইল লাবনী। মন বলছে, বাস্তব কৌতুক করেছে কেউ। দুনিয়ায় আর মানুষ ছিল না, একেই বেছে নিয়েছে বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন? মনটাই খারাপ হয়ে গেল ওর।

'আসার কারণ আছে।' লাবনীর হাতে কাপড়ে মুড়িয়ে রাখা আর্টিফ্যাক্টের দিকে তাকালেন করেলি। 'গতকাল কল করেন ডেনিয়েলসন। বললেন, তুমি নাকি অকল্পনীয় এক আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার অভিযানে জড়িয়ে গেছ। তারপর সমস্যার ভেতর পড়েছ ওটা থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে। উনি অনুরোধ করলেন, যেন তোমাকে সাহায্য করি। ব্যস্ততার ভেতর সময় দেয়া কঠিন, কিন্তু ভাবলাম...' সেসিলিকে দেখলেন তিনি। 'আপনার বাবা যেভাবে চেপে ধরলেন, আমার না এসে আর উপায় ছিল না।'

'কী কারণে বাধ্য হলেন?' রানার কণ্ঠে সামান্য টিটকারির ভাব। আগেই লাবনীর কাছে শুনেছে এই লোকের ব্যাপারে। 'যেভাবে শত্রুর বেডরুমে ঘোড়ার কাটা মাথা পাঠিয়ে দিয়েছিল গডফাদার, তেমন কিছু করেননি তো মিস্টার ডেনিয়েলসন?'

কথাটা বোঝেননি করেলি, সহজ সুরে বললেন, 'আমার

ইউনিভার্সিটিতে মোটা অঙ্কের ডোনেশন দিয়েছেন। সম্মান দেখিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রাইভেট জেট। আগে এত সম্মান দেয়নি কেউ আমাকে।'

'তো কবে প্রাচীন ভাষার ওপর পৃথিবী-সেরা এক্সপার্ট হলেন আপনি?' তেড়চা সুরে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'নিজের ঢাক-ঢোল পেটাতে চাই না, লাবনী, কিন্তু তুমি বোধহয় খেয়াল করোনি, গত কয়েক বছর ধরেই আই.জে.এ.-তে পুরনো ভাষার ওপর লেখালেখি করেছি। পৃথিবীর পাঁচজন অথোরিটির ভেতর একজন আমি। বিশেষ করে পশ্চিমে বলা হয় সেরা। অবশ্য কেমব্রিজের রিকন হর্ন আপত্তি তুলবে।' নিজ কৌতুকে হাসলেন করেলি, ভুলে গেছেন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের ক্লাসে নেই তিনি। এরা কেউ হাসছে না। সামলে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এবার দেখা যাক কী পাওয়া গেছে?'

টেবিলে সোনালি-লালচে আর্টিফ্যাক্ট রাখল লাবনী। ঠিক দিকে ল্যাম্প তাক করল সেসিলি। ঝিকঝিক করছে জিনিসটা। চোখ বিস্ফারিত হলো প্রফেসরের। 'ও... তা হলে... সত্যি... আসলেই অকল্পনীয়!' মুখ তুলে সেসিলিকে দেখলেন। 'আমি কি ওটা হাতে নিতে পারি?'

'পারেন।'

লালচে-সোনালি আর্টিফ্যাক্ট তুলে নিলেন করেলি। ওজনটা বুঝে নিয়ে বললেন, 'যথেষ্ট ভারী, কিন্তু খাঁটি সোনা নয়। রঙের কারণে মনে হচ্ছে, এর ভেতর আছে সোনা আর ব্রোঞ্জ... না, সোনা আর তামা। আমি কি ঠিক বলেছি?'

'আপনি যেটা দেখছেন, ওটা আসলে অরিচালকাম,' মন্তব্য করল লাবনী।

'আগেই সূচনা টেনে দিয়ো না,' বললেন করেলি, 'এটার মেটালার্জিকাল অ্যানালাইয করা হয়েছে?'

‘পুরো টুকরোয় নয়,’ বলল সেসিলি, ‘ছোট এক অংশ নিয়ে টেস্ট করা হয়েছে।’

‘এবং?’

‘যা বলছেন ডক্টর আলম, সেটাই সত্যি।’

সন্তুষ্ট চেহারায় প্রফেসরের চোখে তাকাল লাবনী।

‘বুঝলাম।’ কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন করেলি। নেড়েচেড়ে দেখছেন আর্টিফ্যাক্ট। ‘এই পাতের ছোট ওই ঘাট বা সমতল অংশ... হ্যাঁ!’ আত্মতৃপ্তি নিয়ে লাবনীকে দেখলেন, হাসছেন। ‘লাবনী, হতাশ করলে! এটা তো খুব সহজেই অনুবাদ করতে পারার কথা!’

‘মোটামুটি সবই অনুবাদ করেছি,’ বলল লাবনী। ‘এটা এক ধরনের মানচিত্র। নদী-পথে পৌঁছুতে হবে এক শহরে। কিন্তু অন্যান্য অক্ষর মোটেও গ্লোযেল নয়।’

‘অবশ্যই গ্লোযেল নয়,’ বললেন করেলি, ‘কিন্তু কী করে ভুলে গেলে ওলমেক অক্ষর?’

চিহ্নের ওপর চোখ বোলাল লাবনী। ‘কী বলছেন! এগুলো তো ওলমেক নয়!’

‘ক্লাসিকাল ওলমেক নয়, বদলে যাওয়া অক্ষর। ভালমত দেখো।’ নির্দিষ্ট এক অক্ষরে মন দিলেন তিনি। ‘একটু বদলে নেয়া হয়েছে অক্ষর। তবুও এটা...’

‘হায়, আল্লা!’ বিড়বিড় করল লাবনী, ‘এদিকটা দেখলাম না কেন?’

আর্টিফ্যাক্ট দেখছে সেসিলি। ‘তা হলে এসব ওলমেক!’

‘তাই! প্রফেসর করেলি ঠিকই বলেছেন। ক্লাসিক ফর্মের সিম্বল নয়... সম্ভবত আরও আগের।’ নিশ্চিত হওয়ার জন্যে প্রফেসরের দিকে তাকাল লাবনী।

মাথা দোলালেন তিনি। ‘অনেক আগের। পুরো রিফাইন

করা নয়। কোনও এক এলাকার গ্লোয়েলের ছাপ আছে এসবে। ...আশ্চর্য!' সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'গ্লোয়েল অক্ষর থেকে বদলে যাওয়া প্রোটো-ওলমেক হায়ারোগ্লিফস। এটা দেখলে লজ্জা পাবে অনেক পণ্ডিত।'

'ওলমেক,' বিড়বিড় করল রানা। হাজার হাজার বছর আগের দক্ষিণ আমেরিকান এক সভ্যতার লিখিত ভাষা ছিল ওটা। পুরোপুরি বিকশিত হয়েছিল যিশুর এগারো শ' পঞ্চাশ বছর আগে। মেক্সিকো উপসাগরের তীর থেকে ভেতরের দিকে ছিল ওসব নগর-সভ্যতা।

'প্রফেসর করেলি,' বলল সেসিলি, 'এসব সিম্বল থেকে কী বুঝছেন? আশা করি আপনি ওলমেক সিম্বল চেনেন?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে নিখুঁতভাবে অনুবাদ করতে পারব না। এসব সিম্বল ঠিক ট্র্যাডিশনাল অক্ষর নয়। দেখা যাক, কী বলে ওরা।' নাকে চশমা তুলে সামনে ঝুঁকলেন করেলি। টেবিলের ওদিক থেকে-চশমা ছাড়া একই কাজ করেছে লাবনী।

'প্রথম অক্ষর... ওটা হতে পারে... অ্যালিগেটর?' নিচু স্বরে বলল ও।

'অ্যালিগেটর অথবা ক্রোকোডাইল,' অবাক সুরে বললেন করেলি।

দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে মউরোস, সোজা হয়ে বলল, 'ক্রোকোডাইল নদী? ওই এলাকা ঘুরে এসেছি রানা আর আমি। একবার সিয়েরা লিয়নে...'

ওকে পাত্তা না দিয়ে বললেন করেলি, 'পরের অক্ষর... মাই গড! পানি...'

'অথবা সাগর,' বলল লাবনী, 'আরে, এ তো সাগর-দেবতা! পসেইডন!'

চমকে গিয়ে ওকে দেখল সেসিলি। 'পসেইডন?'

'ক্রোকোডাইল নদীর উত্তর মুখ থেকে...' বললেন করেলি।

'সেভেন, সাউথ... ওয়েস্ট, নদীর সাত নম্বর দক্ষিণ, পশ্চিম... বোধহয়,' বলল লাবনী। 'ওই কোর্স ধরে যেতে হবে পসেইডনের শহরে। গিয়ে...' অন্যান্য সিম্বলের অর্থ খুঁজছে। 'কপাল মন্দ, আমি খুব ভাল বুঝি না ওলমেক।'

আর্টিফ্যাক্টের ওপর আঙুল রেখে বললেন করেলি, 'এদিকের অক্ষর মনে হচ্ছে "বাড়ি", কিন্তু এসব দাগ? যেন বোঝাতে চেয়েছে "বংশধর"... না, "উত্তরাধিকারী", কিন্তু এ থেকে কিছুই তো বোঝা যায় না।'

'সবই বোঝা যাচ্ছে,' বলল লাবনী, 'উত্তরাধিকারীর বাড়ি। নতুন বাড়ি। নতুন এক বাড়ি খুঁজে পাওয়ার জন্যে... এই যে সঠিক সিম্বল।'

'হুম,' এতই ঝুঁকে গেছেন প্রফেসর, নাকের নিঃশ্বাস পড়ে ঝাপসা আয়নার মত হয়ে গেছে আর্টিফ্যাক্টের মসৃণ পাত। 'না, চিনছি না এটা। হতে পারে কারও নাম বা উপজাতির...'

'আটলান্টিয়ান,' সেসিলি বলতেই ঘুরে ওকে দেখল সবাই। 'আটলান্টিয়ানদের নতুন বসত, ওটাই বলেছে ওখানে।'

ঠোঁট মুড়ে ফেললেন করেলি। 'মিস ডেনিয়েলসন, আপনি বোধহয় কষ্টকল্পনা করছেন। আরও অনেক সম্ভাবনা রয়ে গেছে। ওই এলাকার প্রাচীন লিখিত ভাষার ওপর গবেষণা করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে সব।'

'না, সেসিলির কথাই ঠিক,' আর্টিফ্যাক্ট তুলে নিল লাবনী। 'এই অক্ষর বলছে আটলান্টিয়ান। অন্য কিছু হতেই পারে না। ওদের দ্বীপ তলিয়ে যেতে লাগলে দক্ষিণ আমেরিকায় নতুন বসতি করে আটলান্টিয়ানরা। আর মানচিত্রের এ অংশ আমাদের নেবে সঠিক জায়গায়। শুধু বের করতে হবে ওটা কোন নদী। একবার...'

'দক্ষিণ আমেরিকার ক্রোকোডাইল ভরা বিশাল এক নদীর কথা ভাবলে প্রথমে কোন্‌টার কথা মনে পড়বে, লাবনী?' জানতে চাইল রানা, মৃদু হাসছে।

'আমাজন?' রানার দিকে তাকাল লাবনী।

'তোমার হাতের আর্টিফ্যাক্টে কয়টা বাঁক বা উপনদী দেখছ?' বলল রানা, 'প্রতিটা উপনদীর সঙ্গে নম্বর দিয়েছে। আর মস্তবড় ওই নদীর তীরে গোপন কোনও শহর থাকলে, ওটা থাকবে ব্রাযিলিয়ান রেইন ফরেস্টে। অন্য কোথাও থাকলে এত দিনে আর্কিওলজিস্টরা আবিষ্কার করে ঢাক-ঢোল পেটাত।' কাঁধের ওপর দিয়ে লাবনীর বেডরুম দেখল রানা। 'ওখানে অ্যাটলাস আছে। দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।'

লাউঞ্জ ছেড়ে লাবনীর বেডরুমে গেল রানা, কিছুক্ষণ পর ফিরল বড় এক অ্যাটলাস হাতে। ওটা বিছিয়ে দিল টেবিলের ওপর। 'উত্তর দিকে নদীর মুখ বেইলিক-এ। উজানে গেলে বামে চারটে উপনদী...' ওর আঙুল চলেছে অরিচালকাম আর্টিফ্যাক্টের মানচিত্রের বুকে। 'পশ্চিমে উঠে পেঁচিয়ে গেছে আট উপনদী, ওখানেই স্যান্টারেম।' রেখা উপনদীর একটার খাঁজ একটু বেশি গভীর টের পেয়ে সতর্ক হলো রানা।

'এরপর ডানে যেতে বলেছে,' তথ্য দিল লাবনী।

অ্যাটলাস অনুযায়ী উজানে চলল রানা। ঢুকে পড়ল মূল আমাজনের হাজার মাইল ভেতরে। পৃষ্ঠার সরু নীল লাইন বুঝিয়ে দিল, আরও এক শ' মাইল পশ্চিমে গেছে নদী। তারপর বামে চলে গেছে বহু দূরে। একই গন্তব্য দেখিয়ে দিয়েছে আর্টিফ্যাক্ট।

'আরও ভাল ম্যাপ চাই, সঙ্গে স্যাটালাইট ইমেজারি,' বলল রানা।

'আমরা এখন জানি, জায়গাটা কোনদিকে,' বলল সেসিলি।

'টেফে নদীর তীরে, রেইন ফরেস্টের মাঝে,' উত্তেজিত হয়ে জানাল লাবনী।

'প্রোটো-ওলমেক সভ্যতা অত গভীরে?' আনমনে বললেন করেলি। 'বর্তমান কোনও থিয়োরির সঙ্গে মোটেও মিলছে না তাদের উদ্ভব বা জনসংখ্যার হিসাব।'

'আটলান্টিসও এভাবে খুঁজে পাবেন না থিয়োরি অনুযায়ী, যদিও মিলে যাচ্ছে অনেক কিছু,' শ্লেষাত্মক সুরে বলল লাবনী।

চেহারায় অভিমান নিয়ে বললেন প্রফেসর করেলি, 'বলো তো, তোমার থিয়োরি অনুযায়ী গালফ অভ কেডিয থেকে জাহাজ নিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ওখানে কীভাবে যাবে আটলান্টিয়ানরা? সাগর-তীরের প্রাচীন সব কিংবদন্তী মানলেও, আটলান্টিয়ানরা দু'এক শ' মাইল সাগর বা নদীতে চলত; কিন্তু কয়েক হাজার মাইল সাগর পেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় গেছে তারা, এর কী ব্যাখ্যা দেবে? কীভাবে ন্যাভিগেট করবে ওরা?'

'নিশ্চয়ই ওদের ন্যাভিগেট করার ব্যবস্থা ছিল,' বলল লাবনী।

'সত্যি কি ছিল?' জানতে চাইল সেসিলি।

'আধঘণ্টা আগে ইন্টারকম করলে, মনে আছে?' বলল লাবনী। 'তখন এই আর্টিফ্যাক্টের সঙ্গে কীসের যেন মিল আছে বলে মন হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। বুঝছিলাম না। এবার দেখো।' আঙুলের টোকায় আর্টিফ্যাক্টের ফুলে থাকা গোলাকার অংশ নাড়ল ও। পেণ্ডুলামের মত দুলছে ওটা। 'এর মানে, এটা ঝুলত। তা ছাড়া...' আর্টিফ্যাক্টের নিচের খাঁজে নিজের লকেট মিলিয়ে ধরল লাবনী। 'একেবারে মিশে গেছে। বেশ কয়েকটা সংখ্যাও আছে আমার লকেটে। আর এই বাঁক অনুযায়ী এগোলে পাবে আরও কিছু সংখ্যা। আসলে ওরা কোনও সাইটিং সিস্টেম বের করেছিল। সম্ভবত আয়নার মত, ঠিকভাবে খাঁজে বসিয়ে

দিলেই পেত পরিমাপ ও অ্যাংগেল। এমন এক জিনিস, যেটা দিক নির্দেশ করত দিগন্তের।'

'নক্ষত্রের মত কিছু?' জানতে চাইল সেসিলি। 'বা সূর্য?'

'ঠিক!' মাথা দোলাল লাবনী।

'আসলে ওদের কাছে ছিল সেক্সট্যান্ট,' বলল রানা। 'এটা হচ্ছে তারই একটা অংশ।'

'ষোলো শ' শতাব্দীতে সেক্সট্যান্ট আবিষ্কার করেছে মানুষ,' বলল লাবনী, 'কিন্তু তার দশ-এগারো হাজার বছর আগেও ছিল ওই ইন্সট্রুমেণ্ট!'

'সেক্ষেত্রে, সেক্সট্যান্টের জন্যে যে-কোনও দেশের মানুষের ওপর সামরিক ক্ষমতা দেখাতে পেরেছে আটলাণ্টিয়ানরা,' বলল রানা। 'হয়তো তা-ই হয়েছে, সেক্সট্যান্টের কারণে অনায়াসেই ক্যালকুলেট করত ল্যাটিচ্যুড। চিনত উত্তর ও দক্ষিণ, ফলে সূর্য বা নক্ষত্রের কারণে বুঝত, বছরের কোন্ সময় তখন। প্রতিটা প্রাচীন সভ্যতারই এই জ্ঞান ছিল।'

আর্টিফ্যাক্টের অচেনা চিহ্ন দেখল লাবনী। 'এখানে বলছে সাত, তারপর দক্ষিণ এবং পশ্চিম। হয়তো সাতকে কোনও ধরনের পরিমাপ বলে ধরত আটলাণ্টিয়ানরা। বা ওটা ছিল কমপাসের মত। আর ওটাই বলে দিত আটলাণ্টিস থেকে কীভাবে পৌঁছুতে হবে ওই নদীতে। সন্দেহ নেই ওদের ছিল মানচিত্র। লিখতে চেয়েছে, প্রথমে যাও দক্ষিণে, যেটাকে ওরা বলত সাত, তারপর রওনা হও পশ্চিমে। ল্যাটিচ্যুড ঠিক থাকলে সঠিকভাবে পশ্চিমে গেলে পৌঁছে যাওয়ার কথা গন্তব্যে। আমরা যদি বুঝতে পারি, ওদের ল্যাটিচ্যুড সেভেন কী, সেক্ষেত্রে...'

লাবনীর কথা শেষ করল সেসিলি, 'আমরা বের করতে পারব, আটলাণ্টিয়ান ল্যাটিচ্যুডের ইউনিটে কত ডিগ্রি! আর তখন উল্টো পেছালেই পাব কোথায় ছিল আটলাণ্টিস!'

'তার আগে জরুরি কিছু কাজ আছে,' বলল রানা, 'প্রথমে আমাজনের জঙ্গলে ঢুকে খুঁজে বের করতে হবে হারিয়ে যাওয়া এক শহর। তারপর তাদের মানচিত্রের ল্যাটিচ্যুড অনুযায়ী বের করতে হবে কোথায় আছে আটলান্টিস।'

'মিস ডেনিয়েলসন?' সেসিলির দিকে তাকালেন করেলি।

'বলুন?'

'সত্যিই হয়তো টেফে নদী-তীরে কোনও শহর থাকতেও পারে। আমি জানি, বলা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে, সুযোগ পেলে আমিও যেতাম আপনাদের সঙ্গে। তা কি সম্ভব? নেবেন আপনারা আমাকে এই এক্সপিডিশনে?'

'তা হলে আপনি ধারণা করছেন সত্যিই আটলান্টিস আছে?' বলল লাবনী। বুঝতে পারছে, হারানো শহর না পেলেও বিরাট এক বিজয় হয়েছে ওর।

'ভাবছি, আসলে প্রি-ওলমেক সভ্যতার কথা,' বললেন করেলি, 'ওটা স্টাডি করতে পারলে কৃতজ্ঞ হব। আর ওটার কারণে আটলান্টিস পাওয়া গেলে সেটা হবে বোনাস।'

'বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখব,' বলল সেসিলি। 'আপনি কি আসলেই যেতে চান? যেতে হবে গভীর জঙ্গলে। ইউনিভার্সিটির সব দায়-দায়িত্ব...'

'আমিই তো হেড-অভ-দ্য ডিপার্টমেন্ট, সবই সামলে নেব,' হাসলেন করেলি। 'গত বেশ ক'বছর এক্সপিডিশনেও যাইনি। হয়তো শুনেছেন, আগেও আমাজন নদী বা রেইন ফরেস্টের চেয়েও অনেক বিপজ্জনক এলাকায় এক্সপিডিশন করেছি?'

'বাবার সঙ্গে আলাপ করব আপনার বিষয়ে,' কথা দিল সেসিলি। 'আমার তরফ থেকে বলতে পারি, আপনাকে পাশে পেলে খুশি হব।' হাত বাড়িয়ে করেলির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল ও।

লকেট আবারও গলায় পরে নিল লাবনী। ব্রাযিলের মানচিত্রের ওপর রাখল আর্টিফ্যাক্ট। অনুসরণ করছে টেফে নদীর সবুজ লাইন। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা তুলে রানাকে দেখল, চোখে স্বপ্ন। ফিসফিস করে বলল, 'তা হলে ওই শহর ওখানে!'

'আমাদের পরের গন্তব্য ব্রাযিল,' মাথা দোলাল রানা।

বারো

ব্রাযিলের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রায় অচেনা ছোট এক এয়ারপোর্টে নেমেছে মাসুদ রানা, জ্যাঁ মউরোস, লাবনী আলম, সেসিলি ডেনিয়েলসন ও জিম করেলিকে নিয়ে প্রাইভেট জেট বিমান। শীতাতপ কেবিন ছাড়তেই গালে লেগেছে অত্যুষ্ণ চপেটাঘাত। অভিজ্ঞ রানার মনে হয়েছে, ভাপসা এই পরিবেশের চেয়ে বহু গুণ ভাল শুকনো সাহারা মরুভূমি।

আমাজন বেসিনের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জঙ্গলের আরও গহীনে ঢুকে দম আটকে এসেছে ওদের। তাপ আশি ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি। প্রচুর পানি খাচ্ছে ওরা। সর্বক্ষণ সপ্-সপ্ করছে গায়ে লেপ্টে থাকা ভেজা পোশাক। অথচ, এখনও বহু দূরে ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল।

ওই এলাকার মানচিত্র, স্যাটালাইট ফোটো, এরিয়াল সার্ভে ইত্যাদি দেখে, হারিয়ে যাওয়া শহরের সম্ভাব্য এলাকা ছোট করে এনেছে ওরা। টেফে নদীর এক শ' মাইল উজানে গিয়ে খুঁজবে বড়জোর আট মাইল বৃত্তের ভেতর কোন্ জঙ্গল। কাছের বসতি

তিরিশ মাইল দূরে, খুবই ছোট এক ইণ্ডিয়ান গ্রাম।

এরিয়াল ফোটো দেখে প্রথমে লাবনী ভেবেছিল, ওদিকের মাটিতে বিছিয়ে রেখেছে গাঢ় সবুজ কার্পেট। কোনও নড়াচড়া নেই সরীসৃপ সদৃশ আঁকাবাঁকা নদীতেও। আকাশ ছাওয়া গাছের সবুজ পাতার ছাউনির কারণে, চাইলেও নামতে পারবে না কপ্টার। অথচ, মাত্র নব্বুই মিনিটে টেফে নদী থেকে গন্তব্যে পৌঁছুবে যান্ত্রিক ফড়িং!

এসব ভেবেই বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন পাঠান কপ্টার, ভেবেছিলেন জঙ্গলে নামবে ওটা। খুবই খুশি হয়েছিল লাবনী, সেসিলি ও জিম করেলি। প্রয়োজনে উইঞ্চে করে জঙ্গলে নামবে বা উঠবে। কিন্তু রানা বুঝিয়ে বলেছে, ওই কাজ করতে গেলে মস্ত বিপদে পড়বে ওরা।

আলাপের মাধ্যমে শেষপর্যন্ত ঠিক হলো, ব্যবহার করবে ওরা বোট। এক্সপিডিশনের জন্যে দুটো বোট পাঠালেন ডেনিয়েলসন। ওই দুই বোটের ভেতর বড়টা নোয়া, ধূসর-রুপালি এক শ' আট ফুটি সানসিকার প্রিডেটর মোটর ইয়ট, খোলে ফাউণ্ডেশনের লোগো। লাবনী অবাক হয়েছিল, মাত্র তিন দিনের প্রস্তুতি শেষে প্রকাণ্ড এক অ্যানটোনভ এন-২২৫ ট্র্যান্সপোর্ট বিমানে তুলে ইউরোপ থেকে ব্রাযিলের ম্যানুয়াস শহরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে দুই বোট। এরপর তিন শ' মাইল উজানে এসে অপেক্ষা করেছে টেফে নদীতে।

বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত এক শ' ফুটেরও বেশি দীর্ঘ ইয়ট নোয়ার খোল মাত্র চারফুট গভীর, ফলে পৌঁছবে এক্সপিডিশনের এলাকা থেকে মাত্র দশ মাইল দূর পর্যন্ত। অগভীর নদীর কথা ভেবে, ইয়টের ক্রেনে ঝুলছে দ্বিতীয় বোট— পনেরো ফুটি ইনফ্লেটেবল যোডিয়াক ডিঙি। যাত্রার শেষদিকে কাজে আসবে ওটা।

আরও ছোট বোট নেয়া যেত, কিন্তু শুধু যে প্রফেসর করেলি এসেছেন তা নয়, রানা, লাবনী, মউরোস ও সেসিলির সঙ্গে চলেছে আরও চারজন। তাদের দু'জন নোয়ার ক্রু। প্রথমজন দাড়িওয়ালা ক্যাপ্টেন লিও ফার্নান্দো, অন্যজন তাঁর মেট অগাস্টিন পেদরো। তার অন্যতম কাজ ঝিকমিকে সোনার বড় দুটো দাঁত বের করে সরল হাসি দেয়া।

তৃতীয়জন রানার বন্ধু জুলিয়ো ট্যানাগো। চওড়া কাঁধের শক্তিশালী এক ব্রাযিলিয়ান, বয়স তিরিশ। দেখলে মনেই হয় না কিছু তোয়াক্কা করে। নিজেকে বলে ইণ্ডিয়ান ট্র্যাকার।

এ ছাড়া, আছে লম্বা এক আমেরিকান গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। নাম ভ্যান নুন [illegible] লেখাপড়ার এই পর্যায়ে গবেষণা করছে: কতবড় সর্বনাশ হচ্ছে বনাঞ্চলের। সে এক ডেমোক্রেট কংগ্রেসম্যানের ভাতিজা। চাচার অনুরোধে ব্রাযিলিয়ান সরকার তাকে জুটিয়ে দিয়েছে এই দলে। তাকে বলা হয়নি কী কাজে চলেছে ওরা। সাধারণ মানুষের জন্যে কত ক্ষতি হচ্ছে জঙ্গল ও স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের, তার ওপর প্রায় সর্বক্ষণ লেকচার ঝাড়ছে যুবক।

নদীর ডকে পৌঁছে রানা ভেবেছিল, আরেকজন আসবে ওর দলে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। এগনাল্ডো মেরিকে দেখে হতবাক হয়েছে লাবনী। মেনে নিয়েছে, এই মেয়ে ইরানি জাবাইরাহ্ আহদির চেয়েও সুন্দরী! তার চেয়েও বড় কথা, এই মেয়েও মস্ত এক পেট নিয়ে এসেছে রানার সঙ্গে দেখা করতে! কুটিল ভাবনা এল লাবনীর মনে: তবে কি প্রাচীন আমলের ব্রাহ্মণদের মতই নানান দেশে বীজ বপন করছে মাসুদ রানা? লজ্জা পেয়েছে এসব ভাবতে গিয়ে।

ওর লাল মুখ দেখে রানা হেসে বলল, 'বিশ্বাস করো, এটা কো-ইনসিডেন্স!'

'আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি,' মউরোসকে একবার দেখে

নিল লাবনী। 'তাই না, মিস্টার মউরোস?'

'তা তো বটেই,' কলা খাওয়ার ফাঁকে মাথা দুলিয়ে সায় দিল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি, নির্বিকার। 'তবে এ-ও ঠিক, ব্যাটাছেলের আবার বিশ্বাস কী!' রানার ভ্রুকুটিকে পাত্তা না দিয়ে কামড় দিল কলায়।

এগনাল্ডো মেরি সত্যিই এক্সপিডিশনে যেতে পারবে না বুঝে হতাশ হয়েছে রানা, কিন্তু ডকে যে ক্রেট নিয়ে এসেছে মেয়েটা, ওটা খুলে খুশি হলো। ক্রেটের ভেতরের জিনিস দেখেনি লাবনী, অবশ্য আঁচ করে নিয়েছে, ভেতরে অস্ত্র। মেরি চলে যাওয়ার পর জানতে চাইল, 'অস্ত্র?'

'মজার খেলনা,' মন্তব্য করল মউরোস।

'ইরানে এগুলো থাকলে বিপদ কমত,' বলল রা। 'জুলিয়ো বলেছে, স্থানীয় ইণ্ডিয়ানরা অত্যন্ত হিংস্র, কাজেই প্রয়োজনে ভয় দেখাতে হবে।'

'হিংস্র?' ভাবতে গিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল লাবনীর। 'মানুষ খুন করে ফেলবে?'

'ব্যক্তিগতভাবে ওদেরকে চেনে না জুলিয়ো, তবে খারাপ কিছু গল্প শুনেছে। ওদিকে গেলে কাউকে ফিরতে দেয় না ওরা।'

'জামাই আদর করে, না?' বলল লাবনী, 'বুঝলাম। কিন্তু আজকাল তো জংলি বলে কিছু নেই, আমরা সবাই আছি একুশ শতাব্দীতে!'

'তাতে কী?' প্রায় ভূতের মত নিঃশব্দে লাবনীর পেছনে হাজির হয়েছে জুলিয়ো। 'এখনও জঙ্গলে বেঘোরে খুন হয় মানুষ। আপনার মনে হচ্ছে এসব গল্প। কিন্তু বাস্তবে প্রতি বছর শত শত কাঠুরে, প্রসপেক্টর বা টুরিস্ট মরে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের হাতে।' চোখ সরু করে সন্দেহের দৃষ্টিতে ডক দেখছে সে। আশপাশের পুরনো সব কাঠের নৌকার ভেতর

ঝিকমিক করছে ইয়ট নোয়া, যেন দূর-গ্রহ থেকে আসা ইউএফও। 'এদিকে যাদেরকে দেখছেন, তারা অন্তর থেকে ঘৃণা করে ইণ্ডিয়ানদেরকে। আইন করে ইণ্ডিয়ানদের এলাকা আলাদা করে দিয়েছে সরকার। আজ যদি নতুন কোনও উপজাতি পাওয়া যায়, এদিকের মানুষের আয়রোজগার বন্ধ হবে। ইণ্ডিয়ানরা খুন করলেও তাদেরকে কিছুই করবে না সরকার। আর এজন্যেই আমার মত ইণ্ডিয়ান ট্র্যাকারদের দু'চোখে দেখতে পারে না স্থানীয়রা। তাদের দিক থেকেও বিপদ আসতে পারে।'

'এ তো পাগলের কথা!' জোরে বলে উঠল ভ্যান নুনান। জুলিয়োর মতই নীরবে থেমেছে লাবনীর পেছনে। 'আশপাশে উপজাতি আছে কি না, তা না বুঝে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করে না সরকার। তবে, হ্যাঁ, এই পুরো এলাকা অনেক আগেই সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেয়া উচিত ছিল। যেভাবে গাছ কাটা হচ্ছে, যেভাবে খনি থেকে তোলা হচ্ছে ওর, বা যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে জঙ্গল, সুস্থ মস্তিষ্কের যে-কেউ বলবে, এসব এখনই বন্ধ হওয়া উচিত। প্রতি দিন হাজার হাজার একর জমি খালি করছে গরুর খামার তৈরির জন্যে! ব্যাপারটা কিন্তু নিজ ফুসফুসের টুকরো বিক্রি করে দেয়ার মত। আর ওই টাকা দিয়ে কী হবে? বার্গার কিনে খাব আমরা!'

'খুবই খারাপ হচ্ছে, সত্যিই,' বলল মউরোস। 'কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কিছু হয়, ছোকরা! এত উঁচু গলায় কথা বললে, যে-কোনও সময়ে খুন হয়ে যায় বেয়াড়া মানুষ!'

কিছু বলতে হাঁ করেও খপ্ করে মুখ বন্ধ করল ভ্যান নুনান। ঝট্ করে ঘুরে রওনা হয়ে গেল আরেক দিকে।

'মিস্টার মউরোস,' হেসে ফেলল লাবনী, 'গত কয়েক ঘণ্টা যা পারিনি, তাই করেছেন মাত্র কয়েকটা কথা বলে। আপনাকে ধন্যবাদ! সত্যিকারের ট্যালেন্ট আপনি!'

উদাস হয়ে আরেকটা কলা ছিলে কামড় বসাল মউরোস। ভাবছে প্যারিসের জীবনের কথা।

নোয়ার মেইন কেবিন থেকে বেরিয়ে পেছনের ডেকে থামল সেসিলি। 'সব ঠিক তো? রওনা হতে চাইছেন ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো।'

'প্রায় সবই তোলা হয়েছে,' জানাল রানা। 'বাকি জিনিস তুলে নেব এখনই।'

ডক দেখল সেসিলি। 'সেক্ষেত্রে দেরি করব না, যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে চাই গন্তব্যে। দড়ি খুলে নিতে বলছি বাবুর্চি রবার্তোকে।' আবার কেবিনে গিয়ে ঢুকল ও।

নোয়ার ডেকে প্রয়োজনীয় ক্রেট তুলে ফেলল জুলিয়ো, মউরোস ও রানা।

নদী-তীরের শহরের নাম টেফে দেয়া হয়েছিল আমাজনের গভীর অংশের নামে। ওদিকেই পুবে এক শ' ত্রিশ মাইল লেক। বোটের আরেক পাশে থেমে চওড়া নদী দেখল রানা। ওর পাশে থামল লাবনী ও মউরোস।

'কুমিরগুলো দেখলে?' বলল মউরোস। 'ওই যে! শুধু চোখ তুলে দেখছে, চোয়াল ভরা হাসি।'

'এত দাঁত কেন?' আনমনে বলল লাবনী।

'আমাদের লবণাক্ত মাংস খাবে বলে!' বলল মউরোস।

'নাউযুবিল্লাহ্,' বিড়বিড় করল লাবনী।

পরের দেড় ঘণ্টায় লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পৌঁছে গেল নোয়া। উজান থেকে হড়হড় করে আসছে বিপুল পানি, তা ঠেলে এগোতেই ইঞ্জিনের বেশিরভাগ শক্তি ব্যবহার করছে ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো। আরও কিছুক্ষণ যাওয়ার পর কমল গতি। সামনে এঁকেবেঁকে গেছে টেফে নদী। মাত্র কয়েক শ' গজ যেতে না যেতেই বাঁক। কখনও নদী চওড়া হচ্ছে দু' শ' গজ, সরু হচ্ছে

আবারও। তখন দু'পাশে তীর থাকছে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। নোয়ার সরু বিশ ফুটি বিম, ফলে একবারও নদীতলে আটকে গেল না ইয়টের তলা। কখনও তীরের প্রকাণ্ড সব গাছ ছেয়ে ফেলল মাথার ওপরের আকাশ, মনে হলো সবুজ সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে চলেছে ওরা।

নানা রঙা তুলি হাতে এল সন্ধ্যা। বো-র কাছে রানার পাশে দাঁড়িয়ে সবুজ গাছের মাথায় সূর্য ডুবতে দেখল লাবনী। ইকুয়েটরে বড় দ্রুত আসে দিন বা সাঁঝ। কিছুক্ষণ পর নামবে ঘুটঘুটে আঁধার। পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাল লাবনী। ওর আগেই সেসিলি বলল, 'হাই!'

'হাই,' হাসল লাবনী।

'রওনা হয়ে তোমাকে আর দেখিইনি, কোথায় ছিলে?' জানতে চাইল সেসিলি।

'আবারও দেখছিলাম স্যাটালাইট ফোটোগুলো।'

'নতুন কিছু পেলে?'

মাথা নেড়ে রানার পাশের লাউঞ্জার চেয়ারে বসল লাবনী। 'ওদিকে কিছু থাকলেও, তা আছে ঝোপঝাড় বা গাছের আড়ালে। আগে থেকে দেখতে চাইলে চাই গ্রাউণ্ড রেইডার। মিস্টার ডেনিয়েলসন হয়তো জোগাড় করতে পারতেন।'

'বাবা বলেছিল,' বলল সেসিলি, 'কিন্তু নতুন অরবিটে সরাতে হবে স্যাটালাইট, তাতে সময় লাগবে। তার আগেই জায়গাটা নিজেরাই খুঁজে পেয়ে যাব। তাই মানা করে দিয়েছি বাবাকে।' রানা ও লাবনীর পাশের চেয়ারে বসল সেসিলি। ওদের দু'পাশে পিছিয়ে যাচ্ছে গহীন অরণ্য। 'ভাল করে দেখেছ চারপাশ? কী সুন্দর না? এত গাছ আর জন্তু-জানোয়ার! অথচ মানুষ কী করছে? ধ্বংস করছে সব!'

'সত্যি,' সায় দিল লাবনী, 'নুনান খুব বিরক্তিকর লোক, কিন্তু

ওর কথায় সত্যতা আছে।' আকাশের ঝিকমিক করা লাল-নীল-হলদে-সাদা হাজারো তারার দিকে তাকাল। 'মনে পড়ছে তোমার কথা, সেসিলি। ওই যে প্যারিসে বলেছিলে। পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি মানুষ আমরা। কথাটা ঠিকই বলেছ। আমরা সবাই মিলে মারপিট করছি একই সম্পদ দখলে রাখতে। সবাই ভাবছি, আমাদের বিশেষ অধিকার আছে, অন্যের চেয়ে বেশি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লাবনী। 'কেন খারাপ লাগে, জানো? আমরা একদিন সবই ধ্বংস করে ফেলব। অথচ, কিছুই করছি না পৃথিবীর জন্যে।'

মৃদু হাসল সেসিলি। 'কে জানে, একদিন হয়তো ভালর জন্যে কিছু করতে পারব আমরা।'

'কী করে?' মাথা নাড়ল লাবনী। 'মানুষ জন্ম নেয় শুধু অন্য কিছু ধ্বংস করে বেঁচে থাকার জন্যে পাল্টে যাব না আমরা। বদলে দিতে পারব না পৃথিবী।'

'সত্যিই একদিন সব অন্যরকম হবে, দেখো,' লাবনীর বাহুতে হাত রাখল সেসিলি, কণ্ঠ গম্ভীর। 'তুমি যখন আবিষ্কার করবে কোথায় আছে আটলান্টিস, ওটাই বদলে দেবে পৃথিবীর সব। খুব কম মানুষই তোমার মত পারবে এক পলকে ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে বদলে দিতে।'

'শুধু আমি কেন? এই এক্সপিডিশনে তুমি বা রানার গুরুত্ব মোটেও কম নয়। বরং বেশিই বলব। তোমরা না থাকলে আজ এখানে আসতেই পারতাম না। আরেকজনের কথা না বললে অন্যায় হবে। তোমার বাবা এত টাকা খরচ না করলে, বৃথা হতো আমার সব স্বপ্ন। তিনি বিরাট ভূমিকা রেখেছেন।'

মাথা নাড়ল সেসিলি। 'না, টাকা সব নয়। উদ্দেশ্যহীন টাকা কোনও কাজে আসে না। বাবা বা আমি উদ্দেশ্য নিয়ে টাকা খরচ করছি, যাতে সফল হতে পারি। ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ

করছ তুমি বা রানা। আসলে ঠিকই বলেছ, কারও গুরুত্বই কম নয়।' লাবনীর বাহুতে মৃদু চাপড় দিল সেসিলি। 'জানো, তোমার সঙ্গে অনেক মিল আছে আমার?'

'তাই? আমার তো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নেই।'

'কয়েক বিলিয়ন ডলারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আটলান্টিস আবিষ্কার করা। আর সে কাজে তুমি নিয়োজিত না হলে, আরও হাজার বছর লাগত কারও আটলান্টিস খুঁজে বের করতে।'

চুপচাপ মেয়েদুটোর কথা শুনছে রানা। হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল। ধুব-ধুব আওয়াজ তুলছে নোয়ার ইঞ্জিন। নিউট্রাল করা হয়েছে থ্রটল। গতি কমছে নৌযানের। যদিও এখনও পানি কেটে সামনে বাড়ছে বো।

রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'আমরা থামছি কেন? কোনও সমস্যা?'

'সমস্যা নয়,' বলল রানা। 'এত আঁধার নদীতে ন্যাভিগেট করা কঠিন। বিপদ হতে পারে। ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো কোনও ঝুঁকি নিচ্ছেন না।' পেছনের ডেকের নিচে ঝনঝন শব্দ হলো। পরক্ষণে পানিতে ঝপাস্ আওয়াজ। 'নোঙর ফেলা হয়েছে।'

'তার মানে ডিনারও রেডি,' বলল সেসিলি। 'চমৎকার রাঁধে ইতালিয়ান বাবুর্চি রবার্তো। নামকরা এক সেভেন স্টার হোটেল থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। এখন খাবারের জন্যে যে-কোনও সময়ে ডাক পড়বে।'

'খাবারের কথা যখন উঠল, বলল রানা ওর পাশে থেমেছে মউরোস। ওর হাতে পাকা পেয়ারা। ওটা খপ করে কেড়ে নিল রানা, পরক্ষণে বন্ধুর আপত্তি সত্ত্বেও ফেলে দিল নদীতে। অন্ধকারে ভেজা ছলাত শব্দ হলো।

'এবার দেখো,' চেয়ার ছেড়ে রেলিঙে থামল রানা। পাশে অন্যরা। রানার হাতে ছোট কিন্তু শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট। ওটা

জ্বেলে দিতেই নদীতে দেখা গেল কয়েক ডজন হলদে আলো একেকটা যেন পোখরাজ মণি।

'ওগুলো কী?' জিজ্ঞেস করল লাবনী। তখনই নিভে গেল সামনের পোখরাজ মণি।

'ডুব দিল, কিছু না পেলে আবারও অপেক্ষা,' বলল রানা। 'কুমিরের ধৈর্যের শেষ নেই।'

হলদে চোখগুলো দেখে গলা শুকিয়ে গেছে লাবনীর। নার্ভাস সুরে বলল, 'আমরা কি এখানে নিরাপদ?'

'পানিতে না নামলে ধরতে পারবে না,' বলল রানা।

'আরও আছে পিরানহা,' উৎসাহের সঙ্গে বলল মউরোস। 'জানেন, মাত্র এক মিনিটে সাফ করে দেবে আপনাকে, রাখবে শুধু হাড়গুলো!'

লাবনী কিছু বলার আগেই ঢং-ঢং শব্দে জোরে বাজল ঘণ্টি।

ডাক পড়েছে রাজসিক ডিনারে।

তেরো

ভোর হতেই নোঙর তুলল ইয়ট নোয়া, সাপের মতই এঁকেবেঁকে চলল সরু নদী ধরে। ততক্ষণে মুখ-হাত ধুয়ে যে-যার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা ডেকে। রানার সঙ্গে লাবনীর দেখা হলো ব্রিজে। ল্যাপটপে আমাজন জঙ্গলের ইমেজ দেখছে রানা, সেসিলি ও জুলিয়ো। হুইলে ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো, সাবধানে নিয়ে চলেছে বোট।

'ঘুম কেমন হলো?' মুখ তুলে লাবনীকে দেখল রানা।

'ভাল। তোমাদের?'

মাথা দোলাল রানা ও জুলিয়ো।

'সার্চ এরিয়ার নতুন পাওয়া এরিয়াল ছবি,' কাজের কথায় এল সেসিলি। ল্যাপটপ বাড়িয়ে দিল লাবনীর দিকে। স্ক্রিনে দেখা গেল সামনের নদী। কখনও কখনও নিজেই নিজের পেটে ঢুকে তৈরি করেছে গোলকধাঁধা। মাঝে মাঝে ছোট সব দ্বীপ। 'চারটে সাইট বিশেষভাবে দেখব, ওখানেই পাওয়ার কথা হারিয়ে যাওয়া শহর।'

গভীর, সবুজ অরণ্যের হাই-রেযোলুশন ছবি দেখছে লাবনী। কোথাও কোথাও ছায়া। চারটে এলাকা যুম্ করে সেখানে বসিয়ে দেয়া হয়েছে হলদে চারটে পিন। সেগুলোর একটায় গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের ভেতর ধূসর পাথুরে কী যেন। লাবনী মন্তব্য করল, 'ওটা হতে পারে পুরনো কোনও মন্দির।'

'গাছের তলে আস্ত এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লুকিয়ে রাখতে পারবে,' বলল রানা, 'ওপর থেকে দেখবে না কেউ। ওখানে কী আছে জানতে হলে, নামতে হবে তীরে।'

স্ক্রিনে ম্যাপ আনল সেসিলি। 'ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো বলছেন, এ এলাকার তিন মাইলের ভেতর পৌঁছতে পারবেন। তারপর নদী বেশি সরু। ওখান থেকে যোডিয়াক করে এগোতে হবে।'

'যা ভেবেছি, তার চেয়ে অনেক কাছে পৌঁছুতে পারব, সেটা কম কথা নয়,' বলল লাবনী। ম্যাপ দেখছে। 'আর কতক্ষণ লাগবে ওখানে পৌঁছুতে?'

ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল স্ক্রিন দেখল ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো। 'আপাতত যাচ্ছি বারো নট গতিতে। পনেরো কিলোমিটার গেলে সরু আরেকটা উপনদী। ওখানে এঁকেবেঁকে গেছে পথ। তখন থেকে কমাতে হবে গতি। গতকাল যেভাবে যেতে পেরেছি,

তাতে আমার ধারণা, আগামী চার ঘণ্টায় ওখানে পৌঁছে যাব।'

'সন্ধ্যার অনেক আগেই,' বলল লাবনী। রানার দিকে তাকাল। 'ওখানে পৌঁছে আমাদের প্ল্যান কী হবে?'

রানার দিকে চেয়ে আছে জুলিয়ো, সেসিলি ও ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো। 'দেরি করব না,' বলল রানা। 'আগেই গুছিয়ে নিতে হবে কী কী নেব।'

ল্যাপটপ বন্ধ করে ব্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল সেসিলি।

'একটা কথা দিতে হবে তোমাকে, লাবনী,' বলল রানা।

'সেটা কী?' ভুরু উঁচু করল মেয়েটা।

'উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করবে না। ওখানে গোপন ফাঁদ বা কূপ থাকতে পারে। বুবি ট্র্যাপ থাকার খুবই সম্ভাবনা আছে।'

'সিনেমার মত?' হাসল লাবনী। 'বাস্তবে কিছুই থাকবে না। আর থাকলেও গত দশ-এগারো হাজার বছরে নষ্ট হয়ে গেছে সব।'

'তবুও আমি চাই তুমি সতর্ক থাকবে। প্রমিয করছ?'

'প্রমিয।'

তখনই ঘণ্টি বাজিয়ে ঢং-ঢং শব্দে জানিয়ে দেয়া হলো নাস্তা তৈরি। বন্ধ হয়ে গেল লোয়ার ইঞ্জিন।

আধঘণ্টা পর আবারও সামনে বাড়ল ইয়ট। ডেকে এসে পায়চারি করছে সবাই। ক্রমেই আরও সরু হলো উপনদী। তিন ঘণ্টা পর থামল ইঞ্জিন। 'আমরা আর সামনে যাব না,' ব্রিজের দরজা থেকে জানিয়ে দিল ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো।

জিপিএস অনুযায়ী, ওরা আছে সার্চ যোনের তিন মাইল দূরে। সামনের নদী অগভীর, এগোবে না ইয়ট এখান থেকে যোডিয়াক ব্যবহার করবে রানারা।

কিছুক্ষণের ভেতর ইয়ট থেকে নদীতে নামিয়ে দেয়া হলো ছোট বোট। মন্থর গতিতে সরছে পানি, তাতে ভাসছে গাছের

গুঁড়ি, পচা লতাপাতা ইত্যাদি। ভাপসা গন্ধ চারপাশে।

ব্রিজের জানালা দিয়ে সামনের জঙ্গল দেখল লাবনী। সেই আগের মতই চারপাশে সবুজ। যেন একই জায়গায় আটকা পড়েছে ওরা।

'আমরা ছয় ঘণ্টা সময় পাচ্ছি,' লাবনীকে বলল রানা। 'এর ভেতর পৌঁছতে হবে সাইটে। কাজটা কঠিন হবে না। দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

আগেই বলে দেয়া হয়েছে, খুব দরকারী জিনিস ছাড়া কিছুই সঙ্গে নেবে না কেউ।

দশ মিনিট পর তৈরি হয়ে গেল সবাই।

পুরুষরা বহন করবে পানি, খাবার, সার্ভাইভাল গিয়ার ও ইনসেক্ট রিপেলেন্ট। কেবিন থেকে বেরোবার সময় কী ভেবে আটলান্টিয়ান সেক্সট্যান্টের বাহু টেবিল থেকে নিল লাবনী, একবার মিলিয়ে দেখল গলার লকেটের সঙ্গে, তারপর কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখে দিল ওটা নিজের ব্যাগে।

কখন যেন ওর পেছনে থেমেছে সেসিলি। নরম সুরে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি ওটা সিন্দুকে তুলে রাখবে।'

'তাই করব ভেবেও পরে সিদ্ধান্ত পাল্টেছি,' বলল লাবনী। 'হয়তো সাইটে গিয়ে কাজে লাগবে। ওখানে কিছু পেলে সেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারব।'

আর কিছু বলল না সেসিলি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল রানা, 'তোমরা রেডি?'

'হ্যাঁ,' একই সাথে বলল লাবনী ও সেসিলি।

আগেই সব মালপত্র তুলে ফেলা হয়েছে যোডিয়াকে। একে একে বোটে উঠল ওরা। আরেকবার সতর্ক করল রানা, 'কেউ পানিতে নামবে না বা ভুলেও এই পানি ছোঁবে না।'

'তাতে সমস্যা কী?' আপত্তির সুরে বলল ভ্যান নুনান। 'প্রকৃতির জিনিস।' যুবকের পরনে টকটকে লাল শার্ট। চার পাশের জঙ্গলের সঙ্গে মোটেও মানাচ্ছে না। 'বৃষ্টির পরিষ্কার পানি, কোনও লোক কখনও নষ্ট করেনি এই পবিত্র জিনিস!'

'তো স্ট্র লাগিয়ে খেয়ে দেখো,' বলল মউরোস। 'পরে বোট থেকে পায়খানাও তুমিই পরিষ্কার করবে।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল নুনান। 'তা হবে কেন?'

'তবে কি আমরা তোমার পায়খানা পরিষ্কার করব ভাবছ? ডেক ভরে হাগু করে ভাসাবে।' দুই হাতে দেখিয়ে দিল কতটা জায়গা ময়লা হবে।

'কিন্তু...' মেয়েরা চেয়ে আছে দেখে চুপ হয়ে গেল নুনান।

বোটে কোনও সিট নেই। সামনে গোলাকার অংশে বসেছে রানা। আর বোটের পেছনে বসে আউটবোর্ড মোটর চালাবে মউরোস। নৌকার প্রশস্ত অংশে মুখোমুখি বসেছে লাবনী ও সেসিলি। ওদের পর পেছনে জুলিয়ো ট্যানাগো, প্রফেসর জিম করেলি, অগাস্টিন পেদরো আর ভ্যান নুনান। রানার পায়ের কাছে পড়ে আছে ক্যাম্পিং গিয়ার ও অস্ত্রের ব্যাগ।

'ঠিক আছে, সবাই রেডি?' জানতে চাইল রানা। জবাব দিল না কেউ। ইয়টের দিকে তাকিয়ে বাবুর্চি রবার্তোকে হাতের ইশারা করল রানা। লোকটা খুলে দিল দড়ি। আউটবোর্ড মোটর চালু করে রওনা হলো মউরোস। সরে এল ইয়ট থেকে, তারপর বাড়াল গতি। চলেছে উজানে।

সার্চ এরিয়ায় ঢুকে পড়েছে ওরা। মাত্র বিশ ফুট দূরেই তীর, কিন্তু জঙ্গুলে এলাকায় জমেছে ঘন কুয়াশা, কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে না গাছের গুঁড়ি। অনেক কমে গেছে তাপমাত্রা। রানা, মউরোস ও জুলিয়ো ছাড়া অন্যরা ভেবেছিল, গরম কমলে ভাল লাগবে, কিন্তু টের পেল কেমন এক অস্বস্তি। ভিজে যাচ্ছে হাত-

পা-মুখ। প্রথম প্রথম চারপাশে ছিল পাখির কূজন ও জন্তুর ডাকাডাকি, কিন্তু সেটাও থেমে গেছে।

বারকয়েক পরস্পরকে দেখল রানা, মউরোস ও জুলিয়ো। নজর রেখেছে তীরের দিকে। হামলার জন্যে তৈরি। মুখে ওরা কিছু না বললেও সতর্ক হয়ে উঠল অন্যরা।

সামনের বাঁক পেরিয়ে রানার কাছে জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'ওটা কী!'

'কিছু সরে গেল,' সহজ সুরে বলল রানা।

'রানা,' বামদিকে দেখাল জুলিয়ো। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল লাবনী, কিন্তু ওদিকে কাউকে দেখতে পেল না।

'হ্যাঁ, দেখেছি,' নিচু স্বরে বলল রানা।

লাবনীর মনে হলো, সারি সারি গাছ ছাড়া কিছুই নেই এই গহীন অরণ্যে। জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখলে?'

'কাদার ভেতর পায়ের ছাপ,' বলল রানা। দেখিয়ে দিলেও পায়ের ছাপ লাবনীর চোখে পড়ল না।

'চমৎকার!' বরাবরের মতই গলা উঁচিয়ে বলল ভ্যান নুনান। আপত্তির দৃষ্টিতে ওকে দেখল রানা, মউরোস ও জুলিয়ো। 'এই প্রকৃতির বুকে এসে বুঝছি, ভুল করিনি! এমন এক উপজাতির সঙ্গে দেখা হবে, যাদের সঙ্গে আগে পরিচয় হয়নি সভ্য মানুষের! আপনি কি বলেন, জুলিয়ো?'

'আগেও ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে অন্যদের,' নিচু স্বরে বলল জুলিয়ো, 'কিন্তু জান নিয়ে ফিরে গিয়ে কাউকে বলতে পারেনি।'

'জ্যাঁ,' চাপা স্বরে বলল রানা।

আউটবোর্ড ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি।

'কী হলো, রানা?' ফিসফিস করল লাবনী।

জবাবে সামনের দিকে দেখাল রানা।

ধীরে ধীরে কুয়াশার ভেতর দিয়ে চলেছে বোট, কাছে চলে আসছে কী যেন। মনে হলো পানির অনেকটা ওপরে। হঠাৎ ছেঁড়া কুয়াশা সরতেই পরিষ্কার দেখা গেল, বাঁশের সঙ্গে বাঁধা কিছু। বেশ কয়েকটা।

না, ভুল... বাঁশের তীক্ষ্ণ ডগার ওপর চড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

বাঁশের শূল!

গাল কুঁচকে রানাকে দেখল লাবনী। যা দেখছে, তাতে বমি চলে এসেছে গলার কাছে।

লাশ!

বেশ কয়েকটা!

পচে গলে গেছে! খুবলে খেয়েছে বুনো জন্তু। জায়গায় জায়গায় বেরিয়ে এসেছে রক্তাক্ত হাড়।

প্রথম খুঁটিতে নাক ডলল বোট। চট্ করে জুলিয়োর দিকে তাকাল রানা। ওর দিকে বৈঠা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল জুলিয়ো, 'তোমার কী মনে হয়, এরা আছে কত দিন ধরে?'

লাশ দেখে নিয়ে নিচু স্বরে বলল রানা, 'অন্তত কয়েক মাস।' বৈঠা মেরে বোট সরিয়ে নিল। একটু এগোতেই দেখা গেল আরও কয়েকটা বাঁশে গেঁথে আছে বেশ কয়েকজন।

হতবাক হয়ে সব দেখছে ভ্যান নুনান। হঠাৎ হড়হড় করে বমি করল নদীতে। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'সত্যিকারের হারিয়ে যাওয়া উপজাতি!'

'ওরা আড়ালেই থাকতে চায়,' বলল লাবনী।

'আর তাই সতর্ক করে দিয়েছে,' মন্তব্য করল সেসিলি।

'আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরা আসলে ওদের জন্যে বিপজ্জনক নই,' বলল নুনান, 'অনেক তথ্য পাব ওদের কাছ থেকে। সত্যিকারের অ্যানথ্রোপলোজিকাল ডেটা!'

'এর চেয়ে আর্কিওলজি বহু গুণে ভাল,' বিড়বিড় করল

লাবনী। 'যা পাই, সবই হয় মরা, তারা কখনও খুঁটির ওপর ঝোলে না। ...হায়, আল্লা!' লাফিয়ে সরে গেল ও, ভয়ঙ্করভাবে দুলিয়ে দিয়েছে বোট। 'রানা! বোট থামাও! থামো!'

হোলস্টার থেকে ওয়াইল্ডি বের করেছে রানা। দুই সেকেণ্ড পর বুঝল, ভয়ে চিৎকার করেনি লাবনী। ও উত্তেজিত। 'কী ব্যাপার?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল রানা।

'ওই শরীরটা...'

'হ্যাঁ, কী?'

'ওটা!' দেখাল লাবনী।

সামনের লাশের নিচের চোয়াল খসে পড়েছে। পচে গেছে পোশাক, যদিও বুকে ইনসিগনিয়া।

ওটা দেখেই চমকে গেছে লাবনী।

ওই ইনসিগনিয়া হিটলারের অশুভ শাট্‌যস্টাফেল বা এসএস-এর।

'এরা?' আনমনে বলল রানা। 'নাযি? এখানে?'

'পেপারে পড়েছি, আবারও পৃথিবী দখল করবে বলে সব গুছিয়ে নিচ্ছে ওরা,' বলল লাবনী। 'সংগঠিত হচ্ছে জার্মানিতে। ইউরোপিয়ান অন্য দেশেও। এসএস-এর আর্কিওলজিকাল বিভাগ আহনেনেরবের লোক এরা। আজও খুঁজছে কোথায় আটলান্টিস। ওদের ধারণা, আটিলান্টিয়ানদের আত্মীয় তারা। নীল রক্ত তাদের। রাজ বংশ। আবারও একদিন রাজত্ব করবে গোটা পৃথিবী জুড়ে। কিন্তু জানতাম, নতুন আহনেনেরবের লোক এক্সপিডিশন করে এশিয়ায়, জানতাম না আমেরিকায়...'

'যে কারণেই হোক, এসেছিল,' বলল সেসিলি। লাবনীর ব্যাগ দেখাল। ওটার ভেতর সেক্সট্যাণ্টের বাহু। 'হয়তো তোমার মতই এসব খুঁজছে।'

'কিন্তু আহনেনেরবের লোক একসঙ্গে যেত বারোজন করে,'

বলল লাবনী।

'অন্যরা হয়তো পালাতে পেরেছে,' বলল রানা। 'এবার কী করবে ভাবো। জঙ্গলের বন্ধুরা আমাদের খুশি মনে মেনে না-ও নিতে পারে।'

'ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না,' বলল সেসিলি। 'সামান্য এক বুনো উপজাতি যা খুশি করবে বলে...'

'আমার... ইয়ে... মনে হচ্ছে...' বলেও চুপ হয়ে গেল ভ্যান নুনান।

'কী?' জিজ্ঞেস করল মউরোস।

'প্যান্টটা ভিজে গেছে,' লাল হয়ে গেল পরিবেশবাদীর মুখ।

কথাটা শুনেও ফিরে দেখল না রানা। দেখছে কুয়াশা। 'ডান দিকের তীরে উঠতে পারি। ওদিকের জঙ্গল একটু হালকা।'

'সত্যিই কি জংলিদের ভেতর নামব আমরা?' প্রায় কেঁদে ফেলল নুনান।

সবার হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিচ্ছে রানা। ওকে সাহায্য করছে মউরোস ও জুলিয়ো।

'সবাই অস্ত্র হাতে তৈরি থাকবেন,' সতর্ক করল রানা।

ভ্যান নুনান রাইফেল নিল, কিন্তু হাত কাঁপছে থরথর করে।

'সেসিলি, তোমার অস্ত্র...' বলতে গেল রানা।

বাধা দিল সেসিলি, 'এটা কোল্ট কমাণ্ডো এম৪এ১৫, .৫৬ মিলিমিটার অ্যাসল্ট রাইফেল, ম্যাগাযিনে ত্রিশ রাউণ্ড গুলি, এফেকটিভ রেঞ্জ এক শ' ষাট মিটার।' রানার চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে ইজেক্ট করল ম্যাগাযিন, দেখে নিল গুলিতে ভরা। আবার অস্ত্রে ম্যাগাযিন গুঁজে প্রথম রাউণ্ড দিল চেম্বারে। একবারও তাকায়নি অস্ত্রের দিকে।

'ঠিক আছে,' মাথা দোলাল রানা, সন্তুষ্ট।

'আমাকে কোনও অস্ত্র দিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

নিজেই বলল, 'যদিও দিয়ে কোনও লাভ নেই।'

'আমরা ঠিক তিন ঘণ্টা জঙ্গলে খুঁজব,' বলল রানা। 'আবার এখানে ফিরব বিকেল তিনটের সময়। এখানে ক্যাম্প করব না। বোট নিয়ে ফিরব ইয়টে। সবাই বুঝতে পেরেছেন?' মাথা দোলাল সবাই। 'জুলিয়ো আর আমি সামনে হাঁটব। পেছনে থাকবে মউরোস। মাঝে থাকবেন আপনারা। তবে বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটবেন না। লাবনী, তুমি থাকবে সেসিলির খুব কাছে। ওকে বলতে পারো তোমার বডিগার্ড।'

মৃদু হাসছে সেসিলি। মিলিটারি কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে।

কাঁপা স্বরে বলল লাবনী, 'ঠিক আছে, তা হলে চলুন, আমরা খুঁজতে শুরু করি!'

'কী খুঁজতে শুরু করবেন?' জানতে চাইল নুনান। 'আপনারা তো আমাকে এসব কিছুই বলেননি আগে?'

'বলেই বা কী হবে, ছোকরা?' বলল মউরোস। 'আমাদের সঙ্গে নেমে পড়ো বোট ছেড়ে। আর এখন থেকে হিশু এলে গাছের গায়ে কাজ সেরে নেবে।'

প্রথম ঘণ্টায় ওরা পৌঁছল চার সাইটের প্রথমটায়। মনে হলো না জঙ্গলের এদিকে কোনও শহর আছে। বিশ মিনিট খুঁজল, তারপর বুঝে গেল সময় নষ্ট হচ্ছে। এরিয়াল ফোটোতে আলো-ছায়া থেকে মনে হয়েছিল, প্রাচীন কোনও নগরী ছিল এদিকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, আছে শুধু সারি সারি পাথর।

'আমরা আশা করতে পারি না যে প্রথমবারেই সব পেয়ে যাব,' সবাইকে বলল রানা। লাবনীর পাশের পাথরে ম্যাপ ও কমপাস রেখে রিডিং নিল। বাদ পড়ল না জিপিএস স্যাটালাইট দেখে নেয়া। 'রয়ে গেছে আরও তিনটে সাইট। চলো, রওনা হয়ে যাই।'

'পরের সাইট কতটা দূরে?' রানার কাছে জানতে চাইল

লাবনী।

আঙুল তুলে সামনের দিক দেখিয়ে দিল রানা। 'কমপক্ষে একমাইল। হয়তো তৃতীয় সাইটও দেখতে পারব আজই। তারপর ফিরতে হবে বোটে।'

'দ্বিতীয় সাইট দেখেও ফিরতে পারি,' বলল মউরোস। 'ঠিক সময়ে ইয়টে গেলেই তুরুপ জিনিস রবার্তোর রান্না!'

'সামনের দিকে রওনা হয়ে যাও, বাছা,' তাড়া দিল রানা।

রানা-জুলিয়োর পেছনে চলল সবাই। লাবনী ছাড়া অন্যদের কাঁধে ঝুলছে রাইফেল, হাতে ম্যাশেটি। মাত্র দশ মিনিট হাঁটার পর অনেকটা হালকা হলো গাছের সারি। বাধ্য না হলে গাছপালা কাটছে না কেউ। মনে হলো এদিকে সরু কোনও পথ ছিল। আগের চেয়ে দ্রুত হাঁটতে পারল ওরা।

'কপাল এত ভাল হওয়ার বিশেষ কোনও কারণ নেই,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'কী বলছ?' দশ ফুট পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল লাবনী। রানার কথা মেনে সেসিলির সঙ্গে আসছে। কেউ খুব কাছাকাছি নয়।

'আমরা পুরনো কোনও পথে চলেছি, আর সে কারণে বেশি ঝোপঝাড় কাটতে হচ্ছে না,' দু'পাশের ঘন গাছ দেখাল রানা।

ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখল লাবনী। 'হায়, আল্লা, তা হলে তো যে-কোনও সময়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ব!'

'আমরা সাবধানে এগোব,' বলল রানা।

'নইলে রবার্তোর তৈরি খাবারের স্বাদ নিতে পারব না,' বলল মউরোস।

জঙ্গলের ভেতর মাথা নিচু করে ডাল এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে। গাছের ভেতরে ঘনভাবে ভাসছে কুয়াশা। বড়জোর পঞ্চাশ ফুট দূরে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল জুলিয়ো। সে হাত উঁচু

করতেই থেমে গেছে সবাই। নিচু হয়ে মাটি দেখছে ইণ্ডিয়ান ট্র্যাকার। 'পায়ের ছাপ,' নিচু স্বরে বলল।

'দেখে মনে হচ্ছে একদিন আগের,' পাশ থেকে মন্তব্য করল রানা।

'বুঝলে কী করে?' জানতে চাইল লাবনী। পাতার নিচে ওটা যে পায়ের ছাপ, তা-ই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'সবসময় খালি পায়ে হাঁটে বলে ছড়িয়ে পড়েছে আঙুল,' বলল রানা।

সামনের কুয়াশার দিকে চেয়ে আছে জুলিয়ো। 'শহর না পেলেও এই উপজাতি যে অজানা, তা বুঝলাম। আর এটা বুঝি বলেই কাঠুরে বা খামার মালিকরা আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। সরকার জানলে এটা সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা দেবে।'

'এ অকল্পনীয়!' বলল নুনান। সেসিলি ও লাবনীকে ঠেলে সামনে এগিয়ে এসেছে। 'আমরা হব ওই উপজাতির সঙ্গে দেখা করা প্রথম মানুষ! আর একবার শান্তিপূর্ণভাবে যোগাযোগ করার পর, ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারব কত কিছুই! সভ্য জগতে সবাই বলবে...

সামনের জঙ্গল থেকে এসে নুনানের বুকে বিঁধল বর্শা। টকটকে লাল শার্টের বুক ভিজে কালচে হয়ে গেল রক্তে।

তীক্ষ্ণ এক আর্তচিৎকার ছাড়ল লাবনী। বড় বড় চোখে নিজের বুক দেখছে নুনান। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে। পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কাঠের বর্শার চার ফুট দণ্ড। কাত হয়ে পড়ে গেল যুবক।

রাইফেল তুলেই সামনের জঙ্গলে তাক করেছে রানা ও মউরোস। ওদিক থেকেই এসেছে বর্শা। এদিকে লাবনীকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে অস্ত্র হাতে চারপাশ দেখছে সেসিলি।

তখনই জুলিয়োর বাহুতে গাঁথল তীর, ফলা অবসিডিয়ান। ওর হাত থেকে পড়ে গেল ম্যাশেটি। তীব্র ব্যথা পেয়ে কণ্ঠ চিরে বেরিয়েছে গোঙানি। পিছিয়ে গেছে কয়েক পা। হোঁচট খেয়ে পড়ল নুনানের লাশের ওপর।

একই সময়ে উড়ে এসে রানার কপালে জাপ্টে গেল কী যেন। মাঝারি ওজনের বোলা!

টলমল করতে করতে মাটিতে পড়ল রানা। ওজনদার কর্ড গেঁথে বসেছে ওর কপাল ও মাথার মাংসে।

লাবনীর পেছনে মউরোসকে মৃদু আঁতকে উঠতে শুনল রানা। আরেকটা বোলা জড়িয়ে গেছে মার্সেনারির ঘাড়ে। আটকে দিয়েছে শ্বাস। পাগলের মত কর্ড সরাতে চাইছে সে।

লাবনী ও সেসিলির পাশের মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রফেসর জিম করেলি। মাথার একফুট ওপর দিয়ে সাঁই করে গেল একটা বর্শা।

মরিয়া হয়ে টার্গেট খুঁজছে সেসিলি। কিন্তু কুয়াশা ও গাছের কাণ্ড ছাড়া কিছুই দেখল না।

প্রকাণ্ড সব গুঁড়ির মাঝে ছোটাছুটি করছে কারা যেন। অস্ত্র তুলেই ওদিকে তাক করল সেসিলি, দুই কাণ্ডের মাঝে একটা দেহ দেখেই টিপে দিল ট্রিগার।

গুড়ুম!

তখনই সেসিলির মাথায় লাগল কী যেন। বোলা নয় ওটা। বর্শাও নয়। মুঠোসমান এক পাথর। কিন্তু যে ছুঁড়ে দিয়েছে, সে ওস্তাদ লোক, ঠিকই লক্ষ্যে লেগেছে প্রচণ্ড জোরে।

অচেতন না হলেও ধুপ করে কাদাটে মাটিতে পড়ল সেসিলি। কাজ করছে না মাথা। হাত থেকে পড়ে গেছে রাইফেল। কিছুই বুঝছে না। এ কারণেই ভীষণ ভয় লাগল ওর। ক'সেকেণ্ড পর হাত বাড়াল রাইফেলের দিকে, কিন্তু ততক্ষণে

দেরি হয়ে গেছে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগেও ওরা ক'জন ছাড়া জঙ্গলে কেউ ছিল না, কিন্তু এখন পুরো এলাকা ভরে গেছে একদল লোকের ভিড়ে। কালো চুল তাদের, ত্বক বাদামি, চোখে হিংস্রভাব, হাতে মারাত্মক বিপজ্জনক সব ধারালো অস্ত্র। শত্রুদের বুকে ও পিঠে ঠেকিয়ে দিয়েছে তীক্ষ্ণ সব ফলা।

চোদ্দ

রানাদেরকে ঘিরে ফেলেছে কালো বর্শাধারী ইণ্ডিয়ানরা, তিন ফুট দূর থেকে ফলা তাক করেছে ওদের বুক-পিঠে। কপালের ব্যথা এড়াতে বোলা খুলতে চাইছে রানা। শ্বাস আটকে খক-খক করছে মউরোস। কাছেই লাবনী, কাঁপছে ভয়ে। একটু দূরেই সেসিলির রাইফেল, কপাল টিপে ধরে বসে আছে মেয়েটা।

'কী করছ!' লাবনীকে হিসহিস করে বললেন করেলি। 'অস্ত্রটা হাতে নাও! নইলে আমাদেরকে খুন করবে ওরা!'

প্রফেসরের কথা পাত্তা না দিয়ে সামনের লোকটার চোখে চোখ রাখল লাবনী, খুবই ধীরে পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে খুলল ওপরের ফ্ল্যাপ।

এতে আরেক পা সামনে বাড়ল লোকটা।

ব্যাগ থেকে হাত বের করে কাপড় খুলে ভারী আর্টিফ্যাক্টটা ইণ্ডিয়ানের দিকে বাড়িয়ে দিল লাবনী।

থমথম করছে চারপাশ।

যে-কোনও সময়ে খুন হবে ওরা।

অবশ্য এক সেকেণ্ড পর উত্তেজিত স্বরে কী যেন বলল লোকটা। অচেনা কোনও ভাষা। জবাবে কী যেন বলছে ইণ্ডিয়ান যোদ্ধারা। বিচলিত তারা।

লাবনীর হাত থেকে ধাতব পাত নিল লোকটা, সরিয়ে ফেলল বর্শার ফলা। লাবনীকে ঘিরে ফেলল কমপক্ষে বারোজন যোদ্ধা। একটানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে। টেনে তোলা হয়েছে দলের অন্যদেরকেও। মাথার ব্যথায় হাঁপিয়ে উঠেছে সেসিলি। ঠিকভাবে দেখছে না চোখে। এক ইণ্ডিয়ান ওর আহত হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বলে গুঙিয়ে উঠল জুলিয়ো।

বোলা খুলে রানা বুঝল, এরা ভাল করেই চেনে আগ্নেয়াস্ত্র। চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে সব অস্ত্র। বাদ পড়ল না মউরোস ও ওর পিস্তলগুলোও।

'লাবনী, সেসিলি, তোমরা সুস্থ?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। ওর গলায় ধারালো ছোরা ঠেকিয়ে রেখেছে এক ইণ্ডিয়ান, কঠোর চোখে দেখছে শত্রুকে।

'সেসিলি আহত,' বলল লাবনী।

'না, ঠিক আছি,' বলল সেসিলি। 'কী হলো আসলে?'

'ওদের দিয়ে দিয়েছি আমাদের আর্টিফ্যাক্ট,' জানাল লাবনী।

অবিশ্বাস নিয়ে ওকে দেখল সেসিলি 'কী করেছ?'

'এ ছাড়া উপায় ছিল না, নইলে খুন করত সবাইকে।'

সেক্সট্যান্টের বাহু রোদে ধরে সবাইকে দেখাচ্ছে ইণ্ডিয়ান। ভঙ্গি দেখে মনে হলো ওটা পবিত্র কিছু। প্রায় সবার চোখে-মুখে বিস্ময়। বারবার সন্দেহ নিয়ে দেখছে রানার দলের সবাইকে। নিজেদের ভেতর চলছে আলাপ।

'জুলিয়ো, এদের ভাষা বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিছু কিছু শব্দ,' ব্যথার কারণে মুখ কুঁচকে ফেলেছে আহত

ইণ্ডিয়ান ট্র্যাকার। 'এরা জানে ওটা কী। কিন্তু... মনে হয় না আগে কখনও দেখেছে।'

'ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'ওদের বলো, আমরা এসেছি ওটা ফিরিয়ে দিতে,' বলল রানা, 'নইলে কখনও আসতাম না পানির দেবতার শহরে।'

এমন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল জুলিয়ো, মনে হলো আস্ত পাগল দেখছে। 'ওই ভাষায় এসব বলা খুব কঠিন।'

'চেষ্টা করো!'

দলের সবাই দেখছে রানা ও জুলিয়োকে। বুঝে গেছে, এরা দু'জন পরিস্থিতি সামলাতে না পারলে মরবে ওরা সবাই।

কয়েক সেকেণ্ড পর কথা শুরু করল জুলিয়ো। হোঁচট খেয়ে চলল ওর বক্তব্য। মন দিয়ে শুনছে ইণ্ডিয়ানরা। এখনও চোখে-মুখে সন্দেহ। মাঝে মাঝে বক্তার কথা বুঝতে না পেরে কুঁচকে ফেলছে ভুরু। ওর কথা শেষ হলো। আর্টিফ্যাক্ট হাতে লোকটা কী যেন বলল জুলিয়োকে।

'কী বলে?' বন্ধুর কাছে জানতে চাইল রানা।

'যা বলছে, তাতে মনে হয় ওদের গ্রামে নেবে। বড়রা ঠিক করবে... কী যেন। পুরো বুঝতে পারিনি।'

'তার মানে এখনই মেরে ফেলছে না?' বললেন করেলি, 'ওহ্, থ্যাঙ্ক গড!'

'কপাল মন্দ ভ্যান নুনানের,' বলল মউরোস।

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল প্রফেসরের। ভ্যানের ভাগ্য হতে পারত তাঁরও।

'এখনও খুশি হওয়ার কিছু হয়নি, প্রফেসর,' গম্ভীর মুখে বলল রানা, 'এদের গোত্রের নেতারা আমাদের পছন্দ না করলে, বুঝতেই পারছেন, নদীর ওপর বাঁশের আগায় ঝুলব আমরাও।'

হাত পিঠের কাছে বেঁধে ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে ঘন জঙ্গলে চলল ইণ্ডিয়ানরা।

'খারাপ লাগছে যে এভাবে অ্যাম্বুশে পড়লাম,' লাবনীকে মন খারাপ করে বলল রানা। 'আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

'তোমার তো কিছুই করার ছিল না,' বলল লাবনী। 'এরা চারপাশ চেনে। সব সুবিধে ছিল ওদের পক্ষে।'

'আমরা কেউ ওদেরকে দেখিইনি.' খক-খক করে কেশে নিয়ে বলল মউরোস, 'আমাদের দোস্ত জুলিয়োও ডাব্বা মেরেছে!'

'এরা জঙ্গলের পিশাচের মতই,' নালিশ করল জুলিয়ো।

'বড় কথা, বেঁচে আছি,' বলল লাবনী, 'তোমরা যদি এদের কাউকে খুন করতে, আমাদেরকে মরতেই হতো। এরা সংখ্যায় এক শ'রও বেশি।'

'দিন ফুরিয়ে যায়নি,' বলল জুলিয়ো। 'সন্ধ্যার আগেই মারা যেতে পারি!'

'হতাশ লোক,' মন্তব্য করল মউরোস।

নিচু এক টিলায় উঠছে ওরা, চূড়ায় উঠে দেখল আমাজনের বিস্তৃত, বিশাল এক বেসিন। এক পাশে মানুষজনের কয়েকটা কুঁড়েঘর। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর উঠতে হলো খাড়া এক পথে আরেক উঁচু টিলার ওপরে। এদিকে হালকা হয়েছে জঙ্গল।

চূড়ায় উঠে হাঁপ ছাড়ল লাবনী। 'বাপ্‌স্! পায়ে খিঁচ ধরেছে!'

প্রকাণ্ড এই বৃত্তাকার টিলা থেকে নিচে দেখা গেল গহীন অরণ্য। তার সবুজ বুক চিরে গেছে আঁকাবাঁকা নদী। জঙ্গলে প্রাচীন পাথুরে সব দালান। কোনও একসময়ে বড় এলাকা নিয়ে বাস করত সভ্য কোনও জাতি।

প্রায় বিধস্ত সব দালান, একটা এখনও ধসে পড়েনি। ওদিকে

চেয়ে হতবাক হয়ে গেল ওরা।

বিশাল সব গাছ আড়াল করেছে বলে আকাশ থেকে দেখার উপায় নেই ওই দালান। যতটুকু চোখে পড়ল, ওদের মনে হলো ওটা বিশাল কোনও অভিশপ্ত মন্দির। উচ্চতা ষাট ফুটেরও বেশি। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে চার শ' ফুট, প্রস্থে দু' শ' ফুট।

রানার উদ্দেশে বলল লাবনী, 'ক্রিটিয়াসে লেখা: "ওখানে ছিল পসেইডনের নিজস্ব মন্দির, দৈর্ঘ্যে এক স্টেডিয়া, প্রস্থে তার অর্ধেক। উচ্চতা বর্বর আকারের।" সেই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে প্রাচীন এই মন্দির। গ্রিকরা যে-কোনও কিছু অপছন্দ করলেই সেটাকে বারবারিক বলত।'

ওই মন্দির ইনকা বা মায়ান দালানের মতই প্রকাণ্ড। বাঁকে বাঁকে নানান খাঁজ। প্রতিটা কোনা থেকে উঠেছে অদ্ভুতভাবে। ঘন ঝোপঝাড় হয়ে এমনই হয়েছে, সহজে চোখে পড়বে না দালান। নিচের অংশ রুক্ষ, কিন্তু ওপরে অনেকটা আধুনিক এয়ারক্রাফট হ্যাঙারের মত।

হতবাক হয়ে সাগর দেবতা পসেইডনের মন্দির দেখছে ওরা। ওটা মূল মন্দিরের প্রতিরূপ। প্লেটোর বক্তব্য অনুযায়ী, সত্যিকারের মন্দির ছিল মূল্যবান সব ধাতু দিয়ে গড়া। এখানে এটা পাথুরে। চারপাশ থেকে মন্দিরকে ঘিরে রেখেছে লক্ষ-কোটি লতা। গ্রিকদের ছয় শ' সাত ফুটের স্টেডিয়া মিলছে না। এটা অনেক ছোট।

লাবনীর বলা কথা মনে পড়ল রানার।

গ্রিক স্টেডিয়া থেকে ছোট ছিল আটলাণ্টিয়ান স্টেডিয়া। এ কারণে অনেক বদলে যাবে সত্যিকারের ওই দ্বীপের অবস্থান।

দাঁড়িয়ে দেখার সুযোগ রানাদের নেই। পেছন থেকে ঠেলে ওদেরকে ঢালু পথে নিয়ে চলেছে ইণ্ডিয়ানরা। পরিষ্কার বোঝা গেল, নিচের ওই শহর প্রায় পরিত্যক্ত। মন্দিরের একধারে ছোট

এক গ্রাম। ওখানে ঘরগুলো পাথর ও কাঠের। মোটমাট পনেরোটা বৃত্তাকার দালান দেখল রানা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্রামে বাসা গড়েছে এরা। কোনও কোনও কুঁড়েঘর রীতিমত ছোট। সব মিলে সক্ষম ইণ্ডিয়ানরা সংখ্যায় হবে বড়জোর দুই শ'।

ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে গিয়ে মন্দিরের কাছে থামল লোকগুলো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে মহিলা, ছোট ও বুড়োরা। সবার চোখে ভীষণ সন্দেহ। মন্দিরের দেয়ালের কাছে বড় এক কুঁড়েঘর, সেখানে জড় করা হলো সবাইকে।

নানান আলাপ করছে ইণ্ডিয়ানরা। তা থেকে শুনে জুলিয়ো বলল, 'বড়দেরকে ডেকে আনা হচ্ছে।'

সবচেয়ে বড় কুঁড়েঘরের দরজায় বুনো প্রাণীর চামড়া ঝুলছে, সরিয়ে ফেলা হলো। ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনজন লোক। বয়সের কারণে ভাঁজ পড়ে গেছে চেহারায়। কপালের ব্যাণ্ডে কয়েকটা পালক গুঁজে রাখা। শক্তপোক্ত মনে হলো তাদেরকে। বেতের মোড়ায় বসল।

'অদ্ভুত,' নিচু স্বরে বলল সেসিলি, 'এত ছোট বসতি হিসাবে জেনেটিক্স অনুযায়ী, ওদের নানান জেনেটিক অ্যাবনরমালিটি থাকার কথা, তা কিন্তু নেই। তা হলে কি এদের জেনোম উন্নত? ডিএনএ স্যাম্পল পেলে অ্যানালাইয করা যেত ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনে নিয়ে।'

'আপনি বরং এদের বুঝিয়ে বলুন, যেন আমাদের পোঁদে বাঁশ ভরে নদীতে দাঁড় করিয়ে না দেয়,' বলল বিরক্ত মউরোস।

মোড়লদের সামনে এক লাইনে রানাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিল ইণ্ডিয়ানরা। শীতল চোখে শত্রুদেরকে দেখল বুড়োরা। চুপচাপ শুনল শিকারি দলের নেতার কথা, তারপর আটলান্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট দেখাতেই, খেপে গেল বুড়োগুলো। কঠোর চোখে

দেখল রানাদেরকে।

তিন মোড়লের একজন চিলের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কী যেন জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে সঙ্গে শিকারি দলের নেতা দেখিয়ে দিল লাবনীকে। লাফ দিয়ে উঠে ওর সামনে চলে এল তিন বুড়ো। মন দিয়ে দেখছে বেচারিকে। ভয়ে কাবু হয়ে গেলেও চেহারায় আতঙ্ক প্রকাশ পেল না লাবনীর। কিছুক্ষণ ওকে দেখে সেসিলির দিকে মন দিল বুড়োরা। তাদের বিশেষ নজর মেয়েটার নীল চোখে। একজন হাত তুলে স্পর্শ করল সেসিলির সোনালি চুল। তাতে ভুরু কুঁচকে তাকে দেখল সেসিলি।

আবারও ফিরে এসে লাবনীকে দেখল লোকগুলো। কী যেন জিজ্ঞেস করল। কিছুই বুঝতে না পেরে জুলিয়োর দিকে অসহায় চোখে তাকাল লাবনী।

'আর্টিফ্যাক্টের কথা,' বলল জুলিয়ো, 'বোধহয় জানতে চায় কোথা থেকে পেলেন ওটা।'

'বোধহয়?' কয়েক গ্রাম চড়ে গেল লাবনীর কণ্ঠ। 'এখন ভুল কোনও কথা বললে হয়তো মেরেই ফেলবে ওরা!'

'যা জানতে চায়, সত্যি সত্যি বলুন! আমি সাধ্যমত অনুবাদ করব। এখান থেকে অনেক দূরের উত্তর দিকের এক গোত্রের সঙ্গে এদের কথার মিল আছে।'

'মিল থাকাই যথেষ্ট নয়!' ফুঁসে উঠল লাবনী। ওকে ঠাণ্ডা চোখে দেখছে বুড়োরা। 'ঠিক আছে... সব ঠিক... এদের বলুন, আরেক দেশে এক চোরের কাছে ওটা পেয়েছি। ওটা আসলে একটা মানচিত্র। সেটা দেখে এসেছি এদের হাতে জিনিসটা তুলে দেব বলে।'

অনুবাদ শুরু করল জুলিয়ো।

'জিনিসটা এদের, তা নিশ্চিত তুমি?' লাবনীকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তো আর কার হবে? চেনেও তো এই জিনিস!'

তিন মোড়লের একজন এক নাগাড়ে কিছু কথা বলল। মন দিয়ে শুনল জুলিয়ো। তারপর বলল, 'এই জিনিস চুরি করেছিল একদল সাদা লোক তাদের পরদাদাদের কাছ থেকে। পরেও তারা এসেছে। কিন্তু তাদেরকে ধরে নদীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তারা। অবশ্য কয়েকজন পালিয়ে গেছে।'

'নব্য নাযিদের এক্সপিডিশন,' বলল লাবনী।

'পিছনে বাঁশ ভরে দাঁড় করিয়ে দেয়ায় কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে,' বলল মউরোস। একবার লাবনী আরেকবার সেসিলিকে দেখল। 'আপনারা মাফ করবেন, আমি ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্র থাকি কী করে? পোঁদেই যদি...' বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

কী যেন বলেছে মোড়লদের একজন। কিন্তু বুঝতে পারছে না জুলিয়ো। 'বুঝতে পারছি না তো! কী যেন বলে! ও... হ্যাঁ, জানতে চাইছে মিস ডেনিয়েলসন সেই প্রাচীনদের একজন কি না।'

চট্ করে পরস্পরকে দেখল লাবনী ও সেসিলি।

'জিজ্ঞেস করুন কী বলতে চাইছে,' বলল লাবনী।

অনুবাদ করল জুলিয়ো, 'তারা তৈরি করে এই মন্দির। এই বুড়ো ভাম বলছে, তাদের চুলও সেসিলির মতই ছিল।'

'বলুন, আমিও তাদেরই একজন,' বলল সেসিলি। 'এখানে এসেছি পুরনো সব কিছু দেখতে।'

'উচিত হবে এসব ঘাড়ে নেয়া?' নিচু স্বরে বলল মউরোস। 'যদি ধরে নেয় মিথ্যা বলছেন, সবচেয়ে আগে বাঁশের ওপর উঠবেন আপনি।'

আবারও কী যেন বলছে এক বুড়ো। তার সঙ্গে সায় দিল অন্য দু'জন। কীসব যেন আলাপ করছে। কথা বোঝা কঠিন হয়ে

উঠল জুলিয়োর জন্যে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এরা বলছে, ওই আর্টিফ্যাক্ট নেয়া হয়েছে দেবতার কাছ থেকে। কাজেই ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁরই কাছে। কিন্তু কাজটা করতে হবে আমাদেরকে। বিশেষ করে মিস ডেনিয়েলসনকে।'

'আমি?' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সেসিলি।

'ওরা বলছে, সত্যি আপনি পুরনোদের কেউ কি না, তা প্রমাণ হবে ওখানে গিয়ে ওটা রেখে এলে। আর যদি আপনি তাদের কেউ না হন, মরবেন ওখানে।'

'আর যদি ও ফিরে আসে, তখন?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'তখন ওরা সিদ্ধান্ত নেবে।' ইণ্ডিয়ানদের চোখা ফলা দেখাল জুলিয়ো। 'উনি সফল না হলে, মেরে ফেলবে আমাদের সবাইকে।'

'বাহ্!' নাক কুঁচকে ফেলল লাবনী।

'সোজা গিয়ে ঢুকতে হবে মন্দিরের ভেতর,' বলল জুলিয়ো। 'ওখানে আছে তিনটে চ্যালেঞ্জ। প্রথমটা শক্তির, দ্বিতীয়টা দক্ষতার আর তৃতীয়টা বুদ্ধির চ্যালেঞ্জ... আমার ভুল না হয়ে থাকলে।'

'পুরো না জেনে আবারও বকবক করছেন আপনি?' বিরক্ত হয়ে বলল লাবনী।

পাত্তা দিল না জুলিয়ো, 'যদি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সফল হন, তাতেই প্রমাণ হবে মন্দিরে ঢোকার যোগ্যতা আপনাদের আছে। আর সফল না হলে...' ভুরু কুঁচকে ফেলল, 'মউরোস যা বলেছে, ইয়ে-তে চোখা বাঁশ ভরে দিয়ে স্বর্গের দিকে রওনা করিয়ে দেবে আমাদেরকে।'

মাথা দোলাল গম্ভীর রানা। 'বুঝলাম।'

বড় করে দম নিল সেসিলি। 'ওদের বলুন, আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি।'

'তুমি যাবে ওখানে?' বলল লাবনী।

'সত্যি?' অবাক হয়েছে জুলিয়ো।

'হ্যাঁ।'

'জুলিয়ো, এদের বলো, বন্ধুরাও ওর সঙ্গে ওখানে ঢুকবে,' বলল রানা। দেখল লাবনী ও সেসিলিকে।

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই,' বলল সেসিলি।

'তুমি কি পাগল হলে, সেসিলি?' আপত্তি তুলল লাবনী।

'এখানে খুন হওয়া বা বন্দি হয়ে থাকার চেয়ে ভেতরে আমরা নিরাপদ থাকব,' সেসিলি কিছু বলার আগেই বলল রানা। 'অন্তত ঘুরে ফিরে দেখতে পারব মন্দিরের ভেতরটা। ভাষা জানি না তাদের, কিন্তু সেজন্যে তুমি তো থাকছই পাশে। ...নাকি ভাষাবিদ প্রফেসর করেলি যেতে চান আমার সঙ্গে?'

ভয়ঙ্কর ভয় নিয়ে মাথা নাড়ল করেলি। 'না-না, আপনারাই যান। মনে করি না ওখানে কোনও বিপদ হবে আপনাদের। আমি বুড়ো মানুষ...'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল রানা। 'আরও কিছু কারণে...'

ওকে থামিয়ে কী যেন বলল তিন মোড়লের একজন।

কয়েক সেকেণ্ড পর অনুবাদ করল জুলিয়ো, 'বুড়ো ভাম বলছে, ওই চ্যালেঞ্জ মাত্র দু'জনের জন্যে। কিন্তু রানা যখন দলের নেতা, আর যেহেতু অন্য কোনও লোক নেবে না, তাই দুই মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে ও।'

মাথা দোলাল রানা। পরস্পরকে দেখল সেসিলি ও লাবনী।

'তোমাদের সুযোগ থাকছে সন্ধ্যা পর্যন্ত,' বলল জুলিয়ো। 'অন্যরা বন্দি থাকব গ্রামে। এর ভেতর তোমরা বেরিয়ে না এলে আমাদের সবাইকে...' বড় করে ঢোক গিলল ইণ্ডিয়ান ট্র্যাকার। 'কাজেই বেরিয়ে এসো, বাপুরা!'

আকাশ দেখল মউরোস। 'সন্ধ্যা নামতে বড়জোর একঘণ্টা!'

'রওনা হওয়া উচিত,' তাড়া দিল রানা। 'জুলিয়ো, এদেরকে বলো হাত খুলে দিক। জিজ্ঞেস করো, সঙ্গে কী কী নিতে পারব।' একটু দূরে স্তূপ করে ফেলা রাখা হয়েছে ওদের সব মালপত্র।

'তোমাদের জন্যে ফ্ল্যাশলাইট, এক্সপ্লোসিভ, দড়াদড়ি, শাবল, দুটো কোদাল...' চুপ হয়ে গেল মউরোস, মাথা নাড়ল।

রানা, লাবনী ও সেসিলির হাতের বাঁধন খুলল ইণ্ডিয়ানরা।

'এরা বলছে, নিতে পারবে শুধু পোশাক আর বাতি,' বলল জুলিয়ো। 'তোমরা উপযুক্ত হলে এর বেশি আর কিছুই লাগবে না।'

'মনে হচ্ছে মস্ত বিপদে পড়ে গেলাম, সেসিলি,' কবজির লাল দাগ ডলছে লাবনী।

জবাব দিল না সেসিলি।

'সাধ্যমত করবে, তাতেই হবে,' বলল রানা।

'মাথা এত ঠাণ্ডা রাখছ কী করে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লাবনী। 'আমি তো পারছি না!'

'এ ছাড়া উপায় নেই, তাই। তোমাদের মতই ভয় পেয়েছি আমিও, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছি না। তবে কিছুতেই উচিত হবে না হাল ছেড়ে দেয়া।'

'দেখো, আমরা পারব,' বলল সেসিলি।

মেয়েটার কথায় হঠাৎ ভয় একটু কমল লাবনীর। সেসিলি যদি পারে, ও পারবে না কেন? 'ঠিক আছে, চলো যাই। না গিয়ে উপায়ও তো নেই। নইলে সবাইকে মেরে ফেলবে।'

'মরব না আমরা,' জোর দিয়ে বলল রানা।

'প্রমিয করছ?' নার্ভাস হাসল লাবনী।

মাথা দোলাল রানা। 'অবশ্যই।' চট্ করে দেখল হাতঘড়ি। 'সূর্য ডুববে ঠিক আটান্ন মিনিট পর।'

একটা কুঁড়েঘর থেকে এনে রানাদের হাতে কয়েকটা দীর্ঘ লাঠি ধরিয়ে দিল এক ইণ্ডিয়ান। লাঠির মাঝ পর্যন্ত আলকাতরার মত কী যেন।

'ও, তার মানে ফ্ল্যাশলাইট নয়, এটাই আলো দেবে?' দু'হাতে দুই লাঠি উঁচু করে দেখল সেসিলি।

'আমি ভেবেছিলাম...' চুপ হয়ে গেল জুলিয়ো।

হঠাৎ এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত চওড়া হাসি দেখা দিল রানার মুখে। সরে গেল কয়েক পা। তাতে চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলল শিকারিরা। 'ভয়ের কিছু নেই... কিছুই করছি না... ওই ব্যাগ... হাসিটা দেখো... কী সুন্দর লাগছে না? ঠিক দেবশিশু...' আরেক পা সরে একটা ব্যাগের পাশে বসল রানা। গাল ব্যথা হয়ে গেছে এত হাসতে গিয়ে। দরদর করে ঘামছে। যে-কোনও সময়ে খেপে উঠবে লোকগুলো, বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলবে ওকে। বর্শা বাগিয়ে ভয়ঙ্কর চেহারা করেছে শিকারিরা! হাত ভরে দিল রানা ব্যাগের ভেতর। বের করে আনল লেড ফ্ল্যাশলাইট। 'দেখেছ? অস্ত্র না! একটা টর্চ! তোমরাই তো বলেছ, মশাল নিতে পারব!' প্রথমে নিজের দিকে আলো ফেলল রানা, তারপর শিকারিদের গায়ে। কয়েক লাফে পিছিয়ে গেল শিকারিরা। রানার বুক লক্ষ্য করে বাগিয়ে ধরেছে বর্শা। উজ্জ্বল আলো দেখে চমকে গেছে। অবশ্য বুঝে গেল, ওটা কোনও অস্ত্র নয়। তাদের একজন সামনে বেড়ে লেন্সের কাছে হাত নিল। খুব বিস্মিত। এই সাদা আগুনে তাপ নেই। বুড়োদের একজনকে কী যেন বলল সে। বুড়ো আবার ভেবে নিয়ে কিছু বলল জুলিয়োকে।

মাথা দুলিয়ে বলল জুলিয়ো, 'বুড়ো শালা তোমাকে টর্চ রাখতে দেবে।'

'গুড,' বলল রানা, 'গাল ব্যথা হয়ে গেছে, আর হাসতে

পারব না।'

'এবার আর খানিক হেসে ওই এক্সপ্লোসিভ...'

'হাতে কিন্তু সময় নেই,' জুলিয়োকে বাধা দিল সেসিলি, 'অত হেসে বিস্ফোরক পেতে হলে, রাত নেমে যাবে।' ওর হাতে আটলান্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট দিয়ে কী যেন বলল এক বুড়ো।

'শালা বলছে দেরি করলে রাত নামবে, আর তখন সবাইকে মেরে ফেলবে ওরা!' জানাল জুলিয়ো।

'সেসিলি, লাবনী, চলো রওনা হই,' মন্দিরের প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়াল রানা। ওদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে শিকারিরা।

পেছন থেকে চিৎকার করে বলল মউরোস, 'আশা করি একটু পর আবারও দেখা হবে! নইলে স্ট্রেইট স্বর্গে!'

জবাব দিল না রানা।

অন্ধকার প্যাসেজওয়ের আগে থামল ইণ্ডিয়ানরা। হাত তুলে দেখিয়ে দিল প্যাসেজ। ওখানে ঢুকে টর্চ জ্বেলে নিল রানা। এই করিডোরের ছাত মাত্র ছয় ফুট উঁচু। ছাত ছুঁই-ছুঁই করছে রানার মাথা। শেওলার কারণে কখনও নিচু হয়ে হাঁটতে হচ্ছে। দেয়ালে নানান ধরনের পোকা, টিকটিকি ও গিরগিটি। কী যেন সর-সর করে সরে যাচ্ছে আঁধারে। কিছুক্ষণের ভেতর করিডোরে কমে গেল তাপমাত্রা ও স্যাঁতসেঁতে ভাব।

আলো ফেলে হাঁটছে রানা, হঠাৎ থমকে গেল। একদিকের পাথুরে দেয়ালে কিছু সিম্বল। লাবনীর দিকে তাকাল। 'বুঝতে পারছ?'

'আর্টিফ্যাক্টে যে ভাষা, এখানেও তাই,' বলল লাবনী, 'এই মন্দিরের বিষয়ে লিখেছে।' সামনে ঝুঁকে দেখছে গ্লোয়েল ও ওলমেক অক্ষর। শুধু দেয়াল নয়, বরগাতেও লেখা। পড়তে শুরু করে বলল লাবনী, 'সম্ভবত নম্বর। তারিখ বা...'

'লাবনী, হাতে মোটেই সময় নেই, চলো এগোই,' তাড়া দিল সেসিলি। 'পরে ফিরে এসে দেখব এসব।'

হতাশ হলেও মেনে নিল লাবনী। আবারও করিডোর ধরে চলল ওরা। আন্দাজ ত্রিশ ফুট যাওয়ার পর থামল রানা। সন্দেহ নিয়ে আলো ফেলল চারপাশের দেয়াল ও ছাতে।

'কী হয়েছে, মিস্টার রানা?' জানতে চাইল সেসিলি।

'কেমন কু ডাকছে মন,' বলল রানা, 'তিনটে চ্যালেঞ্জ থাকার কথা। মনে হচ্ছে সামনেই পড়বে কোনও ফাঁদ।'

'রানা, আমি কিন্তু আগেই বলেছি, ওসব ফাঁদ অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে,' বলল লাবনী।

'তাই?' সামনের চওড়া দরজার মত জায়গাটা দেখাল রানা। 'আমাদের পালকওয়ালা বন্ধুরা যদি সব ঠিকঠাক ে খে থাকে, তা হলে? নইলে তো কোনও চ্যালেঞ্জ থাকারই কথা নয়। ওরা জানল কী করে?'

ভয়ে পেট মুচড়ে উঠছে লাবনীর। 'ও, তা হলে সাবধানে এগোতে হবে।'

সামনের প্যাসেজ নিরাপদ বলে মনে হলো রানার। হেঁটে চলল ওরা, কিন্তু সামনেই বাঁক।

ওখানে থেমে বলল রানা, 'তোমাদের মনে আছে, শক্তির চ্যালেঞ্জ দেয়া হবে?' বাঁক নিয়ে ছোট এক কুঠুরির মত জায়গায় পা রাখল। জায়গাটা করিডোরের চেয়ে চওড়া, প্রস্থে আট ফুট। ডানের দেয়ালে হাঁটু সমান আয়তাকার পাথুরে বেঞ্চ, গেছে পুরো প্যাসেজ জুড়ে। শেষমাথায় আরেকটা প্যাসেজ, মাত্র চার ফুট চওড়া। পাথুরে বেঞ্চ গিয়ে মিশেছে ওদিকের দেয়ালের এক স্লটে। মোটা লতা বাঁধা ছোট এক কাঠের বেঞ্চে। জায়গাটা টি-র মত। কাঠের বেঞ্চ ও পুরু লতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

হাত তুলে সেসিলি ও লাবনীকে এগোতে মানা করল রানা।

আলো ফেলেছে সরু প্যাসেজে।

'কিছু দেখছেন?' ওর কাছে জানতে চাইল সেসিলি।

'মনে হচ্ছে ছোট অবস্ট্যাকল কোর্স,' বলল রানা। 'সামনের প্যাসেজ লম্বায় বড়জোর বিশ ফুট। কিন্তু ছাত থেকে নেমেছে চোখা সব বর্শার ফলা। এর ভেতর দিয়ে যেতে হবে।'

'পাথুরে বেঞ্চের ব্যাপারে কিছু বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'জিমনেশিয়ামের বেঞ্চের মত,' সামনে বেড়ে ওখানে শুয়ে পড়ল রানা। ওর বুক থেকে সামান্য ওপরে কাঠের গোলাকার বার। 'গায়ে জোর থাকলে, আর বেঞ্চ প্রেস করলে হয়তো ওদিকে খুলবে কোনও দরজা।' ছাতে চোখ পড়তেই দেখল, ঠিক এই বেঞ্চের মতই আরেকটা বেঞ্চ ওখানে। বুঝল না ওটা কী কাজে আসবে।

রানার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে করিডোরের শেষমাথায় আলো ফেলল সেসিলি। ওদিকে নিরেট পাথুরে দেয়াল। কিন্তু ওই দেয়ালে আছে চৌকো একটা গর্ত। 'বুঝতে পেরেছি, একজন ঠেলে ওপরে তুলবে ওজন, আর অন্যজন ট্রিগার করবে রিলিয। ইণ্ডিয়ান বুড়ো বলেছিল, এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চাই কমপক্ষে দু'জন।'

'রানা ওজন নেয়ার আগেই চলে যেতে পারি ওদিকে,' বলল লাবনী।

'কাজটা এত সহজ হবে না,' কাঠের বার সামান্য তুলে পরীক্ষা করল রানা। কয়েক ইঞ্চি উঠতেই এসেছে বাধা। 'এটা তুললে কী হবে, কে জানে!'

আবারও সামনের প্যাসেজ দেখল সেসিলি। 'এমনিতেই ওদিকে যেতে হবে, কাজেই চলো, লাবনী, যাওয়া যাক।'

'আমি?' চমকে গেল লাবনী, ভীষণ নার্ভাস। ছাত থেকে

নিচে তাক করেছে একের পর এক জং ধরা বর্শার ফলা। ওগুলো নামলে? জড়সড় হয়ে দাঁড়ালে হয়তো বিপদ এড়াতে পারবে। আবারও ছাত দেখল লাবনী। প্রতিটি বর্শা বেরিয়ে এসেছে একেকটা গর্ত থেকে। গর্তের ব্যাস পাঁচ ইঞ্চি। মেঝেতেও ঠিক অমনই গর্ত। ছাত থেকে বর্শা নামলে আটকাবে এসে মেঝের গর্তে। 'বুঝছি না কী করা উচিত।'

'হাতে মাত্র তেপান্ন মিনিট,' হাতঘড়ি দেখল রানা।

নিজেকে অসহায় মনে হলো লাবনীর। কেন যেন রাগ হলো রানার ওপর। একবার দেখল ওদিকের প্যাসেজের দেয়ালের গর্ত। ওখানেই বোধহয় আছে দরজা খোলার লিভার। 'ঠিক আছে, চলো, যাই ওদিকে। একবার পৌঁছুলে বার ওপরে তুলবে রানা, তারপর দেখব কী হয়।'

'ঠিক আছে, লাবনী, সেসিলি, রওনা হও তোমরা।'

নিচে তাক করা বর্শার ফলার মাঝ দিয়ে পথ বুঝে পা বাড়াল সেসিলি। পেছনে এলোমেলো পায়ে লাবনী, ভীত। এক পা এক পা করে চলেছে নরওয়েজিয়ান মেয়ে। ডানহাত থেকে বামহাতে নিল ফ্ল্যাশলাইট, যাতে ওর পদক্ষেপ বুঝতে পারে লাবনী।

'আমাকে জানাও কতটুকু গেলে,' বলল রানা।

'আর বড়জোর বারো ফুট,' এক পা সামনে বাড়ল সেসিলি। 'এখনও একযিট দেখছি না, কিন্তু গর্তের মত জায়গায়...'

জোরালো 'ঠং' আওয়াজ হলো।

সেসিলির পায়ের নিচে কীসে যেন চাপ লাগতেই ঠং শব্দে সরে গেছে কিছু!

'কী হলো?' আঁৎকে উঠল লাবনী। সামান্য সরে গেছে মেঝের কয়েকটা স্ল্যাব। 'হায়, আল্লা!'

'জলদি চলো!' তাড়া দিল সেসিলি। খপ্ করে লাবনীর হাত ধরেই ছুটল প্যাসেজের শেষমাথা লক্ষ্য করে। নিচে নামছে ছাত

ভরা জং ধরা কোনও ধাতুর তৈরি বর্শার ফলা! ধাতব আওয়াজ তুলছে পাথর ঘষার। একই সঙ্গে নামছে ছাতের বেশ কিছু ভারী স্ল্যাবও!

বেঞ্চে শুয়ে ওপরে চোখ যেতেই রানা দেখল, ওর দিকেই রওনা হয়েছে ছাতের ওই পাথুরে, ভারী বেঞ্চি!

'ঘটাং!' শব্দে বন্ধ হলো বেরিয়ে যাওয়ার প্যাসেজ।

রানা বুঝল, ছাতের বেঞ্চির জন্যে নামছে গোটা ছাত!

কোথাও আশ্রয় নেই ওদের!

পাথুরে ছাতের প্রচণ্ড ওজন পিষে দেবে ওদের তিনজনকে!

পনেরো

'হায়, আল্লা!' আর্তচিৎকার ছাড়ল লাবনী। বর্শার ফলা এড়িয়ে ওর হাত ধরে এগোতে চাইছে সেসিলি।

লাবনীর কনুইয়ের আস্তিন ফুটো করে নামল পেছনের এক বর্শা। ভীষণ ভয় পেয়েছে ও, কাপড় ছিঁড়ে এগোল। সামনের বর্শা নামল ওর বাম কনুইয়ের কাপড়ের ওপর।

সেসিলি ও লাবনীর পেছনের বেঞ্চে শুয়ে গায়ের জোরে কাঠের বার ওপরে ঠেলছে রানা। জিনিসটা অত্যন্ত ভারী, অন্তত দু' শ' পাউণ্ড। ওই ওজন ঠেলে বেঞ্চ প্রেস করতে হচ্ছে ওকে।

নেমে আসার গতি কমে এলেও থামল না ছাতের পতন।

'ওজন নিয়েছি, তোমরা সামনে এগোও!' তাড়া দিল রানা।

বর্শার ফলা গায়ে খোঁচা মারতেই কেঁদে ফেলল লাবনী।

ওকে টেনে নিতে চাইছে সেসিলি। বাঘিনীর মত সাহসী, বুঝে গেছে বদ্ধ জায়গায় আটকা পড়ছে লাবনী। ছাত নেমে আসছে বলে কুঁজো হতে হচ্ছে সেসিলিকে। কঠিন হয়ে উঠেছে নড়াচড়া করা।

'তুমি যাও!' লাবনী ইশারায় দেখাল প্যাসেজের শেষদিক। গাল বেয়ে পড়ছে অশ্রু।

'তোমাকে ছাড়া যাব না!' শক্ত হাতে লাবনীর কবজি ধরল সেসিলি। 'এসো! চলো! চেষ্টা করো, এগোতে পারবে!'

'না!' জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল লাবনী। ফলার খোঁচা খেয়ে ঘাড় থেকে ওর শার্টে পড়ছে রক্ত। 'হায়, আল্লা!'

আবারও লাবনীর হাত ধরে বর্শার মাঝ দিয়ে টেনে নিয়ে চলল সেসিলি। 'এসো!'

প্যাসেজের মাঝে পৌঁছে গেছে ওরা। যেতে হবে আর বড়জোর দশ ফুট। কিন্তু তার আগে আছে আরও অনেক বর্শা।

স্ল্যাব থেকে ঝরঝর করে ঝরছে বালি ও ধুলো। লাবনীর মাথা থেকে আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে ছাত।

ওদিকে কাঠের বার ঠেলছে রানা, কিন্তু শরীরে এত শক্তি নেই, ওটাকে আরও ওপরে তুলবে। আর বড়জোর কিছুক্ষণ ঠেকাতে পারবে কাঁটাসহ বারের নেমে আসা।

তখনই দেয়ালের স্লটে ধাতব 'ক্লাঙ্ক' শব্দে কী যেন হলো! কোনও মেকানিযম!

'বুম!'

হঠাৎ বাড়তি ওজন চাপল রানার হাতে।

'সর্বনাশ!' চমকে গেছে। অন্তত আরও পঞ্চাশ পাউণ্ড চাপল ওর দু'কাঁধে। ভাঁজ হতে চাইছে কনুই। আগের চেয়ে জোরে নামছে ছাত।

ব্যথায় টনটন করছে রানার মাংসপেশি। 'ওঠ!' দাঁতে দাঁত

পিষে বার ওপরে ঠেলল ও।

ছাত নামার গতি কমল। কিন্তু অতি সামান্য। প্যাসেজের ছাত এখন মাত্র পাঁচ ফুট উঁচু। আরও নামছে।

'হাল ছেড়ো না, এসো!' লাবনীকে তাগাদা দিল সেসিলি। মাত্র আট ফুট গেলেই... সাত... কিন্তু কুঁজো হয়ে ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়ে উঠছে ওদের জন্যে।

আবারও মেকানিযমের খট-খটাং শব্দ। দাঁতে দাঁত পিষল রানা। 'সাবধান!'

'ধুম!' শব্দে আরও ওজন চাপতেই রানার গলা দিয়ে বেরোল চাপা গর্জন। নেমে আসছে কনুই। প্রাণপণে ওপরে ঠেলছে বার। কিন্তু এখন ওর হাত ওজন নিচ্ছে কমপক্ষে তিন শ' পাউণ্ড! হাতসহ গলার কাছে নেমেছে বার!

তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। শালারা অতিরিক্ত ওজন চাপিয়ে চ্যালেঞ্জ করার খেলা খতম করছে! সাথে ওদেরকেও!

প্রাণপণে ঠেলছে বলে ছাত নামার গতি কমল।

তখনই একটা বর্শার ফলা ফুটো করল সেসিলির বাম বাইসেপ, হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল মেয়েটা। ধুলোয় আটকে গেছে দম। উঠে বসতে চাইল ছাত নেমে আসছে! মাংস ছিঁড়ে বাম বাহুতে গাঁথছে বর্শা!

'লাবনী!' চিৎকার করল সেসিলি। 'আটকে গেছি! তোমাকে যেতে হবে দেয়ালের কাছে!' লাবনীর হাত ছেড়ে দিল ও। 'তুমি পারবে! লাবনী! পারবে! যাও!'

দরদর করে ঘামছে রানা। আবারও শুনল মেকানিযমের আওয়াজ। নতুন ওজন চাপবে বুঝি!

'চাইলেও আর ওজন নিতে পারব না, লাবনী! যা করার জলদি!'

সামনে বাড়ল লাবনী। কুঁজো হয়ে পেরিয়ে গেল কয়েকটি

বর্শা। আর মাত্র ক'টা ফুট। ফুটো হলো শার্টের পিঠ। পরের সেকেণ্ডে হোঁচট খেয়ে চলল দেয়ালের দিকে।

আর চার ফুট ওপরে ছাত!

পরের ওজনের জন্যে মানসিকভাবে তৈরি রানা। এ-ও জানে, এবার আর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। পিষে দেবে ছাতটা ওদেরকে!

পরের দুটো বর্শার মাঝের জায়গা দিয়ে পেরিয়ে গেল লাবনী। ছাত এত নিচু, হামাগুড়ির মত চলেছে। ফুটো হচ্ছে ওর ঊরু!

ওদিকে ছাতের ভারী স্ল্যাব চেপে বসছে সেসিলির মুখ ও কাঁধে। বাহুতে ভালভাবে গাঁথছে বর্শা।

আর দু'ফুট নামলেই ছাত মিশে যাবে মেঝেতে!

'ক্লাঙ্ক!'

'সর্বনাশ!' ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। মরার জন্যে তৈরি।

শেষ দেয়ালে কালো গর্তে নামছে ছাতের শেষ স্ল্যাব!

ফুটো বাহুর ভয়ঙ্কর ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আর্তচিৎকার ছাড়ছে সেসিলি।

রানার গলা থেকে বেরোচ্ছে পাশবিক গর্জন। হার মানবে না। যদিও জানে, মরবে পাহাড়ের ওজনে চাপা পড়া পিঁপড়ের মত!

বারবার হোঁচট খেয়ে নামছে ছাত!

হামাগুড়ি দিয়ে গর্তের কাছে পৌঁছে গেল লাবনী।

শেষ স্ল্যাবের কিনারা নামছে গিলোটিনের ব্লেডের মত, মুড়-মুড় করে ভাঙবে লাবনীর ঘাড়!

গর্তের একপাশে কী যেন: কাঠের একটা পুরু হ্যাণ্ডেল!

ওটা টান দিল লাবনী।

তাতে কিছুই হলো না। পরক্ষণে আওয়াজ হলো: 'ধুম্!'

পাথরের ঘরে 'ধুম' শব্দ তুলছে জোরালো প্রতিধ্বনি।

কর্কশ পাথুরে শব্দের সঙ্গেই থেমে গেছে ছাত নেমে আসা!

কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ খুলে চারপাশ দেখল রানা। দম নিতেও ভুলে গেছে। আরও তিন সেকেণ্ড পর বুঝল, গলা থেকে মাত্র দু' ইঞ্চি দূরে গোলাকার কাঠের বার। ওর আঙুলের মাত্র এক ইঞ্চি ওপরে শীতল, পাথুরে ছাত। আরেকটু হলে চ্যাপ্টা হয়ে যেত!

মড়ার মত পড়ে আছে সেসিলি, নড়লেই ব্যথা লাগছে আহত বাহুতে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লাবনীর কী হয়েছে।

দেয়ালের গর্তে আটকা পড়েছে লাবনীর হাত। ছাত আর এক ইঞ্চি নামলে চুর-চুর হতো হাতের হাড়, কাটা পড়ত বাহু থেকে।

হঠাৎ শোনা গেল দানবীয় গোঙানি। পাথরে পাথরে লাগছে ঘষা। ধুলো-ময়লা ঝরিয়ে আবারও ওপরে উঠতে লাগল ছাত।

মাথা কাত করে রানা দেখল, খুলছে করিডোরে ঢোকার পথ।

গর্ত থেকে হাত বের করল লাবনী। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল, ভূতের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সেসিলির বিকৃত মুখ। কয়েক সেকেণ্ড পর স্বস্তির ছাপ পড়ল তার চেহারায়। বর্শার মাঝ দিয়ে পথ করে ওর পাশে থামল লাবনী, হাত বাড়িয়ে সাহায্য করল সেসিলিকে উঠতে। দাঁড়াতে গিয়ে বর্শার খোঁচা খেয়ে চমকে গেছে মেয়েটা। আহত হাতের আস্তিন থেকে টপটপ করে পড়ছে রক্ত।

'হায়, আল্লা!' সেসিলির ক্ষত চেপে ধরল লাবনী। 'রানা! সেসিলি আহত! ওর সাহায্য দরকার!'

'আসছি, আলো ফেলো এদিকে,' বলল রানা। ব্যথায় টন-টন করছে দু'কাঁধ। বেঞ্চ থেকে নেমে বর্শার মাঝ দিয়ে এল। অর্ধেক পথ পাড়ি দিতেই ছয় ফুট ওপরে পৌঁছে গেল ছাত, থেমে

গেছে পাথুরে ঘর্ষণের আওয়াজ।
আবারও জোরালো আওয়াজ হলো: 'ক্লাঙ্ক!'
এবারের আওয়াজ এসেছে প্যাসেজের শেষমাথা থেকে।
ফ্ল্যাশলাইটের আলো ওদিকে ফেলল লাবনী।
সরে গেছে দেয়াল, ওদিকে ঘুটঘুটে আঁধার।
'লাবনী...' রক্তাক্ত বাহু ও কাঁধ দেখছে সেসিলি।
'আমাদের কথা বাদ দাও, তুমি গুরুতরভাবে আহত,' বলল লাবনী।
বর্শার খোঁচা খেয়ে ছিঁড়ে গেছে চামড়ার জ্যাকেট, ওদিকে খেয়াল না করেই মেয়েদুটোর পাশে থামল রানা। 'আমাকে দেখতে দাও কী হয়েছে।'
আলো তুলে সেসিলির ক্ষত দেখাল লাবনী।
'ফলা গেঁথে গিয়েছিল।'
টকটকে লাল রক্ত দেখে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'গভীরভাবে কেটেছে মাংসপেশি। কিন্তু জংলীদের গ্রামে রয়ে গেছে ফার্স্ট এইড কিট।'
'বাদ দিন,' সোজা হয়ে দাঁড়াল সেসিলি। 'বেশি সময় পাব না। এখন কয়টা বাজে?'
হাতঘড়ি দেখে তিক্ত হয়ে গেল রানার চেহারা।
'হঠাৎ কী হলো?' ওকে দেখছে লাবনী।
'হাতে মাত্র ঊনপঞ্চাশ মিনিট!'
'রয়ে গেছে আরও দুটো চ্যালেঞ্জ,' ঢোক গিলল লাবনী।
'আমরা পারব,' দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল সেসিলি। 'চলুন, রানা। এসো, লাবনী।'
নতুন প্যাসেজে পা রেখে থামল রানা। দেখে নিল দু'মেয়ের ক্ষত। সেসিলির আস্তিনের কাপড় ছিঁড়ে বাহুতে বাঁধল ব্যাণ্ডেজ। কমল রক্ত পড়া। লাবনীর কাঁধের ক্ষত অগভীর। ওর কব্জির

কাপড় ছিঁড়ে হালকা ব্যাণ্ডেজ তৈরি করল রানা। কাজ শেষ করে বলল, 'আপাতত আর কিছু করার নেই। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কাটা অংশে স্টিচ করতে হবে। টিকাও লাগবে, নইলে বিষাক্ত জার্ম ইনফেকশন তৈরি করবে।'

শিউরে উঠল লাবনী। 'আল্লা! ভাবলে কেমন লাগছে, পৌঁছে গিয়েছিলাম মৃত্যুর দুয়ারে!'

'এখনও দুটো চ্যালেঞ্জ বাকি,' মনে করিয়ে দিল সেসিলি। জখমী হাত নেড়ে ব্যথা পেয়ে কুঁচকে গেল ওর গাল।

'শক্তির চ্যালেঞ্জ শেষ, এবার দক্ষতা ও মানসিক চ্যালেঞ্জ,' বলল রানা। 'পরের দুটো আরও কঠিন হওয়ার কথা।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বলল সেসিলি, 'কিন্তু ঠিকই জিতব। দেখুন তো কয়টা বাজে?'

'ছিচল্লিশ মিনিট।' মেয়েদুটোকে এগোতে ইশারা করল রানা। 'চলো, দেখা যাক দক্ষতার চ্যালেঞ্জ কী ধরনের।'

সতর্ক চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে নতুন প্যাসেজ ধরে চলল ওরা। পদশব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কীসের শব্দ। লাবনীর কাছ থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে সামনে আলো ফেলল রানা। দূর থেকে মনে হলো, করিডোরের পর ওদিকে বড় কোনও ঘর। 'ওখানে পানি আছে,' মন্তব্য করল ও।

'মন্দিরের ভেতর পানি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'সাগর দেবতার মন্দির, পানি থাকতেই পারে,' হাঁটার গতি বাড়াল রানা। 'স্রোত আছে ওই পানিতে। গ্রামের পাশের ছোট নদী হয়তো ঢুকেছে এখানে।'

ওর কথাই ঠিক হলো। সরু প্যাসেজ চওড়া হলো সামনে। ওরা থামল ছোট এক আয়তাকার পুকুরের পাড়ে। কুলকুল শব্দে বইছে সবজেটে পানি। প্যাসেজওয়ের মতই মাত্র ছয় ফুট উঁচু ঘাট। হাঁপ লেগে যায়। কিন্তু পুকুরের ছাত অনেক ওপরে।

আলো ফেলতেই রানা দেখল, পুকুরের দেয়ালে পানি নড়াচড়ার প্রতিবিম্ব। পুকুর লম্বায় বড়জোর এক শ' ফুট, চওড়ায় পঁচিশ ফুট। ওই পঁচিশ ফুট পেরোবার জন্যে পানিতে আছে সরু কাঠের এক ইঞ্চি পুরু একটা তক্তা। পানির নিচ থেকে বেরিয়ে সরু সেতু পোক্ত করেছে কিছু খুঁটি। ঘাট থেকে দু' ফুট নিচে পানির ওপর সেতু।

'এবার?' রানার দিকে তাকাল লাবনী।

পুকুরের ওদিকে আলো ফেলতেই দেখা গেল, সংকীর্ণ সেতুর ওদিকে দেয়ালের গর্তে সোনালি, চকচকে এক ছোরা। ওটা থেকে দশ ফুট ওপরে তাক। মনে হলো না ওঠা যাবে। 'এটাই দক্ষতার চ্যালেঞ্জ,' ঘাটের কিনারায় থামল রানা। ঝুঁকে দেখল সেতুর কাঠের তক্তা। 'ভারসাম্য রেখে ওদিকে গিয়ে দেয়াল থেকে নিতে হবে ছোরা।' ওদিকের দেয়ালে আরেকটা জিনিস দেখেছে। 'ওই ছোরা সরালেই সত্যিকারের সেতু তৈরি করবে পথ। সহজেই পেরোতে পারব।' ওই দেয়ালে দড়ি দিয়ে বাঁধা সরু ড্র ব্রিজ। আঙুল দিয়ে বাতাসে বক্র পথ তৈরি করল রানা। দড়ি খুলে গেলে ওই ড্র ব্রিজ নামবে এদিকের ঘাটে।

সতর্ক চোখে পুকুর দেখছে লাবনী। ওদিকের ধনুকের মত নালা দিয়েই আসছে পানি। 'সাঁতরে পেরিয়ে গেলে?' আনমনে বলল। 'কতটা গভীর কে জানে, কিন্তু...'

হঠাৎ পানির ওপরে বিস্ফোরণ হলো। এদের দেরি দেখে আর তর সয়নি, বিরাট হাঁ নিয়ে ভেসে উঠেছে একটা কুমির। আরেকটু হলে তাল হারিয়ে পানিতে পড়ত হতবাক লাবনী।

খপ্ করে শার্টের কলার চেপে ধরে ওকে পিছিয়ে আনল রানা। লাবনী যেখানে ছিল, এক সেকেণ্ড পর 'খটাৎ' আওয়াজে সেখানে বন্ধ হলো কুমিরের চোয়াল। খাড়া পাথুরে দেয়াল বেয়ে উঠতে চাইল সরীসৃপ। কিন্তু পিছলে নেমে গেল পানিতে। অশুভ

আওয়াজ তুলল: 'হিস-হিস!'

কথা বলতে পারল না হতভম্ব লাবনী।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'জেসাস!' বিড়বিড় করল সেসিলি।

'সাঁতার বাদ,' বলল রানা, 'পানিতে পিরানহাও থাকতে পারে।'

'এরা এখানে এল কী করে?' ঢোক গিলল লাবনী। থরথর করে কাঁপছে হাঁটু। 'এই মন্দির তো কমপক্ষে আট-দশ হাজার বছর আগের!'

মন দিয়ে পুকুরের নির্দিষ্ট জায়গা দেখছে রানা। ওখানেই তলিয়ে গেছে কুমির। 'এসব ফাঁদ কার্যকর রাখে ইণ্ডিয়ানরাই। ওরাই কুমির আসার ব্যবস্থা করেছে।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, লাবনী, মাথা ঠাণ্ডা রাখো,' নরম সুরে বলল সেসিলি। 'মিস্টার রানা, আর কিছু দেখলেন?'

কিনারা থেকে পিছিয়ে গেছে ওরা। ছাতে আলো ফেলল রানা। 'ওপরের বিমে কী যেন। ভালভাবে দেখছি না। ওদিকের দেয়ালে গর্তের মত কিছু।'

'বিমে উঠতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

'না, অনেক উঁচু। আমাদের যে কাউকে পৌঁছতে হবে ওই ছোরা পর্যন্ত।'

বড় করে দম নিল সেসিলি। 'তিনজনের ভেতর আমি সবচেয়ে হালকা। কাজটা মনে হচ্ছে আমাকেই করতে হবে।'

'কিন্তু তুমি তো আহত,' আপত্তির সুরে বলল লাবনী।

চুপ করে আছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তক্তা পুরু বা চওড়া নয়, কিন্তু আমি বোধহয়...'

ওকে অবাক করে মেঝেতে সুস্থ ডানহাত রেখে দু' পা ছাতের দিকে তুলল সেসিলি, পরক্ষণে ডিগবাজি দিয়ে আবারও

ভর দিল দু' পায়ে।

'ঠিক আছে, বুঝেছি,' মাথা দোলাল রানা। 'ওখানে গিয়ে সরিয়ে ফেলবে ছোরা, তারপর...'

'বিরাট বিপদ হলে, সেসিলি?' ভয়ে ভয়ে পুকুরের পানি দেখল লাবনী। 'কুমির হামলে পড়লে...'

'আর কোনও উপায়ও তো নেই,' তক্তার কাছে সরল সেসিলি।

'আর একচল্লিশ মিনিট বাকি,' বলল রানা।

'কাজেই দেরি করা যাবে না,' সাবধানে ঘাট থেকে তক্তার ওপর নামল সেসিলি। ওজন নিতেই আপত্তির কট-কট আওয়াজে বাঁকা হয়ে গেল তক্তা। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে সেসিলির সামনের পথ আলোকিত করল রানা।

একহাত সামনে বাড়িয়ে ভারসাম্য স্থির রাখল সেসিলি। সামান্য গুঙিয়ে উঠল আহত হাতে ব্যথা পেয়ে। 'ঠিক আছে, রওনা হচ্ছি।'

পা বাড়াতেই কট-কট শব্দে নড়ল তক্তা। এবারের আওয়াজ আগের চেয়েও বেশি। নড়বড় করছে সরু সেতু, যেসব খুঁটি ওটাকে ধরে রেখেছে, ওগুলোও দুলছে এদিক ওদিক।

দূরের নালার কাছে একরাশ বুদ্বুদ, নড়ছে কী যেন। অ্যালজি ভরা পানিতে ভেসে উঠল হলদে দুটো চোখ আর লম্বাটে মাথা। তলিয়ে আছে পেছনের শরীর।

'সেসিলি...' সাবধান করতে চাইল লাবনী।

'দেখেছি,' বলল সেসিলি। পুরো মন দিয়েছে তক্তার ওপর। সাবধানে এগোল ছোরার দিকে। দু'পাশের দুই খুঁটির মাঝে পৌঁছুতেই পায়ের চাপে বাঁকা হয়ে পানির নিচে তলিয়ে গেল তক্তা। এখনও ভাসছে সামান্য অংশ।

তরতর করে এগিয়ে আসছে কুমির। এদিক ওদিক নড়ছে

লেজ। গতি তার সাবলীল।

পাত্তা দিল না সেসিলি, পুরো মন ভারসাম্য রাখার ওপর। তৃতীয় খুঁটি ওজন নিলেও এদিক ওদিক সরছে সেতুর গোটা কাঠামো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন।

মৃদু ছলাৎ শব্দ শুনে পুকুরের আরেক দিকে তাকাল লাবনী। ভেসে উঠেছে দ্বিতীয় কুমির। ওটা আরও বড়! খেয়ালই নেই ছোট কুমিরের দিকে। ভাসছে মস্ত গাছের গুঁড়ির মত।

এমন দাঁতওয়ালা গুঁড়ি পছন্দ করবে না কেউ। বিরাট এক হাঁ করল কুমির, মুখ থেকে বেরোল অশুভ হিস-হিস আওয়াজ।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে সেসিলি, পেরিয়ে গেছে অর্ধেক পথ। ওর বাড়তি ওজন নিতে গিয়ে শত বছরের বুড়োর মত কুঁজো হয়েছে তক্তা। একটু একটু সরে যাচ্ছে।

পরিষ্কার ছোরাটা দেখছে সেসিলি। ধাতব এক কাপের ভেতর ওটার ডগা। অগভীর গর্তের সঙ্গে যুক্ত কাপ।

আরেকটা বুবি ট্র্যাপ?

বিমের সামান্য ওপরে খুব সরু এক তাক, আগে চোখেই পড়েনি সেসিলির। ওটা লম্বায় দু'ফুট। দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে মাত্র এক ইঞ্চি। ওই তাকে বড়জোর পায়ের বুড়ো আঙুল রাখতে পারবে কেউ। জরুরি কাজে লাগবে বলেই বুঝি ওই তাক তৈরি করেছিল মন্দির নির্মাতারা। সেসিলির মনে হলো, ঠিক কী কারণে রাখা হয়েছে, তার জবাব জানলে হয়তো ভাল লাগবে না ওর।

নড়বড়ে তক্তা ভেসে যেতে চাইছে।

রহস্যময় তাকের দিকে মন সরিয়ে নিয়েছে সেসিলি, আর সে কারণেই হঠাৎ হারাল ভারসাম্য। শেষসময়ে সামলে নিতে চাইল, কিন্তু ওর ওজন সরে গেছে তক্তা থেকে! একবার ঝপাস্ করে পানিতে পড়লেই আরাম করে ওকে কয়েক গ্রাসে পেটে

পুরবে কুমির!

সামনে ঝাঁপ দিল সেসিলি, পেটে ভর করে পড়ল তক্তার ওপর। ওর মনে হলো চড়াৎ করে চড় দেয়া হলো ওকে। দু'গোড়ালি দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে সরু তক্তা। আশা করছে, ওখান থেকে পড়বে না পানিতে।

'সেসিলি!' হায়-হায় করে উঠল লাবনী।

ঝটকা দিয়ে জ্যাকেট খুলে ফেলেছে রানা, কুমিরের হামলার সম্ভাবনা পাত্তা না দিয়েই এবার ঝাঁপ দেবে পুকুরে।

শব্দ শুনে সেসিলির দিকে আসছে দুই কুমির।

'কেউ পানিতে নামবে না!' প্রায় ধমকে উঠল সেসিলি। ওর হাঁটু এখনও পানির নিচে। বুট ব্যবহার করে সামনে খাড়ল।

পানি ছেড়ে উঠল কাছের কুমিরের লম্বা মাথা। হাঁ করতেই দেখা গেল এবড়োখেবড়ো সারি সারি হলদে দাঁত!

একইসময়ে লাফিয়ে তক্তায় নামল রানা, ঝপাস্ করে পানিতে ফেলল ডান পা। আওয়াজ হয়েছে জোরালো।

'আয় এদিকে! আয়, শালারা!'

বড় কুমির দিক পাল্টে সোজা এগোল রানাকে লক্ষ্য করে।

সেসিলির দিকে চলেছে দ্বিতীয় কুমির। রানার তৈরি শব্দে খেয়াল নেই। সামনেই লোভনীয় খাবার! তখনই পুরু করোটির পাশে বুটের ইস্পাত সোলের মারাত্মক এক গুঁতো খেয়ে বেদম চমকে গেল– আরে! পরিষ্কার শোনা গেল বদ্ধ জায়গায় শক্ত ধাতব পাতের সঙ্গে কঠিন হাড়ের জোরালো 'খটাৎ!' আওয়াজ।

মস্ত সাপের মত 'হিস্-হিস্' আওয়াজে বাতাস ছাড়ল কুমির, তলিয়ে গেল লেজ। ব্যস্ত হয়ে এগোবার ফাঁকে কাঁধের ওপর দিয়ে বিশাল কুমির দেখল সেসিলি। পানিতে ঘুরেই তেড়ে এল ওটা ওর দিকেই!

আবারও পানিতে ঝপাস্ শব্দে পা নামাল রানা, পরক্ষণে

লাফিয়ে উঠল ঘাটে। সরে গেছে ভেতরের দিকে। মাথা তুলে মস্ত হাঁ মেলে ঘাটে চোয়াল ফেলল ওর কুমির। ততক্ষণে উড়ে গেছে পাখি! পাথুরে মেঝে খামচে উঠতে গিয়েও খড়-মড় শব্দে পুকুরে পড়ল ওটা। ভারী দেহ ঝাঁকিয়ে দিল সরু সেতু।

পড়তে গিয়েও তক্তা খামচে ধরে টিকে গেল সেসিলি। এদিকে আবারও ঘাটে উঠতে চাইছে রানার কুমির। পাগল হয়ে গেছে শিকার না পেয়ে। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর হার মেনে ঝুপ্ করে নামল পুকুরে।

সেসিলির দিকে আবারও চলেছে দ্বিতীয় কুমির, নাকের ডগায় ম্‌ ঢেউ। আগেরবার ব্যথা পেয়ে হুঁশিয়ার, ঠিক করেছে ভুলেও পা দিকে না গিয়ে কামড়ে ধরবে শিকারের উর্ধ্বাঙ্গ।

ওদিকে দেহ টেনে এগিয়ে চলেছে সেসিলি। শীতল পাথুরে দেয়ালের স্পর্শ পেল আঙুলে। উঠে সেতু থেকে এক পা রাখল সরু তাকে। আর তখনই এল কুমিরের হামলা।

আঁৎকে উঠে কাপ থেকে ছোরা নিয়ে ঘুরেই কুমিরের হলদে চোখে ফলা নামাল সেসিলি। ইস্পাতের ডগা ঢুকেছে সরীসৃপের মগজে। তক্তার ওপর বারকয়েক আছাড় খেয়ে পিছলে পানিতে পড়ল দানব। নিথর দেহ তলিয়ে যাচ্ছে। চারপাশ রক্তে লাল।

ওখানেই দেখা দিল ঝটকা। খলবল করছে ডজন ডজন মাছের রুপালি পাখনা।

ঠিকই বলেছিল রানা। পুকুরে ঘুরছে পিরানহা!

দেয়ালের সরু তাকে পায়ের আঙুল রাখল সেসিলি, অন্য পা সেতুর ওপর। পিরানহা মৃত কুমিরকে খুবলে খাচ্ছে বলে থরথর করে কাঁপছে তক্তা। ভীষণ ভয়, পানি দেখছে সেসিলি। কয়েক সেকেণ্ড পর থামল সেতুর কম্পন। চারপাশে তাকাল ও, ছোরা সরিয়ে নেয়ায় কিছু হওয়ার কথা। কিন্তু...

একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল।

রানা ও লাবনীর ওপরের ছাতে ভারী ধাতব আওয়াজ এত আঁধার, ওদিকে কিছুই দেখা গেল না। পরক্ষণে সেসিলির পায়ের তলা দিয়ে সেতু ঢুকে যেতে লাগল দেয়ালের সরু স্লটে। ওটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভি-র মত ভাঁজ হয়ে তলিয়ে গেল সেতুর দু'পাশের খুঁটি। পুকুরের নিচে আছে সেতুর ফ্রেমওঅর্ক। ধীর গতি তুলে তক্তা ঢুকছে দেয়ালের ফাঁকে।

'রানা! কিছু করো!' আর্তচিৎকার ছাড়ল লাবনী। অসহায় চোখে দেখছে, সেতু সরে যাচ্ছে ঘাট থেকে।

সেতু ঠেকিয়ে রাখতে কিছু থাকার কথা, চারপাশ দেখছে রানা, কিন্তু এমন কিছু চোখে পড়ছে না, যেটা কাজে আসবে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেখছে সেসিলি, চোখে ভয়। মাত্র কিছুক্ষণের ভেতর সেতুর তক্তা ঢুকবে এদিকের ালে, তার আগেই কিছু করতে হবে, নইলে পুকুরে গিয়ে পড়বে ও!

কুমির... পিরানহা...

সেসিলির হাতে ছোরা, কিন্তু ওটা দিয়ে কী করবে?

ছোরা দেখছে। ওটা দিয়ে জরুরি কিছু করতে হবে। শুধু কাপ থেকে তুলে নিলেই চলবে না।

'রানা, আমার দিকে ফ্ল্যাশলাইট ছুঁড়ে দিন!' চিৎকার করল সেসিলি।

'পুকুরে পড়বে সেসিলি!' হায়-হায় করে উঠল লাবনী।

ফ্ল্যাশলাইট সহ হাত পিছিয়ে নিল রানা। 'সেসিলি! রেডি?'

'হ্যাঁ!'

জিনিসটা ছুঁড়ল রানা। আলোর উজ্জ্বল রেখা তৈরি করে ছুটল ফ্ল্যাশলাইট, যেন আকাশ থেকে খসে পড়া কোনও তারা। আহত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেসিলি। ওর তালুতে ঠাস্ করে লাগল টর্চ। ভারসাম্য রাখতে গিয়ে দুলে গেছে ও, তবে ঠিকভাবেই ধরেছে ফ্ল্যাশলাইট। দূরের দেয়ালে তাক করল আলো। ওখানে

গোল অ্যালকোভ। ভেতরে ধাতব কিছু। চকচক করছে। সোনা বা তামার। ওটা একফুটি গোলাকার ঢালের মত।

না, সাধারণ কোনও ঢাল নয়, ওটাই হবে ওর নির্দিষ্ট টার্গেট।

বাকি আছে বড়জোর তিন ফুট সেতু, কয়েক সেকেণ্ডে ঢুকে যাবে দেয়ালের স্লটে!

দেরি না করে সেতুর ওপর নামল সেসিলি, ডানহাতে ছোরা পিছিয়ে নিয়েই ছুঁড়ল সামনে। টর্চের আলোয় ঝিলিক দিল ছোরা। খটাং আওয়াজে লাগল টার্গেটে। টলে উঠে পিছিয়ে গেল ধাতব গোলাকার ঢাল। আর দেখা গেল না।

তক্তা বা সেতুর পিছিয়ে যাওয়া থেমে গেছে। কাঠ ও দড়ির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুনল ওরা। সেসিলির দিকের দেয়াল থেকে দূরের ঘাটে গিয়ে ধুপ্ আওয়াজে নামল ড্র ব্রিজ।

সাবধানে ঘাড় কাত করে সেসিলি দেখল, ওর পায়ের নিচে সেতু আছে মাত্র দশ ইঞ্চি। একহাতে দেয়ালে হেলান দিল। অসহায় বোধ করছে। বিরক্তি নিয়ে বলল, 'এবার কী?'

যেন জবাব হিসেবেই আওয়াজ হলো। ওপরের তাক থেকে সড়াৎ করে নেমে এল এক জোড়া দড়ি, দু' প্রান্তে এক ফুট পর পর কাঠের ধাপ।

এদিকে এরই ভেতর ড্র ব্রিজে উঠেছে রানা ও লাবনী। 'ওদিকে গিয়ে দেখছি কী করা যায়!' বলল রানা।

দড়ির মই নিজের দিকে টেনে নিল সেসিলি। পরখ করে দেখল, চট্ করে ছিঁড়বে না। এটা কোনও বুবি ট্র্যাপ নয়। ডানহাতে বেশি ওজন চাপিয়ে দড়ির মই ব্যবহার করে ওপরের তাকে উঠে এল ও। তাক মাত্র দু'ফুট চওড়া। কিন্তু ওর মনে হলো, আগে যেখানে ছিল, সেই তুলনায় এটা রাজপথ।

ড্র ব্রিজের শেষমাথায় থামল রানা ও লাবনী। তাক থেকে

সেতুর ওপর পা দিয়েই সেসিলিকে বলল রানা, ‘দুর্দান্ত লক্ষ্যভেদ!’

রানার গায়ে হেলান দিয়েছে লাবনী, ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘টার্গেটি কত বড় ছিল?’

হাত দিয়ে বৃত্তাকার এক ফুট জায়গা দেখিয়ে দিল সেসিলি। সে সুযোগে ওর ব্যাণ্ডেজ দেখল লাবনী। রক্তে ভিজে গেছে কাপড়। ‘আমি জীবনেও পারতাম না,’ নির্দ্বিধায় বলল, ‘যেমন-তেমন চ্যালেঞ্জ নয়, সত্যিকারের মরণ নিয়ে খেলা!’

‘রয়ে গেল আরও একটা চ্যালেঞ্জ,’ বলল রানা। ‘বুদ্ধির খেলা। তুমি ওটার জন্যে তৈরি তো, লাবনী?’

নার্ভাস হাসল মেয়েটা। ‘আর কোনও উপায় আছে?’

‘হাতে ছত্রিশ মিনিট।’ সামনের প্যাসেজ দেখাল রানা। মন্দিরের আরও গভীরে ঢুকে গেছে ওই প্যাসেজটা। পিছনের করিডোরের মতই দেখতে, কিন্তু কেন যেন রানার মনে হলো, এবারের করিডোর অনেক বেশি বিপজ্জনক। ‘ঠিক আছে, চলো।’

‘আশা করি আমাদের সবার মগজই কাজ করবে,’ নিচু স্বরে বলল লাবনী।

ষোলো

দীর্ঘ করিডোর ধরে হেঁটে চলেছে ওরা, ট্র্যাপের ব্যাপারে সতর্ক। জানে, যে-কোনও সময়ে ঘাড়ে এসে পড়বে মস্ত কোনও বিপদ।

কী যেন মনে পড়তে গিয়েও পড়ছে না রানার। আসলে বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে মন স্থির রাখা কঠিন। কী যেন জানা ছিল ওর, আলাপও করেছে লাবনীর সঙ্গে প্যারিসে।

আপাতত মনে পড়ছে না, কিন্তু জরুরি কথা।

ফুরিয়ে এল করিডোর। সামনে নতুন ঘর। ওটার দরজার কাছে থামল রানা। 'একটু অপেক্ষা করো।' ওদিকের ঘরে আলো ফেলল। 'আগের চেম্বারের চেয়ে ছোট।'

মস্ত পুকুরের ঘরের তুলনায় এই ঘর অনেক ছোট, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পনেরো ফুটের মত। আলো ফেলে ভেতর দিক দেখে নিল রানা। দেয়ালে দেয়ালে কী সব লেখা। গ্লোযেল ও ওলমেক অক্ষর। আর এই ঘরই মন্দিরে ঢোকার প্রথম কক্ষ।

'দেখে মনে হচ্ছে নিরাপদ,' বলল রানা, 'কিন্তু সতর্ক থেকো তোমরা।' ঘরে পা রাখল ও, মনে মনে ভাবছে, বড় কোনও ফাঁদ থাকবে এখানে। ওর পর ঘরে ঢুকল লাবনী ও সেসিলি। 'বুদ্ধির চ্যালেঞ্জ দেয়া হবে এখানে।'

'জানি।' রানার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে দেয়ালের অক্ষরে আলো ফেলল লাবনী। 'হায়, আল্লা! এগুলো অনুবাদ করতে গেলে তো পাক্কা এক বছর লাগবে!'

'কিন্তু তেত্রিশ মিনিট পর সূর্য ডুববে,' বলল রানা।

'লাবনী, এদিকে এসো,' দরজার উল্টো দিকের দেয়ালের সামনে থেমেছে সেসিলি। দেয়ালে বড় একখণ্ড পাথর ভরা অক্ষর। মনে হলো, ওই পাথরখণ্ড আসলে দরজা। পাশেই কী যেন। পুরনো আমলের।

'মাপযন্ত্র,' মন্তব্য করল রানা।

'ওজন মাপা হতো,' সায় দিল লাবনী। ওটার ওপর আলো ফেলল। পাথরের মাপযন্ত্রের পায়ের কাছে গোলাকার বড় পাথুরে খোঁড়ল। ওটার ভেতর কমপক্ষে এক শ'টা সীসের বল।

একেকটা ছোট মার্বেল বলের সমান। 'বোধহয় মাপযন্ত্রে তুলতে হবে সঠিক পরিমাণের বল। কিন্তু জানব কী করে যে কতগুলো দরকার ওটার?' মাপযন্ত্রের তামার পাত্রের পাশে একটা লিভার।

ওটার দিকে হাত বাড়াতেই লাবনীকে বাধা দিল রানা। নিচু স্বরে বলল, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, সুযোগ দেয়া হবে মাত্র একবার।' আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল ছাত। ওপরে ঝুলছে বিশাল এক ধাতব খাঁচা। আর ওটা ভরা এক ফুটি সব তীক্ষ্ণধার ফলা। খাঁচা নামলে ভরে যাবে পুরো ঘর। চট্ করে লিভারের দিক থেকে হাত পিছিয়ে নিল লাবনী।

এবার আলো ফেলল উল্টো দিকের দেয়ালে। একপাশে দেখল খোদাই করা বড় বড় সব অক্ষর। সারিতে সাজিয়ে দেয়া তিন লাইন। প্রথম লাইনে ছয়টি করে সিম্বল। পরের দুটোতে পাঁচটি করে। প্রথমেই চিনে গেল লাবনী প্রথম অক্ষর। ওপরের কমার মত ছোট অক্ষরগুলো...

'ওগুলো সংখ্যা,' বলল লাবনী, 'এটা কোনও অঙ্কের ফাঁদ। অঙ্ক কষে বের করতে হবে কতগুলো বল রাখতে হবে মাপযন্ত্রের পাত্রে।' চুপ হয়ে গেল, সংখ্যা পড়ছে টর্চের আলোয়। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমাদের নিউমেরিকাল অর্ডারের বিপরীত ছিল ওদের। প্রথম সিম্বলের ছোট এই ডট মানে, সবচেয়ে ছোট সংখ্যা। তারমানে, ওগুলো থেকে প্রথম নম্বর হবে ১,৪২,৭৫৩। আমাদের পাওয়া ওই সেক্সট্যান্ট বাহুর সিম্বলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। জানতাম প্রথম ছোট সংখ্যা কী ছিল। নইলে কখনও খুঁজে পেতাম না এই এলাকা।'

'তো? এবার কী?' মৃদু হাসল রানা। 'অন্য দুই যোগফল হচ্ছে... ৮৭,৫২৭... আর ৩৪,১৬৪। ...এবার? এগুলো বিয়োগ করব আগের ওই ফল থেকে? তা হলে হবে...'

'একুশ হাজার বাষট্টি,' প্রায় একই সময়ে বলল লাবনী ও

সেসিলি।

'তোমরা থাকলে ক্যালকুলেটর দরকার কী,' হাসল রানা। 'কিন্তু ওই তামার পাত্রে অত আঁটবে না।'

'অন্য কিছু আছে,' বলল সেসিলি। 'প্রথম সব সংখ্যার ফল থেকে বিয়োগ করতে হবে দ্বিতীয়টার ফল। তারপর ভাগ করতে হবে তৃতীয়টা দিয়ে।'

'না, বেশি জটিল,' আবারও সংখ্যা দেখছে লাবনী। 'এমন কোনও সিম্বল নেই যেটা দেখে মনে হবে, অন্য কোনওভাবে অঙ্ক কষতে হবে। তা ছাড়া...' ভুরু কুঁচকে গেল ওর। কী যেন অঙ্ক কষছে। 'তাতে রেযাল্ট হবে ভগ্নাংশ। আমাদের উপায় নেই যে একটা বলের এক দশমিক ছয় দুই অংশ রাখব প্যানে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। 'ভগ্নাংশ নিয়ে ভাবতে গেলেই কেমন ঘুম আসে!'

'অনেক জটিল হতে পারে হিসাব,' বলল সেসিলি।

চারপাশের দেয়ালে আলো ফেলল লাবনী। 'নানানভাবে অঙ্ক কষতে পারি, কিন্তু উত্তর হবে সহজ। দেয়ালে খোদাই করা অক্ষর বা সংখ্যার ভেতর থাকবে সূত্র। খুঁজে নিতে হবে ওটা। সময়?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর উনত্রিশ মিনিট।'

ঝুঁকে দেয়ালের সিম্বল দেখল লাবনী। এক মিনিট পর বড় করে দম ফেলে হতাশ সুরে বলল, 'এই দালান, শহর ও তাদের মানুষের ইতিহাস লিখেছে। এসবের সঙ্গে অঙ্কের সম্পর্ক নেই।'

'আটলান্টিয়ানরা আসার আগে কী হয়েছে, সেসব লেখেনি?' জানতে চাইল সেসিলি।

'না।' উল্টো দেয়ালের কাছে গিয়ে সিম্বল পড়তে লাগল লাবনী। 'না। এখানেও ওসব নেই। ডায়রির মত। কতগুলো বাচ্চা হয়েছে, কয়টা জন্তু ছিল। সব কয়েক শতাব্দীর হিসাব। এ

চ্যালেঞ্জের সঙ্গে এসবের মিল নেই।' পাথুরে দরজার দিকে আঙুল তুলল লাবনী। 'ওখানেও কিছু নেই।'

'ঘুর পথে চিন্তা করে ধাঁধা সমাধান করতে হবে, এমন হতে পারে?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক কী বলতে চাইছেন?' জানতে চাইল সেসিলি।

'এটা একটা দরজা, ঠিক?' পাথুরে কবাটের সামনে পৌঁছে গেল রানা। 'আমরা একবারও ভাবিনি দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে পারি।'

'চেষ্টা করে দেখো!' তাগাদা দিল লাবনী।

একপাশে ঠেলা দিয়ে দেখল রানা, নড়ল না দরজা। উল্টো দিক থেকেও চেষ্টা করল। ওপরে তুলতে চাইল। নানাদিক থেকে টান দিল। পাথরের দরজা অনড়।

বিরক্ত হয়ে রানা বলল, 'শালার ব্যাটা নড়বে না!'

'আগেও কেউ চেষ্টা করে দেখেছে,' বলল লাবনী। 'ওই যে দেখো, দরজার রং পাথরের ঘরের সঙ্গে মেলে না। অন্য পাথর দিয়ে তৈরি দরজা। এখানে ওখানে বাটালির দাগ। অন্য কোনও দরজায় কিন্তু এমন দাগ ছিল না। ইণ্ডিয়ানরা পাল্টে দিয়েছে এই দরজা। তোমার মতই কেউ ফাঁদ এড়াতে চেয়েছিল। ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল দরজা।'

'আগের নাযিরা?' আনমনে বলল সেসিলি।

'বোধহয়,' সায় দিল রানা, 'সঙ্গে ছিল দরকারী জিনিস। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, আমাদের হাতে তেমন কিছুই নেই।'

পাশের দেয়ালের খোদাই করা অক্ষর পড়ছে লাবনী। 'তবুও হয়তো বেরিয়ে যেতে পারব। এদিকের সব সংখ্যা কেমন যেন অদ্ভুত। দেখো।' লাইন কে লাইন সিম্বলে আঙুল বোলাচ্ছে ও। 'দেখছ? প্রতি সারিতে আটটা করে সংখ্যা। কখনও নয় বা দশ নয়। আট এখানে, ওদিকে আট, আবারও আট...'

'বেস হিসেবে আট ধরেছে?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

'আগেও অন্য সভ্যতা এই আটকে ব্যবহার করেছে।'

'তাতে তুমি কী পেলে?' জানতে চাইল রানা।

'আমরা ধরে নিয়েছি, এরা দশ ব্যবহার করেছে অঙ্কে,' বলল লাবনী, 'কিন্তু তা না হলে?' চকচক করছে ওর চোখ। 'দশের ওপর ভর করে চলছে আমাদের নিউমেরিকাল সিস্টেম। দশ, এক শ', হাজার... কারণ চোখের সামনে দেখি বলে আমরা ব্যবহার করি দশটা আঙুল। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, মিশরীয়রা আমাদের মতই ব্যবহার করেছে দশ আঙুল। কিন্তু আগেও নানান সিস্টেম ছিল অন্যান্য সভ্যতায়। সুমেরিয়ান সভ্যতার মানুষ ব্যবহার করত বেস হিসেবে ষাট।'

'ষাট?' ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। 'ওটা দিয়ে কী হবে?'

'এখনও তো দেখছ,' হাসল লাবনী। 'তোমার হাতঘড়িতে। সময়ের হিসেব চলছে সুমেরিয়ান সভ্যতার আলোকে।'

'ঠিক!' মাথা দোলাল রানা।

'অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাও অন্য বেস ব্যবহার করে হিসাব কষত,' বলল লাবনী, 'মায়ানরা বিশ, ব্রোঞ্জ যুগে ইউরোপিয়ানরা বেস হিসেবে আট...' তুড়ি বাজাল ও। ঝট্ করে মাথা ঘুরিয়ে দেখল আগের সিম্বলে। 'বেস আট! বুঝেছি! ঠিক তাই হয়েছে!'

'বুঝেছি, ওরা বুড়ো আঙুল দিয়ে অন্য চার আঙুল গুনত, কিন্তু বেচারা বুড়ো আঙুলটাকে হিসেবের ভেতরই রাখত না,' বলল রানা।

'ঠিক,' সায় দিল লাবনী। পড়ছে খোদাই করা পাথরে অক্ষর ও সংখ্যা। 'তার মানে দশ, এক শ' বা হাজার বাদ দিয়ে শুরু করেছে এক, আট, চৌষট্টি এসব দিয়ে।' দৌড়ে দরজার সামনে থামল ও। 'প্রথম সারিতে একক সংখ্যা, দ্বিতীয় সারিতে আট, তারপর চৌষট্টি, পাঁচ শ' বারো, চার হাজার ছিয়ানব্বুই আর

তারপর...

'তেত্রিশ হাজার সাত শ' সাতষট্টি,' কথা শেষ করল সেসিলি।

'ঠিক! তা হলে সংখ্যা হবে... তিনটে একক সংখ্যা, যোগ পাঁচটা আট, চল্লিশ, যোগ চৌষট্টি গুণ সাত...'

'অঙ্ক কষা শেষ হলে উত্তর বলবে,' বিরক্ত অঙ্ক শিক্ষকের ভঙ্গি নিল রানা।

দুই মেয়ের ভেতর প্রথমে হিসেব কষল সেসিলি। 'পঞ্চাশ হাজার ছয় শ' সাতষট্টি!'

'ঠিক আছে!' বলল লাবনী, 'পরের সংখ্যা দেখো, তৃতীয়টা আমি বের করছি।' কিছুক্ষণ পর বেরোল দুটো উত্তর: ৩৬,৬৯৫ ও ১৪,৪৫২। 'বেশ! এবার প্রথমে বিয়োগ করব প্রথম ফল থেকে, তারপর দ্বিতীয়টা থেকে তৃতীয় সংখ্যাগুলো...'

ভুরু-গাল কুঁচকে হিসাব কষছে দু'মেয়ে। মনোযোগ দিয়ে ওদেরকে দেখল রানা। মনে মনে বলল, ওদের ভেতর লাবনীই বেশি সুন্দরী। ওদের চেহারা বিকৃত হতে দেখে জানতে চাইল, 'হ্যাঁ, উত্তর কী হবে?' আবারও হয়ে উঠেছে অঙ্কের মাস্টার।

'উত্তর মাইনাস চার শ' আশি,' হতাশ হয়ে বলল লাবনী। 'কিন্তু এটা তো বেস আট হতে পারে না।'

'বেস যদি হয় নয়?' জানতে চাইল সেসিলি। 'ডেসিমেল হবে অনেক বড়, কিন্তু ওকটাল হবে অনেক ছোট...'

'জবাব হবে হাজারো সংখ্যা!' রানার দিকে রাগী চোখে দেখল লাবনী।

'বুঝলাম। তবে, সুমেরিয়ান সভ্যতার হিসেবে সময় আছে আর চব্বিশ মিনিট,' যমের মত গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিল রানা।

'সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, ধ্যাৎ!' রাগ করে দরজায় কসে লাথি বসাল লাবনী। কুঁচকে ফেলল মুখ। ব্যথা পেয়েছে। 'ভুলটা

করলাম কোথায়?'

সীসার বলের ভেতর হাত ভরে সূত্র খুঁজল রানা। তেমন কিছু নেই। 'আচ্ছা, আন্দাজে প্যানে বল তুলে দিলে? কপাল ভাল হলে কিছুই হবে না।'

'এত সহজ নয় জীবন, রানা,' বকা দিয়ে গলার লকেট স্পর্শ করল লাবনী। 'কিন্তু খুব কঠিনও হবে না ওই হিসাব।'

'আগের সব ফাঁদ পেরিয়ে আবারও গ্রামে গেলে খুন হব,' বলল রানা। 'আবার হিসাব ভুল হলেও এখনই শেষ।' ছাতের দিক দেখিয়ে দিল। খাঁচাভরা বর্শার ফলা। 'বাইরে থেকে যদি কোনওভাবে লিভার টেনে দেয়া যেত...'

রানার কথা মনে ধরেছে লাবনীর। এসব ফাঁদ ঠিক রাখতে হয়। তখন নিশ্চয়ই অন্য কোনও পথে আসে ইণ্ডিয়ানরা?

একই চিন্তা থেকে প্যারিসে রানা বলেছিল লাবনীকে, এ ধরনের ফাঁদ থাকতে পারে। কথাটা মনে পড়তেই বলল, 'অন্য পথ আছে, থাকতেই হবে! নইলে এসব ফাঁদ রাখতে পারত না ইণ্ডিয়ানরা।'

'গোপন কোনও পেছন পথ?' বলল সেসিলি।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছে রানা,' সায় দিল লাবনী। 'চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা না করেই ওই পথে মন্দিরে ঢোকে ইণ্ডিয়ানরা আবারও দেয়ালে আলো ফেলল। 'গোপন কোনও সুইচ থাকবে, বা আলগা কোনও স্ল্যাব। যেটার কারণে খুলবে দরজা।'

ব্যস্ত হয়ে দেয়াল দেখতে লাগল ওরা। শীতল পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। মনে হলো না অস্বাভাবিক কিছু আছে। পুরো একমিনিট পর ডাকল রানা, 'এখানে এসো!'

ঘরের কোণে ওর সামনে হাজির হলো লাবনী ও সেসিলি।

দু'দেয়াল যেখানে যুক্ত, ওখানে মেঝের পাশে ছোট একটা খাড়া স্লট। খুব ছোট, কিন্তু অন্য কোনও পাথরের সঙ্গে মিলবে

না। অযোগ্য কেউ তৈরি করেছে আনাড়ি হাতে।

'ভেতরে কী?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

'জানি না, এত সরু যে হাত ভরতে পারব না,' বলল রানা। 'লাবনী, তোমার হাত ছোট, ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দেখবে ওদিকে কী?'

'খচ্ করে আঙুল কেটে নিলে?' ভয় পেয়ে গিয়ে বলল লাবনী। 'আমার আঙুল আমার কাছেই থাক।' বলল বটে, কিন্তু বসে পড়ল স্লটের সামনে, হাত বাড়িয়ে কুঁচকে ফেলল ভুরু। 'ভেতরে কাঁকড়া বিছে থাকলে দোষ রানার!'

'কাঁকড়া বিছের বুঝি দোষ নেই?' প্রশ্ন তুলল নিরীহ রানা।

'না, নেই।' সরু স্লটে আঙুল ভরল লাবনী। কী যেন লাগল আঙুলের ডগায়। কে জানে, ওটা নাড়লে হয়তো ছাত থেকে নামবে বর্শার ফলা ভরা খাঁচা! তবুও নির্বিকার ওরা।

'কিছু পেলে?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

'ধাতুর কিছু।'

'কোনও সুইচ?' জানতে চাইল রানা।

'জানি না, একমিনিট।' বাধা এড়িয়ে সামনে আঙুল পাঠাল লাবনী। 'সুইচ হতেও পারে।'

'টান দিতে পারবে?' ঝুঁকে গেল রানা।

'আমি টান দিয়ে দেখব,' বলল সেসিলি, 'লাবনী, তুমি বাইরের করিডোরে গিয়ে অপেক্ষা করো। খারাপ কিছু হলে আমাদের হোক।'

'এতে কাজ না হলে সবাই মরব,' বলল লাবনী। 'বরং আমি রয়ে যাই, তোমরা গিয়ে দাঁড়াও বাইরের করিডোরে।' কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল ও, টের পেল অন্যরা ওকে ছেড়ে যাবে না। বড় করে দম নিল লাবনী, তারপর সরু স্লটে আবারও ঢোকাল আঙুল। 'ঠিক আছে, দেখা যাক...

ধাতুর জিনিসটা আঙুলে পেঁচিয়ে টান দিল ও। মনে মনে বলল, কে জানে কী হবে!

"ক্লিঙ্ক!"

বর্শার ফলা ভরা খাঁচা আগের জায়গায় ঝুলছে।

এবার আরও জোরালো ধাতব আওয়াজ হলো পাথুরে দরজা থেকে। বড় করে দম নিল লাবনী। 'কাজ হয়েছে!'

'এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাও,' বলল রানা। 'করিডোরে অপেক্ষা করবে।' লাবনী ও সেসিলি পেছনের করিডোরে যাওয়ার পর পাথরের দরজার সামনে থামল রানা। হাঁ হয়ে খুলে গেছে কবাট। ওটার নিচের অংশ ঘষা লেগেছে মেঝেতে। দরজার ওদিকে কালো আঁধার এক করিডোর।

'আমরা পেরেছি!' খুশি মনে বলল সেসিলি। আবার এসে ঢুকেছে ঘরে। পাশে লাবনী।

'হাতে সময় কম, মাত্র একুশ মিনিট,' তাড়া দিল রানা।

'ঘুরপথে সমাধানের চিন্তাটা রানার, ওকে এই ইভেন্টের পুরো ক্রেডিট দেব,' বলল লাবনী।

মাথা দোলাল সেসিলি।

'সবাই যার যার কাজ করেছি বলেই সফল হয়েছি,' বলল রানা।

'আমরা পেরিয়ে গেছি তিন চ্যালেঞ্জ, এবার?' লাবনীর দিকে তাকাল সেসিলি।

'ঠিক জায়গায় রাখব আর্টিফ্যাক্ট, তারপর দেরি না করে বেরিয়ে যাব,' বলল লাবনী।

ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো প্যাসেজে ফেলল রানা। 'চলো, রওনা হই।'

দুশ্চিন্তা নিয়ে পশ্চিমাকাশে তাকাল জ্যাঁ মউরোস। কিছুক্ষণ আগে

উঁচু সব গাছের ওদিকে ডুব দিয়েছে সূর্য। তবে ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে দিগন্তের কাছ থেকে এখনও আসছে উজ্জ্বল লালচে আলো। ক্রমেই গাঢ় নীল হয়ে উঠছে মাথার ওপরের আকাশ। একটু পর ঝপ্ করে নামবে আঁধার।

আবারও মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দিকে তাকাল মউরোস। কালো ওই চৌকো গর্তের কাছে কোনও নড়াচড়া নেই। রানার হাতের ফ্ল্যাশলাইটের জোরালো আলো হারিয়ে যাওয়ার পর পেরিয়ে গেছে কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

'রানা, দোস্ত, জলদি!' বিড়বিড় করল মউরোস।

'ও...ওরা যদি মরে গিয়ে থাকে?' দুর্বল স্বরে বলল প্রফেসর জিম করেলি। ভয় ভরা চেহারায় দরদর করে ঘামছে। বুড়ো সর্দারদের বাড়ির সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওদেরকে। ঘিরে রেখেছে অন্তত বিশজন শিকারি।

'ওরা পারবে,' বলল মউরোস। মনে মনে বলল, সত্যি যদি কথাটা বিশ্বাস করতে পারতাম!

হঠাৎ ইণ্ডিয়ানদের নিচু কথা ও নীড়ে ফেরা পাখির কিচির-মিচির আওয়াজের ওপর দিয়ে এল কর্কশ শব্দ। ওটা আসছে ওদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া ব্যাকপ্যাক থেকে।

'সার্ভে টিম, শুনছেন? আমি ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো। শুনছেন? ওভার।'

ভয়-বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ানরা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইল। অস্ত্র তাক করেছে গ্রামের বাইরে জঙ্গলের দিকে। ভাবছে, যে-কোনও সময়ে হামলা হবে।

'সার্ভে টিম, কাম ইন। কাম ইন। ওভার।'

'জবাব দিতে পারলে ভাল হতো, ক্যাপ্টেন ডেকে আনতে পারত হেলিকপ্টার,' নিচু স্বরে বলল জুলিয়ো ট্যানাগো। 'সশস্ত্র লোক থাকলে...'

‘খুব ভাল হতো,’ সায় দিল করেলি।

‘এদেরকে রাজি করাতে পারলে হাতে পাব রেডিয়ো,’ বলল মউরোস। ইণ্ডিয়ানরা বুঝে গেছে, কোথা থেকে আসছে আওয়াজ। ব্যাকপ্যাকগুলো ঘিরে ফেলেছে। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখছে কী ঘটে।

‘সার্ভে টিম। জানি না শুনছেন কি না...’ বর্শা দিয়ে মউরোসের প্যাকে খোঁচা দিল এক যুবক শিকারি। ক’ সেকেণ্ডের জন্যে আবছা হলো কথা। ‘...বাইরে... থেকে লোক... অন্তত একটা হেলিকপ্টার। দুটোও... আমার পজিশনের দিকে... আমাদের না... আবারও বলছি, আমাদের না। দয়া করে...’

‘মিলিটারি?’ চিন্তাক্লিষ্ট সুরে বলল মউরোস।

‘ওদের কোনও জাঙ্গল অপারেশন হলে আগেই আমাকে জানিয়ে দিত সরকার,’ বলল জুলিয়ো ট্যানাগো।

‘সর্বনাশ...’ বিড়বিড় করল মউরোস। ভয় লেগে গেল ওর। আঁচ করছে, কারা আসছে হেলিকপ্টারে করে। ‘জুলিয়ো, দেখো তো ওদের কাছ থেকে রেডিয়ো পাও কি না। খুব দরকার!’

ব্যাগ ঘেঁটে ওয়াকি-টকি বের করেছে এক ইণ্ডিয়ান। আগের চেয়ে পরিষ্কার শোনা গেল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ: ‘সার্ভে টিম! পরিষ্কার দেখছি তাদের হেলিকপ্টার! ...সর্বনাশ, জিসাস!’

স্পিকার থেকে এল স্ট্যাটিকের চড়া আওয়াজ। হাত থেকে রেডিয়ো ফেলে তিন লাফে পনেরো ফুট উড়ে গেল ইণ্ডিয়ান। চিন্তিত মউরোস ও ট্যানাগোর দিকে তাকাল করেলি। ‘কী হয়েছে? ওই আওয়াজ কীসের?’

গা মুচড়ে নদীর দিকে ফিরল মউরোস। কয়েক সেকেণ্ড পর শুনল দূর থেকে বজ্রপাতের মত আওয়াজ। শুকনো গলায় বলল, ‘বিস্ফোরিত হলো নোয়া।’

‘কী!’

‘ডোনাটি লুক্কা। খুঁজে বের করেছে আমাদেরকে।’

হাতঘড়ি দেখল রানা। ‘আর মাত্র আঠারো মিনিট।’

‘আরও দ্রুত গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় ফিট হয় এই জিনিস।’ লাবনীর হাত থেকে সেক্সট্যান্ট বাহু নিল সেসিলি।

‘ফেলে রেখে গেলে?’ জানতে চাইল লাবনী, ‘ভাব করব ঠিক জায়গায় রেখে এসেছি।’ মোটেও ঠাট্টা করছে না।

‘ব্যাটারা পরীক্ষা করে দেখলে?’ ভুরু নাচাল রানা।

‘ও... হ্যাঁ... ভেবে দেখিনি।’

প্যাসেজের শেষমাথায় পৌঁছে গেছে ওরা।

ফ্ল্যাশলাইট উঁচু করে ধরল রানা। প্রকাণ্ড ঘরে জোরালো আলো হারিয়ে গেল সামনের আঁধারে, দেখা গেল না ওদিকের দেয়াল।

‘দ্য টেম্পল অভ পসেইডন,’ ফিসফিস করে বলল লাবনী।

‘দুর্দান্ত!’ নিচের চোয়াল ঝুলে গেছে সেসিলির।

চুপ করে আছে রানা।

সামনের ঘর কমপক্ষে দু’ শ’ ফুট লম্বা, চওড়ায় তার অর্ধেক। খিলানযুক্ত ক্যাথেড্রালের মতই উঁচু পাথুরে ছাত ও দেয়ালে ঝিকমিক করছে সোনা-রুপার কারুকাজ। দু’পাশের চওড়া সব পিলার ও কলাম ধরে রেখেছে মস্ত ছাতকে। মাঝে মাঝে অ্যালকোভ, ফ্ল্যাশলাইটের জোরালো আলোয় ঝিকঝিক করছে সেখানে দারুণ সুন্দর সব সোনার প্রমাণ সাইয়ের মূর্তি। সংখ্যায় অন্তত এক ডজন। অকল্পনীয় সম্পদ!

কিন্তু এসবের চেয়েও আকর্ষণীয় সোনালি এক মূর্তি দেখে চমকে গেছে তিন অভিযাত্রী। মন্দিরের পেছনে উঁচু মেঝে থেকে শুরু করে ষাট ফুট ওপরে উঠেছে মস্ত এক সোনার মূর্তি!

পসেইডন, আটলান্টিয়ানদের সাগর দেবতা!

'হায়, আল্লা,' কখন যেন আনমনে মূর্তির দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে লাবনী। ভুলেই গেছে, সামনে থাকতে পারে ফাঁদ। 'একেবারে মিলে গেছে প্লেটোর বর্ণনার সঙ্গে!'

'ওখানে ছিল ডানাওয়ালা ছয়টি ঘোড়ার পেছনে রথে স্বয়ং দেবতা, মন্দিরের ছাত স্পর্শ করেছিল মাথা,' লাবনীর পাশে আবৃত্তি করল সেসিলি। আঙুল তুলে দেখাল পসেইডনের রথে ছোট সব সোনার মূর্তি।

নীরবে প্রকাণ্ড মূর্তির দিকে চলল ওরা।

'ছোট মূর্তি থাকবে চৌষট্টিটা,' বলল লাবনী। 'দশ বেস-এর চেয়ে ওই সংখ্যাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আট বেস-এ। অন্য নিউমেরিক সিস্টেম থেকে অনুবাদ করেছিলেন প্লেটো। আর এ কারণেই পাল্টে গেছে সংখ্যা। আসলে...'

'আমি দেখছি তেয়াত্তরটা মূর্তি,' বাধা দিল সেসিলি।

'কী বললে... তেয়াত্তরটা?' চমকে গেল লাবনী। 'কোন্ সিস্টেম ব্যবহার করেছে তেয়াত্তর সংখ্যা?'

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'লাবনী, এসবে কিছু যায় আসে? আমরা পৌঁছে গেছি, এখন প্রথম কাজ জিনিসটা ঠিক জায়গায় রেখে প্রাণটা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া।'

'তা ঠিক,' ঠোঁট ফোলাল লাবনী, 'কিন্তু বুঝছি না...

একের পর এক ধাপ পেরিয়ে উঠতে হবে প্রকাণ্ড মূর্তির দিকে। সামনে আরেকটা চেম্বার পেল ওরা। ওটা মূল মন্দিরের চেয়ে ছোট। কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর করে সাজানো। আসল মন্দির পাথুরে, বহু উঁচু ছাত, কিন্তু ছোট মন্দির অন্য জিনিসে তৈরি।

'হাতির দাঁত,' বলল সেসিলি। মন্দিরের ওপর আলো ফেলল রানা। ভুরু কুঁচকে গেছে সেসিলির। 'প্লেটোর কথা অনুযায়ী, পুরো মন্দিরের ভেতর দিক ছিল হাতির দাঁতে বাঁধানো, আর...'

‘এটা পসেইডনের মন্দির নয়,’ বলল লাবনী, ‘প্রতিরূপ। ওদের নতুন দেশে নতুন করে আটলান্টিসের সিটেডল তৈরি করতে চেয়েছে আটলান্টিয়ানরা। হয়তো কঠিন ছিল হাতির দাঁত জোগাড় করা, তাই যা হাতে পেয়েছে, তা দিয়েই... আরে!’ থমকে গেল লাবনী। ‘ফ্ল্যাশলাইট দেবে?’ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রানার দিকে। ওটা পেয়ে বলল, ‘আমরা পেয়ে গেছি যেজন্যে এখানে এসেছি!’

ছোট মন্দিরের ভেতরের পেছন দেয়ালে আলো ফেলল ও। ওদিক থেকে এল লালচে-সোনালি আলো। অরিচালকাম।

পুরো দেয়াল মুড়িয়ে রাখা হয়েছে ওই ধাতু দিয়ে। প্রাচীন আমলের ভাষায় সব অক্ষর। লাবনী চট্ করে বুঝে গেল, আবারও এখানে সামান্য বদলে গেছে ভাষা। আরও পুরনো, কিন্তু সংহত। অন্যদিকে মন দিয়ে দেখল, দেয়ালে খোদাই করা পরিচিত একটি লাইন...

‘মানচিত্র?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘পুরো আটলান্টিক মহাসাগর,’ ফিসফিস করল লাবনী। ‘আরও আছে।’ রানার দিকে তাকাল। ‘কতক্ষণ সময় পাব?’

‘চোদ্দ মিনিট, কঠিন হবে বর্শার ফলার মাঝ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। সব মিলে আট মিনিট লাগবে বেরোতে।’ মানচিত্র থেকে সরে পেছনের কোণে অন্য কিছু দেখল ও।

‘মাত্র ছয় মিনিট বাড়তি সময়, সর্বনাশ!’ হতাশ হয়ে হাত মুঠো করে ফেলল লাবনী। ‘আরও অনেক সময় দরকার!’

উঁচু করে অরিচালকাম তুলে ধরল সেসিলি। ‘চলো, আগে দেখি এটা কোথায় রাখতে হবে। ঠিক সময়ে ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে না গেলে আর সবাই মরবে। আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত প্রমাণ করা, আমরা আসলে ভাল মানুষ। সেক্ষেত্রে হয়তো পরে ঢুকতে দেবে। তখন কাজে আসবে ফোটো। ক্যামেরা নিয়ে

ফিরব।'

'এসব যথেষ্ট নয়,' করুণ সুরে বলল লাবনী। ওর মনে হচ্ছে, এত বড় সুযোগ পেয়েও হারাচ্ছে। যদি মন্দিরে আর ঢুকতে না দেয় ইণ্ডিয়ানরা? খুনই করে ফেলল, যেন জানাতে না পারে কাউকে!

'ওই যে, ওদিকে ছিল পথ,' বলল রানা। নিচে গেছে সরু এক রাস্তা, কিন্তু বুজে গেছে পাথরের স্তূপে। মন্দিরের আর সব গুছিয়ে রাখা, তাই অন্যদিক চোখে পড়ল ওর। 'ওদিকে দেখো!'

রানার চোখ অনুসরণ করে একটা বেদি দেখল লাবনী ও সেসিলি। চকচকে পাথুরে বেদির কাছে উঠে এল ওরা। ওখানে বেশ কিছু জিনিস। সব অরিচালকাম দিয়ে তৈরি।

'ওই যে সেক্সট্যান্টের অংশ,' পিঠার মত চ্যাপ্টা এক জিনিস দেখাল সেসিলি। ওটার গায়ে খোদাই করা আটলান্টিয়ান সংখ্যা। গলা থেকে লকেট খুলে সেক্সট্যান্টের নিচের অংশে ধরল লাবনী। নিখুঁতভাবে মিলে গেল দুটো অংশ।

'এর একটা অংশ অনেক দিন ধরেই আমার কাছে,' লকেট আবারও গলায় পরল লাবনী। 'সেক্সট্যান্টের বাহু দাও, সেসিলি।'

'নাযিরা বহুকাল আগে চুরি করেছে, কিন্তু পুরো জিনিস নিতে পারেনি, এটা কেমন করে হলো?' বলল সেসিলি।

'অনেক পরে যারা এসেছে সেক্সট্যান্ট নিতে, তাদের কয়েকজন ধরা পড়ে ঝুলছে নদীতে পুঁতে রাখা বাঁশে,' বলল রানা, 'আগেও এসেছে তাদের দলের লোক। তখন চুরি করেছে সেক্সট্যান্টের একটুকরো, আর পরে ওটা লাবনীর বাবা-মা পেয়েছিলেন মরুভূমিতে।'

ত্রিকোণ পিঠার মত জিনিসটার গর্তে সেক্সট্যান্টের বাহু আটকে দিল লাবনী। দুলছে বাহুটা। তীরের ফলা তাক করছে

কিছু সংখ্যার দিকে। 'কাজ করছে,' বলল লাবনী। মনে কষ্ট, দুনিয়ার আর্কিওলজিস্টরা দেখল না, আসলে কী আবিষ্কার করেছে ও! স্লট মিলে যাচ্ছে। সত্যিই ওরা ল্যাটিচ্যুড বের করত দশ হাজার বছর আগেও!'

'ঠিক আছে, জিনিসটা জায়গায় রাখা হয়েছে, এবার ফিরব, চলো,' বলল রানা।

হাত নাড়ল লাবনী। 'একমিনিট! মাত্র একমিনিট!'

'দেরি করলে অন্যদেরকে মেরে ফেলবে ওরা,' বাধ্য হয়েই কড়া গলায় বলল রানা।

'একমিনিট! মাত্র একমিনিট! প্লিয!'

'একটু অপেক্ষা করুন,' অনুরোধ করল সেসিলি।

আপত্তি নিয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা।

'এই দেয়ালের ধাতুর মানচিত্রে দেখিয়ে দিয়েছে বাণিজ্য-পথ,' হড়বড় করে বলছে লাবনী, 'সঙ্গে সংখ্যা আর গন্তব্যের কমপাস ডিরেকশন। আর আমাজনের এদিকের মুখ এখানে...' মানচিত্রে আঙুল। 'বলছে এটা সাত। দক্ষিণ। পশ্চিম। ঠিক সেক্সট্যান্টের বাহুর মতই।' মানচিত্রের আফ্রিকায় আঙুল ঠুকল। 'এখানে মহাদেশের শেষ দক্ষিণাংশ, দেখাচ্ছে কেপ অভ গুড হোপ। আর এ থেকে আটলান্টিসের ল্যাটিচ্যুড পাব আমরা!'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বাড়তি কথা বাদ দিয়ে মূল বক্তব্যে এসো, লাবনী!'

'আমরা আগেই জানি, আমাজনের মুখের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আটলান্টিসের। সাত ইউনিট ল্যাটিচ্যুড। আর এখন জেনে গেছি দক্ষিণ মানে দূরের ওই কেপ... আর বর্তমানের মেজারমেন্ট থেকে ঠিকই বের করতে পারব, কত বড় ছিল আটলান্টিয়ান ল্যাটিচ্যুডের ইউনিট। এখন যদি আমাজনের উত্তর মুখ থেকে ওদিকে যাই, পাব সত্যিকারের আটলান্টিস! কাজটা কঠিন নয়!

জেনে গেছি, কীভাবে হিসাব কষতে হবে! এখন বাকি থাকল শুধু হিসাব কষে নেয়া!'

'হিসাব বাদ দিয়ে সময়ের স্বল্পতা নিয়ে ভাবো,' কঠোর সুরে বলল রানা। মেয়েরা বুঝে গেল, এবার বেরোতেই হবে মন্দির থেকে। লাবনীর হাত থেকে টর্চ নিল রানা। 'লাবনী-সেসিলি! আর এক মুহূর্তও নয় এখানে!'

ছোট মন্দির থেকে বেরিয়ে বিশাল পসেইডনের মূর্তি পাশ কাটিয়ে ফিরতি পথে চলল ওরা। প্রকাণ্ড ঘরে উঠছে ওদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি। তার ওপর দিয়ে এল কীসের এক আওয়াজ। প্রথমে শুনতে পেয়ে বলল লাবনী, 'আওয়াজটা কীসের? শুনতে পাচ্ছ না তোমরা?'

শুনেছে রানাও। খুব নিচু গর্জনের মত। বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। 'আরে, মনে তো হচ্ছে হেলি...'

বিস্ফোরণের ফলে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা মন্দির, পরক্ষণে ছাতে তৈরি হলো মস্ত গর্ত!

সতেরো

'মেঝেতে শুয়ে পড়ো!' ঝাঁপিয়ে পড়ে লাবনীকে আড়াল করল রানা। ছাত থেকে ঝরঝর করে পড়ছে ছোট-বড় পাথর! গর্তের জায়গাটার বড় বোল্ডারগুলো সরাসরি নিচে পড়ে গড়িয়ে গেল নানানদিকে। ওই পতনের ফলে আবারও থরথর করে কাঁপল মেঝে।

গোটা মন্দিরে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। ঘূর্ণি তৈরি করেছে ধুলো-বালি। বিপদ কমতেই লাবনীর ওপর থেকে সরে গেল রানা, চোখ পড়ল গোধূলীর লালচে আকাশে। কিন্তু সেটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে অন্য কিছু।

মস্ত বড় কিছু!

প্রকাণ্ড হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন, রোটর ও মেশিনগানের তুমুল গুলির আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে। প্রচুর ওজন নিয়ে বহু দূরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তৈরি করা হয়েছে রাশান এমআই-২৬, ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হেলিকপ্টার। মালপত্রের বদলে বহন করতে পারে একদল সশস্ত্র সৈনিক।

ছাতের গর্তের ওপরের আকাশে ভাসছে হেলিকপ্টার। খুলে গেল ফিউজেলাজের দরজা, যে-কোনও সময়ে রেপেল করে মন্দিরের মেঝেতে নামবে সৈনিকরা।

বজ্রপাতের মত আওয়াজের ওপর দিয়ে গলা ফাটিয়ে বলল রানা, 'জলদি এসো! সোজা সুড়ঙ্গে!'

'কী হচ্ছে এসব?' চিৎকার করে জানতে চাইল লাবনী।

'তোমার প্রিয় ব্রাদারহুড! প্যাসেজে চলো! দৌড় দাও!' হতভম্ব লাবনীর হাত ধরে ছুটল রানা। ওদের পাশে সেসিলি।

হেলিকপ্টার থেকে মন্দিরের মেঝেতে পড়ল কালো ছয়টা দড়ি, টানটান হলো কালো কমব্যাট গিয়ার পরা একদল লোক ঝুলে পড়তেই। দক্ষতার সঙ্গে নেমে আসছে তারা, বুকে বসানো উজ্জ্বল আলো দিন করে দিয়েছে চারপাশ। ছুটতে ছুটতে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে দেখল রানা। এরা পেশাদার, আগে ছিল মিলিটারিতে, প্রত্যেকের কাঁধে হেকলার অ্যাণ্ড কচ ইউএমপি-৪০ সাবমেশিনগান। অন্য অস্ত্রও থাকতে পারে।

সামনের করিডোরে পৌঁছে গেল রানা, লাবনী ও সেসিলি। আগে ছুটছে রানা, হাতে ফ্ল্যাশলাইট। একের পর এক বাঁক

েরিয়ে চলেছে, কিন্তু পেছনে পরিষ্কার শুনল হেলিকপ্টারের গর্জন। বুদ্ধি চ্যালেঞ্জের ঘর পেরিয়ে এল ওরা।

'আমাদের খুঁজে পেল কী করে?' সামান্য হাঁপাতে শুরু করে বলল সেসিলি।

'জানি না,' পরের করিডোরে পৌঁছে গেছে রানা। 'নিশ্চয়ই বোটে কোনও ট্র্যাকার ছিল।'

দৌড়াতে গিয়ে ক্লান্ত লাবনী জানতে চাইল, 'কী চায় ওরা?'

'আমরা যা চাই, একই জিনিস,' বলল সেসিলি। 'কিন্তু অন্য কারণে। আমরা রক্ষা করতে চাই সব, আর ওরা চায় ধ্বংস করতে। আটলান্টিসের কোনও চিহ্নই রাখবে না।'

'সেজন্যে নিরীহ মানুষও খুন করবে?' বলল লাবনী। 'এবার কী হবে প্রফেসর করেলি, মউরোস বা ট্যানাগোর?'

'মনে হচ্ছে গ্রামে না গিয়ে সরাসরি মন্দিরে এসেছে এরা,' বলল রানা। করিডোর পেরিয়ে পৌঁছে গেছে ড্র ব্রিজের সামনে।

ওরা শুনল পিছনের করিডোরে পদশব্দের প্রতিধ্বনি।

'মন্দিরের করিডোরের শেষমাথায় থামবে,' বলল রানা। পাশেই দৌড়ে চলেছে সেসিলি। তার হাতে ফ্ল্যাশলাইট ধরিয়ে দিল ও। ঝড়ের গতি তুলে সেতু পেরোচ্ছে বলে থরথর করে কাঁপছে কাঠের তক্তা। 'ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'এদিকে তুমি কী করবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'চেষ্টা করব, যাতে পিছু না নেয়। সোজা মন্দিরের দরজার কাছে যাও!' সেতু পেরিয়ে ঘাটে থামল রানা। ওকে পেরিয়ে গেল লাবনী ও সেসিলি। বর্শার ফলা ভরা ছাতের বিপজ্জনক ঘর লক্ষ্য করে ছুটছে ওরা। দু' হাতে ঘাট থেকে সেতু তুলেই পুকুরে ফেলল রানা। জোরালো ঝপাস্ আওয়াজ হলো। আলোড়ন টের পেয়ে ভেসে উঠল কয়েকটা কুমির।

'তোরা পাহারায় থাক!' বলেই ঘুরে দৌড় লাগাল রানা।

উড়ে চলেছে মন্দিরের প্রবেশদ্বার লক্ষ্য করে। কিছুটা দূরে দৌড়াচ্ছে লাবনী ও সেসিলি। রানাকে পাশে পাওয়ার জন্যে গতি কমাল লাবনী।

'কুমিরের জন্যে সহজে পুকুর পেরোতে পারবে না,' লাবনীকে বলল রানা।

'আমার ধারণা ওরা কুমির নয়, কেইম্যান,' আপত্তি তুলল লাবনী।

'যা খুশি হোক, আমি বাঙালি মানুষ, ওদেরকে কুমিরই বলব, পারলে মানা করুক কেউ!' তাড়া দিল রানা, 'সোজা পেরিয়ে যাও শক্তি পরীক্ষার ঘর।'

ওই ঘরের ছাত থেকে দাঁত বের করেছে অসংখ্য বর্শা। দৌড়বিদের গতি তুলে ঘর পেরিয়ে করিডোরে পড়ল ওরা। আবারও সবার সামনে জায়গা করে নিল রানা। ছুটতে ছুটতে বলল, 'ঠিক আছে, মন্দির থেকে বেরিয়েই লুকিয়ে পড়বে জঙ্গলে।'

'আর তোমার কী হবে?' জানতে চাইল লাবনী, 'বা অন্যরা?'

'ওদের মুক্ত করব। আশা করি এতক্ষণে পালিয়ে গেছে রেড ইণ্ডিয়ানরা। এরই ভেতর ওদের মন্দিরের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ডোনাটি লুক্কা। কপাল ভাল হলে কেউ পাহারা দিচ্ছে না মউরোসদেরকে।'

'তবুও যদি পাহারা দেয়?' জানতে চাইল সেসিলি।

'সেক্ষেত্রে মস্ত বিপদে পড়ব,' নির্দ্বিধায় বলল রানা। বাঁক নিয়ে দেখল সামনে লালচে আলো। 'তোমরা তৈরি তো?'

'না, ভয় লাগছে,' গুঙিয়ে উঠল লাবনী।

'সাহস রাখো, লাবনী,' বলল রানা, 'তোমার দেখভাল করবে সেসিলি। প্রথম সুযোগে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।'

'আমি কখনও ওকে বিপদে ফেলে যাব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল

সেসিলি। প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা।

'ঠিক আছে। রেডি হও! যাও! সোজা জঙ্গলে!'

হাতে হাত রেখে প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে ছুটল সেসিলি ও লাবনী, কিন্তু থামতে হলো কড়া ব্রেক কষে।

পালাবার উপায় ওদের নেই। মন্দিরের উঠানে অপেক্ষা করছে কালো কমব্যাট গিয়ার পরা অন্তত দশজন লোক, অস্ত্র তাক করেছে ওদের বুকে। কুঁড়েঘরের মাঝে পড়ে আছে চারটে লাশ, রেড ইণ্ডিয়ানদের। উপজাতির আর সবাই উধাও। আগের মতই বন্দি হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে মউরোস, করেলি ও ট্যানাগো।

পাঁচ সেকেণ্ড পর প্যাসেজ থেকে রানা বেরোতেই হেণ্ড্রিক ড্রেক বলল, 'হ্যালো, রানা!'

লাবনী দেখল, যুবকের পরনে সুটের বদলে এখন মিলিটারি আউটফিট। হাতে-পায়ে-বুকে আর্মার, ওয়েবিঙে অ্যামিউনিশন ও ছোরা। পিঠে গ্র্যাপলিং হুক। ডান চোখে কালো ব্যাণ্ডেজ। ভয়ে ভীষণ শিরশির করে উঠল লাবনীর মেরুদণ্ড।

'আরে, দোস্ত!' মাথার ওপর হাত তুলল রানা, চেহারা স্বাভাবিক। 'জলদস্যুর মত চোখে কালো প্যাচ কেন?'

শীতল চোখে ওকে দেখল ড্রেক। 'শুকনো রসিকতা, না?' রাগ চেপে অন্যদিকে মনোযোগ দিল সে। 'আহ্, ডক্টর আলম! আবারও দেখা পেয়ে খুব খুশি হলাম!'

একই সময়ে লাবনীর সামনে দাঁড়িয়ে গেল রানা ও সেসিলি।

'ওকে বিরক্ত করবেন না,' বলল নরওয়েজিয়ান মেয়েটা।

ভুরু কপালে তুলল ড্রেক। 'সেসিলি ডেনিয়েলসন। ভাবিনি তোমার সঙ্গে দেখা হবে। খানসারির উচিত ছিল লুক্কার কথা মত ঝামেলা দূর করা।' অস্ত্রের নলের ইশারা করল সে। সামনে বাড়ল তার লোক। মাথার ওপরের আকাশে চক্কর কাটছে

হেলিকপ্টার। পেছনে আরেক যান্ত্রিক ফড়িং। দুই যন্ত্রদানবের তৈরি শোঁ-শোঁ ঝড়ের জন্যে থর-থর করে কাঁপছে গাছপালা।

'ইণ্ডিয়ানদের কী হলো?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'বুদ্ধিমানরা পালিয়ে গেছে,' বলল ড্রেক। একটু দূরের লাশ দেখল। 'আর ছাগলগুলো ভেবেছিল আমাদের হারাতে পারবে।'

তার লোক সামনে বেড়ে সার্চ করল রানাকে। বাদ পড়ল না সেসিলি ও লাবনীও।

'আমাদের ব্যাপারে কী ভাবছ, ড্রেক?' জানতে চাইল সেসিলি। সরু হয়ে গেছে চোখ। 'খুন করবে?'

'বিনা দ্বিধায়,' ড্রেকের নিষ্কম্প কণ্ঠ কাঁপিয়ে দিল লাবনীকে। 'কিন্তু তার আগে, জানব কী আছে ওই মন্দিরে।' বেল্ট থেকে রেডিয়ো খুলে ঘুরে দাঁড়াল সে। এ কারণে তার সব অস্ত্র দেখতে পেল লাবনী। যেটাকে ভেবেছিল গ্র্যাপলিং হুক, ওটা আসলে মোটা ব্যারেলের শটগান। তার দলের অন্যদের পিঠেও একই জিনিস। 'হক লিডার টু এণ্ট্রি টিম, কাম ইন!'

'কোনও দিনই সত্যিকারের লিডার হতে পারবে না,' মন্তব্য করল রানা।

কথাটা শুনে তুড়ি বাজাল ড্রেক। যার উদ্দেশে শব্দটা করা হয়েছে, সে পেশিবহুল বিশাল এক দানব। রানার মাথা ছাপিয়ে একফুট ওপরে উঠেছে মাথা। সরে যাওয়ার কোনও সুযোগই পেল না রানা, তার আগেই ওর ঘাড়ে নামল মারাত্মক এক কিল। ধুপ করে কিল পড়তেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

'রানা!' দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলল লাবনী।

অবাক চোখে ওকে দেখল ড্রেক। 'ও, প্রথম দর্শনেই প্রেম? মেয়ে, তুমি জানো, কখনও কাউকে ভালবাসেনি রানা? ওকে বলতে পারো সত্যিকারের চিট।' আরও কিছু বলত, কিন্তু কড়-

কড় আওয়াজ করে উঠল তার রেডিও।

'এন্ট্রি টিম টু হক লিডার,' ওদিকের লোকটা বলল। 'আমরা মন্দিরের ভেতর পেয়ে গেছি চোরাই আর্টিফ্যাক্ট। ওটা ছোট এক মন্দিরের ভেতর। আরও আছে বাইরে বিশাল সোনার মূর্তি। চিন্তা করা যায় না এসব বিক্রি করলে কত কোটি ডলার পাওয়া যাবে।'

'জানি, কিন্তু ওই চিন্তা বাদ দাও,' নিষেধ করে দিল ড্রেক। 'ওখানে আরও কী আছে, রুস্ট?'

'দেয়ালে ম্যাপ, অরিচালকামে তৈরি। পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে কোথায় আছে আটলান্টিস!'

গম্ভীর হয়ে গেল ড্রেকের কণ্ঠ: 'মানচিত্র কতটা নিখুঁত?'

'মহাদেশের অবস্থান একটু এদিক ওদিক। কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে তেমন তফাৎ নেই। ড্রেক, এই মানচিত্র দেখিয়ে দেবে কোথায় আছে আটলান্টিস!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বার্গু রুস্ট। 'আমাজনের উত্তর দিক বলছে এটা ল্যাটিচ্যুডের সাত দক্ষিণ। মিশকিনের চোরাই আর্টিফ্যাক্টের মতই দেখা যাচ্ছে কেপ অভ গুড হোপ... এখানে ছয়টা বিন্দু ছাড়াও একটা উল্টো ভি। আমাদের আর্কাইভের সিম্বল অনুযায়ী এই আটটা সিঙ্গল ইউনিটের পর ওটা। তার মানে, উল্টো ভি আসলে সংখ্যা নয়। তার সঙ্গের ছয়টি বিন্দু যোগ করলে ল্যাটিচ্যুড হবে পনেরো।'

'কেপ কিন্তু দক্ষিণের চৌত্রিশ ডিগ্রিতে,' বলল ড্রেক। 'আর আমাজনের ডেল্টা আন্দাজ এক ডিগ্রি উত্তর দিকে।'

'পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির তফাৎ? পনেরো থেকে সাত বাদ গেলে থাকে আট আটলান্টিয়ান ল্যাটিচ্যুড ইউনিট। মানে, পঁয়ত্রিশকে আট দিয়ে ভাগ দিলে বেরোবে একটা করে ইউনিট...' চুপ হয়ে হিসাব কষছে লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ওটা হবে ৪.৩৭৫ ডিগ্রি!'

'তা হলে ল্যাটিচ্যুড অনুযায়ী কোথায় আছে আটলাণ্টিস?' জানতে চাইল ড্রেক।

'ল্যাপটপ দেখে বলছি... ৪.৩৭৫ গুণ ৭... তা হলে হবে ৩০.৬২৫ ডিগ্রি। যোগ এক ডিগ্রি ব-দ্বীপের কারণে... তো আটলাণ্টিস আছে একত্রিশ বা বত্রিশ ডিগ্রি উত্তরে!'

টিটকারির চোখে লাবনীকে দেখল ড্রেক। 'ওটা কেডিয উপসাগরের অনেক দক্ষিণে। সেক্ষেত্রে তোমার থিয়োরি নিয়ে আর ভাবতে হবে না আমাদেরকে।'

চুপ করে আছে লাবনী। মন্দিরের মানচিত্রে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে আটলাণ্টিস আছে গাল্‌ফ্‌ অভ কেডিযে। মহাদেশগুলোর আকৃতির ভেদ আছে, কিন্তু তা হতেই পারে, কত দূরেই বা গেছে সেসব আটলাণ্টিয়ানরা?

আবারও বলে উঠল ড্রেকের সহচর রুস্ট, 'ওদের হিসাব ভুল, আমাদের মত নিখুঁত নয়, তবুও মাত্র কয়েক দিনের ভেতর বের করে ফেলব আটলাণ্টিস।'

'হুম, তখন আমরা নিশ্চিত করব, কেউ যেন না আর খুঁজে পায় আটলাণ্টিস,' হাসল ড্রেক, 'গুড ওঅর্ক, রুস্ট। ঠিক জায়গায় থারমাইট চার্জ বসিয়ে বেরিয়ে এসো, গলে যাক সব।'

'মন্দির ধ্বংস করবেন আপনারা?' চমকে গেছে সেসিলি।

ঠাণ্ডা চোখে ওকে দেখল ড্রেক। 'তোমার বাবা বা তোমার মত মানুষকে ঠেকাতে যা দরকার, তার সবই করব আমরা। যাতে কখনও খুঁজে না পাও আটলাণ্টিস।'

'আপনি কি পাগল?' ফুঁসে উঠল লাবনী। 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিকাল ফাইণ্ড নষ্ট করবেন? ...কেন? ...কারণ আপনার উন্মাদ বস চাইছে গোপন রাখবে ওই জ্ঞান? আপনারা কত বড় পশু তা ভাবতে গিয়ে অসুস্থ বোধ করছি আমি!'

বিস্মিত হয়ে নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ বের করল ড্রেক।

'জেসাস! তুমি মেয়ে কি সত্যিই জানো না আসলে কী ঘটছে?'

'আপনিই বরং আমাকে জ্ঞান দিন,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল লাবনী।

'ও, তা হলে ভেবেছ, তোমার বান্ধবী সেসিলি বা তার বাবা হবি হিসেবে বেছে নিয়েছে আটলাণ্টিসকে খুঁজে বের করা?' মাথা নাড়ল ড্রেক। 'জানো, ওরা কত বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে? টাকা রোজগার করতে কষ্ট হয়, এমনি এমনি খরচ করে না কেউ! এরা কেন তা করছে?'

'কারণ আছে, তাই খরচ করছি,' বলল সেসিলি। 'ডোনাটি লুক্কার মত সব ধ্বংস করতে চাই না আমরা।'

'আসল উদ্দেশ্য জানি, তাই ডোনাটি লুক্কার সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হয়েছি,' লাবনীর দিকে তাকাল ড্রেক। আবারও দেখল সেসিলিকে। 'তোমার বান্ধবীকে বলেছ, আসলে কী করতে চাও? বলতে, কেন এত জরুরি আটলাণ্টিসকে খুঁজে বের করা!'

'ওরা কিছু ধ্বংস করছে না, সেটাই আমার জন্যে যথেষ্ট,' বলল লাবনী। প্রশংসার দৃষ্টিতে ওকে দেখল সেসিলি।

'বাস্তব পরিস্থিতি জানলে হয়তো মনোভাব পাল্টে যেত তোমার,' বলল ড্রেক। তখনই আবারও কড়-কড় আওয়াজ তুলল তার রেডিও। 'কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার আর কিছু করারও নেই।'

'হক লিডার, দরকারী সব কিছুই করা হয়েছে,' জানাল বার্গুরুস্ট। 'তৈরি সব চার্জ।'

'ঠিক আছে।' মুখ তুলে দেখল ড্রেক। এখনও আকাশে এক শ' ফুট ওপরে ধীরে ধীরে ঘুরছে দুই হেলিকপ্টার। রেডিও চ্যানেল পাল্টে নিল সে। 'চপার টু, হক লিডার বলছি। পিকআপ পযিশনে এসো।'

'রজার,' জানাল পাইলট। মন্দিরের ছাত থেকে সামান্য ওপরে থাকতে অলস ভঙ্গিতে রওনা হলো একটা হেলিকপ্টার। ওটা থেকে নিচে ফেলা হলো আরও কালো দড়ি।

'তো তোমাদের খেলা খতম,' রানাকে দেখল ড্রেক, 'তোমার জন্যে খারাপ লাগছে, রানা, কিন্তু নির্দেশের এদিক ওদিক করার উপায় আমার নেই।'

'তোমাকে কয়েকবার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে না বাঁচালে আজকে কোথায় থাকতে, ড্রেক?' নিচু স্বরে বলল রানা।

'সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, দুনিয়ার মানুষ খুশি হবে যে আমি বেঁচে আছি,' বলল ড্রেক। 'তোমার উচিত ছিল না বেঈমানি করা।' নিজ লোকদের দিকে ইশারা করল সে। রানার পাশে হাঁটু গেড়ে লাবনী ও সেসিলিকে বসিয়ে দিল তারা।

লাবনী টের পেল, ওর মাথার পেছনে ঠেসে ধরা হয়েছে ঠাণ্ডা ধাতুর কিছু। নিশ্চয়ই অস্ত্রের নল। চোখ বুজে ফেলল ও। শুনল হিসহিস একটা আওয়াজ।

পরক্ষণে 'ঠক্!'

লাবনীর পেছনের লোকটা 'ওহ্!' বলেই ধুপ্ করে পড়ে গেল মাটিতে। চোখ মেলে ও দেখল, মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একের পর এক বর্শা! প্রফেসর করেলির পেছনের লোকটার ডান পায়ে বিঁধল তীর। ভয়ঙ্কর চেহারা করে হ্যাঁচকা টানে তীর বের করে নিল লোকটা, কিন্তু ওই দুই সেকেণ্ডেই বিস্ফারিত হলো তার চোখ। বিষের কারণে কাঁপছে থর-থর করে। পরমুহূর্তে কাত হয়ে মাটিতে পড়ল লাশ।

ঘুরেই প্রতিরোধ করতে চাইল ড্রেক। তার বুকে লাগল আরেকটা তীর। আটকে আছে কেভলার বডি আর্মারে। 'ওপেন ফায়ার!' চিৎকার করে উঠল সে। এক দৌড়ে কাভার নিল সবচেয়ে কাছের কুঁড়েঘরের আড়ালে। চারপাশের গাছ লক্ষ্য

করে গুলি করল ইউএমপি-৪০ থেকে।

লাবনী ও সেসিলির পেছনের লোক দু'জন লাফিয়ে পিছিয়ে গেছে, তাদের নেতাকে অনুসরণ করল। গুলি করছে জঙ্গল লক্ষ্য করে। লাবনীর হাত খপ্ করে ধরল সেসিলি। 'চলো!'

উঠেই সেসিলির সঙ্গে দৌড় দিল লাবনী। পেছনের এক কমাণ্ডো ওদেরকে দেখে গুলি করতে চাইল। কিন্তু একটা বোলা আটকে ফেলল তার দু'হাত সহ অস্ত্র। তৃতীয় পাথরটা লাগল সরাসরি মুখে। ঝরঝর করে ঝরল তার অন্তত দশটা রক্তাক্ত ভাঙা দাঁত।

পেছনে দানবের মত লোকটা নড়ে উঠতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, গায়ের জোরে কনুই চালাল শত্রুর তলপেট লক্ষ্য করে। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর বুঝল, ঠিক জায়গায় লাগাতে পারেনি। দানবের উরুর ওপরের অংশের পেশিতে লেগেছে কনুই। ঘুরেই রানা দেখল, আকাশ থেকে ওকে দেখছে লোকটা রাগী চোখে। অস্ত্র ঘুরিয়ে তাক করছে সে!

দানবের গোড়ালি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রানা, ঠেলে ফেলবে মাটিতে। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও টলমল করে টিকে গেল লোকটা, পড়ল ওরই ওপর। তার হাঁটু নামল রানার বুকের ওপর। ফলে ফুসফুস থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে গেল ওর সব বাতাস। তবুও খামচে ধরতে চাইল শত্রুর ইউএমপি-ফোরটি...

কিন্তু তখনই মুখে নামল প্রচণ্ড এক ঘুষি। রানা টের পেল, কড়মড় আওয়াজে নড়ে গেছে চোয়াল। হাড়ের ব্যথা এমনই, মনে হলো এক লাফে পৌঁছে যাবে চাঁদে।

দ্বিতীয় ঘুষি নামল গলা লক্ষ্য করে। অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে আঘাত ঠেকাল রানা। পরক্ষণে মুঠো ধরে ভেঙে দিতে চাইল লোকটার হাতের আঙুলগুলো।

জোরালো গর্জন ছেড়ে হাত ছুটিয়ে নিল দানব, হাঁটু নামিয়ে

আনল রানার পাঁজরের ওপর। ব্যথায় পাগল হয়ে গেল রানা, আর্তনাদ করবে সে সাধ্যও নেই।

ওদিকে লাবনী ও সেসিলি ছুটছে মউরোস ও অন্যান্য বন্দির দিকে। 'কুঁড়েঘরে ঢোকো!' লাবনীকে বলল সেসিলি। এইমাত্র ওর পাশ দিয়ে গেছে একটা বর্শা।

'না, ওদেরকে সাহায্য করতে হবে!' আপত্তি তুলল লাবনী। একটু দূরে পড়ে আছে এক ইণ্ডিয়ান শিকারি। তার পাশ থেকে ছোরা তুলে নিল ও। 'এসো!'

গাছের দিকে গুলি করছে হেণ্ড্রিক ড্রেক। তারই ফাঁকে নির্দেশ দিল ওয়াকি-টকিতে: 'চপার ওয়ান! চাই গাছের দিকে সাপ্রেসিং ফায়ার! এক্ষুণি!'

বন্দিদের খুব কাছেই ড্রেকের এক লোকের মগজে ঢুকল বর্শা। গুলি বন্ধ করে কুঁড়েঘরের দেয়ালে কাত হয়ে পড়ল তার লাশ। মড়মড় করে ভেঙে গেল কাঠের দেয়াল।

গার্ডরা হতভম্ব বলে প্রথম সুযোগেই উঠে দাঁড়িয়েছে মউরোস ও ট্যানাগো। একই সময়ে ওদের সামনে পৌঁছে গেল লাবনী ও সেসিলি। ঝটপট প্রফেসর করেলির হাতের বাঁধন কেটে দিল লাবনী। মউরোসের বাঁধন খুলল সেসিলি।

'আমাদের অস্ত্র!' একটু দূরের স্তূপ দেখাল মউরোস।

ধড়াস্ করে মাটিতে পড়ল ড্রেকের আরেক লোক। ঘাড়ে বিঁধে আছে বিষাক্ত তীর।

গ্রামে বয়ে গেল ঝোড়ো হাওয়া। অনেক নেমে এসেছে এক হেলিকপ্টার। ওটার অস্ত্র থেকে শিলার মত পড়ছে ছয় ব্যারেলের রোটারি কামানের খালি কেসিং। বিস্ফোরিত হচ্ছে চারপাশের জঙ্গল।

মুক্ত হয়েছেন করেলি। 'সেসিলি!' ডাকল লাবনী। বান্ধবীর দিকে ছুঁড়ে দিল ছোরা। ওটা খপ্ করে ধরে কয়েক পোচে ট্যানাগোর বাঁধন কেটে দিল সেসিলি। একই সময়ে রাইফেলের জন্যে ঝাঁপ দিল মউরোস ও ট্যানাগো।

'কুঁড়েঘরে ঢোকো!' তাড়া দিল সেসিলি।

ঘরে ঠেলে প্রফেসরকে ভরল লাবনী। ওর পাশে কাঠের দেয়ালে বিঁধল তীর। হুড়মুড় করে কুঁড়েঘরে ঢুকল ওরা।

তীরের স্রোত দেখে ব্রাদারহুড টিমের কয়েকজন আড়াল নিয়েছে একটা কুঁড়েঘরের। তখনই টের পেল, মুক্ত হয়ে গেছে তাদের ব[illegible]া।

একই [illegible]য়গায় থেমে মিনিগান থেকে গোলাবর্ষণ করছে হেলিকপ্টার। মেইন রোটরের বাতাস তৈরি করেছে জোরালো ঝড়, নানাদিকে ছিটকে যাচ্ছে কুঁড়েঘরের ছাত।

রানার ওপর ঝুঁকে পড়েছে দানব সৈনিক, দু'হাতে ধরেছে ঘাড়, এবার চাপ দিতে লাগল ক্যারোটিড আর্টারিতে।

হার্টবিট দামামা বাজাচ্ছে রানার কানে, তার পরেও শুনল হেলিকপ্টারের গর্জন। ওটা আছে ওদের ঠিক মাথার ওপরে। সাঁই-সাঁই ঘুরছে আবছা রোটর। অস্পষ্ট চোখে রানা দেখল, ওর গলা টিপে ধরে খুশিতে দাঁত বের করে হাসছে শয়তানটা! হাত তুলে তার মুখে ঘুষি মারতে চাইল রানা। কিন্তু মুখ এত ওপরে, লক্ষ্যে পৌঁছুল না ওর ঘুষি।

আঁধার নামছে ওর চোখে। দপদপ করছে মাথা। বুঝে গেল, শত্রুর মুখে মারতে পারবে না ঘুষি, বুকে চেপে বসেছে। কিন্তু...

হেলিকপ্টার থেকে গোলাবর্ষণ হতেই পালাতে শুরু করেছে জঙ্গলের বাসিন্দারা, তাদের কেউ কেউ আর্তনাদ ছাড়ছে গোলার

আঘাতে।

খপ্ করে একটা কোল্ট রাইফেল তুলে নিয়েছে মউরোস, ওটা ঘুরিয়ে নিয়েই তাক করল এক লোকের দিকে। ওই লোক এইমাত্র ইউএমপি তাক করেছে ওর দিকেই।

টিপে দিল সে ট্রিগার। আর ওই একই সময়ে এক লাফে মউরোসের সামনে চলে এল ট্যানাগো। পরক্ষণে বুলেট বিদ্ধ হয়ে পিছিয়ে গেল সে। তিনটা গুলি বিঁধেছে কোমর ও উরুতে। ছিটকে বেরোচ্ছে তাজা রক্ত। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে।

পাল্টা গুলি করল মউরোস। শত্রুর দেহে আর্মার, তাই গুলি করেছে মাথা লক্ষ্য করে। ওর তিন গুলি লাগল টার্গেটে। শত্রুর করোটি বিস্ফোরিত হয়ে চারপাশে ছিটিয়ে গেল রক্ত ও মগজ।

ড্রেকের এক লোক শুনেছে গুলির আওয়াজ ঘুরেই অস্ত্র তাক করতে চাইল নতুন শত্রুর দিকে। কিন্তু তার মুখে নামল বুটের গোড়ালি। পরক্ষণে প্রচণ্ড লাথি পড়ল তলপেটে। ছিটকে গিয়ে কাঠের দেয়ালে পড়ল সে। তার অস্ত্রটা তুলে নিল সেসিলি, মাত্র এক সেকেণ্ডে ঠিক করে নিল কী করবে, পরক্ষণে গুলি করল শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে।

রানা বুঝে গেছে, যে কোনও সময়ে সংবিৎ হারাবে। সত্যিকারের রক্তপিশাচের মত ঝুঁকে পড়েছে দানবটা। মাথার বেশ ওপরে বন-বন করে ঘুরছে হেলিকপ্টারের রোটর।

অবশ হয়ে আসছে রানার দেহ। চোখে আবছা দৃষ্টি। তবুও ডানহাত তুলে খপ্ করে ধরতে চাইল দরকারী জিনিসটা: ওর চাই শত্রুর পিঠের গ্র্যাপলিং গানের হ্যাণ্ডেল।

পেয়েও গেল। টেনে দিল ট্রিগার।

'থুম্ব!' আওয়াজ তুলে রিলিয হলো কমপ্রেস্‌ড্ গ্যাস। রকেটের গতি তুলে সরাসরি আকাশে ছুটল নাইলন-কোটেড

স্টিলের কেবল নিয়ে গ্র্যাপলিং হুক। ওটার লক্ষ্য হেলিকপ্টারের রোটর।

প্রচণ্ড গতি রোটরের আঘাতে চুরমার হলো কার্বন ফাইবারের গ্র্যাপলিং হুক, কিন্তু পেছনের কেবল জড়িয়ে গেল রোটর হেডে!

গুটিয়ে তুলছে কেবল।

কী ঘটছে বুঝতে পেরে বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল দানব। আর তখনই প্রচণ্ড জোরে তাকে আকাশে টেনে তোলা হলো, মুড়-মুড় করে ভাঙল পাঁজরের কয়েকটা হাড়। কেবলের টানে উড়তে উড়তে রোটরের মাঝে গিয়ে পড়ল সে। পরক্ষণে চারপাশে ছিটিয়ে গেল মাংস কুচি, ভাঙা হাড় ও মিহি রক্তের লাল কুয়াশা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হোঁচট খেল হেলিকপ্টার, কেবল জড়িয়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত রোটর শাফটে, ফলে আটকে গেল পিচ কন্ট্রোল।

রানার দিকে ঘুরে তাকাল সেসিলি।

মন্দিরের বাঁক লক্ষ্য করে ছুটছে ড্রেক।

মাথার ওপর চরকির মত ঘুরছে হেলিকপ্টার। ভয়ঙ্কর গুঙিয়ে উঠছে ইঞ্জিনের মেশিনারি।

রানার খুব কাছেই ড্রেকের এক লোক।

একই সময়ে গুলি করে তাকে পরপারে পাঠাল সেসিলি ও মউরোস।

পাক খাচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হেলিকপ্টার। কেবিন ডোর দিয়ে পা হড়কে অনেক নিচে মোড়লদের কুঁড়েঘরের ছাতে গিয়ে পড়ল এক লোক, মটকে গেল ঘাড়। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গড়াতে শুরু করে মন্দিরের দিকে গেল হেলিকপ্টার, ক্রমেই কমছে উচ্চতা।

অন্য হেলিকপ্টারের পাইলট দেখেছে ওটাকে, পাগল হয়ে গেল সে, থ্রটলের ফুল পাওয়ার ব্যবহার করে উঠতে লাগল

ওপরে। যারা উঠে আসছিল মন্দিরের ভাঙা ছাতের মাঝ দিয়ে, ভয়ঙ্করভাবে আছড়ে পড়ল এবড়োখেবড়ো কিনারাগুলোয়। ক্ষত-বিক্ষত লাশ গিয়ে পড়ল নিচের মেঝেতে।

ঘুরন্ত হেলিকপ্টার গিয়ে গুঁতো মারল মন্দিরের ছাতে। ওটার ভারী ওজন ও প্রচণ্ড ধাক্কা দুর্বল করে দিয়েছে পাথরের গাঁথুনি, ধসে গেল গোটা ছাত, কিছু কলাম ও বিম। হুড়মুড় করে মেঝের দিকে রওনা হলো বিধ্বস্ত যান্ত্রিক ফড়িং। চারপাশের কঠিন পাথরের আঘাতে নানানদিকে ছিটিয়ে গেল হাজার টুকরো রোটর।

খাড়াভাবে ধুম্ করে পসেইডনের মূর্তির ভিত্তির ওপর পড়ল প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট, ফিউয়েল ও অ্যামিউনিশনের কারণে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো।

মন্দিরে নানানদিকে ধেয়ে গেল আগুনের হলকা, পুড়িয়ে কয়লা করল ড্রেকের দলের অবশিষ্ট লোককে। টলে উঠেছে দেবতার সোনার মূর্তি, পরক্ষণে উপুড় হয়ে নামল জ্বলন্ত হেলিকপ্টারের ওপর। লেলিহান আগুনের তাপ এতই বেশি, গলে যেতে লাগল দেবতার সোনার অঙ্গ।

তীব্র তাপ পৌঁছে গেল বেদি ঘরে, ওখানেই ছিল থারমাইট চার্জ। বিস্ফোরিত হলো বোমা। মাত্র এক সেকেণ্ডে মন্দিরের ভেতরের অংশের তাপ হয়ে উঠল দু'হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট। সমস্ত সোনা, অরিচালকাম বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল উত্তপ্ত বাতাসে।

বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে মন্দিরের দিকে তাকাল মউরোস। লাফিয়ে সরে গেল ঘাস ফড়িঙের মত। পরের সেকেণ্ডে আগের জায়গায় গাঁথল ধারালো রোটরের তিন ফুটি একটা টুকরো।

'শালার হেলিকপ্টার!' ফিসফিস করল মউরোস, 'বাঁচতে

দেবে না আমাকে!'

বিকট আওয়াজ তুলে ধসে গেল মন্দিরের পুরো ছাত। হাজার হাজার টন ওজনের পাথর পড়ল মেঝেতে। গুড়-গুড় আওয়াজ তুলে কাঁপছে মাটি। কারও সাধ্য নেই যে বাঁচবে ওই মন্দিরের ভেতর। টানেল ও ঘরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেল শকওয়েভ, ফলে মন্দিরের প্রবেশদ্বার দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি তুলে বেরোল ধুলোবালি, ভাঙা পাথর ও ধাতব টুকরো। মাত্র তিন সেকেণ্ড আগে ওখান থেকে সরে গেছে রানা।

হাজারো বছর ধরে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল আটলাণ্টিয়ানদের দেবতা পসেইডনের মন্দির, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে চিরকালের জন্যে বিধ্বস্ত হলো। কেউ উদ্ঘাটন করতে পারবে না তার রহস্য।

কুঁড়েঘরের দরজা থেকে উঁকি দিল লাবনী, ধুলোর ঝড় এড়াতে গিয়ে হাত রাখল চোখের ওপর। বিড়বিড় করল, 'হায়, আল্লা!'

মন্দিরের দেয়ালে হাত রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। ব্যথায় টনটন করছে চোয়াল। দেখল ওর দিকে ছুটে আসছে সেসিলি আর মউরোস। 'ড্রেককে দেখেছ?' জানতে চাইল ও।

'ওদিকে গেছে!' দূরের কোণ দেখাল মউরোস।

'লাবনী?'

'কুঁড়েঘরে,' বলল সেসিলি।

'জুলিয়ো?' জানতে চাইল রানা।

'গুলি খেয়েছে,' উত্তর দিল মউরোস।

'তোমরা ওর পাশে থাকো,' বলল রানা। সেসিলির উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল। 'রাইফেলটা দাও।'

অস্ত্রটা হাতে পেয়েই বিধ্বস্ত মন্দিরের কোণ লক্ষ্য করে ছুট লাগাল রানা।

যে কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়েছে করেলি ও লাবনী, ওখানে পৌঁছে দরজার চামড়ার চাদর সরিয়ে দিল সেসিলি। 'লাবনী, তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমরা ভাল আছি,' বলল লাবনী।

'আমি ভাল নেই,' গুঙিয়ে উঠলেন প্রফেসর।

কথাটা পাত্তা দিল না লাবনী। 'অন্যদের কী হয়েছে? রানা কোথায়?'

'গুলি খেয়েছে ট্যানাগো, ওর শুশ্রূষা করছে মউরোস,' বলল সেসিলি। 'এদিকে হেণ্ড্রিক ড্রেককে ধরতে গেছে রানা।'

'একা? সর্বনাশ! চলো, ওকে সাহায্য করতে হবে!' কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল লাবনী। দূরে দেখল মন্দিরের ভাঙা পাথরের দেয়ালের কাছে রানা।

'ওখানে যাওয়া খুব বিপজ্জনক!' আপত্তি তুলল সেসিলি।

পাত্তা দিল না লাবনী, দৌড়াতে শুরু করেছে।

পেছন থেকে বলল সেসিলি, 'লাবনী! ভুল করছ!' বুঝে গেল, শুনবে না মেয়েটা। ইকুইপমেন্টের স্তূপ থেকে রাইফেল নিল সে, তারপর পিছু নিল লাবনীর।

বাঁক পেরিয়ে দেখল রানা, দূরে হেণ্ড্রিক ড্রেক। বদমাসটা কী যেন বলছে ওয়াকি-টকিতে। জঙ্গলের মাথার ওপর ভাসছে দ্বিতীয় হেলিকপ্টার। ওটা থেকে নিচে ফেলা হয়েছে দড়ি।

দৌড় না থামিয়ে ছুটে চলল রানা।

কিন্তু হেলিকপ্টারের দড়ির সঙ্গে নিজের হুক আটকে নিয়েছে ড্রেক, ওয়াকি-টকিতে কী যেন বলে বেল্টে রেখে দিল ওটা। একই সময়ে ওপরের দিকে রওনা হয়ে গেল সে। দ্রুত উঠছে তার হেলিকপ্টার। দূরে রানাকে দেখে ওর দিকে তাক করল

ইউএম্‌পি। টিপে ধরেছে ট্রিগার।

পাশ দিয়ে একরাশ বুলেট যেতেই ডানদিকের পাথরের আড়াল নিল রানা। তিন সেকেণ্ড পর উঁকি দিল হেলিকপ্টারের দিকে। উড়ন্ত যন্ত্রদানবের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ড্রেক। পরের সেকেণ্ডে হারিয়ে গেল কেবিনে।

ঘুরে গিয়ে উত্তর-পুবে রওনা হয়েছে হেলিকপ্টার।

গুলি করতে পারে রানা, কিন্তু কাজটা হবে অযথা। একটা বুলেটও বিঁধবে না ভারী কপ্টারের ধাতব দেহে। দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওটা। পেছনে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনল ও। পরের সেকেণ্ডে নরম দুটো হাত ওকে জড়িয়ে ধরল! কে যেন হাঁপাচ্ছে হাপরের মত!

ওই দু'হাত কার, বুঝে গেছে রানা। আস্তে করে আলিঙ্গনের ভেতর ঘুরে লাবনীর মুখোমুখি হলো ও। অবাক হলো মেয়েটার চোখে পানি দেখে।

'তুমি মোটেও ভালমানুষ নও, রানা,' বিড়বিড় করে বলল লাবনী।'

জবাব দিল না রানা। একটু দূরে থমকে গেছে সেসিলি। ওদের সবাইকে ঘিরে ফেলেছে ইণ্ডিয়ানরা। হাতের ইশারা করে ওদেরকে জানিয়ে দিল তারা, আবার ফিরতে হবে গ্রামে।

আঠারো

হেণ্ড্রিক ড্রেকের লোক খুন করেছে দলের অনেককে, ভেঙে

দিয়েছে কুঁড়েঘর, ধ্বংস করা হয়েছে হাজার বছরের মন্দির, তবুও ইণ্ডিয়ানদের চোখে-মুখে হিংস্রতা বা রাগ নেই রানাদের প্রতি।

গ্রামে পৌঁছে মোড়লদের ঘরের সামনে আনা হলো রানা, লাবনী ও সেসিলিকে। ওরা অবাক হয়ে দেখল, আগুন জ্বেলে পাশে শুইয়ে রাখা হয়েছে ট্যানাগোকে। এরই ভেতর তার গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে মউরোস। এখন করেলির সাহায্য নিয়ে আহত ইণ্ডিয়ানদের ফার্স্ট এইড দিচ্ছে। রানাকে দেখে মৃদু হাসল মউরোস। 'বেশ ক'জন নতুন বন্ধু পেয়ে গেছি।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

'আসলে ওরা যখন দেখল আমরা ড্রেকের লোকদের বিরুদ্ধে লড়ছি, তখনই পাল্টে ফেলেছে মনোভাব,' বলল ট্যানাগো। 'বুঝলে না, "শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু!"'

একদল ইণ্ডিয়ান তরুণ ঘুরে ঘুরে ড্রেকের মৃত লোকদের মালপত্র এনে জড় করছে একপাশে। কয়েকজন মেয়ে পার্চমেন্টের মত বাকলে তুলে রাখছে টালি। বিশেষ নজর কেড়েছে বুলেট। টুং-টাং আওয়াজ তুলে ওগুলো নিয়ে খেলছে ইণ্ডিয়ান কিশোরীরা। বারবার আগুনের আলোয় দেখছে চকচকে কেসিং।

'কাজটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না,' রানাকে বলল মউরোস। 'বুলেট দিয়ে...'

'লোডেড অস্ত্র নিয়ে খেলার চেয়ে ভাল,' বলল রানা। 'ট্যানাগোর কী অবস্থা?'

ওর রোগীকে দেখল মউরোস। 'টিটেনাস দিয়েছি। কথা বলতে পারছে। অনুবাদও করতে পারবে। এবার সাহায্য চাইতে হবে রেডিয়োতে। ইয়ট নোয়া বিস্ফোরিত হওয়ার আওয়াজ

শুনেছি। মনে হয় না বেঁচে আছে ক্যাপ্টেন বা অন্যরা।'

'হায়, আল্লা!' নরম সুরে বলল লাবনী। 'ইয়ট উড়িয়ে দিয়ে থাকলে সাহায্য পাব কার কাছে?'

'যার মাধ্যমে পিৎসা চাও, তার সাহায্য নেবে,' বলল রানা। 'ভুলে গেলে, আমাদের প্যাকে স্যাটালাইট ফোন আছে?'

'তা-ও ভাল,' বললেন করেলি। কণ্ঠে হতাশা ও রাগ। 'কিন্তু ভাবতে পারছি না, এভাবে নষ্ট করবে দুর্মূল্য আর্কিওলজিকাল সাইট!'

'প্রফেসর, যদি দেখতেন মন্দিরের ভেতরে কী ছিল,' দুঃখিত সুরে বলল লাবনী, 'অকল্পনীয় সম্পদ! টেম্পল অভ পসেইডনের অবিকল প্রতিরূপ ছিল ওই মন্দির। একেবারে প্লেটোর দেয়া বর্ণনার মত। একটা মানচিত্রও ছিল। ওটাতে দেখিয়ে দিয়েছিল কোথায় ছিল আটলান্টিস।' আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল লাবনী। ওই মানচিত্রে কী যেন অন্যরকম...

'কিন্তু তোমাদের সশস্ত্র বন্ধুরা সব শেষ করল,' বললেন করেলি। দূরে গিয়ে কুঁড়ের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন।

প্রফেসরের কথা পাত্তা দেয়নি লাবনী। মনে করতে চাইছে, মন্দিরের ভেতরে কী কী জিনিস দেখেছে।

'লাবনী? জরুরি কিছু ভাবছ?' জানতে চাইল সেসিলি।

'ওই মানচিত্র... ওটা অনুযায়ী আটলান্টিস ছিল গাল্ফ্ অভ কেডিযে,' জোর দিয়ে বলল লাবনী। 'ভুল বলেছিল ড্রেকের লোক। এ ছাড়া উপায় ছিল না তার। পুরো সাগর পাড়ি দিয়ে যে-কোনও এলাকায় যেত আটলান্টিয়ানরা।' কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল লাবনী, তারপর নিচু স্বরে সেসিলিকে বুঝিয়ে দিল জটিল আটলান্টিয়ান আট সংখ্যা ভিত্তিক অঙ্ক।

কিছুক্ষণ চুপ করে হিসাব কষল সেসিলি, তারপর বলল, 'তা হলেই মিলে যাবে সব? তুমি শিয়োর?'

মাথা দোলাল লাবনী।

'খুব কঠিন হিসাব,' মন্তব্য করল সেসিলি।

'এজন্যেই প্রথমে আমরা মেলাতে পারিনি মন্দিরের পাযল,' বলল লাবনী, 'বুঝিনি মন্দিরের ভেতরে কেন তিয়াত্তরটা মূর্তি।'

ভুলেও অঙ্ক কষতে যায়নি রানা। 'এজন্যেই বেচারা প্লেটো বিরক্ত হয়ে বলেছেন: ওসব মূর্তি সংখ্যায় এক শ'র বেশি!'

'আসলে হাজার বছর ধরে আটলান্টিয়ানদের হিসাব বুঝিনি কেউ,' বলল সেসিলি, 'আজ সঠিক পথ দেখাল লাবনী।'

'সম্ভব হলো, কারণ ওখানে ছিল ওই মন্দিরের মানচিত্র,' বিনীত স্বরে বলল লাবনী।

'কিন্তু ডোনাটি লুক্কার লোক জানবে না,' বলল রানা, 'ভুল হিসাব কষে ল্যাটিচ্যুড বের করে চলে যাবে বহু দূরে।'

মনের চোখে ওই মানচিত্র দেখল লাবনী। 'শত শত মাইল!'

'জানেও না, আটলান্টিস আছে গাল্ফ্ অভ কেডিযে!' বলল সেসিলি, 'ওদের আগেই ওটা আবিষ্কার করব আমরা!'

আহত ইণ্ডিয়ানদের শুশ্রূষা শেষ করেছে মউরোস। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এত খুশি হওয়ার আগে জঙ্গল থেকে বেরোবার ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'আমার প্যাকে স্যাটালাইট ফোন আছে, জ্যা,' বলল রানা। 'যোগাযোগ করব দলের অন্যদের সঙ্গে।'

'আর ওরা আসবে আরেকটা হেলিকপ্টার নিয়ে? শালার কপাল!' রানার ব্যাগ ঘাঁটতে লাগল মউরোস।

ওদেরকে ঘিরে রাখা ইণ্ডিয়ানদের দেখল লাবনী। 'আমরা দুনিয়াকে জানিয়ে দেব না ওদের কথা? ওদের সাহায্য দরকার। মন্দির ভেঙে গেল, বাড়িঘরও নেই।'

'ব্যবস্থা করব,' বলল ট্যানাগো। 'ব্রাযিলিয়ান সরকারের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চারপাশের সবাইকে জানিয়ে দেব,

এখন থেকে এই জঙ্গল সংরক্ষিত এলাকা।'

'ওরা কিন্তু খুন করেছে ভ্যান নুনানকে,' বলল লাবনী।

'আমাদেরও খুন করেনি বলে বিদায় হওয়ার আগে ধন্যবাদ দেব,' বলল মউরোস। রানার হাতে ধরিয়ে দিল স্যাটালাইট ফোন। 'ফোন করো, বাপু!'

'দরকারী সবই দেব ওদেরকে,' বলল সেসিলি। 'ব্রাযিলিয়ান সরকারের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের, আগেও তাদেরকে ত্রাণ দিয়েছি আমরা। এদের ত্রাণ দিতেও আপত্তি নেই। হতে পারে আটলান্টিয়ানদের সরাসরি উত্তরপুরুষ এরা। ডিএনএ অ্যানালাইয করলেই বেরোবে অদ্ভুত তথ্য।' অন্ধকারে বিধ্বস্ত মন্দিরের দিকে তাকাল মেয়েটা।

বৃদ্ধদেরকে জানাল ট্যানাগো, ওরা বিদায় নিতে চায়। তাতে খুব অখুশি চেহারা করল তারা। নিচু স্বরে কী যেন বলছে।

সেসিলির উদ্দেশে বলল ট্যানাগো, 'ওরা ভাবছে, বাইরের লোক এসে মন্দির লুটে নিয়ে যাবে।'

'আর কিছুই নেই যে লুঠ করবে,' বলল মউরোস।

স্যাটালাইট ফোন থেকে চোখ তুলল রানা। 'না, ঠিকই বলেছে ওরা। মন্দিরে রয়ে গেছে কোটি কোটি টাকার সোনা।'

'ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেব,' বলল সেসিলি। 'টাকার পাগল নয় এমন একদল লোক এসে ত্রাণ দেবে, পাহারাও দেবে মন্দির। আমাদের উচিত হবে না প্রকাশ করা যে, কোথায় আছে এই মন্দির। আপনি কি বলেন, ট্যানাগো?'

'আপনারা বললে চেপে যাব সব,' বলল ইণ্ডিয়ান ট্র্যাকার।

'তা হলে তাই করুন,' অনুরোধ করল সেসিলি।

নিচু স্বরে কী যেন বলল রানা স্যাটালাইট ফোনে, ওদিকের কথা শুনে বলল, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।' দলের অন্যদের উদ্দেশে জানাল, 'হেলিকপ্টার আসছে। জিপিএস পেয়েছে, কিন্তু

আসতে হবে রাতের আঁধারে, তাই কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।'

'ট্যানাগো ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন তো?' মউরোসের দিকে চেয়ে জানতে চাইল লাবনী। 'যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'আমাকে নিয়ে ভাববেন না,' লাজুক সুরে বলল ট্যানাগো। 'আগেও আহত হয়েছি। টিকে যাব আগামী বেশ কয়েক ঘণ্টা।'

'চুপচাপ বিশ্রাম নেবে, দরকার পড়লে পেইন কিলার দেব,' বলল মউরোস।

রানার পাশে থেমে ওর কাছ থেকে স্যাটালাইট ফোন নিল সেসিলি। 'বাবাকে জানিয়ে দেব, এখানে কী ঘটেছে। ব্রাযিলিয়ান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তিনি। ঝামেলা ছাড়াই এই দেশ ছেড়ে যেতে পারব।' সরে এসে লাবনীর পাশে বসে পড়ল সে। 'আমার পরের কাজ তোমাকে ভাল একটা মানচিত্রের সামনে পৌঁছে দেয়া। মন্দিরের সব তথ্য হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার পরেও ডোনাটি লুক্কার অনেক আগেই আটলান্টিসে পৌঁছব।'

'হ্যাঁ, সামনে অনেক কাজ,' নিচু স্বরে বলল লাবনী। চট্ করে দেখল রানাকে। ব্যস্ত হয়ে ব্যাকপ্যাক ঘাঁটছে মানুষটা।

উনিশ

জিব্রাল্টারের সেরা হোটেলের সুইটে মেহগনি কাঠের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা। বিছিয়ে দিয়েছে চার্ট। ওর আঙুল

চলছে ছত্রিশ ডিগ্রি উত্তর লক্ষ্য করে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'অনেক এলাকা নিয়ে ওই সাগর।'

'কপাল ভাল, আমাদের অত খাটতে হবে না,' বলল সেসিলি। 'এরই ভেতর বাবার সার্ভে এয়ারক্রাফট হাই রেযোলুশন সিনথেটিক অ্যাপারচার রেইডার সার্ভে করছে গালফের সি-বেড। ষাট ফুট সেডিমেন্টের নিচে কিছু থাকলেও পরিষ্কার দেখবে।'

চুপ করে আছে রানা। নুমার ডিরেক্টর হিসেবে ভাল করেই জানে এসব বিষয়ে।

ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল মউরোস, 'কিন্তু ষাট ফুটের নিচে কিছুই দেখা যাবে না, তাই না?'

'সেক্ষেত্রে হার মানতে হবে,' বলল লাবনী।

নিচু কণ্ঠে গালি বকল সেসিলি।

মেয়েটাকে প্রথমবারের মত মুখ খারাপ করতে দেখে অবাক হয়েছে রানা।

'কিছু জানলেন ডোনাটি লুক্কা বা তার লোকের বিষয়ে, মিস্টার রানা?'

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'মরোক্কোয় চোখ-কান খোলা রেখেছে আমার এক বান্ধবী।'

'নিশ্চয়ই সে-ও প্রেগন্যান্ট?' জিজ্ঞেস না করে পারল না লাবনী।

হেসে উঠল সেসিলি।

'ঠিক বলেছ...' নির্বিকার চেহারায় কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'গতকাল ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা থেকে জাহাজ নিয়ে রওনা হয়েছে লুক্কার লোক। সার্ভে শিপ। সেসিলির বাবার দামি জাহাজের মত নয়। তবে ওটার আছে সাবমারসিবল। লাবনীর কথাই ঠিক, ভুল জায়গায় খুঁজতে যাচ্ছে ওরা। ওই কোর্স ধরে রাখলে সরে যাবে

দু' শ' মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।'

'আশা করি ওখানেই ঘুরপাক খাবে,' বলল সেসিলি। 'এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, কী করে অত দ্রুত আমাদের খুঁজে বের করেছিল ওরা!'

'ইয়ট নোয়াকে দেখলে ভুলতে পারত না কেউ,' মন্তব্য করল মউরোস।

'তার চেয়েও বড় কথা, আমার ধারণা, ওই ইয়টে ট্র্যাকার ছিল,' বলল রানা। নদীর নিচে পাওয়া গেছে ইয়ট। হেলিকপ্টার থেকে অ্যান্টিট্যাঙ্ক মিসাইল মেরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল ওটাকে। 'এখন যত কম লোক জানবে কোথায় চলেছি, সেটাই মঙ্গল। সেসিলি, তোমাদের জাহাজে কতজন ক্রু?'

'চব্বিশজন,' বলল মেয়েটা, 'প্রত্যেকে তারা বাবার বিশ্বস্ত।'

'বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত তুমি?' জানতে চাইল রানা। মেয়েটাকে দ্বিধা করতে দেখে বুঝে গেল, কী হবে জবাব। 'সেক্ষেত্রে শুধু ক্যাপ্টেন আর ন্যাভিগেটরকে জানাব কোথায় যাব আমরা।'

'তার আগে রেইডার সার্ভে রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল সেসিলি।

রানার পাশে থেমে মানচিত্রে মন দিল লাবনী। কেডিয উপসাগর দক্ষিণ ও উত্তর দিকে প্রায় তিন শ' মাইল বিস্তৃত। প্লেটো এ কারণেই লিখেছেন, ওই উপসাগর মহাদেশের চেয়ে অনেক ছোট। আর সে কারণেই, তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ওই দ্বীপের কমপক্ষে তিন ভাগের দু'ভাগ হবে সত্যিকারের আটলান্টিস। গ্রিকদের স্টেডিয়ামের চেয়ে ছোট হওয়ার কথা আটলান্টিয়ানদের স্টেডিয়াম। মূল মন্দিরের যে প্রতিরূপ ছিল আমাজনের জঙ্গলে, ওটার তথ্য অনুযায়ী আটলান্টিয়ান স্টেডিয়াম ছিল বড়জোর চার শ' ফুট লম্বা।

ওই হিসাব অনুযায়ী, সত্যিকারের আটলান্টিস দৈর্ঘ্যে মোটামুটি এক শ' পঁচিশ মাইল, চওড়ায় এক শ' মাইল। ফলে ঠিকই এঁটে গিয়েছিল গ্যালফের ভেতর। তার চেয়েও বড় কথা, ওই দ্বীপটা ছিল মহাদেশীয় তাকের খুব কাছে। ডুবে যেতে দেরি হয়নি মহাসাগরের তলে। ওটা থেকে অনেক দূরে খুঁজতে শুরু করবে ব্রাদারহুড।

ম্যাপে রানার মনোযোগ দেখে জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'কী ভাবছ?'

'ব্রাদারহুডের কথা ভাবছি,' মুখ তুলে লাবনীকে দেখল রানা।

'সত্যি আশ্চর্য, লোকটা কে? কেন আটলান্টিস আবিষ্কার ঠেকাতে চাইছে?' মাথা নাড়ল লাবনী। ওর মনে পড়ল ড্রেকের একটা কথা। 'লোকটা বলেছিল, যেভাবে হোক ঠেকাবে সেসিলি ও তার বাবাকে, যাতে আবিষ্কার করতে না পারে আটলান্টিস।' সেসিলির দিকে তাকাল লাবনী।

'আমিও জানি না, কেন এমন করছে ওরা,' দ্বিধা নিয়ে বলল সেসিলি। লাবনীর চোখে তাকাল। 'তবে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো। কী বিষয়ে?'

লাবনীর হাত ধরে দূরের সোফায় গিয়ে বসল সেসিলি। নিচু স্বরে বলল, 'আটলান্টিসের চেয়েও বেশি করে খুঁজছি আমরা আরেকটি জিনিস।'

'সেটা কী?' অবাক হয়েছে লাবনী। 'আটলান্টিসের চেয়েও বেশি গুরুত্ব তার?'

'তুমি অবাক হবে হয়তো, কিন্তু সত্যি বলতে আটলান্টিস খুঁজে বের করলে শুরু হবে নতুন এক যুগের। তুমি তো জানো, ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে পুরো দুনিয়া জুড়ে মেডিকেল

এইড দিচ্ছি?' মাথা দোলাল লাবনী। 'এর মাধ্যমে সব ধরনের মানুষের রক্ত থেকে জেনেটিক স্যাম্পল নিচ্ছি আমরা।'

লাবনীর মনে পড়ল, ইরানের উদ্দেশে যাওয়ার আগে ওকে টিকা দেয়া হয়েছিল ওই ফাউণ্ডেশন থেকে। ওই দাগ এখনও রয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকেও নেয়া হয়েছে স্যাম্পল,' বলল সেসিলি। 'চট্ করে কোনও মন্তব্য করে বোসো না। জরুরি একটা কাজে সংগ্রহ করা হয়েছে এসব স্যাম্পল।'

'তার মানে, আমারও ডিএনএ টেস্ট করেছ তোমরা?' রাগ লাগল লাবনীর। 'আমাকে না বলেই?'

'গোপন করতে হয়েছে সব। প্লিয, ব্যাখ্যা করতে দাও আমাকে। প্লিয?'

'বলো, কী বলবে,' গম্ভীর হয়ে গেছে লাবনী।

'আমি যখন অনেক ছোট, সেসময় প্রথমবারের মত বাবা আবিষ্কার করলেন, এক শ'জন মানুষের ভেতর একজন বহন করছে অদ্ভুত এক জেনেটিক মার্কার। ওটা খুব রেয়ার। কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে দুনিয়া জুড়ে। সব দেশেই তাদেরকে পেয়েছি আমরা। আমাদের ধারণা...' চুপ হয়ে গেল সেসিলি। মনে হলো অতি গোপন তথ্য বলতে গিয়ে দ্বিধা করছে। 'আমাদের ধারণা, ওই জেনেটিক মার্কার এসেছে সেই এগারো হাজার বছরের আগের আটলান্টিয়ানদের তরফ থেকে। অন্যভাবে বললে বলতে হবে, এদের প্রত্যেকের ডিএনএর জিনে...'

'তার মানে, তারা আটলান্টিয়ানদের উত্তরপুরুষ?'

মাথা দোলাল সেসিলি। 'ঠিক ধরেছ। হারিয়ে গেছে আটলান্টিস, কিন্তু ওই দেশের মানুষ জয় করে নিয়েছিল দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা। নামিবিয়া, তিব্বত, পেরু বা নরওয়ের ক্ষমতা দখল করেছিল ওরা। ওই জয়ের তালিকা অনেক দীর্ঘ।'

'নরওয়ে?'

'হ্যাঁ,' লাবনীর দু'হাত নিজের হাতে নিল সেসিলি। 'লাবনী, সত্যি বলতে কখনও হারিয়ে যায়নি আটলান্টিয়ানরা। আমাদের মাঝে বাস করছে তারা। বা বলতে পারো, আমরাই আসলে আটলান্টিয়ান। আমার বাবা, আমি বা তুমি বহন করছি ডিএনএর ওই মার্কার।' সরাসরি লাবনীর চোখে তাকাল ও।

'আমিও? কিন্তু...'

'তুমি আমাদের একজন, লাবনী। তুমি আটলান্টিয়ানদের উত্তরনারী। আমরা আমাদের মত মানুষগুলোকে খুঁজে বের করার কাজে ব্যস্ত।'

কথা শুনে মাথা ঘুরছে লাবনীর। একবার ভাবল, সেসিলির হাত থেকে ছুটিয়ে নেবে নিজের হাত। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে না বলে মনে হলো। ওর গবেষক মন জানতে চাইছে আরও তথ্য। জানতে চাইল, 'কী করে খুঁজে বের করবে সবাইকে?'

'আটলান্টিস খুঁজে পাওয়া গেলে অনায়াসেই আমরা বের করে ফেলব, কীভাবে কোন্ দেশে কখন ছড়িয়ে পড়েছি আমরা। এরই ভেতর আমরা দেখেছি, কীভাবে ব্রাযিলে নতুন করে সভ্যতা তৈরি করেছে আটলান্টিয়ানরা। অন্য জায়গাতেও তাই হওয়ার কথা। মন্দিরের মানচিত্র আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, কত দূর সাগরে গেছে তারা। বাদ পড়েনি এশিয়া বা অস্ট্রেলিয়া। আমরা শুধু জেনে নেব, কোন্ পথে কোথায় গেছে। তখন হয়তো আমরা...'

'খুঁজে বের করবে উত্তর পুরুষদেরকে?'

'আমার সোনালি চুল দেখে ইণ্ডিয়ানরা জানতে চেয়েছিল, আমি পুরনো আমলের মানুষদের একজন কি না। ওদের রক্তে আছে সেই স্মৃতি। হাজার হাজার বছর ধরে গল্প করেছে নিজেদের ভেতর।'

'তা হলে বলতে পারি, ওরাও আটলান্টিয়ান,' হাসল লাবনী। 'ডোনাটি লুক্কাও কি আমাদের কেউ?'

তিক্ত হয়ে গেল সেসিলির চেহারা। 'না। আটলান্টিয়ান উত্তরপুরুষদেরকে ঘৃণা করে সে বা তার দলের সবাই।'

'তার সমস্যা কী?' জানতে চাইল লাবনী। 'ডিএনএর মার্কার সম্পর্কে সবই জানে সে?'

'হ্যাঁ, জানে। কয়েক বছর আগে আমরা জানলাম, ছুঁচো ঢুকেছে আমাদের জেনেটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। বাবা জানলেন ওই লোক গোপনে তথ্য বিক্রি করছিল আরও অনেক দিন আগে থেকেই। আমরা আটলান্টিয়ানরা দুনিয়া জুড়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারি, তা ঠেকাতে যা খুশি করবে লুক্কা। দরকার হলে খুন করতেও দ্বিধা নেই তার, নিজের চোখেই দেখেছ।'

'এসব থেকে দূরে থাকতে পারলেই ভাল হতো,' বিড়বিড় করল লাবনী।

'মোটেও তা নয়,' লাবনীর হাতে আলতো চাপ দিল সেসিলি। 'আজ তুমি না থাকলে আমরা এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না। ...এখন তো জানো, কী জন্যে কাজ করছি আমরা। প্রয়োজনে লাখ লাখ মানুষ তোমাকে রক্ষা করতে জান দিতেও রাজি হবে। কাজেই ভয় পেয়ো না।'

লাবনী নিচু স্বরে বলল, 'শুনে খুশি হয়েছি। তবুও ভয় লাগছে। জানি না আটলান্টিস পেলে কী ধরনের বিপদে গিয়ে পড়ব!' চার্ট টেবিলের দিকে তাকাল ও। কখন যেন মউরোসকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে রানা।

'সাগরের তলে কিছু থাকলে, এসএআর সার্ভে ঠিকই দেখিয়ে দেবে,' বলল সেসিলি।

'হয়তো অনেক গভীর সেডিমেন্টের নিচে চাপা পড়েছে। সেখান থেকে তুলে আনবে কী করে? অগভীর পানিতে কাজ

করাই কঠিন, কয়েক শ' ফুট নিচের সাগরের কথা ভাবাই যায় না।'

হেসে ফেলল সেসিলি। 'তুমি এখনও দেখোইনি আমাদের সাবমারসিবলগুলো। অন্য জিনিস।'

'সাবমারসিবল একটার বেশি?'

মাথা দোলাল সেসিলি। 'ড্রেক ভুল বলেনি, আটলান্টিস খুঁজে বের করা সাধারণ কোনও হবি নয় বাবার জন্যে। ওটা হয়ে উঠতে পারে তাঁর সবচেয়ে বড় ব্যবসা। তাতে কোনও খুঁত রাখছেন না তিনি।'

'তুমিও নিশ্চয়ই তাঁর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত?'

'অবশ্যই!' লাবনীর হাত ছেড়ে দিল সেসিলি। 'বেশি দেরি হবে না রেইডার সার্ভে রিপোর্ট পেতে।' জানালা দিয়ে দূরে দেখাল ও। 'এসো, ঘুরে বেড়াই জিব্রাল্টারে।'

মাথা নাড়ল লাবনী। 'ইচ্ছে করছে না। মনের ওপর দিয়ে গেল অনেক ঝড়। চুপচাপ বিশ্রাম নিতেই ভাল লাগবে।'

একটু হতাশ হলো সেসিলি। 'ঠিক আছে। তবে মন চাঙ্গা হলেই আমাকে বোলো।'

'ঠিক আছে।'

ঘর ছেড়ে চলে গেল সেসিলি। টেবিলে গিয়ে চার্টে মনোযোগ দিল লাবনী। ভাবছে, আসলে কীসের ভেতর জড়িয়ে গেলাম আমি?

কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, খুব কাছে কেউ। চোখের কোণে দেখল রানাকে। ওর মন বলল, সব বিপদ ঠেকিয়ে ওকে নিরাপদ রাখবে রানা।

পরদিন পেরিয়ে গেল কোনও ঘটনা ছাড়াই। এরপর নতুন ভোরে এল এরিয়াল সার্ভে রিপোর্ট। সকাল আটটায় নাস্তা শেষ করে রানা, লাবনী, সেসিলি, মউরোস ও জিম করেলি জড় হলো

লাবনীর সুইটের লাউঞ্জে। ওদের সামনে কমপিউটার স্ক্রিন। ভিডিয়োলিঙ্কে বললেন লোভিস ডেনিয়েলসন, 'দেখে নিন।' ল্যাপটপের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে এলসিডি মনিটর। ওটাতে দেখা গেল বিশাল এলাকার রেইডার সার্ভে প্রিন্টআউট। তার এক জায়গায় লাল কার্সার দিয়ে দেখানো হয়েছে সাগরের লাল একটা বিন্দু।

বিলিয়নেয়ার ডেনিয়েলসন আরও নিখুঁতভাবে জায়গা দেখিয়ে দেয়ায় উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। সাগরের অনেক নিচে কী যেন ধূসর।

'স্কেল কত?' জানতে চাইল রানা।

'প্রতি মিলিমিটার সমান পাঁচ মিটার,' রুলার দিয়ে মেপে বলল সেসিলি। ওর হাত থেকে স্কেল নিয়ে বৃত্তাকার জায়গাটার মাপ নিল লাবনী।

'এক শ' পঁচিশ মিলিমিটার। একটু কম বা বেশি হবে। তার মানে, ছয় শ' পঁচিশ মিটার। দু'হাজার ফুটেরও বেশি। প্লেটোর লেখার সঙ্গে মিলে গেছে।' বেশ কয়েকটা বৃত্তাকার জায়গার ঠিক মাঝের জায়গার মাপ নিল লাবনী। অনেকটা আয়তাকারের মত এক জায়গা সাদা-কালো পাথর দিয়ে তৈরি। প্রায় ফিসফিস করে বলল ও, 'লম্বায় চার শ' ফুটের বেশি, চওড়ায় দু' শ' ফুট। তার মানে, ব্রাযিলের সেই মন্দিরের সঙ্গে একেবারেই মিলে যাচ্ছে!'

'ওসব বৃত্তাকার জায়গা কি প্রাকৃতিক?' আনমনে বললেন করেলি। 'কোনও তলিয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরি, বা উল্কা পতনে তৈরি গর্ত?'

'উঁহুঁ, নিয়মিত,' বলল লাবনী, 'মানুষ তৈরি করেছে। ...সাগরের কতটা গভীরে?'

জবাব দিলেন ডেনিয়েলসন, 'সাগর-তলের দু' শ' চল্লিশ মিটার নিচে।' বামদিকে তাকালেন তিনি, আরেকটা স্ক্রিনে দেখে

নিলেন কী যেন। 'পাঁচ মিটার সেডিমেন্টের নিচে।'

'আট শ' ফুট,' রানাকে জানানোর জন্যেই বলল লাবনী।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'যথেষ্ট গভীর। তবে সাবমারসিবল থাকলে শেষ করা যাবে কাজটা। স্কুবা গিয়ারের শেষ সীমা। একেকবারে কয়েক মিনিটের বেশি ওই গভীরতায় থাকতে পারব না আমরা।'

'ঠিক তা নয়, নতুন ধরনের ডাইভিং গিয়ার নিয়ে কাজ করেছি আমরা,' রানাকে বলল সেসিলি। 'জাহাজে যাওয়ার পর আপনাকে দেখাব ওগুলো।'

'সেডিমেন্ট সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে কী করা হবে?' জানতে চাইল লাবনী।

মুচকি হাসল সেসিলি। 'আগেই তো বলেছি, চমকে যাবে আমাদের সাবমারসিবল দেখলে। দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছে ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের বিজ্ঞানীরা। প্রথমবারের মত সাগরের অত গভীরে ওগুলো কাজে লাগাব আমরা।'

ঝুঁকে পড়ে প্রিন্টআউট দেখছেন করেলি। 'আমার ভুল না হয়ে থাকলে যা দেখছি, ওটা নিশ্চয়ই জোরালো রেইডার রিটার্নের আবছা কোনও ছবি?'

'তা নয়,' ব্যাখ্যা দিল সেসিলি। 'সাদা এলাকা দেখাচ্ছে ছায়ার মত। আর যেখানে বাধা পড়েছে রেইডার তরঙ্গ, সেসব জায়গা দেখাচ্ছে কালো।'

'তা হলে ওখানে কঠিন কিছু আছে,' মাঝের পুবের দিক দেখালেন প্রফেসর। 'যেমন ওখানে। মনে হচ্ছে, যেন অনেক ওপর থেকে ছবি তোলা হয়েছে ধ্বংসাবশেষের। জারড়ে গেছে সব। যেন ভেঙে পড়েছে দেয়াল। তবুও বোঝা যায় ওখানে সভ্যতা ছিল।'

'ওটাই আটলান্টিস,' বলল লাবনী। 'প্রায় নিখুঁতভাবে ওটার

বর্ণনা দিয়ে গেছেন প্লেটো। সিটেডালের বাইরে ছিল পানিতে ভরা তিনটে পরিখা। দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল খাল।' স্ক্রিনের কালো একটা আয়তাকার অংশে টোকা দিল ও। 'আর এটা... সত্যিকারের দ্য টেম্পল অভ পসেইডন। এতে কোনও ভুল থাকতেই পারে না।'

'সাগরের অত গভীরে নেমে গেল কী করে?' বিস্ময় নিয়ে বলল মউরোস। 'আট শ' ফুট!'

'বড় টেকটোনিক অবস্থান সরলে ধসে পড়ে সাবসার্ফেস ভলক্যানিক কেলডেরা,' বলল লাবনী। 'তখন মাত্র কিছুক্ষণের ভেতর তলিয়ে যেতে পারে কন্টিনেন্টাল শেল্ফ্। ওটার ফলে তৈরি হতে পারে প্রচণ্ড সুনামি। তার ফলেও তলিয়ে গিয়ে থাকতে পারে আটলান্টিস দ্বীপ। আর পরে ধীরে ধীরে আরও নিচে গেছে ওটা। দশ হাজার বছর আগের বরফ যুগের পর অনেক ওপরে উঠে এসেছে পৃথিবীর সাগরের পানি। তার আগেই তলিয়ে গেছিল আটলান্টিস। তবে আমরা জানি না যে ভূমিকম্প না সুনামির কারণে তলিয়ে গেছে দ্বীপটা। জানতে হলে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গবেষণা করতে হবে।'

'তা-ই করব আমরা,' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেসিলির মুখ। 'লাবনী, তুমি আবিষ্কার করেছ বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিকাল সাইট! এমন এক দ্বীপ, যেটাকে কিংবদন্তী বলে মনে করত সবাই!'

'অনেকে এখনও মানতে চাইবে না,' বাঁকা চোখে প্রফেসর করেলিকে দেখল লাবনী।

'হ্যাঁ, মানতে হবে,' হাল ছেড়ে বললেন করেলি, 'আমার ভুল হয়েছিল।' হাত বাড়িয়ে দিলেন লাবনীর দিকে। 'কংগ্র্যাচুলেশন্স, ডক্টর আলম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, প্রফেসর,' হাত মেলাল লাবনী।

সামনে বেড়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন প্রফেসর। 'ওয়েলডান, লাবনী! দুর্দান্ত কাজ করেছ!'

জবাবে হাসল লাবনী। চেহারায় সামান্যতম গর্বও প্রকাশ পেল না।

'এবার পরের কাজ হবে আট শ' ফুট নিচে নেমে যাওয়া,' জরুরি কথায় এল রানা।

'এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব আমি,' ডেনিয়েলসন বললেন, 'দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলব যত দ্রুত সম্ভব যেন আপনাদেরকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেন। এরই ভেতর সব প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি। আগামীকাল পৌঁছে যাবেন আপনারা হেলিকপ্টারে করে তাঁর জাহাজে।' মৃদু হাসলেন তিনি। 'আবারও বলব, ডক্টর আলম, আপনি জাদু দেখিয়ে দিয়েছেন। এজন্যে মস্ত বড় আয়োজন করে সম্মানিত করা হবে আপনাকে। আপনি তখন দেখবেন আমরা কী অনুষ্ঠান করি।'

'তাই করব আমরা, স্যার,' সায় দিল সেসিলি।

'কোনও সন্দেহ নেই, আবারও যখন আপনার সঙ্গে আমার কথা হবে, ততক্ষণে আটলান্টিস আবিষ্কার করে ফেলেছেন আপনি,' আন্তরিক হাসলেন ডেনিয়েলসন। 'ভাল থাকুন। ভাল হোক আপনার। ভয় পাবেন না বা মোটেও ভাববেন না, দুনিয়া-সেরা যোগ্য এক মানুষের দায়িত্বেই আছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও খুশি হতেন মিস্টার রানার দেয়া নিরাপত্তা পেলে।' কালো হয়ে গেল স্ক্রিন।

বিশ

'ওই যে দ্য সায়েন্টিস্ট!' হেলিকপ্টারের উইণ্ডশিল্ডের এদিক থেকে দূরের সাগরে জাহাজটা দেখাল সেসিলি।

কেডিয উপসাগরের গাঢ় নীল জলে ঝিলিক মারছে সূর্যের আলো। পর্তুগাল তীর থেকে পুরো নব্বুই মাইল ও জিব্রাল্টার থেকে এক শ' মাইল দূরে পাওয়া গেল সায়েন্টিস্টকে। আটলান্টিক মহাসাগরের বুক চিরে প্রতি ঘণ্টায় বারো নট গতি তুলে ছুটে চলেছে গন্তব্যের উদ্দেশে। দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজটা দেখা যাচ্ছে নীলের বুকে ঝিকমিক করা সাদা এক তীরের মত। দু' শ' ষাট ফুট দৈর্ঘ্যের ওশোনোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেলটি দেখার মত সুন্দর। ওটার মধ্যে রয়েছে সাগরে নামার জন্য দরকারি সব মেশিনারি ও সাবমারসিবল। খরচ করতে গিয়ে কিপটেমি করেননি বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন।

'ওই তো!' বলে উঠল মউরোস। গোপন রাখতে চাইছে হেলিকপ্টার যাত্রার দুশ্চিন্তা। 'কখন যে ওটার ডেকে পা রাখব! নড়বে ওটা, দুলবে, তবুও তো পায়ের নিচে শক্ত কিছু! আমি শালা ঘৃণা করি হেলিকপ্টার!'

'আপনি বোধহয় জানেন না চলন্ত জাহাজে নামা কত কঠিন,' বলল পাইলট।

তিক্ত চোখে দেখল তাকে মউরোস। পকেট থেকে সবুজ একটা আপেল বের করে ওটার বুকে কামড় বসাল।

হাল ছাড়ল না পাইলট। 'তবে ভয় পাবেন না। আগেও কমপক্ষে এক শ' বার জাহাজে নামিয়েছি বেল ৪০৭।'

'আমি ভাবছি এক শ' এক বারের কথা,' বিড়বিড় করল মউরোস।

সেসিলির কাঁধের ওপর দিয়ে জাহাজটা দেখল লাবনী। ওই জাহাজকে আলট্রামডার্ন বলে মনে হলো ওর। যদিও একটু অদ্ভুত ডিযাইনের। খোল স্বাভাবিক, কিন্তু ভারী ওটার সুপারস্ট্রাকচার, আবার মাঝখানে চেপে এসেছে দু'দিক থেকে। অনেক ওপরে রেইডারের মাস্তুল।

হেলিকপ্টার আরও কাছে যাওয়ার পর দেখা গেল জাহাজের আকৃতি সত্যিই অস্বাভাবিক। পেছনে বেরিয়ে আছে প্রপেলারের ওপরে ফ্যানটেইলে হেলিকপ্টার প্যাড। ওদিকে জাহাজের সামনের দিকের বেশিরভাগ অংশ খেয়ে নিয়েছে ভারী সব ক্রেন উইঞ্চ। ওগুলোই সাগরে নামিয়ে দেবে দুই সাবমারসিবলকে। কোথাও কোনও বাড়তি জায়গা নেই।

'মাত্র এক বছর আগে সাগরে নেমেছে,' জাহাজের অনেক কাছে পৌঁছে বলল সেসিলি। 'তিন হাজার দুই শ' টনী। পাঁচজন অফিসার। উনিশজন ক্রু। ঝাড়া দুই মাস সাগরে রাখতে পারবে তিরিশজন বিজ্ঞানীকে। ওটার জন্যে খুব গর্বিত আমার বাবা।'

মিথ্যা বলেনি পাইলট, নিখুঁতভাবে হেলিপ্যাডে নেমে পড়ল সে। প্রথম যাত্রী হিসেবে প্রায় লাফ দিয়ে হেলিকপ্টার থেকে নেমে গেল মউরোস, বড় করে দম নিয়ে বলল, 'যাক! বাঁচলাম এযাত্রা!'

'খুশিতে হাতদুটো ওপরে ছুঁড়ো না,' ওকে সতর্ক করল রানা। দেখিয়ে দিল মাথার ওপর ঘুরছে পাখা। 'মনে আছে তো, মানসারির কী হয়েছিল?'

রোটরের আওতা থেকে সরে গিয়ে বলল মউরোস, 'এর

চেয়ে সাগরে অনেক নিরাপদে থাকব।'

আপাতত দলের নেতৃত্ব দিল সেসিলি। সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে সবাইকে নিয়ে নেমে এল চারতলা নিচে। ওখানেই ওদের সঙ্গে দেখা হলো দ্য সায়েন্টিস্টের ক্যাপ্টেন জ্যাক হাওয়ার্ডের। পরনে তার নিপাট সাদা ইউনিফর্ম। ওদের উদ্দেশে বললেন, 'আর মাত্র তিন ঘণ্টার ভেতর টার্গেট এরিয়ায় পৌঁছে যাব।' এবার সেসিলির উদ্দেশে বললেন, 'মিস ডেনিয়েলসন, আপনি কি চান আমরা প্রথমবারেই সাগরে নামিয়ে দেব দুই সাবমারসিবল? আমার মনে হয়, আগে অ্যাডভেঞ্চারকে সি বেড দেখতে পাঠানোই ভাল।'

মাথা নাড়ল সেসিলি। 'হাতে সময় কম। ভুললে চলবে না, সাগরে আছে ডোনাটি লুক্কার জাহাজ। ভুল জায়গায় খুঁজছে। কিন্তু এরই ভেতর জেনে গেছে, আমরা আরেক দিকে রওনা হয়েছি। খোঁজ নিতে লোক পাঠাবে সে। আমার ধারণা, দেরি করবে না।'

'আপনি কি ভাবছেন হামলা হতে পারে?'

'আগেও হামলা করেছে,' মন্তব্য করল রানা।

হাসলেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। 'আসলে ওয়ারশিপ নয় দ্য সায়েন্টিস্ট, কিন্তু দরকার পড়লে নিজেদের দেখভাল করতে পারি আমরা।' আবারও সেসিলির দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনার বাবা বিশেষ কিছু ইকুইপমেণ্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঝামেলা হলে দেরি না করে ব্যবহার করব আমরা।'

'গুড, ক্যাপ্টেন।'

কথা শেষ হয়ে যাওয়ায় এক ক্রুকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। সবাইকে দারুণ বিলাসবহুল সব ঘরে পৌঁছে দিল সে। সেসিলি ব্যবস্থা করে রেখেছে বলে, পাইলট হাউসের নিচে চিফ সায়েন্টিস্টের স্টেটরুম পেল লাবনী। পাশের ঘরই রানার। হয়তো ভেবে নিয়েছে গভীর প্রেমের সম্পর্ক চলছে ওদের মধ্যে,

কাছাকাছি কামরা পেলে সুবিধে হবে।

নিজের ঘরটা একবার দেখে নিয়েই লাবনীর ঘরে এসে ঢুকল রানা। 'নোয়ার কেবিনের মত অতটা আরামদায়ক না, কিন্তু এটাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়াও কঠিন হবে।'

'বাদ দাও, ভয় লাগে,' শিউরে উঠল লাবনী।

'ঠাট্টা করছি না,' বলল রানা। 'সেসিলির কথা ভুলে গেলে? লুক্কা জানে আমরা এদিকেই আছি। মেয়েটা ভাবছে ক্রুরা বিশ্বস্ত, কিন্তু টাকা পেলে অনেকেই কাত হয়ে যায়।'

'তোমার কি মনে হয়, জাহাজে গুপ্তচর রেখেছে লুক্কা?' বিছানায় বসে রানার দিকে তাকাল লাবনী।

'আমার তা-ই ধারণা,' বলল রানা। 'ভেবো দেখো, আমাদের দলে নিজের লোক না রাখলে আমাজনে অত দ্রুত খুঁজে বের করতে পারত ড্রেক? সরাসরি এসেছে, বোট অনুসরণ করে নদী ধরে আসেনি ওই কপ্টারগুলো। আমরা ধীর গতি তুলে সামনে বেড়েছি। পিছু নিলে ফিউয়েল শেষ হয়ে যেত ওদের। তার মানে, কেউ না কেউ বলে দিয়েছে; আমরা কোথায় আছি। অথবা, বোটে ছিল হোমিং ডিভাইস।'

ঘরের উষ্ণ পরিবেশেও শিউরে উঠল লাবনী। 'হোমিং ডিভাইসের ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু কেউ যদি সংকেত দিয়ে থাকে, সে কে?'

'বলা কঠিন। হয়তো ভ্যান নুনান। কখনও বলেনি কোথায় যাবে। এ ছাড়া, হতে পারে ক্যাপ্টেন লিও ফার্নান্দো বা বাবুর্চি রবার্তো। কাউকে হিসাবের বাইরে রাখা ভুল হবে।'

'ক্যাপ্টেন আর বাবুর্চিকে বাদ দিতে পারো, তুমি তো ওদের লাশও দেখেছ।'

'হয়তো ছেঁড়া সুতো বাঁধতে গিয়ে তাদেরকে খুন করেছে ড্রেক। সম্ভাবনা খুব কম যে, নিজের বাবাকে বিক্রি করেছে

সেসিলি। তুমি নিজেও নিজের সর্বনাশ করবে না। তা হলে থাকে শুধু মউরোস, আমি আর প্রফেসর।'

'প্রফেসর করেলি বাবার বন্ধু ছিলেন, চিনি অনেক বছর ধরে,' বলল লাবনী। 'মরে গেলেও আমার ক্ষতি করবেন না তিনি।'

'তো থাকল মউরোস,' বলল রানা। 'ওকে বিশ্বাস করতে না পারলে নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারব না। এ থেকে কী বুঝলে? আসলে কী হয়েছে, তা বোঝা আপাতত অসম্ভব।'

'আশা করি তোমাকে হিসাবের বাইরে রাখতে পারি?' ফিক করে হেসে ফেলল লাবনী।

'কে জানে!' মাথা নাড়ল রানা। 'দোষ করে থাকলেও নিজেকে পিটিয়ে খুন করতে পারব না।' গম্ভীর হয়ে গেল ও। 'কিন্তু এমন হতে পারে, নোয়ায় কারও কাছে স্যাটালাইট ফোন ছিল ওই বোটের ক্রুদের মালপত্র ঘেঁটেছি, কিন্তু এই জাহাজ পুরো তল্লাসী করা প্রায় অসম্ভব।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আশা করি মস্ত কোনও বিপদে পড়ব না।'

'কিন্তু কাউকে যদি ধরেই ফেলো, তখন তাকে কী করবে?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'সত্যি বলতে, দ্বিধা করব না খুন করে সাগরে ফেলে দিতে,' গম্ভীর হয়ে গেছে রানা। 'তার জন্যে কতজন মানুষ খুন হয়েছে ভেবে দেখো।' লাবনী বুঝে গেল, মোটেও ঠাট্টা করছে না মানুষটা।

একঘণ্টা বিশ্রাম নেয়ার পর জাহাজটা ঘুরে দেখল রানা, লাবনী, মউরোস ও প্রফেসর জিম করেলি। ডেকের সামনের দিকে যাওয়ার পর ওদের সঙ্গে দেখা হলো সেসিলির। ওর পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে দুই তরুণ।

'লাবনী,' বান্ধবীর উদ্দেশে বলল সেসিলি। 'এরা আমাদের

সাবমারসিবলের পাইলট। শুধু তাই নয়, সত্যি বলতে ওগুলোর ডিযাইনারও।'

তাদের দু'জনের ভেতর লম্বা তরুণ বলল, 'আমি ম্যাট বেন্টসেন।' ক্যাপ্টেনের মতই কানাডিয়ান মানুষ। ঝুনঝুন শব্দে বাজছে কবজির সুতোয় বাঁধা শামুক। লাবনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, 'আপনি ভাবছেন সত্যিই আবিষ্কার করেছেন আটলান্টিস? দুর্দান্ত ব্যাপার!'

'আপনি চান ওটাকে খুঁড়ে তুলতে?' বলল অস্ট্রেলিয়ান বেঁটে তরুণ। পেরেকের মত চুল তার। পছন্দ করে কথা বলতে। 'দেখবেন সত্যিই ওই কাজ করে দেখাব আমরা। আমি জোসেফ ওয়েস্টকট। দরকার পড়লে সাগরের নিচের ওই শহর ওপরে তুলে এনে রোদে শুকিয়ে নেব।'

'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল লাবনী। মন দিয়ে দেখল দুই সাবমারসিবল। 'এগুলো ব্যবহার করবেন?' অত্যাধুনিক দুই সাবমারসিবল দেখতে অনেকটা মাটি খোঁড়ার ভারী যন্ত্রের মত।

'আপনি ভেবেছিলেন সামনের দিকে বড় একটা বুদ্বুদের মত কিছু থাকবে, তাই না?' বলল ওয়েস্টকট। 'উঁহুঁ, আমরা ওই জিনিস চাই না! একবার চিড় ধরলেই চ্যাপটা হয়ে মরতাম! শুধু মাছ বা টাইটানিক দেখতে গেলে তখন ওই জিনিস লাগে। কিন্তু আমাদের জিনিস কাজের। এতই পোক্ত, ভাবতেও পারবেন না।'

'যেন প্রেশার হাল ফুটো না হয়, তা দেখতে হয়েছে,' এক নাগাড়ে বলল বেন্টসেন, মনেই হলো না তার বন্ধু আর সে একই লোক নয়। ছোট সাবমারসিবলের সামনের কমলা গোলাকার অংশ দেখাল। ওটার ওপর লেখা: অ্যাডভেঞ্চার। 'সব মিলে ওটা এক টুকরো, কোথাও কোনও জোড়া নেই। আর এজন্যেই এত গভীরে যেতে পারবে।'

'চারপাশ দেখবেন কী করে?' গোলাকার জায়গায় পোর্টহোল দেখেছে লাবনী, কিন্তু ওটা খুব ছোট।

ওর প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিতভাবে সব বুঝিয়ে দিতে পারত রানা, কিন্তু চুপ করে থাকল।

'আমরা লিডার ভার্চুয়াল ইমেজিং সিস্টেম ব্যবহার করছি,' বলল বেন্টসেন। 'ওটা কাজ করবে রেইডারের মত। জিনিসটা নীল-সবুজ লেসার। মিসাইল সাবমেরিনের কমিউনিকেশন সিস্টেম হিসেবে ওটার ডিযাইন করেছিল ইউ.এস. নেভি। এমনই এক ওয়েভলেংথ, সাগরের পানিতে বাধাগ্রস্ত হয় না।'

'আসলে ওরা ব্যবহার করেছিল দুটো লেসার,' বলল ওয়েস্টকট. 'দুই চোখ যেন স্টেরিওস্কোপিক। প্রতি সেকেণ্ডে বিশবার সামনে থেকে ফিরবে। কোনও কিছু পেলেই তা থ্রি ডিমেনশন ছবির মাধ্যমে দেখিয়ে দেবে বড় স্ক্রিনে। এখন আর বিশ ফুট দূরের দৃশ্য দেখার জন্যে শক্তিশালী স্পটলাইট লাগবে না, প্রয়োজন নেই ভারী সব ব্যাটারি। চাইলেই পরিষ্কারভাবে একমাইল দূরেও দেখতে পাব আমরা।'

'বুদ্বুদের পোর্টহোল দিয়ে দেখতে হবে না, হাসতে হাসতে দেখব চারপাশ,' বলল বেন্টসেন। 'আর্ম ব্যবহার করে অনেক সহজে দ্রুত গতিতে কাজও করতে পারব।' সাবমারসিবলের স্টিলের ম্যানিপুলেটর দেখিয়ে দিল সে। 'এর ডিযাইন বৈপ্লবিক।'

'সত্যিই তাই,' হাসল ওয়েস্টকট। 'আমরা গবেষণা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ রাজি ছিল না টাকা দিতে। তখন মিস্টার ডেনিয়েলসন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। ব্যস, মনের চোখে দেখা জিনিসটা তৈরি করে ফেললাম আমরা।'

মনে মনে দুই তরুণের ডিযাইনের প্রশংসা না করে পারল না রানা।

'তবে এবার প্রমাণ করতে হবে ডিযাইনের কার্যকারিতা,' বলল সেসিলি। 'আপনারা সফল হলে চিরকালের জন্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিকাল আবিষ্কারের সঙ্গে উচ্চারিত হবে আপনাদের নামও।'

'তা-ই হবে, ধরে নিন তা-ই হবে,' মাথা নাড়ল বেন্টসেন।

'ঠিক,' সায় দিল তার বন্ধু ওয়েস্টকট।

দুই পাগলাটে বন্ধুকে হাই ফাইভ করতে দেখে মৃদু হাসল লাবনী। জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাডভেঞ্চার বুঝলাম সাধারণ সাবমারসিবল, কিন্তু পাশের বড় ওটার স্টিলের আর্ম কী কাজ করে?' হলদে যন্ত্রদানবের মুখ অনেকটা ভ্যাকিউয়াম ক্লিনারের মুখের মতই। ওপরের দিকে ক্রুদের গোল কোয়ার্টার। ভেসেলের মূল দেহের নিচে চওড়া একটা পাইপ। মনে হলো ওটা সামনে বা পিছনে যেতে পারবে। ঢুকে পড়েছে আরেকটা কম্পার্টমেন্টের ভেতর। রানা বুঝে গেল, ওই কম্পার্টমেন্ট আলাদা করা যায় সাবমারসিবল থেকে। ওই নডিউলের পেছনে আরেক দফা লম্বা, মোটা পাইপ। জিনিসটা লেজের মত। ওখানে লেখা: জরুরি কাজ, দেরি করিয়ে দিয়ো না!

'ওটা?' গর্ব নিয়ে সাবমারসিবল দেখাল ওয়েস্টকট। 'কিলার-ওয়েইলডোযার। পানির নিচে ষাঁড়ের মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত ডোযার নেই, তাই নাম দিয়েছি আমরা কিলার-ওয়েইলডোযার।'

'আমি বোধহয় ওটার কাজ বুঝতে পেরেছি,' হাসল লাবনী।

'পানির নিচে কাজ করতে পারে একাই,' স্টিলের ভারী দুটো বাহু দেখিয়ে দিল বেন্টসেন। ছোট সাবমারসিবলের থাবার মত নয়, বড় সাবমারসিবলের বাহুর শেষ দিকে মস্ত বালতি। খপাখপ বালি বা মাটি তুলবে আর্থমুভারের মত। 'ভারী পাথরও সরিয়ে ফেলতে পারে, আবার ভ্যাকিউয়াম পাম্পের মতও কাজ করে।'

গোল দেহের নিচে পাইপের মুখ দেখাল সে। 'চটপট সরিয়ে ফেলবে কাদা বা সেডিমেন্ট।'

'আর যেহেতু সব সরিয়ে ফেলবে মেইন পাম্প, সামনে বেড়ে পরিষ্কার পানিতে চারপাশ দেখব,' বলল ওয়েস্টকট। ভেসেলের পেছনের দিক দেখাল।

'কাদা বা বালি কত দ্রুত সরিয়ে ফেলতে পারবে ওটা সাইট থেকে?' জানতে চাইল রানা।

'পাঁচ মিটার তো?' হাসল বেন্টসেন। 'বলতে গেলে সময়ই লাগবে না। চট্ করে দেখে নিতে পারবেন নিচে কী আছে।'

'আসলে সঠিকভাবে ড্রেজ করে চারপাশ দেখতে গেলে...' কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েস্টকট। 'নির্ভর করছে আপনি কত বড় গর্ত তৈরি করবেন। ধরে নিলাম আপনি তৈরি করতে চান দু' শ' ফুট চওড়া গর্ত, সেক্ষেত্রে সব কাদা সরিয়ে ফেলতে লাগবে অন্তত কয়েক ঘণ্টা।'

'তখন কোনও কিছু তুলে নিতে চাইলে ব্যবহার করতে পারব কিলার-ওয়েইলডোযারের ম্যানিপুলেটর আর্ম,' বলল বেন্টসেন। 'বা ব্যবহার করব দাপুটে রাক্ষসকে।'

'ওটা আবার কী?' জানতে চাইল লাবনী।

কিলার-ওয়েইলডোযারের সঙ্গে যুক্ত খাঁচা দেখাল ওয়েস্টকট। ওটার ভেতরে আছে নীল বাক্সের মত কিছু। তরুণ গবেষক বুঝিয়ে দিল, ওটা ছোট একটা রোভ। 'দূরে সরে গিয়েও কাজ করতে পারে দাপুটে রাক্ষস। আসলে রোবট ও, তৈরি করেছি ক্যামেরন সিস্টেমের বিবি-১০১ নকল করে। কিলার-ওয়েইলডোযারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে। ওর আছে স্টেরিয়োস্কোপিক ক্যামেরা। দূর থেকেও ওকে চালাতে পারব। ওর নিজেরও ছোট সব বাহু আছে।'

খুদে রোবটের কী নাম দিয়েছে দুই তরুণ গবেষক, ভেবে হাসল লাবনী। জানতে চাইল, 'প্রথমবার ওকে কাজে নামাচ্ছেন আপনারা?'

'আগেও টেস্ট করেছি,' বলল ওয়েস্টকট, 'তবে এই প্রথমবারের মত সত্যিকারের অপারেশনে নামছে। দেখা যাক কেমন কাজ করে ও!'

'আমিও তা জানতে চাই,' দিগন্তের দিকে তাকাল সেসিলি। 'আগামী দু'ঘণ্টার ভেতর সাইটে পৌঁছে যাব আমরা। আপনাদের কতক্ষণ লাগবে রেডি হতে?'

'এরই ভেতর প্রি-লঞ্চ প্রিপারেশন শুরু করেছি,' বলল বেন্টসেন। 'সব ঠিক থাকলে একঘণ্টার ভেতর রেডি হয়ে যাব।'

'এরই ভেতর রিপিটার মনিটর চালু করে দিয়েছি মেইন ল্যাবে,' লাবনীকে বলল ওয়েস্টকট, 'ওখান থেকে সবই দেখতে পাবেন ত্রিমাত্রিক পর্দায়। খারাপ লাগবে না দেখতে।'

'গুড,' খুশি হলো লাবনী। বুকে কেমন এক উত্তেজনা। মনে জমে আছে অনেক দ্বিধা ও চাপ। শেষে যদি দেখা যায় ওখানে কিছুই নেই, তখন?

ওর অস্বস্তি টের পেয়েছে সেসিলি। 'শরীর খারাপ লাগছে, লাবনী?'

'সি-সিকনেস,' একটু দুর্বল সুরে বলল লাবনী। 'কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে সেরে যাবে। ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পর আমাকে জানাবে?'

'নিশ্চয়ই!' বলল সেসিলি। 'আটলাণ্টিস আবিষ্কার করা হবে, আর যে ওটাকে খুঁজে বের করল, তার কথা ভুলে যাব?'

'ঠিক আছে, তা হলে নিচে গিয়ে শুয়ে থাকি কেবিনে,' সুপারস্ট্রাকচারের দিকে পা বাড়াল লাবনী। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, ওর পিছু নিয়েছে রানা।

কেবিনের দরজা পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল দুঃসাহসী বাঙালি যুবক। বিছানায় শুয়ে ভাবল লাবনী, ওর হিসাবের ওপর ভর করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন ডেনিয়েলসন। সত্যি যদি দেখা যায় সব ভুল। তখন? মুখ দেখাতে পারবে না কাউকে। অস্থির লাগতে লাগল লাবনীর। আধঘণ্টা পর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, করিডোরে এসে টোকা দিল রানার কেবিনের দরজায়। ভেতর থেকে এল গম্ভীর কণ্ঠ: 'আসুন।'

দরজার নব মুচড়ে রানার কেবিনে ঢুকল লাবনী। ওর চোখ পড়ল বিছানায়। এইমাত্র উঠে বসেছে রানা। পাশেই একটা বই। ওটার কাভার দেখে অবাক হলো লাবনী। 'তুমি প্লেটোর ডায়ালগ্স্ পড়ছ?'

'এই একটু ঝালিয়ে নিচ্ছি,' মৃদু হাসল রানা।

ওর পাশে বিছানায় বসল লাবনী। দেখল বালিশের পাশে ক্রিটিয়াস রাখা। 'ওটাও পড়েছ?'

'নতুন করে আবার একবার। দেখেছ, কী নিষ্ঠুর ছিল আটলাণ্টিয়ান ক্ষমতাশালীরা?'

'কোন্ দিক থেকে?'

'পণ্ডিতরা মনে করেন ক্রিটিয়াস ছিল সঠিক সমাজ তৈরির জন্যে প্লেটোর দিক নির্দেশনা। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। খুব নোংরা ও নীচ মনের একদল লোক ছিল আটলাণ্টিয়ানরা। প্রথম সুযোগে দখল করত অন্য জাতির এলাকা। ক্রীতদাস বানাত তাদেরকে। তৈরি করেছিল সামরিক সমাজ। রাজাদের ছিল চরম ক্ষমতা। একটু এদিক ওদিক হলেই স্রেফ খুন করে ফেলা হতো নাগরিকদেরকেও। গণতন্ত্র বলতে ওই সমাজে কিছুই ছিল না।' কয়েক সেকেণ্ড ঘেঁটে বইয়ের একটা পাতায় চোখ নামাল রানা। '"ওরা চূড়ান্ত ক্ষমতা পেয়ে যা খুশি করত। ফলে যিউস রেগে

গেলেন। অধীনস্থ দেবতাদের ডেকে বললেন, যেন মানুষদেরকে শাস্তি দেয়া হয়।" আমার মনে হয়েছে, নীচ মানুষগুলো পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেয়ায় বড় কোনও ক্ষতি হয়নি।'

'আমিও একমত,' মাথা দোলাল লাবনী, 'বইয়ের ওই অংশ নিখুঁত অ্যানালাইয করেছ।'

বইটা নামিয়ে রাখল রানা। 'এসব পড়ার চেয়ে ভাল কোনও থ্রিলার পড়া ঢের মজার।'

'তবুও ওই মানুষগুলোকে খুঁজছি আমরা,' বলল লাবনী। 'বা তাদের কীর্তি।' ওর মনে পড়ল সেসিলির কথা। আচ্ছা, রানাকে ডিএনএর মার্কারের কথা বলেছে মেয়েটা? মনে হয় না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকল লাবনী, তারপর বলল, 'আসলে সেই ছোটবেলা থেকে মগজে গেঁথে গেছে আটলান্টিস। তা হয়েছে হয়তো বাবা-মার জন্যেই। তাঁদের সঙ্গে নানান জায়গায় গেছি। সব সময় মনে হয়েছে, আমরা এমন কিছু পাব, যেটার কারণে আবিষ্কার করে ফেলব আটলান্টিস।' টি-শার্টের ভেতর থেকে লকেট বের করল ও। পোর্টহোলের আলোয় ঝিকঝিক করছে জিনিসটা। 'আর কী অবাক কাণ্ড, বেশ কয়েক বছর ধরেই আমার কাছে ছিল আটলান্টিয়ান এই আর্টিফ্যাক্ট। বুঝতেও পারিনি।'

'আটলান্টিসের বিষয়ে অন্যকিছু পেয়েছিলেন তোমার বাবা-মা?' জানতে চাইল রানা।

আবারও বুকে ঠাঁই পেল লকেট। 'ঠিক... জানি না। মনে হয়েছিল কী যেন জেনেছেন। কিন্তু আমাকে খুলে বলেননি। চার বছর আগে যখন মারা গেলেন, তখনকার কথা...' চুপ হয়ে গেল লাবনী।

'দুঃখিত, তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল লাবনী। 'না, ঠিক আছে। আসলে আজকাল

ওঁদের কথা ওঠেই না। ভুলে থাকতে পারি। তখন তাঁরা ছিলেন তিব্বতে। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার কারণে বাদ পড়ে যাই আমি।'

'তিব্বত?' বিড়বিড় করল রানা। 'ওটা তো আটলাণ্টিক থেকে অনেক দূরে।'

'হাজার বছর ধরে আটলাণ্টিসের সঙ্গে মিশে আছে তিব্বতের কিংবদন্তী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েকবার ওখানে এক্সপিডিশন করেছে নাযিরা।'

'নাযিরা...' বিড়বিড় করল রানা। 'প্রথম সুযোগে নানানদিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ওরা। এমন কী পৌঁছে গিয়েছিল ব্রাযিলের জঙ্গলেও। সেক্সট্যান্টের অংশ চুরি করে। ওখানে এমন কিছু দেখেছিল, যে কারণে তাদেরকে যেতে হয় তিব্বতে।'

'হয়তো মানচিত্রে কিছু ছিল, বা লেখার ভেতর,' বলল লাবনী। 'ওটার মাধ্যমে নাযিরা জেনে যায়, তথ্য পেতে হলে যেতে হবে এশিয়ায়। হাতে সময় ছিল না বলে এ বিষয়ে আর খোঁজ নিতে পারিনি।'

'লাবনী, তোমার বাবা-মা ওখানে গিয়েছিলেন ঠিক কী কারণে?'

'জানি না। তবে কিছু পেয়েছিলেন তাঁরা। আমাকে বলেননি।' ভুরু কুঁচকে গেল লাবনীর। 'ব্যাপারটা অবাক করার মত। সবসময় আমার সামনেই সব বিষয়ে আলাপ করতেন তাঁরা।'

'হয়তো লেখাপড়া থেকে তোমাকে অন্য দিকে সরিয়ে দিতে চাননি।'

'হতে পারে,' এখনও কুঁচকে আছে লাবনীর ভুরু। 'তারপর কয়েক দিন পর পোস্টকার্ড পাঠালেন তাঁরা। অবাক হয়ে গেলাম। আরে, ওঁরা আছেন তিব্বতে! ওই পোস্টকার্ড এখনও

রেখে দিয়েছি।'

'কী লিখেছিলেন ওটাতে?'

'বেশি কিছু নয়। তাঁরা রওনা হয়েছেন হিমালয়ের একটা গ্রাম যিয়াওদং থেকে। এক সপ্তাহের জন্যে গেছেন। ফিরবেন...' চুপ হয়ে গেল লাবনী।

ওর কাঁধে সহানুভূতির হাত রাখল রানা। 'বাদ দাও, লাবনী। কিছুই বলতে হবে না।'

'না, বলতে দাও। এখন অবাক লাগে। কিছু দিন আগেও জানতাম না আটলান্টিসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে নাযিদের। পাঁচ বছর আগে জার্মানিতে গিয়েছিলেন বাবা। হয়তো পেয়ে গিয়েছিলেন আহনেনেরবে এক্সপিডিশনের কোনও তথ্য। এমন কিছু, যেটার কারণে যান তিব্বতে। কিন্তু অবাক কাণ্ড হচ্ছে, আমাকে কিছুই বললেন না কেন তাঁরা?'

'হয়তো নাযিদের তথ্য ব্যবহার করছেন বলেই তোমাকে জানতে দেননি তাঁরা,' বলল রানা।

'অসম্ভব নয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লাবনী। 'এখন আর কিছুই যায় আসে না। অ্যাভালাঞ্চে আটকা পড়ে মারা যান তাঁরা। জায়গাটা ছিল যিয়াওদং থেকে দক্ষিণে। প্রায় কেউ বাঁচতে পারেনি। খুঁজেও পাওয়া যায়নি লাশ।'

'প্রায় কেউ বাঁচতে পারেনি,' ভুরু উঁচু হলো রানার। 'তবে রক্ষা পায় কেউ। সে কে?'

'প্রফেসর জিম করেলি।'

'অবাক করলে! প্রফেসর জিম করেলি?'

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম তুমি জানো। বাবা-মার সঙ্গে ওই এক্সপিডিশনে ছিলেন। আর পরে এ কারণেই আমার লেখাপড়ার বিষয়ে খোঁজ রাখতেন। কেমন একটা অপরাধ বোধে ভুগতেন। যেন বেঁচে গিয়ে দোষ করেছেন। ক'দিন আগে পর্যন্ত

অভিভাবকের মতই আমাকে আড়াল করে রেখেছেন।'

'তাই?' বেড স্ট্যাণ্ডে হেলান দিয়ে বসল রানা।

'হ্যাঁ।'

দূরের দেয়ালে চোখ রাখল রানা।

'বেশ কয়েকবার এক্সপিডিশনে গেছেন বাবা-মার সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।'

'ও।' কী যেন ভাবছে রানা। লাবনী মুখ খোলার আগেই টোকা পড়ল দরজায়। রানার নয়, লাবনীর ঘরের দরজায়। 'আমরা এখানে!' গলা উঁচু করে বলল রানা।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সেসিলি। 'বিরক্ত করলাম না তো?'

'না,' বলল রানা।

'এলাম, জানাতে: আমরা পৌঁছে গেছি খুব কাছে। জাহাজের থ্রাস্টার ব্যবহার করে একই জায়গায় থামছেন ক্যাপ্টেন জ্যাক হাওয়ার্ড। নোঙর ফেলা হয়নি, কারণ নিচের কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিজ্ঞানীরা নামাতে শুরু করেছে সাবমারসিবল। দেখতে চাইলে এখনই যেতে হবে।'

'চলো যাই,' উঠে দাঁড়াল লাবনী। 'রানা, যাবে?'

'তোমরা সাবমারসিবল ডেকে যাও, পাঁচ মিনিটেই এসে পড়ব,' বলল রানা।

দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজে খুব কম জায়গায় গোপনে থাকতে পারবে কেউ। কিন্তু চারপাশ ঘুরে ঠিক জায়গা বেছে নিয়েছেন প্রফেসর করেলি। দাঁড়িয়ে আছেন দ্বিতীয় লেভেলের এক গ্যাংওয়েতে। একপাশে অনেক নিচে সাগর।

নার্ভাস চোখে আরেকবার চারপাশ দেখলেন তিনি। দূরে বড় সাবমারসিবলটাকে তুলে নিয়েছে ভারী এক ক্রেন। খোলা

আকাশের সাহায্য লাগবে বলে জিপিএস রিসিভারের অ্যান্টেনা সাগরের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জাহাজের খোলের একপাশে আছেন বলে যে-কোনও বিপদ হতে পারে।

বাধ্য হয়েই যোগাযোগ করতে হচ্ছে।

বেশ কয়েক দিন আগেই পেয়েছেন স্যাটালাইট ফোনটা। লোভিস ডেনিয়েলসন যোগাযোগ করার পর থেকেই। এরপর থেকে এদের সব তথ্য জানিয়ে দিচ্ছেন ডোনাটি লুক্কার কাছে। ভীষণ ভয়ের ভেতর আছেন। যখন তখন ধরা পড়ে যাবেন। এরা কেউ স্যাটালাইট ফোন দেখলেই পড়বেন মস্ত বিপদে। জিব্রাল্টারের হোটেলে একবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তখন দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজের গতিপথ লুক্কাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাজনে নোয়া ইয়ট উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে আরেকটু হলেই তাঁকে সন্দেহ করত মাসুদ রানা। আত্মা কেঁপে গিয়েছিল। লোকটা একবার তাঁর ব্যাকপ্যাক ঘাঁটলেই খুন হতেন। লোকটাকে তাঁর বড় ভয়।

এখন আগের চেয়ে ভাল জায়গায় আছেন জিম করেলি। গ্যাংওয়ের দু'দিকে দরজা। কোথাও কোনও জানালা নেই। চট্ করে কেউ আসবে না। কানেকশনের জন্যে অধীর অপেক্ষা করছেন।

'হুঁ?' জানতে চাইল কেউ। কণ্ঠ জানিয়ে দিল, সে হেণ্ড্রিক ড্রেক।

'জিম করেলি। হাতে সময় নেই। পৌঁছে গেছি ঠিক জায়গার কাছে। আমাদের বর্তমান কো-অর্ডিনেট...' জিপিএস ইউনিটের সংখ্যা জানিয়ে দিলেন তিনি।

'এরপর দ্য সায়েন্টিস্ট চলে যাবে সোজা আট শ' ফুট নিচে,' বলল ড্রেক। 'আমরা রওনা হয়ে গেছি। গুড ওঅর্ক, করেলি। এ জন্যে পুরস্কার পাবেন।'

‘আমি শুধু চাই, যেন এই মস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাই,’ ভুরু থেকে ঘাম ঝাড়ল লোভী, স্বার্থপর প্রফেসর। ‘দেরি হবে না তো আমাকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে?’

‘না, তা হবে না,’ দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিল ড্রেক। ‘শেষ হয়ে এল আটলাণ্টিসের পেছনে দৌড়ে বেড়ানোর দিন।’

জাহাজের দু’পাশে সাগরে নামানো হয়েছে দুই সাবমারসিবল। এরই ভেতর ককপিটে বসেছে দুই পাইলট। জলযানের ভেতরের কমিউনিকেশন সিস্টেম পরীক্ষা করছে ওয়েট সুট পরা ক্রুরা। একবার সাবমারসিবল তলিয়ে গেলে যোডিয়াকে করে উঠে আসবে জাহাজের ফ্যানটেইলে।

সাবমারসিবলগুলো নামবে আট শ’ ফুট গভীরে। তাতে লাগবে কমপক্ষে দশ মিনিট। ল্যাবে প্রধান সায়েণ্টিস্ট হিসেবে সম্মান দেখানো হয়েছে লাবনীকে, পেছনের সারির চেয়ারে সেসিলি, রানা, মউরোস ও জিম করেলি। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে দ্য সায়েণ্টিস্টের ক্রুরা।

আরেক মনিটরে দেখা গেল, পাইলটরা প্রেশার স্ফিয়ারে পরীক্ষা করছে এলএসডি ডিসপ্লে ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। ছবি সব তিনমাত্রার। বিশেষ চশমা পরতে হয়েছে লাবনীদেরকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ঠিকভাবেই নামবে সাবমারসিবল। সামনে দিয়ে কোনও মাছ গেলেও চোখে পড়বে, মনে হবে ওটা ভুতুড়ে কিছু।

একটু পর বলে উঠল ওয়েস্টকট, ‘আমরা পেরিয়ে গেলাম সত্তর ফুট। সব ঠিক আছে। কমিয়ে আনা হলো নামার গতি।’

‘নিশ্চিত করুন টার্গেটের দিকেই চলেছি,’ বলল বেণ্টসেন।

‘অ্যাডভেঞ্চার ক্রু, বাঁক নিন টু যিরো ওয়ান ডিগ্রিতে,’ হেডসেটে বলল সেসিলি, ‘গন্তব্যে পৌঁছতে বড়জোর তিন শ’

মিটার। কিলার-ওয়েইলডোযার ক্রু, ধরে রাখুন আগের পযিশন। দরকার পড়লে সরে যেতে বলা হবে।'

'এরই ভেতর চারপাশ দেখার কথা,' আপত্তির সুরে বলল ওয়েস্টকট। খাড়াভাবে সাগরতল লক্ষ্য করে নেমে চলেছে সাবমারসিবল। নিচে তাক করা হয়েছে লেসার। রেযোলুশন এতই পরিষ্কার, দেখা গেল পিলপিল করে কাদার ভেতর ছুটে পালাচ্ছে একপাল কাঁকড়া।

বেন্টসেনের সাবমারসিবল গতি হ্রাস করে সামনে বাড়ছে। সাগরতল থেকে ভাসছে মাত্র বিশ ফুট ওপরে। ছোট এক স্ক্রিনে দেখা গেল ভিডিয়ো ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবি। লিডার ইমেজ ওটাকে করে তুলল অনেক পরিষ্কার।

সামনে ওপরে উঠেছে সাগরতল।

'দ্য সায়েন্টিস্ট, সামনে কিছু আছে,' রিপোর্ট পাঠাল বেন্টসেন। 'ওদিক থেকে আসছে শক্তিশালী সোনার তরঙ্গ... ওটা কাদা নয়। বড় কিছু। তলিয়ে যাওয়া কোনও জাহাজ হতে পারে...'

'ডুবে যাওয়া জাহাজ নয়...' ত্রিমাত্রার স্ক্রিনে চোখ রেখে ফিসফিস করল লাবনী। চিনতে ভুল করেনি। দেখতে ওটা ঠিক ব্রাযিলের জঙ্গলের ওই মন্দিরের মতই।

কোনও ধ্বংসাবশেষ নয়। নিখুঁত। থম মেরে বসে আছে সাগরের আট শ' ফুট নিচে। পসেইডনের মন্দির!

চুপ করে স্ক্রিন দেখছে রানা।

'জেসাস! দ্য সায়েন্টিস্ট, আপনারা কি দেখতে পেয়েছেন?' জানতে চাইল বেন্টসেন।

'হ্যাঁ,' সায় দিল সেসিলি। লাবনীর হাতে ধরিয়ে দিল হেডসেট। 'পরিচালনার দায়িত্ব এখন থেকে তোমার হাতে।'

'আমি?' অবাক হলো লাবনী, 'কিন্তু সাবমারসিবলের

্যাপারে তো কিছুই জানি না!'

'জানতে হবে না কিছুই। তুমি শুধু বলে দেবে, কোথায় দেখতে হবে।'

'ঠিক আছে...' নার্ভাস হয়ে গেছে লাবনী। ওর মনে হলো, এখন যদি সাগরের অত নিচে ভুল কিছু করে সর্বনাশ হয় সাবমারসিবলের? চট্ করে কানে হেডসেট পরে ঠোঁটের কাছে নিল মাইক্রোফোন। 'বেন্টসেন, লাবনী বলছি। শুনছেন?'

'পরিষ্কার,' বলল কানাডিয়ান। 'আমি ওটা থেকে এক শ' পঞ্চাশ মিটার দূরে। আশা করি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।' ঢালু কাদার ভেতর ডুবে আছে মন্দিরের দেয়ালের নিচু অংশ। বাঁকা ছাত সাগরতল থেকে কমপক্ষে তিরিশ ফুট ওপরে। লেসার লাইট পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে মন্দিরের পাথুরে অংশে বসিয়ে দেয়া অমূল্য সব ধাতু। কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও অম্লান। 'অবাক লাগছে, এখনও আস্ত আছে মন্দির।'

সামনে ঝুঁকে স্ক্রিন দেখছে বিশ্বাসঘাতক জিম করেলি। বিড়বিড় করে বলল, 'ডিযাইন এমনই, একে অপরের ভারসাম্য রাখছে প্রতিটা পাথর। দ্বীপ যখন তলিয়ে গেল, ভেঙে পড়ল প্রায় সব, তখনও কিছুই হলো না মন্দিরের। অদ্ভুত!'

'নিচের স্রোত কেমন?' জানতে চাইল রানা।

যন্ত্রপাতি দেখে নিয়ে বলল ওয়েস্টকট, 'সরিয়ে নিতে চাইছে আধ নট গতির স্রোত। ওটা যাচ্ছে উত্তর-পুবে।'

'এ কারণেই পুরো তলিয়ে যায়নি,' বলল বেন্টসেন। 'স্রোত ঠিক থাকলে স্পেনের উপকূলে তাড়িয়ে দেব একগাদা কাদা।'

'মন্দির ছাড়া সাগরতলে আর কিছু দেখছেন?' জানতে চাইল লাবনী।

কয়েক সেকেণ্ড পর হোঁচট খেল ত্রিমাত্রার দৃশ্য। সরে যায়নি

অ্যাডভেঞ্চার, কিন্তু একপাশে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ওটার স্ক্যানার। 'জায়গায় জায়গায় স্তূপ বা ঢিবির মত। কিন্তু মন্দিরের মত নাক উঁচু করে নেই কিছু। চারপাশে কাদা। ওই মন্দির কত উঁচু ছিল?'

'কমপক্ষে ষাট ফুট।'

'সেক্ষেত্রে বলতে হবে, অর্ধেক বেরিয়ে আছে। চারপাশে জড় হয়েছে অনেক কাদা।' ক্যামেরা আবারও ঘুরে গেল মন্দিরের দিকে।

'কিলার-ওয়েইলডোযার, আরও কাছে যান,' বলল সেসিলি, 'চলে যাবেন উত্তর দিকের প্রান্তে। দূরে থাকবেন অ্যাডভেঞ্চার থেকে।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল ওয়েস্টকট। দ্বিতীয় ত্রিমাত্রিক ডিসপ্লেতে দেখা গেল সাবমারসিবলের এগিয়ে যাওয়া।

'বেন্টসেন?' ডাকল লাবনী। 'ঘুরে আসতে পারবেন দালানের বাইরে থেকে? জানতে চাই ওদিক থেকে দেখতে কেমন।'

নির্দেশ পালন করল বেন্টসেন। তাতে লাগল বেশ কয়েক মিনিট। আবারও দেখা গেল দৃশ্য। মন্দিরের এদিক ওদিক একইরকম। বাঁকা হয়ে উঠেছে ছাতের দিকে। কাদার তলে ডুবে আছে বেশিরভাগ অংশ। দেখলে মনে হবে, কাদার ভেতর প্রায় তলিয়ে আছে কচ্ছপের খোলস।

'দ্য সায়েন্টিস্ট!' উত্তেজিত সুরে বলল ওয়েস্টকট। 'এদিকে এসে শেষ হয়েছে উত্তর দিকের দেয়াল। স্রোতের কারণে কাদা কম। দেয়ালের বেশিরভাগ অংশ দেখছি।'

কিলার-ওয়েইলডোযারের স্ক্রিনে মনোযোগ দিল ওরা। মন্দিরের উত্তর দিকে গামলার মত এক জায়গা। মনে হলো, মস্ত কোনও চামচ দিয়ে তুলে নেয়া হয়েছে প্রচুর কাদা। 'আরও

কাছে যেতে পারবেন?' জানতে চাইল লাবনী।

'সমস্যা নেই। যাচ্ছি ওদিকে।'

গামলার মত জায়গার উদ্দেশে রওনা হলো ওয়েস্টকট, কিন্তু তাতে লাগল সময়। কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর মন্দিরের দেয়ালের কয়েক ফুট ওপরে থামল সে। 'সোনার রিডিং নেব,' বলল তরুণ। 'একটু অপেক্ষা করুন।'

মনিটরে দেখা দিল এবড়োখেবড়ো গ্রাফ। অন্যরা না বুঝলেও ওটা কী, ভাল করেই জানে সাবমারসিবলের পাইলট ও রানা। 'সেডিমেন্টের নিচে বা ওপরে কিছু আছে,' বলল রানা।

'হয়তো দেয়ালে কোনও গর্ত,' বলল ওয়েস্টকট।

'দাপুটে রাক্ষসকে কাজে নামাবে?' জানতে চাইল বেন্টসেন।

'হয়তো পরে, দ্য সায়েন্টিস্ট, আপনারা অনুমতি দিলে সরাতে শুরু করব সেডিমেন্ট।'

লাবনীর দিকে তাকাল সেসিলি।

জবাবে মাথা দোলাল উত্তেজিত লাবনী।

এবার বোধহয় খুলবে মন্দিরে ঢোকার পথ!

'কাজে নামুক কিলার-ওয়েইলডোযার।'

সাবমারসিবলের গতি অত্যন্ত ধীর বলে মনে হলো ওদের। টেবিলে বসে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে লাবনী। এদিকে মন্দিরের কাছে কিলার-ওয়েইলডোযারকে নিল ওয়েস্টকট। সাবধানে উত্তর-পুব থেকে অন্তত এক শ' গজ দূরে রাখল পাম্প মডিউল, লেজ থাকল স্রোতের ভেতর। অ্যাডভেঞ্চারের লিডার ডিসপ্লে দেখিয়ে দিল, মাদার শিপ কিলার-ওয়েইলডোযার থেকে বহু দূরে টিউব। আবারও আগের জায়গায় ফিরল কিলার-ওয়েইলডোযার। থামল উত্তর দিকের দেয়ালের ওপরের পানিতে। পুরো কাজটা করতে গিয়ে পেরিয়ে গেল পুরো বিশ মিনিট

'এবার আপনারা অনুমতি দিলেই সত্যিকারের কাজ হাতে নেব, দ্য সায়েন্টিস্ট,' জানাল ওয়েস্টকট।

'কাজ শুরু করুন,' চাপা স্বরে বলল লাবনী।

নড়ে উঠল পাম্প। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভ্যাকিউয়াম ক্লিনারের মত মস্ত হাঁ করে কাদা ও বালি গিলতে লাগল কিলার-ওয়েইলডোযার। প্রচণ্ড জোরে কাদা-মাটি ও বালি তুলছে না, কিন্তু ওই গতি কমও নয়। পাইপের মাঝ দিয়ে এক শ' গজ দূরে গিয়ে আরেক দিকে পড়ছে ভারী আবর্জনা। স্রোতের সঙ্গে মিশতে লাগল কাদামাটি ও বালি, মন্দির থেকে অনেক দূরে সাগরে তৈরি হলো কালচে মেঘ। সবাই ভেবেছিল, খুব জটিল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু চোখের সামনে দেখল, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কাদা।

ধীর গতি তুলে পেরিয়ে গেল আরও দশ মিনিট। একপাশ থেকে ছবি পাঠাল অ্যাডভেঞ্চার। দেয়াল থেকে এদিক ওদিক সরে ময়লা তুলছে কিলার-ওয়েইলডোযার। প্রতিবার ঘুরে এসে একই জায়গায় ফিরলে তখন বোঝা গেল, ওই জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে আগের কাদার স্তর। অনেকক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ বলে উঠল অস্ট্রেলিয়ান গবেষক, 'এদিকে কিছু দেখছি!' নির্দিষ্ট দিকে ক্যামেরা তাক করল সে।

সাগরের পানিতে ভেসে সরছে কাদা। তবুও দৃশ্যটা পরিষ্কার। বুকের ভেতর মস্ত লাফ দিল লাবনীর হৃৎপিণ্ড। 'প্রবেশদ্বার বলে মনে হচ্ছে!'

দেখা গেল দূরের আঁধারে মিলিয়ে গেছে পাথুরে এক প্যাসেজওয়ে। কতটা বড় বা ছোট, আন্দাজ করা কঠিন। কিন্তু আটলান্টিসের মন্দির ব্রাযিলের জঙ্গলের ওই মন্দিরের সমান হলে, ফটক হওয়ার কথা বড়জোর চার ফুট চওড়া।

'দ্বিতীয় ভ্যাকিউয়াম ব্যবহার করব ড্রেজ করতে,' বলল

ওয়েস্টকট। 'সেজন্যে সময় দিতে হবে আমাকে কয়েক মিনিট।' সামনে বেড়ে গেল কিলার-ওয়েইলডোযারের বাহু। কিন্তু শেষ দিকের বালতি ব্যবহার না করেই পেছন থেকে পাঠানো হলো সরু এক ধাতব পাইপ। ওটার মাধ্যমে প্যাসেজের ভেতরের কাদামাটি ও বালি শুষে নিতে লাগল পাম্প।

মনোযোগ দিয়ে ত্রিমাত্রিক ডিসপ্লে দেখছে রানা। লাবনীর উদ্দেশে বলল, 'সত্যি ব্রাযিলের মন্দিরের মত হলে, ওই প্যাসেজ ধরে গেলে পৌঁছুনো যাবে বেদি-ঘরে। ব্রাযিলে পেছনের দিকেও প্যাসেজ বা শাফট ছিল। বুজে গিয়েছিল পাথর ধসে।'

'ছিল?' রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'তুমি তো বলোনি!'

'সময় ছিল না, তখনই পালাতে শুরু করি আমরা।'

'ওটা নিশ্চয়ই যাজকের বেরিয়ে যাওয়ার গোপন-পথ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল সেসিলি।

আরও বেশ কয়েক মিনিট ব্যস্ত হয়ে কাজ করল ওয়েস্টকট, তারপর পিছিয়ে নিল যান্ত্রিক বাহু। 'সাধ্যমত পরিষ্কার করেছি। বেন্টসেন, এবারের কাজ আমাদের দাপুটে রাক্ষসের।'

কিলার-ওয়েইলডোযার নিয়ে পিছিয়ে গেল ওয়েস্টকট, এদিকে নিজের সাবমারসিবল নিয়ে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছে গেল বেন্টসেন। উত্তর দিকের দেয়ালের গর্তে থামল সে। পযিশন নেয়ার পর বলল, 'দ্য সায়েন্টিস্ট, এবার রওনা হবে রোভ।'

সবার চোখ অ্যাডভেঞ্চারের ত্রিমাত্রার ডিসপ্লেতে। ভুতুড়ে সবুজ লিডার সিস্টেমের দৃশ্য বিদায় নিতেই দেখল, স্বাভাবিক রঙের ভিডিয়ো ইমেজ। খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে এল দাপুটে রাক্ষস, রওনা হয়ে গেল মন্দির লক্ষ্য করে। ওর মার মত লেসার ইমেজিং সিস্টেম নেই, যদিও আছে স্টেরিয়োস্কোপিক ক্যামেরা। দাপুটে রাক্ষস করিডোরে ঢোকার পর ওদের মনে হলো,

রোবটের এগিয়ে যাওয়ার গতি অস্বাভাবিক দ্রুত।

'গতি এত বেশি কেন?' অবাক হলো লাবনী।

'ক্যামেরার কারণে এমন মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল দাপুটে রাক্ষস। মেঝেতে এখনও অন্তত একফুট গভীর কাদা। তবে রোভের জন্যে যথেষ্ট পথ তৈরি করে দিয়েছে ওয়েস্টকট। দম আটকে আসা একটা পরিবেশ হলো জাহাজের ল্যাব রুমে। এগিয়ে চলেছে রোভ।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে গেল।

সামনে পাথুরে দেয়াল।

'হায়, আল্লা!' হতাশ হয়ে বলল লাবনী। 'কানাগলি?'

বামে ঘুরল রোভ, তারপর ডানে। স্পটলাইটে দেখা গেল নিরেট সব পাথুরে দেয়াল। 'এবার কী করতে বলেন?' জিজ্ঞেস করল বেণ্টসেন।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে বলবে লাবনী, কিন্তু রানা বলে উঠল, 'বেণ্টসেন, রানা বলছি। দেখুন তো, সরাসরি ওপরে উঠতে পারে ওটা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

'তা-ই করুন।'

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল দ্বিধায়, তারপর সাবধানে ছাতের দিকে চলল রোভ।

এগিয়ে চলেছে যন্ত্র।

হঠাৎ 'আরেহ্!' বলে উঠল বেণ্টসেন। ওপরে উঠতে উঠতে পাশের দেয়ালের ছবি দেখাচ্ছে দাপুটে রাক্ষস। 'আপনি জানলেন কী করে যে ওখানে ওটা থাকবে?'

'আন্দাজ,' বলল রানা। ওর দিকে চেয়ে আছে লাবনী ও সেসিলি। 'সাবধান হোন। যাওয়ার পথে ফাঁদ থাকতে পারে।'

'বারবার মনে হচ্ছে, গত এগারো হাজার বছর ধরে নিয়মিত

মন্দিরের দেখভাল করেছে কেউ,' মন্তব্য করল লাবনী।

'হতে পারে, খুব বাজে মানুষ এই জলপরীরা,' হাসল রানা।

আবারও স্ক্রিনে মনোযোগ দিল ওরা। ক্যামেরা তাক করেছে বেণ্টসেন। সোজা ওপরে গেছে শাফট। 'কী যেন দেখা যাচ্ছে,' বলল সে। দ্রুত নিচে যাচ্ছে শাফট। দূরে চকচক করছে কী যেন।

হঠাৎ দিগন্তের দিকে সমান্তরাল হলো ক্যামেরা। স্ক্রিনে দেখা গেল একদিকের দেয়াল। 'বেণ্টসেন!' শ্বাস আটকে বলল লাবনী, 'কী হলো? কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছেন?'

'এক সেকেণ্ড...' ধীরে ধীরে ঘুরল রোভ। কাঁপছে দৃশ্য। দেয়াল ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। 'ঠিক আছে। আর যেতে পারবে না দাপুটে রাক্ষস।'

'পারবে না মানে?' রেগে গেল সেসিলি। 'কোনও কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে? নষ্ট হয়ে গেছে রোভ?'

মৃদু হাসল বেণ্টসেন। 'তা নয়। সমস্যা হচ্ছে, দাপুটে রাক্ষসকে তৈরি করা হয়েছে পানিতে কাজ করতে। এবার অন্য কোনও উপায় বের করে মন্দির অভিযান চালাতে হবে।'

'কেন কাজ করতে পারবে না রোভ?'

'কারণ, সাগরতল নেমে গেছে নিচে। মন্দিরের ভেতরের পানিতে ভাসছে এখন দাপুটে রাক্ষস। ওখানে বদ্ধ পরিবেশে আটকা পড়েছে হাজার হাজার বছরের পুরনো বাতাস।'

একুশ

আবারও সাগরের বুকে ভেসে উঠেছে সাবমারসিবল দুটো। তুলে নেয়া হলো জাহাজে কিলার-ওয়েইলডোযারকে, কিন্তু পানিতে রয়ে গেল অ্যাডভেঞ্চার। অবশ্য ওটার সঙ্গে থাকল কেবল, ওটা রিচার্জ করবে ব্যাটারি।

আবারও ডাইভের জন্যে প্রস্তুতি চলছে। এবার শুধু রোবট দিয়ে অনুসন্ধান করা হবে না, নামবে ওরা তিনজন গভীর সাগরে।

'আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুব ভাল লাগত,' বলল লাবনী। সাগরে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা, সেসিলি ও মউরোস।

'পরেরবার সুযোগ পাবে,' ঠাট্টা করল রানা। ওর মাথায় হেলমেট বসিয়ে দিল এক ক্রু।

নতুন ডিযাইনের ডিপ সুট পরেছে ওরা। জিনিসটা সাধারণ স্কুবা ডাইভিং সুটের মতই, কিন্তু রোবোটিক। গভীর পানিতে অনেক সময় নিয়ে থাকতে পারবে ওরা। সাধারণ নিওপ্রেন রাবারের ড্রাই সুট, কিন্তু মাথা ও শরীরে জায়গায় জায়গায় রিঙের জোড়া। উরু, কাঁধ, গোড়ালি ও কবজিতে শক্তি দেবে ওগুলো।

স্কুবা ডাইভিঙের শেষসীমায় পৌঁছে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ নামবে ওরা অন্তত আট শ' ফুট। ফলে ওদের দেহের ওপর পড়বে পানির কমপক্ষে পঁচিশ গুণ চাপ। সর্বক্ষণ সুটের ভেতর থেকে সমান পরিমাণের বাতাসের চাপ চাই, নইলে

চ্যাপটা হবে ওদের ফুসফুস। বাতাস প্রেশারাইয করার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে মারাত্মক বিপদে থাকবে রানারা। কমপ্রেস্ড্ গ্যাস রক্তে মিশে যাওয়ার পর আবারও ডাইভার উঠে আসতে চাইলেই চাপ কমবে ওই গ্যাসের। রক্তে সৃষ্টি করবে নাইট্রোজেন বুদ্বুদ। বেশি দ্রুত উঠলে ওই গ্যাস তৈরি করবে প্রচণ্ড ব্যথা, ক্ষতি হবে দেহের কোষের। ফলাফল মারাত্মক—ভয়ঙ্কর, কষ্টকর মৃত্যু।

ডিকমপ্রেশন সিকনেস চাইছে না রানা বা অন্য দু'জন।

অবশ্য, ওদের সুটে আছে বিপদ এড়াবার উপায়। নতুন সুট রক্ষা করবে কচ্ছপের খোলসের মত, বাইরের চাপ ঠেকাবে, কিন্তু সেজন্যে বেশি নাড়তে হবে হাত-পা। সোজা [illegible]য়, খরচ করতে হবে দৈহিক শক্তি। মনে রাখতে হবে, ও[illegible] যত বেশি গভীরে থাকবে, ততই বাড়বে বেণ্ডের ঝুঁকি।

'ভিডিয়ো ক্যামেরায় আমাদেরকে দেখতে পাবে,' লাবনীকে বলল সেসিলি।

'নিজে সঙ্গে যাওয়া অন্য কথা,' হতাশ সুরে বলল লাবনী।

'চিন্তা করবেন না,' বলল মউরোস, 'আমরা আপনার জন্যে ধরে আনব একটা জলপরী।'

'হায়, আল্লা! ভুলেও মন্দিরের কিছু সরাবেন না,' আঁৎকে উঠে বলল লাবনী। 'মনে রাখবেন, আর্কিওলজিকাল সাইট ওটা।' রানার দিকে ফিরল। 'সত্যি কি উচিত হচ্ছে সঙ্গে করে বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়া?'

'ওপরের প্যাসেজ বন্ধ থাকলে কাজে লাগবে,' বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না, উড়িয়ে দেব না তোমার মন্দির।'

'আশা করি কোনও ক্ষতি হবে না।' রানার হেলমেটে টোকা দিল লাবনী। 'কেমন লাগছে এটা পরে?'

'মনে হচ্ছে মাথায় চেপে বসেছে সিন্দাবাদের জিন, ওজন

অতিরিক্ত বেশি।'

'আসলেই,' নিজ দেহের হলদে খোলসের মত পোশাক দেখল মউরোস। 'মনে হচ্ছে আমাকে আটকে দিয়েছে ইঁদুরের খাঁচায়।'

পোশাকের কোমরে হাত রাখল সেসিলি। 'রানি ভিক্টোরিয়ার আমলের মহিলারা বোধহয় এমন কষ্টেই থাকত।'

'আর সেই দুঃখেই লাফিয়ে পড়ত টাইটানিক থেকে,' বলল মউরোস।

'ওটা ভিক্টোরিয়ান সময় ছিল না, এডওয়ার্ডিয়ান,' বলল রানা।

'নরকে গিয়ে মরুক,' বিড়বিড় করল মউরোস। সুটে শেষ ক্লিপ আটকে দিচ্ছে দুই ক্রু। নড়ে উঠে বলল মার্সেনারি, 'এবার মাফ করে দেয়া যায় না আমাকে?'

'কাজ শেষ,' বলল এক ক্রু।

'দারুণ লাগছে আপনাকে দেখতে,' বলল সেসিলি।

'খুনের জন্যে তৈরি, তা-ই না?' নড়েচড়ে দেখল মউরোস। 'ঠিক আছে, মরতেই যদি হয়, আপত্তি নেই।'

'সাগরের নিচে হেলিকপ্টার নেই, চিন্তা কীসের,' বলল রানা।

'কিন্তু হেলিকপ্টার না থাকলেও পানির নিচে রয়ে গেছে তার খালাতো ভাই সাবমারসিবল,' আপত্তি তুলল মউরোস।

ওর হেলমেটে চাটি মারল রানা। 'এবার ভদ্রলোকের মত নেমে পড়ো পানিতে।'

অ্যাডভেঞ্চারের পেছনের বাম্পার ধরে তৈরি হলো ওরা, কয়েক সেকেণ্ড পর সাবমারসিবলের সঙ্গে তলিয়ে গেল সাগরে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড জাহাজের পাশ থেকে ওদেরকে দেখল লাবনী, তারপর প্রায় দৌড়ে ফিরল ল্যাব রুমে। রানার সুটের

ডান কাঁধের ক্যামেরা অ্যাডভেঞ্চারের ফাইবার-অপটিক লিঙ্কের মাধ্যমে স্ক্রিনে দেখাচ্ছে সাগরতল। আমবিলিকাল ঠিকভাবেই জাহাজে পৌঁছে দিচ্ছে সব দৃশ্য। হেডসেট পরে নিল লাবনী। 'সেসিলি-রানা! দেখছি তোমাদেরকে!'

সুট পরা একজন হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে।

'ডাইভার্স, কমিউনিকেশন চেক,' পাশের মনিটরের মাধ্যমে বলল ওয়েস্টকট। 'মিস্টার রানা?'

'লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার,' বলল রানা। মনে হলো অনেক দূর থেকে এল ওর কণ্ঠ।

'মিস ডেনিয়েলসন?'

অস্পষ্ট শোনাল সেসিলির কণ্ঠ: 'সবই শুনছি, কিন্তু মাঝে তৈরি হচ্ছে অনেক খড়-মড় আওয়াজ।'

'একই অবস্থা আমারও,' জানাল মউরোস।

'এসব ট্র্যান্সমিটারের রেঞ্জ কত?' জানতে চাইল জিম করেলি। সাবমারসিবলের সঙ্গে সংযুক্ত রানার কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার, কেবলে জড়িয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে পানির নিচে রেডিয়ো লিঙ্ক ব্যবহার করছে সেসিলি ও মউরোস। যে-কারণে ওদের জন্যে জীবন্ত রিলে স্টেশন হয়ে উঠেছে রানা।

'বড়জোর পনেরো মিটার,' বলল ওয়েস্টকট, 'আসলে নির্ভর করে পানির লবণ কতটুকু তার ওপর। লবণ বেশি হলে হ্রাস পায় সিগনাল। তখন বড়জোর যোগাযোগ করা যাবে দুই বা তিন মিটার দূরে।'

'তোমরা দয়া করে পরস্পরের কাছাকাছি থেকো, ঠিক আছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে বলল লাবনী। ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল সেসিলি।

আগের চেয়ে ধীর গতি তুলে নামছে সাবমারসিবল। কিন্তু সাইটের ঠিক ওপরে জাহাজ স্থির করেছেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড।

ফলে দূরত্ব গেছে কমে। চট্ করে পৌঁছে যেতে পারবে ওরা সাগরতলে। একটু পরেই লিডার ডিসপ্লেতে দেখা দিল মন্দির।

'ডাইভার্স?' বলল ট্রুলি, 'এক্সকেভেশনের কিনারায় আগের জায়গায় থামব।'

রানার ক্যামেরার দৃশ্য দেখছে লাবনী।

অ্যাডভেঞ্চারের দেহে জ্বলছে বেশ কয়েকটি স্পটলাইট। এত আলো ব্যবহার করে না সাধারণ সাব। কালো সাগরের পটভূমিতে আলোয় ঝিকমিক করছে মন্দির। সাবমারসিবলের থ্রাস্টারের কারণে ছোট সব ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে বালিতে।

'দ্য সায়েন্টিস্ট,' বলল বেন্টসেন। 'আমরা নিরাপদে পৌঁছে গেছি। ডাইভার্স, গুড লাক!'

টিউবের মত বাম্পার ছেড়ে সাগরের মেঝেতে নামল রানা। ওকে অনুসরণ করল সেসিলি ও মউরোস। 'ঠিক আছে, এবার রেডিয়ো চেক।'

'শুনতে পাচ্ছি,' বলল সেসিলি।

'রেডিয়ো ঠিক আছে,' বলল মউরোস। পরক্ষণে আপত্তির সুরে বলল, 'কিন্তু পিঠে শুরু হয়েছে ভয়ঙ্কর চুলকানি। আমার বোধহয় ফিরেই যাওয়া উচিত জাহাজে। খসখস করে...'

'সেক্ষেত্রে প্যাসেজ পেরিয়ে মন্দিরের হাজার কোটি টাকার সোনাদানা দেখতে পাবে না,' হেঁটে দেখল রানা। ফ্লিপার পরা পায়ের কারণে উড়ছে বালি ও কাদা। সুটের কারণে নিউট্রাল বয়্যান্সি পেয়েছে, কিন্তু শক্ত সব জোড়ার কারণে চলা কঠিন। সামনে বাড়তে গেলেই বাধা হয়ে উঠছে সাগরের পানি। 'নাহ্, হেঁটে যাওয়া যাবে না। তার চেয়ে থ্রাস্টার ব্যবহার করাই ভাল।'

সাগরতল ছেড়ে সাঁতারের ভঙ্গিতে ভেসে উঠল রানা। ওকে অনুসরণ করল সেসিলি ও মউরোস। সুটের বুকে কন্ট্রোল স্টিক ধরে থ্রাস্টার চালু করল ওরা। এবার ভাসতে ভাসতে রওনা হবে

মন্দিরের উদ্দেশে।

‘খুব কাছে থাকবে,’ নির্দেশ দিল রানা। ‘কোনও বিপদ, বা কমিউনিকেশনের সমস্যা হলে সোজা ফিরবে সাবমারসিবলের কাছে। অপেক্ষা করবে অন্যদের জন্যে। বেশ, চলো এবার।’

লাঠি সদৃশ স্টিকের ডগায় বাটন টিপল রানা। শেষমাথায় ঘুরতে লাগল ছোট ফ্যানের মত পাখা। সহজ কায়দায় সুটের কেসিঙে বসানো হয়েছে থ্রাস্টারের কন্ট্রোল। যন্ত্রটায় আছে তিনমাত্রার স্পিড বাটন। এসব বাটন গতি অনুযায়ী টেনে নেবে ডাইভারকে। আরেকটা বাটন পিছিয়ে নেবে তাকে। স্টিকের ডগার বাটন থেকে হাত সরিয়ে নিলেই দেরি না করে থামবে মোটর। সবচেয়ে কম গতির বাটন ব্যবহার করে সামনে বাড়ল রানা। কয়েক সেকেণ্ডে বুঝে গেল, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে ওর। এবার মধ্যম গতির বাটন ব্যবহার করল। সাবমারসিবলের সঙ্গে রানার ফাইবার অপটিক কেবল আছে বলে, মাকড়সার ঝুলের মত অতি সরু তার পিছু নিল ওর।

রানার সমান গতি বজায় রাখল মউরোস। ‘কাজটা খুব সহজ!’ সামান্য দূরত্বেও বিকৃত শোনাল ওর কণ্ঠ। ‘কেন যে এত বছর ধরে বোকার মত সাঁতার কাটলাম! হাত-পা নাড়ব না, কিন্তু কেমন চলে যাচ্ছি যেদিকে খুশি!’

‘সামনের দেয়ালে গুঁতো মেরে মাথা ফাটিয়ো না,’ বলল রানা। ‘সেসিলি, তুমি ঠিক আছ?’

ওকে পাশ কাটিয়ে গেল সেসিলি। ‘তুমি বোধহয় জানো না, রানা, এসব সুট ডিযাইনের সময় ওদেরকে সাহায্য করেছি। আর্কিওলজি বা আর্কিটেকচার ছাড়াও আরও হবি আছে আমার।’

‘তাই?’ মন্দিরের অনেক কাছে চলে এসেছে রানা। ‘এবার কমিয়ে আনো গতি।’

‘রানা, সাগরতল ছাড়া আর কিছুই দেখছি না,’ রেডিয়োতে

নালিশ করল লাবনী। 'মন্দিরের কত কাছে তোমরা?'

কণ্ট্রোল স্টিক ছেড়ে সোজা হয়ে ভাসল রানা। কাঁধের ক্যামেরা তাক করেছে প্রাচীন দালানের ওপর। 'খুব কাছে। এবার দেখতে পাচ্ছ?'

অবাক মনে হলো লাবনীর কণ্ঠ: 'হ্যাঁ!'

কাদা থেকে ওঠা ঢালু দেয়াল মাত্র দশ ফুট দূরে। মাছের মত ভেসে না গিয়ে সাগরতলের বালিতে নামল রানা, মউরোস ও সেসিলি। ওদের স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, দেয়ালে খোদাই করা ঝিকমিকে অরিচালকাম। মন্দিরের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মাছ, পাত্তাও দিচ্ছে না অতীতের প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী পসেইডন দেবতাকে।

'কোথা দিয়ে যেন ঢুকতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনার বামদিকে, আন্দাজ ছয় গজ দূরে,' জানিয়ে দিল বেণ্টসেন।

নির্দিষ্ট দিকে চলল তিনজনের দল। রানা ও সেসিলির হাতে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট, এ ছাড়া রয়েছে সুটের বাতি। একবার কাঁধের ওপর দিয়ে অ্যাডভেঞ্চারকে দেখল রানা। জ্বলজ্বল করছে ওটার স্পটলাইট। দপদপ করছে স্ক্যানিং লেসার। তবে কাদা ভরা ঘোলা পানিতে প্রায় দেখাই গেল না সাবমারসিবল।

'ওই যে!' সেসিলির বাতি দেখিয়ে দিল প্যাসেজের মুখ।

সাধ্যমত কুঁজো হয়ে করিডোরে আলো ফেলল রানা। সামনে সরাসরি ওপরে ওঠেনি করিডোর। রোভের ক্যামেরার কারণে আগে মনে হয়েছিল, বহু দূর গেছে ওটা। 'ঠিক আছে, আমি সামনে যাব। আমার পর মউরোস। ইকুইপমেন্ট বেল্ট থেকে দড়ি নিয়ে আমার সুটের পেছনে আটকে নাও বাঁক নেয়ার পর শাফট বেয়ে সবাই মিলে উঠতে না পারলে, টেনে বের করে নেবে আমাকে।'

দড়ি আটকে টান দিয়ে দেখল মউরোস। সবই ঠিক আছে। পরীক্ষা করল কমিউনিকেশন লাইন। জড়িয়ে যায়নি ওসব। 'অত মাংস না খেয়ে ফলমূল খেলে কোথাও আটকে যাওয়ার ভয় থাকত না তোমার,' রানার উদ্দেশে মন্তব্য করল মউরোস।

'কচকচ করে আপেল আর অন্যসব ফল খেয়ে চিঁছড়ে থেকে কী লাভ তোমার?' আপত্তির সুরে জানতে চাইল রানা।

'বুঝবে! যখন দেখবে আমি বেঁচে আছি দেড় শ' বছর ধরে!'

'একটা বন্ধুকেও পাবে না পাশে,' হুমকি দিল রানা।

'শালা বলে কী!' আঁৎকে উঠল মউরোস। 'তা হলে তো খামোকা বেঁচে থাকা।'

রানাকে সাঁতারের ভঙ্গিতে তুলে ধরল অন্য দু'জন। তাড়া দিল মউরোস, 'এবার গর্তে সাপের মত ঢুকে পড়ো, বাপু!'

ডানহাতে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে প্যাসেজে ঢুকল রানা। কম গতি তুলে চালু করল থ্রাস্টার। পেছনে পড়তে লাগল দেয়াল। সাধারণ কোনও চার ফুট চওড়া করিডোরে এগিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু মোটাসোটা, ভারী সুট কঠিন করে তুলল কাজটা।

যদিও বেশিক্ষণ লাগল না করিডোরের শেষমাথায় পৌঁছতে। শরীর চিত করে শাফটের ওপরে আলো পাঠাল রানা। কূপের মত জায়গাটার শেষ দিকে ঘুটঘুটে কালো আঁধার। রেডিয়োতে জানিয়ে দিল, 'শাফটে আছি।'

'শাফট?' উত্তেজিত স্বরে বলল লাবনী, 'উঠতে পারবে?'

রওনা হয়ে সংকীর্ণ বাঁকের দেয়ালে ঘষা লাগল রানার হেলমেট। খুব সাবধানে জটিল জায়গা পেরিয়ে বলল, 'সমস্যা কেটে গেছে। দেখা যাক ওপরে কী আছে।'

আবারও থ্রাস্টার ব্যবহার করল রানা। নীরবে ওকে এগিয়ে নিয়ে চলল পাখা। এই শাফট কমপক্ষে তিরিশ ফুট উঁচু। খাড়া উঠেছে চার দেয়াল। কিছুক্ষণ পর প্রায় পৌঁছে গেল আঁধার

জগতে। আরেকটু ওপরে উঠেই থেমে গিয়েছিল দাপুটে রাক্ষস। এরপর ছিল মস্ত কোনও ঘর। ওখানে আটকা পড়েছে হাজারো বছরের বদ্ধ বাতাস।

দু' সেকেণ্ড পর পানি থেকে মাথা তুলল রানা। ফেসপ্লেট বেয়ে দরদর করে নামল জলস্রোত। উজ্জ্বল আলোয় দেখল ছয় ফুট ওপরে শেষ হয়েছে শাফট। তার ওদিকে ঘুটঘুটে আঁধার।

ইকুইপমেন্ট বেল্টে ফ্ল্যাশলাইট আটকে নিল রানা, অন্যান্য জিনিস থেকে নিল গ্র্যাপলিং গান। ওটা গ্যাস পাওয়ার্ড। শাফটে কর্কের মত ভাসতে ভাসতে ওপরের দক্ষিণ দেয়াল লক্ষ্য করে গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ল রানা।

বদ্ধ জায়গায় গ্যাসের জোরালো 'থুম্ব!' আওয়াজ উঠল। ওপরে ছুটে গিয়ে পাথরে বাধা পেল গ্র্যাপলিং হুক। কন্ট্রোল ব্যবহার করে গুটিয়ে নিল রানা কেবল। কয়েক সেকেণ্ড পর কীসে যেন আটকে গেল হুক। কয়েকবার টেনে দেখল রানা। খসে আসছে না জিনিসটা। এবার সুটের স্ট্র্যাপে আটকে নিল কেবল। বাটন টিপে উঠতে লাগল ওপরে। ওজন নিতে গিয়ে আপত্তি তুলছে শক্তিশালী মোটর।

কয়েক সেকেণ্ডে মন্দিরের মেঝের সমান হলো ওর মাথা।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল লাবনী। পরিষ্কার দেখছে ভিডিয়ো ফিড। চোখ সরাতে পারছে না। সত্যি বেদি ঘরে পৌঁছে গেছে রানা। ব্রাযিলের মন্দিরের মতই সব গুছিয়ে রাখা।

তবুও আটলান্টিসের পসেইডনের সত্যিকারের মন্দির নানান দিক থেকে বিস্ময়কর। লো-রেযোলুশন ভিডিয়োতেও দেখা গেল, ঝিকমিক করছে অরিচালকাম, সোনা, রুপা ও দেয়ালের হীরা, জেড ও অন্যান্য অমূল্য পাথর।

'সর্বনাশ!' দম আটকে ফেলল করেলি। 'অবিশ্বাস্য! আমার ভুল না হয়ে থাকলে, এসব দিয়ে ভরা পুরো মন্দির!'

'শুধু যে নিপুণ হাতে তৈরি মন্দির, তা নয়, ব্যবহার করেছে হাজার কোটি টাকার সম্পদ! দেখেছেন, কেমন করে সাজিয়ে দিয়েছিল প্রিয় দেবতার মন্দির!'

'হ্যাঁ...' চুপ হয়ে গেল জিম করেলি।

'রানা, কোনও দেয়ালের কাছে যেতে পারবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'আগে উঠতে হবে মেঝেতে...' লাফিয়ে আরেক দিকে গেল রানার ভিডিয়ো ক্যামেরা।

কেবল গুটিয়ে শাফট থেকে উঠে এল রানা। 'যা ভেবেছি, এই শাফটের মতই ছিল ব্রাযিলের মন্দিরের ধসে যাওয়া শাফট। একইভাবে তৈরি দুই মন্দির। তবে এখানে দেয়াল ঢেকে দেয়া হয়েছে সোনা-রুপা-তামা আর দামি সব পাথরে। দেয়াল ঢেকে দিয়েছে অরিচালকামের পাত দিয়ে, কী যেন লেখা ওখানে।'

'আমাকে দেখতে দাও,' বলল লাবনী। নড়ে বসেছে নিজের চেয়ারে।

এক দিকের দেয়ালের সামনে থামল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল দেয়ালে। লাবনী বুঝল, ওখানে লেখা গ্লোযেল ভাষা, কিন্তু হাইরোগ্লিফিক্স সিম্বল নেই ব্রাযিলের মন্দিরের মত।

গোঁফ মুচড়ে নিয়ে স্ক্রিনে ঝুঁকে মনোযোগ দিল করেলি। 'ইন্টারেস্টিং। এদের সঙ্গে মিল আছে ইণ্ডিয়ানদের ভাষার। অনেক পরে বোধহয় ব্রাযিলে পাল্টে যেতে থাকে ভাষা। বা দুটো ভাষার ভেতর মিশ্রণ হয়েছে।'

'পুরো চেম্বার দেখাতে পারবে, রানা?' জিজ্ঞেস করল লাবনী। 'খুব ধীরে।'

দেয়াল থেকে সরে গেল রানা, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। ওর ক্যামেরা দেখিয়ে চলেছে মস্ত ঘরের দৃশ্য।

'থামো! থামো!' চমকে গিয়ে বলল লাবনী। কী যেন নজর

পড়েছে। 'সামান্য ডানে বাঁক নাও। হ্যাঁ। ওদিকটা ঠিকভাবে দেখাও।'

'বুঝলাম দাপুটে রাক্ষসের কেমন লেগেছিল,' বিড়বিড় করল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর সামনে বেড়ে বলল, 'কী দেখলে?'

'সবকিছু খুব নিখুঁত!' বলল লাবনী। 'আসলে এই ঘরের প্রতিটি দেয়ালে লিখে রাখা হয়েছিল আটলান্টিসের অতীত সব কাহিনি। সামনের দিকে লিখেছে সে-সময়ের বর্তমানের ঘটনা। তাও আজ অতীত। জানিয়ে দিয়েছে কী ঘটেছে দ্বীপ বা মানুষের। অরিচালকাম পড়তে চাইছি, আরও একটু এগিয়ে যাও দেয়ালের দিকে।' আগের ফিড থেকে পাওয়া ভিডিয়োর সঙ্গে বর্তমানের দৃশ্য মিলিয়ে দেখছে ও।

'আপাতত অপেক্ষা করতে হবে,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা। 'আগে ওপরে তুলব মউরোস আর সেসিলিকে। ওদের কাছেও ক্যামেরা আছে।'

দেয়াল-লিপি-পড়তে পারবে না বুঝে হতাশ হয়েছে লাবনী, বিশ্বাস করতে পারছে না, এগারো হাজার বছর ধরে লুকিয়ে আছে এত কাহিনি বা তথ্য! অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করল লাবনী।

এদিকে মউরোস ও সেসিলিকে তুলে আনতে ব্যস্ত হলো রানা। ভারী এক মূর্তি পেঁচিয়ে নিয়ে কেবল বেঁধে রেডিয়োতে বলল, 'এবার উঠে এসো তোমরা।'

'এবার আরেকবার ওদিকের দেয়াল দেখাবে?' জানতে চাইল লাবনী।

ঘুরে দেয়ালে খোদাই করা লেখায় আলো ফেলল রানা।

ওয়েস্টকটের উদ্দেশে বলল লাবনী, 'ভিডিয়ো ফ্রেম ফ্রিয করতে পারবেন?'

'পারব, রেকর্ডার ডিজিটাল। স্টোরেজ এক টেরাবাইট। সবই তুলে রাখা যাবে। কোন্ দৃশ্য স্থির করতে চাইছেন?'

'আমার সামনের সবচেয়ে বড় স্ক্রিনটা।'

'ত্রিমাত্রার ছবি পাবেন না।'

'তাতে কিছুই যায় আসে না।' কয়েক সেকেণ্ড পর আগের দেয়ালের লিখিত ভাষা দেখল লাবণী।

দৃশ্য ঝাপসা। জড়িয়ে গেছে রং। কিন্তু পড়তে পারল লাবনী অক্ষরগুলো। হয়ে উঠেছে চিন্তিত।

তখনই ব্যস্ত পায়ে ল্যাব রুমে ঢুকল এক ক্রু। 'ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড? আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে একটা জাহাজ।'

'জাহাজ?' চমকে গেলেন ক্যাপ্টেন। 'কতটা দূরে?'

'বড়জোর পাঁচ মাইল। প্রথম যখন দেখলাম, মনে হয়েছিল ওটা চলেছে লিসবনের দিকে। কিন্তু কয়েক মিনিট আগে দেখি, ওটা আসছে সরাসরি আমাদের দিকেই।'

'গতি কত?'

'কমপক্ষে ঘণ্টায় বারো নট, স্যর।'

'ডোনাটি লুক্কার জাহাজ?' ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডকে বলতে শুনল লাবনী। ঘুরে মানুষটার দিকে তাকাল ও।

'সম্ভবত, স্যর। ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে রওনা হওয়া জাহাজটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বর্ণনা।'

'সর্বনাশ!' ডানহাতে চিবুক ঘষলেন ক্যাপ্টেন। 'ঠিক আছে, সবাইকে জানিয়ে দাও, সামনে ভয়ঙ্কর ঝামেলা আসছে। ওই জাহাজ দুই মাইলের ভেতর এলে, বা বোট নামিয়ে দিলে, দেরি না করে সমস্ত অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকবে সবাই। আমি এখনই আসছি ব্রিজে।'

'ইয়েস, স্যর,' বলে ফিরতি পথ ধরল নাবিক।

কয়েক সেকেণ্ড পর তার পিছু নিলেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড।

'কী ঘটছে শুনেছ, রানা?' জানতে চাইল লাবনী। 'ওরা মনে করছে হাজির হয়ে গেছে ডোনাটি লুক্কার জাহাজ!'

'কী বললে?' অবাক সুরে বলল রানা।

ছোট মনিটরে ওকে শাফট থেকে সেসিলিকে তুলে আনতে দেখল লাবনী।

'ক্যাপ্টেন কী করবেন বলে ঠিক করেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'জানি না, বোধহয় লড়বেন,' বলল লাবনী। 'তার আগে দয়া করে দেয়ালের ছবি পাঠাও। ওই জাহাজ এখনও পাঁচ মাইল দূরে। দেরি আছে আসতে।'

'মাত্র পাঁচ মাইল?' চমকে গেছে রানা। 'ততক্ষণে সাগর সমতলে উঠে আসতে পারব না আমরা!'

'প্রয়োজন পড়লে সাব ফেলেই ভেসে উঠব আমরা,' রানাকে বলল সেসিলি।

শুনল বেন্টসেনের আপত্তি: 'বলেন কী! আমাদের এতজনের পরিশ্রম বৃথা হবে সাবমারসিবল হারালে!'

'প্রয়োজনে নতুন সাব তৈরি করে নেব,' পানির ভেতর পরিষ্কার ট্র্যান্সমিশন হলো। 'আসল কথা, মন্দিরের অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করা। দয়া করে চারপাশের ভিডিয়ো তুলুন। কিছুই যেন বাদ না পড়ে। আমিও তুলছি ছবি।'

'শুনলে, রানা?' আপত্তির সুরে বলল মউরোস।

'যতটা পারা যায় সময় দেব,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা।

স্ট্যাটিকের ভেতর দিয়ে এল মউরোসের কণ্ঠ: 'আমাকে কী করতে বলো?'

'তুমি অপেক্ষা করবে মন্দিরের বাইরে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় কোনও সমস্যা হলে সাহায্যে আসবে।'

'ঠিক আছে। তবে বেশিক্ষণ রয়ে যেয়ো না।'

আবারও দেয়াল-লিপির সামনে ফিরল রানা।

মেইন স্ক্রিনে রানার পাঠানো ইমেজ দেখল লাবনী, মন দিল

গোপন তথ্য পড়তে।

দ্য সায়েন্টিস্ট রিসার্চ ভেসেলের ফ্যানটেইলের নিচে হাজির হয়েছে এক ফ্রগম্যান। নাবিকরা দেখতে পায়নি তাকে। তার পাশে ভেসে উঠল আরও একজন। তারপর আরেকজন।

ফ্যানটেইলের তিরিশ ফুট নিচে, ঢেউয়ে ভাসছে তাদের মাণ্টা টো স্লেড। প্রতিটি জলযানে তিনজন করে ফ্রগম্যান। জাহাজের কাছে পৌঁছে যাওয়ায় মিনি সাব ত্যাগ করল তারা। অন্ধকার সাগরে তলিয়ে গেল মাণ্টা টো স্লেড। বোট ডক লক্ষ্য করে চলল লোকগুলো। একই জায়গায় থাকতে গিয়ে থ্রাস্টার ব্যবহার করছে জাহাজ। স্থির হয়ে আছে প্রপেলার।

সাবধানে মইয়ে চড়ল প্রথম লোকটা। ওপরে উঠে উঁকি দিল ডেকে। বিশ ফুট দূরে হেলিপ্যাডে এক ক্রু। আশপাশে কেউ নেই।

ফ্রগম্যানের হাতে হেকলার অ্যাণ্ড কচ এমপি-৭। খুলে ফেলল মোটা সাইলেন্সারের মুখের লাল রাবারেব সিল। নীরবে উঠে এল মইয়ের শেষ ধাপে। ট্রিগার টিপল সে। ধাতব বোল্টের আগুপিছুর সামান্য সড়াৎ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বুলেট বিঁধল নাবিকের বুকে। 'টুং!' শব্দে ৪.৬ মিলিটারের কেসিং যেন ডেকে না পড়ে সেজন্যে নেট লাগানো আছে ইজেক্ট চেম্বারের সঙ্গে। দু' সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে ডেকে এলিয়ে পড়ল লাশ। উঠে এসেছে ডেকে ফ্রগম্যান, কাভার নিতে বাল্‌ক্‌হেড লক্ষ্য করে ছুটে গেল। জাহাজের গায়ে ঢেউয়ের চাপড় ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই।

দ্য সায়েন্টিস্টে উঠে এল দ্বিতীয় আততায়ী।

আগের লোকটা মুখ থেকে মুখোশ খুলতেই দেখা গেল, জলদস্যুর মত কালো কাপড়ে বাঁধা তার একটা চোখ।

নিচু স্বরে বলল হেণ্ড্রিক ড্রেক, 'জাহাজ দখল করো!'

বেদি-ঘরে ধাতব লিপির ভিডিয়ো তুলছে রানা। ভারী সুট পরে নানানদিকে তাক করতে হচ্ছে ক্যামেরা। কাজটা কঠিন।

ব্রাযিলের মন্দিরের মতই এখানেও আছে প্রধান ঘর। সিঁড়ির সামনে পৌঁছে আবারও শাফটে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল রানা। নিচের পানিতে দেখা গেল দেয়াল ও ছাতের প্রতিচ্ছবি।

'কপাল ভাল, আমরা হেলমেট খুলিনি,' সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে ভিডিয়ো নিল রানা। 'বাইরের পানির প্রেশার কমপক্ষে পঁচিশ এটিএ, মন্দিরের ভেতরেও একই সমান হওয়ার কথা।'

'অর্থাৎ, মূল মন্দিরে পানি ঢোকেনি?' বলল সেসিলি।

'বাতাস আটকা পড়েছে বলে বেশিরভাগই শুকনো।'

'চারপাশ দেখতে পেলে ভাল হতো,' বলল সেসিলি। 'চিন্তা করা যায় না যে এত বছর ধরে টিকে আছে কোনও মন্দির।'

'সত্যিকারের দক্ষ কারিগররা তৈরি করেছে,' বলল রানা, 'তোমার কাজ কেমন এগোল?'

ব্যস্ত হয়ে ছবি তুলছে সেসিলি। 'অর্ধেক কাজ প্রায় শেষ।'

টানেলে রানার পেছনে হারিয়ে গেছে ফাইবার-অপটিক কেবল। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে ভাবছে মউরোস, দুর্ভাগ্য কাকে বলে, ওদের মন্দ সময়ে হাজির হয়েছে ডোনাটি লুক্কা এবং তার লোক! রানা আসলে ঠিক কথাই বলেছিল, ওদের দলেরই কেউ যোগাযোগ রেখেছে। কিন্তু কে সে বদমাস শয়তান?

অ্যাডভেঞ্চারের স্পটলাইট দূরে। ওর সুটের আলো পড়েছে পাথুরে দেয়ালে, সেদিকে চেয়ে থাকল মউরোস। আর তা-ই বুঝল না, ক্রমেই আলোকিত হয়ে উঠছে চারপাশ। বেণ্টসেনের সাবমারসিবলটা ছাড়াও সাগরের গভীরে হাজির হয়েছে অন্য

আরও সাবমারসিবল!

দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজের পাইলট হাউসে শক্তিশালী বিনকিউলার চোখে তুলে অগ্রসরমান জাহাজ দেখলেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড।

ওই ভেসেল এখনও তিন মাইল দূরে। ডিপ-সি সার্ভে শিপ, ফোরডেকের ক্রেনে সাবমারসিবল ঝুলছে না। বড় কোনও ভুল না হয়ে থাকলে ওই জাহাজ চার্টার করেছে ডোনাটি লুক্কা। কী করে যেন জেনে গেছে, এখানে আটলান্টিস খুঁজছে ড. আলম। বহু দূর থেকে ফুল স্পিড তুলে হাজির হয়েছে শত্রুদল। মাত্র কয়েক মিনিটে দুই মাইলের ভেতর পৌঁছবে। তখন বাধ্য হয়েই ধরে নিতে হবে, ওই জাহাজ হুমকিদাতা।

ওটা থেকে নামানো হয়নি বোট। অথচ, যোডিয়াক অনেক আগেই ভিড়তে পারত দ্য সায়েন্টিস্টের পাশে। ডোনাটি লুক্কা বোধহয় চাইছে এসে পাশে থামতে।

এ কারণেই বিস্মিত হতে হবে তাকে। দ্য সায়েন্টিস্ট নিরাপদ রাখতে নাবিকদের হাতে পি-নাইন্টি সাবমেশিনগান দিয়েছেন বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন। এ ছাড়া জাহাজে আছে দুটো ভারী মেশিনগান ও কয়েকটি রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড লঞ্চার। জাহাজ দখল করতে চাইলে, পাল্টা হামলার মুখে পালাতে হবে যে-কাউকে।

ওই দূরের জাহাজ থেকে নামানো হয়নি বোট। ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডের মনে হলো না, কোনও তোড়জোড় করছে তারা।

ক্রেনে সাবমারসিবল নেই। তা হলে ওটা এখন কোথায়?

হঠাৎ করে সবই বুঝে গেলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আগেই সর্বনাশ হলো। তিনি ইন্টারকমে কথা বলার আগেই দড়াম করে খুলে গেল পাইলট হাউসের দরজা।

সাবমারসিবল অ্যাডভেঞ্চারের স্ফিয়ারে কন্ট্রোল প্যানেলে টোকা মেরে বোল তুলছে ম্যাট বেন্টসেন। ত্রি-মাত্রা স্ক্রিনে দেখছে তলিয়ে যাওয়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারে জ্যাঁ মউরোস।

লিডার সিস্টেমের অসুবিধার কথা ভাবল সে। দৃশ্যের প্রায় কোনও রং নেই বলেই ম্যাড়ম্যাড়ে লাগে চারপাশ। এখন কিছুই নড়ছে না বলে বিরক্তিকর লাগছে আরও। মুখ তুলে মনিটর দেখল সে। ওখানে সাবমারসিবলের মেইন ভিডিয়ো ক্যামেরার দৃশ্য। সাগর ধূসর, কালো, সাদাটে... আকর্ষণ করার মত কিছুই নেই।

নাকি আছে?

আরে, কী হচ্ছে চারপাশে?

এইমাত্র ছোট্ট পোর্টহোলে চোখের কোণে কী যেন নড়ল।

কোনও মাছ?

না, অন্য কিছু। পাল্টে যাচ্ছে চারপাশের দৃশ্য...

বরফ এল কোত্থেকে?

বদলে যাচ্ছে আলো। অথচ স্পটলাইট সরিয়ে নেয়নি সে। নড়ছে না তার সাবমারসিবল...

'দ্য সায়েন্টিস্ট!' রেডিয়োতে বলল বেন্টসেন। 'হাজির হয়েছে আরেকটা সাব...'

খড়-মড় শব্দ তুলে থেমে গেছে হেডফোন, কমিউনিকেশন কন্সোলের লেড-এর প্রতিটি ইণ্ডিকেটর হয়ে গেল সবুজ থেকে লাল।

'দ্য সায়েন্টিস্ট! ডু ইউ কপি? কী হচ্ছে এসব?'

জবাব এল কয়েক সেকেণ্ড পর। ভোঁতা আওয়াজ হলো বেন্টসেনের সাবমারসিবলের ওপরের অংশে। লিডার টারেটের সামনের দিক ঢেকে গেল দীর্ঘ সাপের মত কিছু দিয়ে।

আমবিলিকাল। কেটে ফেলা হয়েছে ওটা!

পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে এল আরও আলো। খুব কাছে পৌঁছে গেছে অদৃশ্য শত্রু।

'সর্বনাশ!' খপ করে কন্ট্রোলে হাত রেখে মোটর চালু করল বেন্টসেন। নড়ে উঠেছে সাবমারসিবল। সাগরতলে বিস্ফোরিত হয়ে ছিটিয়ে গেল কাদা ও বালি। 'মউরোস! সাহায্য করুন! আমার ওপর হামলা হচ্ছে!'

কী যেন গুঁতো দিল ওর সাবমারসিবলে। কাত হয়ে পাশের দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেন্টসেন।

কর্কশ গুঞ্জন শুনে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ওর সুটের মাধ্যমে আওয়াজটা পৌঁছে গেল সেসিলির কানে। অবাক হয়ে বলল সে, 'কী হলো?'

হঠাৎ করেই বন্ধ হয়েছে দ্য সায়েন্টিস্টের সাগরতলের সব ফিড। কালো হলো কয়েকটা স্ক্রিন। অন্যগুলো গাঢ় নীল হয়ে বুঝিয়ে দিল, কোথাও কোনও সিগনাল নেই।

'হঠাৎ কী হলো?' অবাক হয়ে বলল লাবনী।

'এভাবেই শেষ হলো তোমার এক্সপিডিশন, বোকা মেয়ে!' ওর পেছন থেকে বলে উঠল কেউ।

চরকির মত ঘুরে তাকাল লাবনী। 'হেণ্ড্রিক ড্রেক!'

এক চোখ দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে ওকে দেখছে লোকটা। দু'পাশে ওয়েট সুট পরা কয়েকজন লোক। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত অস্ত্র। ঘরের সবাইকে কাভার করেছে তারা। 'উঠে পড়ো সবাই,' তাড়া দিল ড্রেক। 'সোজা গিয়ে থামবে ডেকের পেছনে।'

হেডসেটে আবছা আর্তচিৎকার শুনেই ঘুরল মউরোস, তখনই

দেখল ওদের সাবমারসিবলের ওপর হামলে পড়েছে আরেক সাবমারসিবল!

এইমাত্র সাগরতল ছেড়ে ভেসে উঠছিল বেণ্টসেনের অ্যাডভেঞ্চার, কিন্তু তখনই পাশ থেকে ওটাকে গুঁতো দিয়েছে আকারে ছোট এক সাধারণ সাবমারসিবল। ওটার আছে নিরেট স্টিলের খাঁচা, মাঝে বুদ্বুদের মত ককপিট। ধাক্কা খেয়ে আবারও সাগরতলে নেমে গেছে অ্যাডভেঞ্চার। প্রায় হারিয়ে গেল কাদা ও বালির ঘন মেঘের ভেতর।

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করল মউরোস। পরক্ষণে মাইকে বলল, 'রানা! শুনছ? সেসিলি!'

ওদিক থেকে কোনও জবাব এল না। ওর কথা রিলে করতে পারছে না ওদের সাবমারসিবল।

মেঘের ভেতর থেকে উঠে এল আক্রমণকারী সাবমারসিবল, বাঁক নিয়েই সরে গেল। পেছনে একগাদা বুদ্বুদ। জলযানের স্পটলাইট গিয়ে পড়ল নিচের সেডিমেণ্টের ভেতর কমলা রঙের ধাতুর ওপর।

আবারও অ্যাডভেঞ্চারের ওপর হামলা করবে, ভাবল মউরোস। কিন্তু তা না করে সামনে বাড়িয়ে দিল ম্যানিপুলেটর আর্ম। দুই আঁকশির মাঝে কী যেন ধরেছে। ওটা অ্যাডভেঞ্চারের কমাণ্ড স্ফিয়ারের পাশে। মনে হলো খুব সাবধানে কিছু রাখছে।

এবার খারাপ কিছু ঘটবে, বুঝে গেছে বেণ্টসেন। পোর্টহোলে দেখল, ওর সাবের ওপর ছায়া ফেলেছে শত্রুযান। পোর্টহোলের পাশ কাটিয়ে গেল ওটার ম্যানিপুলেটর আর্ম এক সেকেণ্ড পর শুনল, প্রেশার স্ফিয়ারের সঙ্গে ঘষা লাগল কীসের যেন!

নষ্ট করে দেয়া হয়েছে লিডার, ফলে ছোট্ট পোর্টহোল ছাড়া বাইরে দেখার উপায় নেই। আসলে প্রায় অন্ধ করে দিয়েছে

ওকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেটে গেছে কপাল, বামহাতে জায়গাটা টিপে ধরল বেণ্টসেন। দূর করতে চাইছে ভয়। অন্য হাতে কণ্ট্রোল নেড়ে চালু করতে চাইল থ্রাস্টার।

কিছুই ঘটল না। সাবমারসিবল পোক্তভাবে তৈরি করেছে ওরা, কিন্তু তখন ভাবেনি বাইরে থেকে হামলা আসতে পারে। এখন ইলেকট্রিকাল কণ্ট্রোল বোর্ড দপ-দপ করে দেখিয়ে চলেছে ওয়ার্নিং সিগনাল।

এবার কী করবে, ভাবল বেণ্টসেন। থ্রাস্টার চালু করতে রিসেট করবে ক্ষতিগ্রস্ত সার্কিট, অথবা থামিয়ে দেবে সাব-এর পেটের ভারী স্টিল ব্যালাস্টের ইলেকট্রোম্যাগনেট? সেক্ষেত্রে কাজ করবে ইমার্জেন্সি সিস্টেম, ওপরে রওনা হবে সাব। মাত্র কয়েক মিনিটে উঠে যাবে সাগর-সমতলে।

এর খারাপ দিক, ফেলে যেতে হবে তিন ডাইভারকে। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কী? লিডার সিস্টেম নষ্ট হওয়ায় অন্ধ হয়ে গেছে সে। বাইরে বাঘের মত খাপ পেতে আছে শত্রুযান। পোর্টহোল দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওটার উজ্জ্বল স্পটলাইট।

সিদ্ধান্ত নিয়ে সিটের পাশে লাল লিভার টানল বেণ্টসেন।

এইমাত্র ব্যালাস্ট স্ল্যাব ত্যাগ করেছে অ্যাডভেঞ্চার, আতঙ্ক নিয়ে দেখল মউরোস। সাগরতলে বোমার মত আওয়াজ তুলে নামল ভারী ওজন। চারপাশে মেঘের মত ছড়িয়ে গেল কাদা ও বালি। ওজন কমে যেতেই লাফিয়ে ওপরে রওনা হলো অ্যাডভেঞ্চার। নড়তে লাগল ওটার স্পটলাইট। সেই সঙ্গে চাবুকের মত রওনা হয়ে গেল ওদের ফাইবার-অপটিক লাইন।

'যাহ্!' হতাশ বোধ করল অসহায় মউরোস।

যেন কথা শুনতে পেয়েছে শত্রুযানের চালক!

ওর দিকে ঘুরে গেল সাব-এর স্পটলাইট। যেন জ্বলন্ত সব

চোখ। পিছিয়ে স্টিলের দেহ থেকে ঝুলন্ত র‍্যাকেটে ঢুকল ম্যানিপুলেটর আর্ম, তারপর আবারও সামনে বাড়ল যান্ত্রিক বাহু।

এবার ওই বাহুর ভেতর কী যেন।

এক সেকেণ্ড পর বুঝে গেল মউরোস। ওটা বোমা!

সাবলীল বেগে উঠছে অ্যাডভেঞ্চার, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ফিরে পেতে লড়ছে বেণ্টসেন। অকস্মাৎ চমকে গেল একটা শব্দ শুনে। পানির ভেতর গোঙাচ্ছে সাবমারসিবল, ওপরে ওঠার সময় এটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ওই আওয়াজ অন্যরকম।

ছন্দের মত। যান্ত্রিক। শব্দটার উৎস স্ফিয়ারের পাশে। ওখানেই খামচে ধরেছিল শত্রু সাবের বাহু।

ঘড়ির মত টিক-টিক আওয়াজ...

সত্যি কী ঘটছে, বুঝল না বেণ্টসেন, তার আগেই বিস্ফোরণ ঘটল সাবমারসিবলে। স্টিলের প্রেশার স্ফিয়ারে তৈরি হয়েছে এক ফুট চওড়া গর্ত। ছুটন্ত ট্রেনের মত প্রচণ্ড বেগে বেণ্টসেনের বুকে ধাক্কা লাগল পানির, মুহূর্তে খুন হলো তরুণ বৈজ্ঞানিক।

ভারী হেলমেট ও মন্দিরের পাথুরে পুরু দেয়াল থাকা সত্ত্বেও গম্ভীর, নিচু একটা গর্জন শুনল রানা। বুঝে গেছে কী ঘটেছে।

'আওয়াজটা কীসের?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

'পানির নিচে বিস্ফোরণ।'

'ভুল হচ্ছে না তো?'

'না।' আরও গম্ভীর হয়ে গেছে রানা। 'হয় পানি সমতলে দ্য সায়েন্টিস্টের ওপর একহাজার পাউণ্ডের বোমা পড়েছে, নয়তো উড়িয়ে দিয়েছে সাব।' নিজের সুটের দিকে তাকাল রানা। 'তার মানে... সর্বনাশ! সেসিলি, দেরি না করে কেটে দাও আমার কমিউনিকেশন লাইন!'

'সেক্ষেত্রে আর আলাপ করতে পারব না!'

'এমনিতেই বাইরে যোগাযোগ বন্ধ। যা বলছি, করো!'

ক্যামেরা রেখে হাঁসের ভঙ্গিতে হেলেদুলে রানার দিকে চলল সেসিলি, কোমরের বেল্ট থেকে নিয়েছে ছোরা। রানার সুটের পিঠে প্রোটেকটিভ প্লাস্টিকে রাখা ফাইবার-অপটিক কেবল ধরে করাতের মত করে ছোরা চালাল মেয়েটা।

'জলদি!' তাড়া দিল রানা।

'খুব ধীরে কাটছে!' কয়েক সেকেণ্ড পর কাটা পড়ল কেবল। রানার সুটের কেবলের ছেঁড়া অংশে নীল আভা দেখল সেসিলি। পরক্ষণে হ্যাঁচকা টানে ওর হাত থেকে বেরিয়ে গেল কেবল, বিদ্যুদ্বেগে গিয়ে ঢুকল শাফটে। 'এটা কী হলো, রানা?'

'বিস্ফোরিত হলে ব্যালাস্টসহ সাগরতলে থাকত সাব, কিন্তু তা না করে রকেটের মত সাগর-সমতল লক্ষ্য করে উঠছিল অ্যাডভেঞ্চার। অর্থাৎ, যাওয়ার পথে সঙ্গে নিয়ে যেত আমাকে, নানান জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে মরতাম।' সেসিলির দিকে ফিরল রানা। 'ধন্যবাদ। কড়া কথা বলেছি বলে দুঃখিত।'

'যা পরিস্থিতি, তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই!' শাফটের দিকে তাকাল সেসিলি। 'সত্যিই যদি সাব উড়িয়ে দেয়া হয়, এখন আমাদের কী করা উচিত?'

'প্রথম কাজ এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।' শাফটের কাছে চলে গেল রানা। 'জ্যা? শুনছ? না, কিছুই শুনছে না!'

'আমি কিন্তু এখনও রেডিয়োতে তোমার কথা শুনছি।'

'হ্যাঁ, কারণ তুমি আছ বাতাসের ভেতর পাঁচ ফুট দূরে। কত হাজার ফুট পাথর বা পানির ওদিকে আছে জ্যা, বলা মুশকিল। ...জ্যা!'

কন্ট্রোল স্টিক ধরে ফুল স্পিডে সুটের থ্রাস্টার চালু করেছে

মউরোস, কাদার ভেতর পেছনে ফেলছে বুদ্বুদ। তেড়ে আসছে ওদিক থেকে সাবমারসিবল। পালাবার ফাঁকে একবার দেখল ওটার দিকে। কন্ট্রোল স্ফিয়ারে বড় করে লেখা: মারমেইড। ভেতরে পেটে ভর করে শুয়ে আছে পাইলট। কাঁচের বুদ্বুদের এদিক থেকে তার মুখ বিকৃত ও বড় দেখাল।

মউরোসের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে ম্যানিপুলেটর বাহু। শরীর গড়িয়ে আরেক দিকে সরল ও। ফিন ব্যবহার করে পাল্টে নিয়েছে দিক। আবারও দেখল পেছনে। পাইলট স্থির করেছে নিজের কাছে বিস্ফোরকের প্যাকেট রাখবে, ঠিক জায়গায় বোমা বসিয়ে তারপর দেখে নেবে মউরোসকে।

আপাতত লোকটার একমাত্র টার্গেট মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

'রানা!' গলা ফাটিয়ে ডাকল মউরোস। যদিও বুঝে গেছে, ওর কথা শুনবে না বন্ধু। 'ওখান থেকে বেরিয়ে এসো! রানা!'

বুদ্বুদ তুলছে সাবের থ্রাস্টার। রিভার্সে চলছে প্রপেলার। দেয়ালের কাছে স্থির হতে চাইছে ডুবো জলযান। সামনে বাড়িয়ে দিল দীর্ঘ বাহু, ঢুকে গেল প্যাসেজওয়েতে। কয়েক সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল। চকচকে স্টিলের থাবা এখন খালি।

থ্রাস্টার কন্ট্রোলে বুড়ো আঙুল রেখেছে মউরোস। ভাবল, একবার ওই করিডোরে ঢুকে পড়তে পারলে বের করে আনতে পারবে বিস্ফোরক।

কিন্তু ওই সুযোগ কেন দেবে পাইলট?

কাঁকড়া বিছের লেজের মত খোলের ওপর ধাতব বাহু তুলল পাইলট। ঘুরে গেল তার সাবমারসিবল। এবার তাড়া করে শেষ করবে অসহায় শিকারকে।

উজ্জ্বল স্পটলাইটে প্রায় অন্ধ মউরোস। সাবের প্রপেলার ঘুরতেই দেখল একগাদা বুদ্বুদ। মৃত্যুদূত তেড়ে এল ওকে লক্ষ্য করে।

'আয়, শালা!' বিড়বিড় করল মউরোস। আঙুল সরিয়ে নিল কন্ট্রোল স্টিক থেকে। হাত চলে গেল ইকুইপমেন্ট বেল্টে।

ছুটন্ত বর্শার মত গতি তুলে তেড়ে আসছে সাবমারসিবল।

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে মউরোস। কয়েক সেকেণ্ড পর সরাসরি ককপিট বুদ্বুদ লক্ষ্য করে গ্র্যাপলিং গান তাক করল ও, পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার।

গ্র্যাপনেলের স্টিলের ফলা লাগল কাঁচে, আটকে গেল ওখানেই। ভেদ করেছে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার কাঁচ। পেছনে পড়ে যাওয়া পানির স্রোতে খুলে গেল ফলা, কেবলসহ হারিয়ে গেল ছুটন্ত সাবের পেছনে।

এরই ভেতর হাত থেকে যন্ত্রটা ফেলে দিয়েছে মউরোস। আবারও চালু করেছে থ্রাস্টার। বাঁক নিয়ে ছুটে চলেছে অগ্রসরমাণ সাবের পাশে উঠতে। ওর উদ্দেশ্য বোঝার আগেই পাইলট দেখল, বাহু বাড়িয়ে ধরার আগেই সামনে থেকে উধাও হয়েছে লোকটা।

যথেষ্ট দ্রুত সাবমারসিবল ঘুরিয়ে নিল সে, ধাওয়া করার জন্যে তৈরি।

এদিকে মউরোস বুঝে গেছে, ওর সুটের সাধ্য নেই যে পেছনে ফেলবে শত্রুকে। তার দরকার আছে, তা-ও মনে করছে না ও।

সামনে উজ্জ্বল হলদে খোলসের মত মউরোসের সুট দেখে ককপিটে দাঁত বের করে দুই কান পর্যন্ত হাসল পাইলট। ফুল পাওয়ারে ধাওয়া করল সে। এবার পিষে ফেলবে শত্রুকে।

কিন্তু গ্র্যাপনেলের তৈরি সামান্য ফুটো হঠাৎ করেই বড় হতে লাগল। বিস্তৃত হচ্ছে কাঁচের ফাটল, ছড়িয়ে পড়ছে মাকড়সার জালের মত। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর দাঁত কিড়মিড় করার মত বাজে আওয়াজ তুলে ফাটল পুরো কাঁচ। প্রচণ্ড চাপ নিয়ে

সাবমারসিবলের ভেতর ঢুকল সাগরের প্রবল পানি।

যেন বড় কামানের বিস্ফোরিত গোলা, জোর আওয়াজ তুলে চ্যাপটা হলো সাবের ককপিট। তিন ইঞ্চি পুরু ধারালো কাচ ফালি করেছে পাইলটের দেহ। পরক্ষণে বাতাসের মস্ত বুদ্বুদের সঙ্গে ছড়িয়ে গেল রক্ত-মাংসের ফুটন্ত এক গোলাপ। সাগরতলে বালি-কাদার ভেতর গেঁথে গেল বিধ্বস্ত সাব।

ঘুরে পেছনে দেখল মউরোস। এখনও হয়তো সময় আছে, সরিয়ে ফেলতে পারবে বিস্ফোরক।

না, সে সময় নেই!

প্যাসেজের শেষমাথা থেকে এল প্রচণ্ড শকওয়েভ, শক্তিশালী ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল মউরোস। কানে তালা লেগেছে বিকট আওয়াজে। দ্রুতগামী গাড়ি যেন উড়িয়ে নিয়েছে ওকে। বেশ ক'বার নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ডিগবাজি খেল। কাদার চাদর ছড়িয়ে পড়তেই আঁধার হয়ে গেছে চারপাশ।

কল্পনার দরকার নেই, বুঝে গেল কী ঘটছে। বিস্ফোরণের পর পর থরথর করে কাঁপছে চারপাশ। টানেলে নামছে প্রকাণ্ড সব পাথরের চৌকো ব্লক, চিরকালের জন্যে বুজিয়ে দিচ্ছে মন্দিরে ঢোকার পথ!

বেদি ঘরে এইমাত্র সেসিলিকে শাফটে নামাবে রানা, এমন সময় পাতাল কূপ থেকে উঠে এল সাগরের প্রবল সব ঢেউ। তোড় এতই বেশি, পেছনের মেঝেতে ছিটকে পড়ল ওরা। পাথর-বালি নিয়ে হুড়মুড় করে উঠে আসছে আস্ত সাগর। ছোট-বড় সব পাথর হাতুড়ির বাড়ির মত এসে পড়ছে ওদের সুটে।

'মাই গড!' কাঁপা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সেসিলি। প্রথমবারের মত রানা টের পেল, ভীষণ ভয় পেয়েছে মেয়েটা। 'কী হচ্ছে এসব, রানা?'

‘শান্ত হও, সেসিলি,’ ওর হাত ধরল রানা। ‘ভয় পেয়ো না, বিপদ হবে না। পরীক্ষা করে দেখো, তোমার সুট ঠিক আছে কি না।’ দাঁড় করিয়ে দিল সেসিলিকে।

পরস্পরের সুটের কেসিং পরীক্ষা করে দেখল ওরা। জায়গায় জায়গায় তুবড়ে গেছে, তবে ওগুলো নষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো না রানার। অবশ্য, আপাতত এসব নিয়ে ভেবেই বা কী করবে?

‘বুঝলে আসলে কী হচ্ছে?’ জানতে চাইল সেসিলি।

শাফটের দিকে তাকাল রানা। ‘ধসিয়ে দিয়েছে প্যাসেজ। ভেতরে আটকা পড়েছি আমরা।’

দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজের যাত্রী ও ক্রুদের সবাইকে হেলিপ্যাডে জড় করেছে হেণ্ড্রিক ড্রেকের লোক। মাথা গুনে লাবনী বুঝে গেল, এরই ভেতর মারা পড়েছে নয়জন ক্রু।

দ্য সায়েন্টিস্টের পাশে থেমেছে শত্রু জলযান। এরই ভেতর দু' জাহাজ বেঁধে ফেলেছে দস্যুরা। দু'ডেকের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছে বাম্পার হিসেবে ট্রাকের টায়ার। সাগর ফুলে উঠলেই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ আসছে ওখান থেকে।

রিসার্চ ভেসেলে উঠল এক দীর্ঘদেহী লোক, দু'পাশে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী। পেছন ডেকে এসে থামল তারা। দলের একজনকে ইশারা করল লম্বা লোকটা, তার সামনে হাজির করতে হবে লাবনীকে। আপত্তি তুললেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। অবশ্য অস্ত্রের মুখে চুপ হয়ে যেতে হলো তাঁকে।

লাবনী এরই ভেতর বুঝে গেছে, সামনের ওই লোক কে। ত্রিকোণ ওই চেহারা আগেও দেখেছে কমপিউটারের মনিটরে।

‘ডক্টর আলম,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে। ‘যাক, শেষ পর্যন্ত দেখা হলো আপনার সঙ্গে। আমার নাম ডোনাটি লুক্কা।’

বাইশ

'জানি আপনি কে,' বলল লাবনী, গোপন করতে চাইছে বুকের ভয়। 'কী চান আপনি আমার কাছে?'

'কী চাই মানে?' মৃদু বিস্ময় নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল লুক্কা. কঠোর হয়ে গেল চেহারা। 'আর সবার মত একই জিনিস চাই, ডক্টর আলম। শান্তি এবং নিরাপত্তা যেন বজায় থাকে পৃথিবী জুড়ে আর ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না আপনাকে, এই আপনার কারণেই সত্যিকারের প্রশান্তি ফিরবে এই জগতে।' তার নিষ্ঠুর চোখ স্থির হলো প্রফেসর জিম করেলির মুখে। 'তোমাকেও ধন্যবাদ, জিম। বেশ কয়েক বছর পর দেখা। চার বছর, তা-ই না?'

'ভেবেছিলাম আর কখনও দেখা হবে না,' কাঁপা স্বরে বলল জিম করেলি।

'আপনি এই লোককে চেনেন?' ঝট্ করে প্রফেসরের দিকে ঘুরল লাবনী।

'জিম বা প্রফেসর করেলি, যে নামেই ডাকো, আগেও আটলান্টিস খুঁজে বের করা ঠেকানোর কাজে আমাকে সাহায্য করেছে সে,' বলল লুক্কা। দলের এক লোককে ইশারা করল সে। ওই লোক বন্দিদের মাঝ থেকে সরিয়ে নিল জিম করেলিকে। 'যাক, আসা যাক আসল বিষয়ে।' বিস্তৃত সাগর দেখাল সে। 'এবার চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে আটলান্টিস। ধ্বংস করে দেয়া হবে ওটাকে।'

কড়া সুরে জানতে চাইল লাবনী। 'কী কারণে নষ্ট করা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্কিওলজিকাল সাইট? আর কেনই বা খুন করা হলো এতগুলো মানুষকে?'

'যদি জানতেন কী কারণে কী করা হচ্ছে, তা হলে এ বিষয়ে টুঁ শব্দও করতেন না,' বলল লুক্কা। 'দেরি না করে সহায়তা করতেন আমাকে। কিন্তু বুঝতে পারছি, বিষিয়ে দেয়া হয়েছে আপনার মন। একইভাবে আপনার বাবা-মার মন বিষাক্ত করে দিয়েছিল ওই ডেনিয়েলসনরা। খুব লজ্জার বিষয়। অথচ কত কিছু দেয়ার ছিল তাঁদের, যদি না নিষেধ অমান্য করে বেছে নিতেন ভুল পথ।'

'একমিনিট, এসবের ভেতর আমার বাবা-মার কথা আসছে কেন?' কৌতূহল বোধ করছে লারনী।

কিন্তু আরেক দিকে মনোযোগ দিয়েছে লুক্কা। এইমাত্র সুপারস্ট্রাকচার থেকে বেরিয়ে এসেছে ড্রেক।

'ওই ডাইভের যত তথ্য, বা কমপিউটারের হার্ড ড্রাইভে যা কিছু ছিল, সব নষ্ট করেছি, লুক্কা,' খুশিমনে বলল ড্রেক। 'এবার মন্দিরটা মিশিয়ে দিলেই আর কোথাও কোনও প্রমাণ থাকবে না।'

'এক্সেলেন্ট,' মাথা দোলাল লুক্কা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডেকে উঠল কে যেন।

পাশের জাহাজ থেকে দ্য সায়েন্টিস্ট-এ উঠে হেলিপ্যাডের দিকে ছুটে এল লোকটা। দৌড়ে এসে হাঁফাচ্ছে। 'মিস্টার লুক্কা, স্যার! ভয়ঙ্কর খারাপ ব্যাপার ঘটে গেছে!'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল লুক্কা।

'ডেনিয়েলসনের সাবটাকে শেষ করেছে আমাদেরটা...'

সামনে বেড়ে গালি বকতে শুরু করল জোসেফ ওয়েস্টকট। ঝাঁপিয়েই পড়ত লুক্কার ওপর, কিন্তু তাকে পাকড়ে ধরল দু'গার্ড। আরেকজন অস্ত্র তাক করল কপাল বরাবর। চুপ হয়ে গেল প্রতিভাবান গবেষক।

'তারপর, স্যর, আমাদের সাবের পাইলট ডেটোনেট করেছে ডেমোলিশন চার্জ। কিন্তু তার একটু পরেই হাইড্রোফোনে আমরা পেয়েছি ইমপ্লোশনের আওয়াজ।'

'ওটা হয়তো ডেনিয়েলসনের সাব?'

'না, স্যর। ওদের ওটা উঠছিল, এমন সময় বিস্ফোরিত হয়। পরে সাগরতলে আরেকবার বিস্ফোরণের আওয়াজ পাই আমরা। ভুল না হয়ে থাকলে ওই তিন ডুবুরির কেউ উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের সাব।'

ঘুরে জিম করেলির দিকে তাকাল লুক্কা, চোখে প্রশ্ন।

'সেসিলি... মানে, মিস ডেনিয়েলসন... আর রানা ছিল মন্দিরে,' ভয়ে কাঁপছে প্রফেসরের কণ্ঠ, 'তা হলে বোমা মেরেছে ওই জ্যাঁ মউরোস।'

'চমৎকার, মউরোস!' শুকনো স্বরে বলল লাবনী।

ভয়ঙ্কর ঘৃণা নিয়ে একমাত্র সুস্থ চোখে ওকে দেখল ড্রেক। উত্তেজনার কারণে টিসটিস করছে ক্ষতিগ্রস্ত চোখ।

কুঁচকে গেছে ডোনাটি লুক্কার ভুরু। 'ঠিক জায়গায় বোমা বসাতে চাইলে লাগবে ওই সাবমারসিবল! কতক্ষণ লাগবে আরেকটা জোগাড় করতে?'

'কমপক্ষে পাঁচ দিন, স্যর।'

'এত দেরি হলে চলবে না। ততক্ষণে অনেক লোক আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে হাজির হবে লোভী বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন। আমাদের জন্যে পুরোপুরি তৈরি থাকবে সে।'

'এদের অন্য সাবটাকে ব্যবহার করা যায় না?' জানতে চাইল ড্রেক। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল দ্য সায়েন্টিস্টের বো-তে ঝুলন্ত কিলার-ওয়েইলডোযারকে।

'শুধু আমি জানি কীভাবে চালাতে হয়,' বলল ওয়েস্টকট। 'কিন্তু মরে গেলেও তোমাদের হয়ে কাজ করব না।' তার কণ্ঠ

বুঝিয়ে দিল মরতেও আপত্তি নেই। 'তোমরা আমার বন্ধুকে খুন করেছ, শুয়োরের বাচ্চারা!'

চোখে-মুখে বিরক্তি নিয়ে তরুণের দিকে অস্ত্র তাক করল ড্রেক। খুন করবে। কিন্তু মাথা নাড়ল লুক্কা। 'ঠিক আছে, আমাদের জাহাজ থেকে ডেমোলিশন চার্জ তোলো এ জাহাজে।' কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবল। 'সামনের দিকে পানি সমতলে আটকে দেবে তিনভাগের দু'ভাগ বিস্ফোরক। আর শেষভাগ রাখবে পেছনের দিকে।'

'আপনি কী করতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'বোমা দিয়ে যখন ধসিয়ে দিতে পারছি না মন্দির,' বলল লুক্কা, 'অন্য ব্যবস্থা নেব। সোজা মন্দিরের ওপর তিন হাজার টন স্টিল নেমে গেলেই কাজ হবে।'

সশস্ত্র লোক ঘিরে রেখেছে ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডকে, তবুও সামনে বেড়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'লুক্কা! আমার ক্রুদের কী হবে? কোনও দোষ করেনি আমার ছেলেরা!'

স্বাভাবিক সুরে বলল লুক্কা, 'আমি তো জানতাম ম্যারিটাইম নিয়ম অনুযায়ী, ক্যাপ্টেন তলিয়ে যাবে তার জাহাজের সঙ্গে। এক্ষেত্রে তার সঙ্গে যাবে তার ক্রুরাও।' চট্ করে লাবনীকে দেখল সে। 'বাদ পড়বে না যাত্রীরাও।'

'সিফিলিস ধরা কুকুরীর পেট থেকে বেরিয়ে দুনিয়া জ্বালাতে এসেছিস তুই,' লুক্কার মুখ লক্ষ্য করে থুতু ছুঁড়লেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড, তবে ওসব কয়েক ফুট আগেই মেঝেতে পড়ল।

'আপনি আমাদেরকে ডুবিয়ে মারবেন?' ভীষণ চমকে গেছে লাবনী।

মাথা নাড়ল লুক্কা। 'না, আমি নিষ্ঠুর নই। ডেনিয়েলসনের মত লোক সবসময় আমার নামে যা-তা বলে। সত্যি বলতে, জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার আগেই তোমাদের শেষ করব।'

ট্যাঙ্কে কতটুকু বাতাস আছে, পরীক্ষা করে দেখল রানা। বহুক্ষণ গভীর পানিতে থাকতে তৈরি করা হয়েছে ডিপ সুট, কিন্তু তার মানে এ-ই নয়, চিরকাল অক্সিজেন দেবে ওটা। বড়জোর এক ঘণ্টার বাতাস পাবে ওরা।

হ্যাঁ, ওই একঘণ্টা পর চিরকালের জন্যে প্রাচীন মন্দিরের বাসিন্দা হবে ওরা দু'জন!

একই কথা ভাবছে সেসিলি।

একটু পর বলল রানা, 'বেরিয়ে যাওয়ার অন্য পথ থাকবে।' নিচে যাওয়ার একটা সিঁড়ি দেখাল। 'প্যাসেজ দিয়ে এসে মেইন চেম্বার ভরিয়ে দেবে না পানি, নইলে এতক্ষণে তলিয়ে যেত এই ঘর।' হাত ধরে সেসিলিকে টেনে তুলল রানা। 'চলো, সিঁড়ি বেয়ে নেমে দেখি ওদিকে কী।'

'হয়তো বেরোতে পারব,' রানার পাশে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল হতাশ সেসিলি।

'দেখো তো, তোমার কাছে কয়টা বড় গ্লো স্টিক আছে। একটু পরেই প্রচুর আলো লাগবে।'

বেল্টে ঝুলন্ত পাউচ ঘাঁটল সেসিলি। 'সব মিলে ছয়টা।'

'আমারও ছয়টা। ঠিক আছে, দেখা যাক নতুন কোনও পথ পাওয়া যায় কি না।'

বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ তুলে এগোল ওরা।

সাঁতরে আবারও প্রবেশদ্বারের কাছে থেমেছে মউরোস। বোমা বিস্ফোরণে তৈরি কাদার মেঘ ভাসছে পানিতে। পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে জানে, কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগে পানি পরিষ্কার হতে।

কাদার মেঘে ঢুকল মউরোস, দ্বিধাহীন। চারপাশে যেন বাদামি

রঙের ভারী কুয়াশা, তা মোটেও ভেদ করছে না শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো। পানিতে ভাসছে ধূলির সূক্ষ্ম কণা।

মউরোস বুঝে গেল, সামনে বেড়ে কী দেখবে।

কিছুক্ষণ পর বিমর্ষ হলো ওর মন। মস্ত সব পাথরের বোল্ডারে বুজে গেছে প্যাসেজের পথ। কিন্তু ওখানেই পেল রানার লাইন। ওটা ঢুকে গেছে সুড়ঙ্গের ভেতর। পরীক্ষার জন্যে লাইন ধরে টান দিল, কিন্তু ওদিক থেকে ছুটে এল না ওটা।

আবারও সুটের থ্রাস্টার ব্যবহার করে স্বচ্ছ পানিতে ফিরল মউরোস। একবার দেখল এয়ার প্রেশার মিটার, বাঁচতে চাইলে একঘণ্টা পেরোবার আগেই উঠে যেতে হবে সাগর-সমতলে।

কিন্তু তারপর কী হবে, কে জানে! সাগরের নিচে হামলা করা মানেই, ভাল নয় ওপরের অবস্থাও। এ-ও বোঝা যাচ্ছে, ডোনাটি লুক্কার লোক দখল করে নিয়েছে রিসার্চ ভেসেল দ্য সায়েন্টিস্ট। নিজের কোমরের দিকে তাকাল মউরোস। অস্ত্র বলতে মাত্র একটা ছোরা। বস্তার মত এই পোশাক নিয়ে ওপরে উঠলেও বাঁচার জন্য লড়তে পারবে না।

সোজা কথায়, এখন প্রথম কাজ হওয়া উচিত রানা ও সেসিলিকে খুঁজে বের করা। ওদেরকে পেলে, পরে ভেবেচিন্তে সবাই মিলে বের করবে ভাল কোনও পরিকল্পনা।

মনে মনে প্রার্থনা করছে মউরোস, যেন বেঁচে থাকে রানা আর সেসিলি।

দম আটকে আসা টানটান উত্তেজনা হেলিপ্যাডে। রিসার্চ ভেসেল দ্য সায়েন্টিস্টের কয়েকজন তরুণ ক্রু প্রায় কেঁদে ফেলেছে ভয়ে। অন্যরা বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে। ওদেরকে ঘিরে ফেলেছে লুক্কার লোক, হাতে উদ্যত এমপি-সেভেন।

‘একমিনিট,’ বলে উঠল লাবনী। কাঁপছে বুক। কিন্তু দূর

করতে চাইছে ভয়। 'আমার কথা শুনুন!'

'আর কী শোনার আছে?' জানতে চাইল লুক্কা।

'আমরা একটা চুক্তি করতে পারি। আপনি ছেড়ে দেবেন ক্রুদেরকে। ওরা চলে যাবে লাইফবোট নিয়ে। তারপর ডুবিয়ে দেবেন জাহাজ। আর তার আগে...' বড় করে দম নিল লাবনী। 'নিজেকে তুলে দেব আমি আপনার হাতে।'

বিরক্তি নিয়ে নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল ড্রেক। শুকনো হাসল ডোনাটি লুক্কা। 'এমনিতেই আপনি আমার হাতে বন্দি, ডক্টর আলম! দেয়ার কিছুই নেই আপনার। যা চাই, সবই এসে গেছে মুঠোর ভেতর। ভাল করেই জানি কোথায় আটলান্টিসের রাজধানী। এবার ধ্বংস করে দেব ওটা। ব্যস।'

'আরও কিছু আছে, যেটা আপনার জানা নেই,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল লাবনী। 'আপনি কি জানেন, কোথায় আছে পসেইডনের তৃতীয় মন্দির?'

কথাটা শুনে বিস্মিত চোখে লাবনীকে দেখল লুক্কা। 'তৃতীয় কোনও মন্দির ছিল না, ডক্টর আলম। ব্রাযিলে ছিল একটা। ওটা ধ্বংস করা হয়েছে। দ্বিতীয়টা... বলা উচিত প্রথমটা... ওটা আছে সাগরের নিচে। একটু পর চুরমার হবে। ব্যস, এতেই শেষ হচ্ছে আটলাণ্টিয়ানদের অতীত খুঁজে বেড়ানো।'

'ভুল বললেন।' মাথা নাড়ল লাবনী। 'রয়ে গেছে তৃতীয় আরেকটা। আগে হোক বা পরে, কেউ না কেউ খুঁজে বের করবে ওটা। আপনি ভাবছেন মাত্র দুটো মন্দির ধ্বংস করলেই হারিয়ে যাবে সব সূত্র? না, তা হবে না। অনেকে জেনে গেছে কোথায় আছে আটলান্টিস। তাদের কেউ না কেউ খুঁজবে সাগরের নিচে। ওখানে রয়ে গেছে আস্ত এক আর্কিওলজিকাল শহর। এক এক করে প্রতিটা টুকরো জোড়া দেবে। তারপর নতুন করে খুঁজে বের করবে কোথায় আছে শেষ মন্দির ও শহর। ঠেকাতে পারবেন না

সবাইকে। কিন্তু...'

ডোনাটি লুক্কা রাগ চাপতে চাইলেও কণ্ঠে তা প্রকাশ পেল: 'আপনার কিন্তুটা কীসের?'

'আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে পারি, কোথায় আছে তৃতীয় মন্দির। সেক্ষেত্রে নিজে গিয়ে ধ্বংস করতে পারবেন সব।'

'স্রেফ মিছেকথা,' বলল ড্রেক। 'আর কিছুই জানা নেই ওর। মিথ্যা বলে চাইছে জান বাঁচাতে। চাই বাড়তি সময়, যদি রক্ষা পায়, তাই।'

'মিস্টার লুক্কা, আপনার এই কানা, বেয়াড়া লোকটাকে বলুন, ফালতু কথা বন্ধ করুক,' ভয় চেপে গম্ভীর কণ্ঠে বলল লাবনী, 'রয়ে গেছে তৃতীয় মন্দির। ওখানে একটা শহরও আছে। দ্বীপ তলিয়ে যাওয়ার আগে দুনিয়ার দু'দিকে আটলান্টিয়ানরা তৈরি করে দুটো শহর। তাদের এক এক্সপিডিশন গিয়েছিল পশ্চিমে... অর্থাৎ ব্রাযিলে। অন্য এক্সপিডিশন কোথায় হয়, তা ভাল করেই জানি। আপনি ক্রুদের ছেড়ে দিলে আপত্তি তুলব না সে তথ্য দিতে।'

ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডের মাথার একপাশে অস্ত্রের মাযল ঠেকাল ড্রেক। 'অন্য কাজও করা যায়। এক এক করে এদেরকে খুন করব। ফলে নিজের সময় আসার আগেই মুখ খুলবে তুমি।'

'আমাদেরকে যখন মেরেই ফেলবে, তো চুক্তি নিয়ে ভেবে কী লাভ?' হাল ছেড়ে দিয়েছে লাবনী।

করেলির দিকে ফিরল লুক্কা। 'এই মেয়ে কি ঠিক বলছে?'

'সম্ভবত ঠিকই বলেছে,' দ্বিধা নিয়ে বলল করেলি। 'ব্রাযিলের মন্দিরের দেয়ালে লেখা ছিল, ওরা তৈরি করবে আরও একটা শহর। কিন্তু এখনও পুরো অনুবাদ করিনি।' সন্দেহ নিয়ে লাবনীকে দেখল সে। 'আমার মনে হয় না ডক্টর আলমও এ ব্যাপারে কিছু জানে।'

'আমি তোমার মত নই, চট্ করে পড়তে পারি, করেলি,'

টিটকারির ভঙ্গিতে হাসল লাবনী। এখন আর প্রফেসার বলছে না।

'পরের তথ্য পড়তে পারবে?' করেলির দিকে তাকাল লুক্কা।

আফসোস নিয়ে মাথা নাড়ল প্রফেসর। 'না, তা আর সম্ভব নয়।'

'হাহ্!' ড্রেকের দিকে তাকাল লাবনী। 'এখন নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, উচিত হয়নি চট্ করে হার্ড ডিস্ক নষ্ট করা?' লুক্কার দিকে তাকাল। 'এবার কী করবেন? একটা প্রস্তাব দিয়েছি। এখনও সময় আছে, রাজি হওয়ার। ছেড়ে দিন ক্রুদেরকে, আপনাকে নিয়ে যাব আটলান্টিসের তৃতীয় শহরে।'

'মশকরা করছ, ওখানে বেড়াতে নেবে আমাদেরকে?' রাগে নাক ফুলিয়ে ফেলল ড্রেক।

গম্ভীর চেহারায় ডোনাটি লুক্কার দিকে চেয়ে আছে লাবনী। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল. 'বেশ কয়েক বছর ধরে খুঁজছি আটলান্টিস। সত্যি যদি ওটার জন্যে মরতেই হয়, তার আগে জানতে চাই, কেমন ছিল ওদের তৃতীয় শহর ও মন্দির। আশা করি, বড় বেশি কিছু চাইছি না আপনাদের কাছে?'

'কেন মস্ত বিপদে পড়বেন, ডক্টর আলম,' বললেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। 'এরা এমনিতেই আমাদেরকে মেরে ফেলবে। এদের ঠেকাবে কে?'

'উনি মস্ত কোনও অন্যায় করবেন না, তা ধরে নিয়েছি,' বুকের গভীরে বুঝে গেল লাবনী, যা বলছে, তা মোটেও যৌক্তিক নয়। 'আশা করব, চুক্তি করলে তা রক্ষা করবেন মিস্টার লুক্কা।'

রাগী চোখে ওকে দেখছে ড্রেক। নিস্পৃহ লুক্কার চেহারা দেখে কিছুই আঁচ করতে পারল না লাবনী।

কয়েক পা বেড়ে ওর চোখে চোখ রাখল ডোনাটি লুক্কা। 'নিশ্চয়ই জানেন. তৃতীয় শহর ধ্বংস করলেও আপনাকে বাঁচতে দেব না?'

'বুঝতে পেরেছি, মৃত্যু আমার নিশ্চিত।'

'তবুও চুক্তি করে বাঁচাতে চান এদের প্রাণ?'

একবার ঢোক গিলে শুকনো গলায় বলল লাবনী, 'হ্যাঁ।'

কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবল লুক্কা। চোখে ফুটল লাবনীর প্রতি সমীহভাব। মাথা দোলাল। 'আপনি সত্যিই সাহসী মেয়ে, ডক্টর আলম। দারুণ দৃঢ়চিত্ত। ...বেশ, এই জাহাজের সবাইকে ছেড়ে দেব, বদলে আপনি পথ দেখিয়ে নেবেন আমাকে শেষ মন্দিরে। তা হলে কি ধরে নেব আমাদের চুক্তি হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, তা-ই,' বলল লাবনী।

মাথা দোলাল লুক্কা। 'বেশ! ড্রেক, ডক্টর আলম ছাড়া এদের সবাইকে লাইফবোটে তুলে নামিয়ে দাও সাগরে।'

'কোনও ভুল হচ্ছে না তো?' আপত্তির সুরে বলল ড্রেক।

'পরে বুঝব। আগে সার্চ করো এদেরকে। কারও সঙ্গে যেন রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বা ফ্লেয়ার না থাকে। চাই না আমরা এদিকের সাগর থেকে সরে যাওয়ার আগে এদেরকে তুলে নিক কোনও জাহাজ।' উত্তর দিক দেখাল সে। 'ওদিকে এক শ' চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পর্তুগাল উপকূল, ক্যাপ্টেন। আশা করি ওদিকে গেলে বৈঠা মেরে গন্তব্যে পৌঁছবেন আপনারা।'

ঘৃণা নিয়ে ডোনাটি লুক্কাকে দেখলেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। পরের সেকেণ্ডে তাঁদেরকে তাড়িয়ে লাইফবোটের দিকে নিয়ে চলল হেণ্ড্রিক ড্রেকের লোক।

'সাগরের নিচের আটলান্টিসে যারা রয়ে গেল, তাদের কী হবে?' জানতে চাইল লাবনী। 'ওরা আমার বন্ধু!'

'ওরা ওখানেই থাকবে,' সহজ সুরে বলল লুক্কা।

'কিন্তু... আমরা না চুক্তি করেছি...'

খপ্ করে লাবনীর কবজি ধরল ডোনাটি লুক্কা, সঙ্গে করে ওকে নিয়ে যেতে যেতে কড়া সুরে বলল, 'আমরা চুক্তি করেছি জাহাজের

ক্রুদেরকে প্রাণে বাঁচতে দেব, ডক্টর আলম। আপনার বন্ধুরা এখন এই জাহাজে নেই। এতে আপত্তি থাকলে বলুন, নির্দেশ দিই ক্রুদেরকে খুন করতে! আমার কথা মগজে ঢুকেছে আপনার?'

'হ্যাঁ,' হাল ছেড়ে দিল লাবনী।

'ডক্টর আলম,' ঘুরে মেয়েটার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। তাঁকে অস্ত্রের মুখে অন্যদের সঙ্গে হাঁটতে ইশারা করল ড্রেকের এক লোক। 'আপনার পরিবারের কেউ থাকলে বলুন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'না, কেউ নেই আমার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লাবনী। ছোট চাচা ছিলেন, আমেরিকায় এসে খুন হন সন্ত্রাসীর হাতে। 'তবে... কখনও যদি রানার সঙ্গে দেখা হয়, ওকে বলবেন, আমি ওর জন্যে দূর এক দেশ থেকে পোস্টকার্ড পাঠাব।'

বিস্মিত হলেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। সুযোগ পেলেন না কিছু বলার। পিঠে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে।

লাবনীকে ইশারা করল লুক্কা। 'এবার আমার জাহাজে উঠুন, ডক্টর আলম। জানতে চাই, কোথায় আছে তৃতীয় আটলান্টিয়ান মন্দির আর শহর—'

সাগরতলে সত্যিকারের টেম্পল অভ পসেইডন চারভাগের তিনভাগ তলিয়ে গেলেও, দক্ষিণ আমেরিকার নকল মন্দিরের তুলনায় অনেক গুণ আকর্ষণীয় ও সুন্দর।

'সত্যিই অবিশ্বাস্য!' মস্তবড় বিপদে ভীষণ ভয় পেলেও, জাঁকজমক পূর্ণ, বিশাল মন্দির দেখে বিস্মিত হয়েছে সেসিলি। রত্ন-সোনা-রুপা-অরিচালকাম-এ নিখুঁত কারুকাজ করা প্রতিটি দেয়াল। অনেক ওপরে ছাত। 'ছাত দেখো, রানা! ওখানে আইভরির নিখুঁত শিল্প! সবই মিলছে প্লেটোর বর্ণনার সঙ্গে!'

'মনে হচ্ছে, মৃত সভ্যতার পাঁজরে ঢুকে আটকা পড়েছি,'

মন্তব্য করল রানা। সাঁতরে পৌঁছল সেসিলির পাশে। আরেকটা গ্লো স্টিক জ্বেলে ছুঁড়ে দিল ঘরের আরেক দিকে। পানিতে পড়ে জ্বলজ্বলে আলো ছড়াল ওটা। ওদের ফ্ল্যাশলাইটের আলোর বাইরে, ঘরের ওদিকে এখন অদ্ভুত এক কমলা আভা। পানি থেকে উঠেছে পসেইডনের মাথা, ভয়ঙ্করভাবে ক্ষিপ্ত সোনালি চোখে দেখছে রানা-সেসিলিকে। 'বেরোবার পথ দেখলে?'

'না। তুমি?'

ঘরের দক্ষিণে ইশারা করল রানা। 'আগের মন্দিরের মতই। প্যাসেজ ধরে গেলে সামনে পড়বে একই রকম ফাঁদ।'

'তা হলে ওদিকে প্যাসেজ আছে? বেরিয়ে যেতে পারব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। মনে নেই, তলিয়ে আছে ওদিক? বেরোবার পথের ওপর কমপক্ষে তিরিশ ফুট পলি আর বালি।'

'অন্তত চেষ্টা করা উচিত না? ছাত তো এখনও আস্ত। অন্য পথে ঢুকেছে সাগরের পানি। আর ওদিক দিয়েই হয়তো বেরিয়ে যেতে পারব।'

'সহজ পথ তৈরি করে নিতে পারি,' কোমরের থলি থেকে বিস্ফোরক বের করে দেখাল রানা।

'সেটা খুব বিপজ্জনক হবে,' বলল সেসিলি, 'হয়তো ছোট কোনও ফুটো করলাম, আর তখনই ধসে পড়ল পুরো মন্দির!'

'সম্ভাবনা খুব কম।' ছাতের আইভরি কারুকাজ করা অংশ থেকে দূরের পাথুরে দেয়াল দেখাল রানা। 'ছোট্ট একটা গর্ত করব, যেটা দিয়ে বেরোতে পারব।'

'আশা করি তোমার বোমা মাথার ওপর নামিয়ে আনবে না আস্ত ছাত।'

ওদিকের দেয়ালের সামনে গিয়ে থামল ওরা।

সুটের ভেতর কাঁধ ঝাঁকাল রানা 'ঝুঁকি না নিলে কী মূল্য জীবনের?' পাথুরে দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল।

ব্লকগুলোর মাঝের ফাঁক দেখছে। ব্রাযিলের মন্দিরেও নিখুঁতভাবে বসানো ছিল সব ব্লক, মাঝে দেখাই যায়নি চুন-বালির মিশ্রণ। ভারসাম্য রেখে দালান ধরে রেখেছিল ওগুলোই। দুই ব্লকের মাঝের ফাঁকে ছোরা ভরে দেখল রানা, ফলা গেল মাত্র কয়েক সেণ্টিমিটার। 'সবচেয়ে দুর্বল অংশে বসাব বোমা।' কিছুক্ষণ পাথুরে দেয়াল দেখে ঘুরে পসেইডনের মূর্তি দেখল ও। 'এতই বড়, মাথা স্পর্শ করেছে ছাত...'

'প্লেটোর বই পড়েছিলে?' রানার দিকে তাকাল সেসিলি।

'দাঁত বসানো কঠিন,' মন্তব্য করল রানা। 'ভালও লাগেনি পড়ে। যাক, বুড়ো দেবতার মাথার কাছে উঠে ছাতের সবচেয়ে ওপরে বসাব চার্জ। বোমা ফাটলে ছাতের সামান্য অংশ ভেঙে পড়লেও সমস্যা নেই, সেক্ষেত্রে চারপাশের পাথুরে দেয়াল ওজন নেবে মন্দিরের ছাতের।'

'কিন্তু বাইরে সাগরের প্রেশার কমপক্ষে টোয়েণ্টি-ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার,' আপত্তি তুলল সেসিলি, 'ছাত ভাঙলে তলিয়ে যাবে এই ঘর। আসলে খুন হব!'

'এক ঘণ্টার ভেতর সাগর সমতলে না উঠলে, এমনিতেও মরব,' বলল রানা। 'উপায় নেই যে পরিষ্কার করব প্যাসেজ, চলে এসো।' থ্রাস্টার ব্যবহার করে মূর্তির উদ্দেশে রওনা হলো রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছু নিল সেসিলি।

এইমাত্র পুরো মন্দির একচক্কর কেটে, আবার দক্ষিণ দেয়ালের কাছে ফিরেছে মউরোস। এমন কোনও গর্ত দেখেনি, ঢুকতে পারবে ভেতরে। মন্দিরের ছাত ফুলে আছে কচ্ছপের খোলসের মত, একেবারে নিখুঁত।

আপনমনে দালানের গায়ে হাত রাখল মউরোস। দেয়াল বোধহয় অনেক পুরু। কিন্তু রানা খুব কাছে থাকলে হয়তো পাথর

ভেদ করে পৌঁছবে ওর রেডিও ওয়েভ।

'রানা?' মাইকে বলল মউরোস। 'সেসিলি? তোমরা শুনতে পাচ্ছ?'

পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ। সুটের রেগুলেটরের মৃদু হিসহিস শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই।

'মহাবিপদ,' বিড়বিড় করে মন্দিরের পশ্চিম লক্ষ্য করে চলল মউরোস।

লাইফবোটে বসে বৈঠা মেরে রিসার্চ ভেসেল দ্য সায়েন্টিস্ট থেকে সরছে ক্রুরা। ডোনাটি লুক্কার জাহাজের ব্রিজ থেকে হতাশ চোখে তাদেরকে দেখছে লাবনী। ওকে পাহারা দিচ্ছে দু'পাশ থেকে দু'জন সশস্ত্র গার্ড। লুক্কার শেষ কয়েকজন গার্ড লাফিয়ে ফিরে এল এই জাহাজে। দড়ি খুলে সরিয়ে নেয়া হলো বাম্পার। আলাদা হয়ে গেল দুই জাহাজ।

ব্রিজে ঢুকল ড্রেক। 'লুক্কা, দরকারি সমস্ত জায়গায় বসানো হয়েছে বিস্ফোরক।' দুটো রেডিও ডেটোনেটর লুক্কার হাতে ধরিয়ে দিল। 'ডানেরটা ফাটাবে বো-র চার্জ, আর অন্যটা ইঞ্জিন রুমের।'

'খুলে দেয়া হয়েছে সব হ্যাচ?' জানতে চাইল লুক্কা।

'হ্যাঁ। একেবারে ইঞ্জিনিয়ারিং বাল্‌ক্‌-হেড পর্যন্ত। বো-র বোমা ফাটলেই পানিতে ভরে যাবে জাহাজের তিনভাগের দু'ভাগ। আর বো ডুবলেই ফাটাবে অন্যান্য বোমা। ব্যস, সোজা নিচে যাবে তিন হাজার টন লোহা।'

'খারাপ লাগছে, মগজ থাকলেও সৃষ্টিশীল কিছু না করে বেছে নিয়েছেন ধ্বংসের পথ,' মন্তব্য করল লাবনী।

'আপনি কখনও জানবেন না, ডক্টর আলম, সৃষ্টিশীলতার জন্যে কত সময় ব্যয় করেছি, আর আজও করছি,' বলল লুক্কা।

তিক্ত মনে বলল লাবনী, 'তা-ই নাকি? বলুন না, কী ধরনের

কীর্তি করেছেন?'

'পরে হয়তো বলব। কে জানে, হয়তো বুঝবেন আমার দলে থাকাই আপনার উচিত।'

'তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।'

'আমারও তা-ই ধারণা, মনোভাব পাল্টে নেবেন না,' বলল লুক্কা। ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে জানাল, 'নিরাপদ দূরত্বে সরে যান। কাজ শেষ হলে ঘুরে যাবেন দ্য সায়েন্টিস্টের দিকে। নিজ চোখে দেখতে চাই সব।'

যারা প্রচুর সময় দিয়ে অঢেল শ্রদ্ধা নিয়ে তৈরি করেছে ওই সোনার মূর্তি, কখনও ভাবতেও পারেনি এতবড় ক্ষমতাশালী দেবতার মাথায় চেপে বসবে সামান্য এক বাঙালি যুবক।

পুরো নিখুঁত নয় প্লেটোর বর্ণনা, ভাবছে রানা। নিচের মেঝে থেকে মনে হবে ছাতে গিয়ে ঠেকেছে পসেইডনের মাথা, কিন্তু বাস্তবে ছাত ও দেবতার মাথার মাঝে আছে সামান্য ফাঁক। আর ওখানেই আপাতত চিত হয়ে শুয়ে আছে রানা। সমস্যা করছে না পসেইডনের সোনার চুল ও রাজসিক মুকুট। সাগরের শৈবাল দিয়ে তৈরি হওয়ার কথা শেষ জিনিসটা। এখন কাজে লাগছে মঞ্চের মত। পরনে ভারী সুট আছে বলে কাঁটার মত চুল আর সোনালী মুকুট মোটেও বিঁধছে না ওর গায়ে।

'কী অবস্থা?' নিচ থেকে জানতে চাইল সেসিলি।

'কাজ প্রায় শেষ।' একই সময়ে ফাটবে রানার দুই বোমা। ডেটোনেটরটা অতি সাধারণ মেকানিকাল টাইমার। মাঝে পুরো এক শ' ফুট পানির দেয়াল থাকলেও কাজ করবে। একবার চালু হলে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছুতে মাত্র একমিনিট পাবে রানা।

মন্দির থেকে বেরোলে সুটের থ্রাস্টার ব্যবহার করে দ্রুত উঠতে পারবে সাগর সমতলে।

কিন্তু সত্যি যদি ধসে পড়ে মন্দিরের ছাত...

'আমি এখনও বলব, মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছ,' বলল সেসিলি।

'কাজে ভুল হলে পরপারে গিয়ে গালি দিয়ো, আমার কাজ প্রায় শেষ,' বলল রানা। ছাতের ফাঁকে গুঁজে দিল বোমা। ওর অভিজ্ঞতা বলছে, মস্ত কোনও বিপদ হবে না। কিন্তু বোমা এমনই জিনিস, নিশ্চিত হতে পারবে না কেউ। 'এবার সরে যাও।' হাতের ইশারা করে মন্দিরের আরেক দিক দেখিয়ে দিল রানা। 'আপাতত তলিয়ে থাকো পানির নিচে।'

'ঠিক আছে।' ডুব দিতেই আবছা হলো সেসিলির সুটের আলো।

আরেকবার ডেটোনেটর দেখল রানা। উঠে বসে চালু করল টাইমার। দুটো স্তর আছে ওটার। প্রথমে ঘুরিয়ে খুলতে হবে একটা পিন, তারপর সুইচ টিপে দিলেই ঘড়ির মত সময় গুনবে ডেটোনেটর। আর ষাট সেকেণ্ড পর...

নিশ্চিত নয় পানির নিচে কাজ করবে সুটের রেডিয়ো, ঘুরিয়ে পিন খোলা ও সুইচ টেপার আগে মাইকে বলল রানা, 'ঠিক আছে, সেসিলি। আর মাত্র ষাট সেকেণ্ড। শুরু হলো!' বিড়বিড় করল রানা, 'দেবতার মাথায় চেপে বসা, বেয়াদব? জলদি নেমে পড়!'

পরের দু'সেকেণ্ডে বোমা চালু করেই মূর্তি বেয়ে নামতে লাগল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে থমকে গেল। অত সহজ দেবতা নয় পসেইডন, মুকুটের কাঁটায় আটকে নিয়েছে ওর ইকুইপমেন্ট বেল্ট!

'শালা তো খুন করবে আমাকে!' দেবতার থুতনি আর নাকে কষে লাথি মেরে নিজেকে ছোটাতে চাইল রানা। কাজ হলো না! অসহায়ভাবে ঝুলছে বেচারা। 'আরে, শালা...'

'দূরত্ব পাঁচ শ' মিটার, স্যার,' জানাল ক্যাপ্টেন।

'গুড.' ব্রিজের জানালা দিয়ে দূরে দেখছে ডোনাটি লুক্কা।

সরাসরি সামনে ঝিকমিক করা সাদা রঙের দ্য সায়েন্টিস্ট। উজ্জ্বল হলদে বাল্‌ক্‌-এ বো ক্রেন থেকে দুলছে সাবমারসিবল কিলার-ওয়েইলডোযার। প্রাণপণে বৈঠা মেরে বিপজ্জনক জাহাজ থেকে সরে যাচ্ছে লাইফবোটের ক্রুরা।

'প্লিয,' করুণ সুরে বলল লাবনী। 'এ কাজ করবেন না!'

ওর দিকে ঘুরেও দেখল না ডোনাটি লুক্কা। চোখ সামনের জাহাজের ওপর। 'এ ছাড়া উপায় নেই।'

প্রথম রেডিও ডেটোনেটর তুলে বাটন টিপে দিল সে।

থ্রাস্টার বন্ধ করে এইমাত্র মন্দিরের ছাতে নেমেছে মউরোস। ওর মন বলল, এইমাত্র খুব আবছা কী যেন শুনেছে হেডফোনে। কিন্তু নতুন করে আর কোনও আওয়াজ পেল না।

'রানা?' পাথুরে ছাতে দাঁড়াল মউরোস। 'তুমি কিছু বললে, রানা? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

আবারও শুনল 'গুম-গুম!' আওয়াজ।

কিন্তু ওটা হেড্রফোনের নয়। গোটা সাগর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হলো ভারী, ভোঁতা আওয়াজ। যেন বহু দূরে হয়েছে বজ্রপাত।

ভাল করেই জানে মউরোস, ওপরের সাগরে বিস্ফোরিত হয়েছে শক্তিশালী বোমা। এর মানে...

লাবনী ভেবেছিল দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজের বো-টাকে খপ্‌ করে গিলে নেবে বিশাল এক লাল-কমলা আগুনের গোলা। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই হলো না। হাস্যকরভাবে হ্যাচ থেকে ফুস-ফুস' শব্দে বেরোল ধোঁয়া, পোড়া কাগজ আর নানান আবর্জনা। জাহাজের কাছের পানিতে তৈরি হয়েই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সাদা ফেনা।

কয়েক মুহূর্ত পর বুঝল লাবনী, বোমার বিধ্বংসী প্রভাব।

হঠাৎ করেই পানির দিকে ঝুঁকল বো, ডানে কাত হলো

জাহাজ। পিছলে ডেকের আরেক দিকে গেল আলগা জিনিসপত্র, সব ঝপাঝপ পড়ল সাগরে। পানি থেকে সামান্য ওপরে নর্তকীর মত দুলছে কিলার-ওয়েইলডোযার। অ্যাফট ডেকে প্যাডের সঙ্গে আটকে রেখেছে স্টিলের কেবল, তবুও হোঁচট খেল হেলিকপ্টার।

জাহাজ ডোবার গতি দেখে অবাক হয়েছে লাবনী, বড় বড় চোখে দেখল ওদিকে। সাগরে নাক ডুবিয়ে দিল জাহাজের বো। পানি ও বাতাসের জোর চাপে হ্যাচ থেকে বেরোল ভাঙাচোরা জিনিসপত্র। যে গতি নিয়ে সাগরে হারিয়ে যাচ্ছে জাহাজ, বড়জোর একমিনিটে তলিয়ে যাবে ফোরডেক।

রুষ্ট দেবতার সোনার মুকুটের কাঁটা থেকে বেল্ট খুলতে চাইলেও কাজটা প্রায় অসম্ভব, পরনের মোটা সুটের জন্যে আঙুল দিয়ে ভালভাবে কিছুই ধরতে পারছে না রানা।

এদিকে বোমা ফাটবে মাত্র চল্লিশ সেকেণ্ড পর!

বাইরে থেকে এল বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ!

খড়মড় আওয়াজ তুলল রানার হেডফোন। স্ট্যাটিকের ভেতর দিয়ে এল কার যেন কণ্ঠ।

সেসিলি?

না, মউরোস!

'রানা! শুনছ? রানা!'

রিলে ছাড়াও কাজ করছে রেডিয়ো, খুব কাছেই কোথাও আছে মউরোস। 'জ্যা!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা, 'সরে যাও! বোমা! পালাও!'

'রানা! আবারও ব...'

বিস্ফোরণ হবে ত্রিশ সেকেণ্ড পর!

চিৎকার করল রানা, 'বোমা! জ্যা! পালাও!' বের করতে চাইছে ছোরা। সুটের কোমরের কাছে ইকুইপমেন্ট বেল্ট। ছোরা পেয়ে

যেতেই ওটার ফলা দিয়ে পোঁচ মারল প্লাস্টিক-কোটেড কর্ডের ওপর।

বিস্ফারিত হলো মউরোসের চোখ। রানার ট্র্যান্সমিশন খুব আবছা বলেই কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু এবার পরিষ্কার শুনল বন্ধুর সতর্কবাণী।

ঘুরেই মন্দিরের ছাত থেকে সরে যেতে লাগল মউরোস। ফুল স্পিডে কাজ করছে থ্রাস্টার।

ডিপ-সি রিসার্চ ভেসেল দ্য সায়েন্টিস্টের ডেক এখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি খাড়া, কয়েক সেকেণ্ডে ঢেউয়ের নিচে হারিয়ে গেল বো। কেবল ছিঁড়ে প্যাড পেরিয়ে ঝপাস্ শব্দে সাগরে পড়ল হেলিকপ্টার, প্রথমে তলিয়ে গেল লেজ, কয়েক সেকেণ্ড পর তলিয়ে গেল ককপিটও।

ফোরডেকে একটা কেবল ছিঁড়ে যেতেই মস্ত পেণ্ডুলামের মত এদিক ওদিক দুলল ভারী কিলার-ওয়েইলডোযার, পরক্ষণে সাগরে আছড়ে পড়ে তৈরি করল বিশাল এক ঢেউ। প্রচণ্ড ওজন নিতে ব্যর্থ হয়ে ভিত্তি থেকে মড়াৎ করে ভাঙল ক্রেন, ঢালু ডেক পেরিয়ে নামল সাবের পিঠে। একই সময়ে সাগরে তলিয়ে গেল সাবমারসিবল ও ক্রেন।

জাহাজ ডুবছে বলে চারপাশের পানিতে ছড়িয়ে গেল নানান জঞ্জাল। স্টার্ন সাগর ছেড়ে আকাশে উঠে যেতেই ঝরঝর করে প্রপেলার থেকে ঝরল একরাশ পানি।

দ্বিতীয় ডেটোনেটর তুলে ধরল ডোনাটি লুক্কা, নিস্পৃহ চেহারায় টিপে দিল লাল বাটন।

আর মাত্র বিশ সেকেণ্ড, এরপর নিজের তৈরি বোমা খতম করবে

রানাকে!

'শালার কর্ড!' নিচ থেকে ছোরা ওপরে চালিয়ে প্লাস্টিক-কোটেড কর্ড কাটতে চাইছে রানা। তাতে প্রবল চাপ পড়ছে পুরু সুটের ওপর। এক সেকেণ্ড পর ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল বেল্ট।

আট ফুট ওপর থেকে চিত হয়ে পানিতে পড়ল রানা, মাথা ঠুকে গেল হেলমেটের ভেতর। হাতে বড়জোর পনেরো সেকেণ্ড! ব্যথা নিয়ে না ভেবে দ্রুতগামী ডলফিনের মত গভীর পানির দিকে চলল রানা।

ফ্যানটেইল দিয়ে বাষ্প ও ধোঁয়া ছেড়ে চিরকালের জন্যে আটলাণ্টিক মহাসাগরে তলিয়ে গেল ডিপ-সি রিসার্চ ভেসেল দ্য সায়েণ্টিস্ট। তার আগে শেষবার আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল। জাহাজ ডুবে যেতেই ওই জায়গায় সৃষ্টি হলো বুদ্বুদ ভরা বড় বড় ঢেউ। ভেসে উঠল হাজারো ভাঙাচোরা, পোড়া জিনিস— এতই হালকা, তলিয়ে গেল না ঘূর্ণির ভেতর।

জাহাজ তলিয়ে যেতেই অ্যাফট কম্পার্টমেণ্টে ঢুকেছে পানি। ফলে থেমে গেছে জেনারেটর, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করেছে ব্যাটারি-চালিত ইমার্জেন্সি বাতি— জ্বলে থাকল পানির নিচেও। পেছনে প্রচুর বুদ্বুদ রেখে নেমে চলেছে সার্ভে শিপ। নাক তাক করেছে সরাসরি সাগরতল লক্ষ্য করে। নিচে হারিয়ে যাওয়া আটলাণ্টিস।

ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল ডোনাটি লুক্কা। 'পূর্ণ গতি ব্যবহার করে ফিরে চলুন বন্দরে।'

'আই-আই, স্যর!' ব্রিজের ক্রুদের উদ্দেশে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। ঘরের কোণে মুখে হাত রেখে চুপ করে আছে লাবনী, ফুঁপিয়ে উঠল একবার। বুঝে গেছে, বাঁচবে না রানা, সেসিলি ও

মউরোস।

ফুল স্পিডে থ্রাস্টার ব্যবহার করছে রানা, একমাত্র উদ্দেশ্য ওই অভিশপ্ত মূর্তি থেকে সরে যাওয়া।

পাঁচ... চার... তিন...

আরও নিচে সেসিলির আবছা আলো দেখল রানা। ওদিকে বাঁক নিয়ে ছুটল। তখনই ডেটোনেট করল বিস্ফোরক!

তেইশ

আটলান্টিস তলিয়ে গেলেও কিছুই হয়নি দেবতা পসেইডনের মূর্তির, পুরো এগারো হাজার বছর ধরে নিজের মন্দির পাহারা দিয়েছে, কিন্তু বোমার আঘাতে হাজারো টুকরো হলো তার মাথা। চুরচুর হলো হাতির দাঁতে কারুকাজ করা ছাতের এক অংশ। প্রায় নিমজ্জিত ঘরের জমা পানিতে নানানদিকে ছিটিয়ে গেল ক্ষুরের মত ধারালো সাদা সব টুকরো।

শুধু যে মিলিয়ে গেছে ছাতের নির্দিষ্ট জায়গার কারুকাজ, তা নয়, সঠিক পাথরের ব্লকে ভয়ঙ্কর আঘাত হেনেছে বিস্ফোরক।

ওপরের পানির প্রচণ্ড চাপ সহ্য করেও প্রায় একফুট ওপরে লাফিয়ে উঠল মস্তবড় পাথরের এক ব্লক।

আরও কিছু ঘটল।

হাজার হাজার বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে আটলান্টিক মহাসাগর, এবার হাতের নাগালে পেয়েছে সবচেয়ে পুরনো ও

মূল্যবান পুরস্কার। ছাতের মাঝের গর্ত কমপক্ষে বিশ ফুট চওড়া, ওদিক দিয়ে হুড়মুড় করে নামল হাজার হাজার টন পানি। এমনই শক্তি তার, মাত্র দু'এক সেকেণ্ডে গুঁড়ো হলো দেবতার সোনালি মূর্তি।

মন্দিরের পানির ভেতর শক্তিশালী বিস্ফোরণ ছড়িয়ে দিল জোরালো এক শকওয়েভ। যেন মস্ত কোনও দানব হ্যাঁচকা টানে মেঝে থেকে তুলে নিল ভারী সব মূর্তি, সামান্য খেলনার মত ছুঁড়ে ফেলে দিল বহু দূরে।

রানার মনে হলো, ওকে ধাক্কা দিল দ্রুতগামী কোনও ট্রাক। টান দিয়ে কেড়ে নেয়া হলো হাতের ফ্ল্যাশলাইট। পাগলা ঘূর্ণির ভেতর জ্বলতে জ্বলতে হারিয়ে গেল ওটা। খুব জোরে ধুপ্ করে দেয়ালে আছড়ে পড়ল রানা। খেপা ঢেউ ও প্রবল স্রোত এতই শক্তিশালী, সরে যেতে চাইলেও নড়তে পারল না ও— যেন বোর্ডে পিন দিয়ে আটকে রাখা জ্যান্ত প্রজাপতি।

আরও কিছুক্ষণ পর থামল সব আওয়াজ। দেহের ওপর থেকে সরে গেল পানির চাপ। মিলিয়ে গেল স্রোত। বাম কবজিতে জ্বলুনি ও ব্যথা টের পেল রানা। মনে পড়ল, খুব জোরে দেয়ালে আছড়ে পড়েছিল বাম হাত।

এখনও জ্বলছে সুটের বাতি, কিন্তু কোনও কাজেই আসবে না। মন্দিরের মেঝেতে পুরু আস্তরের যে পলি-মাটি বা বালি জমেছিল, জলোচ্ছ্বাসের সময় সব মিশে গেছে পানিতে। এখন দেখতে লাগছে ভেজাল মেশানো দুধের মত।

এতদিনে পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়েছে মন্দির। নতুন করে আর ঢুকবে না সাগর। তার মানে, এবার ছাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে, ভাবল রানা। তখনই মনে পড়ল সেসিলির কথা।

কত শক্তিশালী জলোচ্ছ্বাস আসছে, আগে থেকে বোঝার উপায় ছিল না মেয়েটার। নিশ্চয়ই রানার মতই অসহায় হয়েছে, হয়তো

আহত।

রেডিয়ো ব্যবহার করতে চাইল রানা। 'সেসিলি! সেসিলি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি কোথায়? সেসিলি!'

জবাব এল না।

হয়তো রেডিওর রেঞ্জের বাইরে, মারাত্মকভাবে আহত বা মৃত।

মেঝের দিকে চলল রানা, ভুরু কুঁচকে গেছে বাম কবজির ব্যথায়। থ্রাস্টার ব্যবহার করে যাওয়া সহজ হতো, কিন্তু ঝুঁকি নিল না। কিছুর ওপর আছড়ে পড়লে বিপদ হবে।

কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, পায়ের নিচে জঞ্জাল। ভাঙা সব মূর্তি ও পাথর। জায়গাটা হয়ে উঠেছে আকাশ থেকে বোমা পড়া ক্ষত-বিক্ষত এলাকার মত।

কাদাভরা পানিতে চল্লিশ বা পঞ্চাশ ফুট দূরে অবছা আলো। রানার যে অবস্থা, ওর মনে হলো ওদিকটা প্রায় পাঁচ মাইল দূরে।

'সেসিলি!' রেডিয়োতে ডাকল রানা। চলেছে আলো লক্ষ্য করে। ওটা বোধহয় সেসিলির সুটের স্পটলাইট, নড়ছে না।

মেয়েটা কি মারা গেল?

জানা নেই।

মেঝে থেকে সামান্য ওপরে ভাসছে দেহটা।

কাছে গিয়ে দেহটা তুলে ধরল রানা। ঠোকাঠুকি হলো দুই হেলমেটের। কাদাটে পানির ভেতর সেসিলির চেহারা দেখতে চাইল ও। চোখ বুজে আছে মেয়েটা। বোঝার উপায় নেই শ্বাস নিচ্ছে কি না। বাতাসের জন্যে ক্লোসড্ সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে ডিপ সুটে। উঠছে না কোনও বুদ্বুদ। 'সেসিলি!'

এক সেকেণ্ড পর পিটপিট করে চোখ মেলল মেয়েটা।

'জেগে ওঠো, সেসিলি! এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে!'

পুরো চোখ খুলল সেসিলি। 'রানা? কী হয়েছে?'

‘সংক্ষেপে বললে, বুম! মাথা গেছে দেবতার! ঝপাস! ছাতে গর্ত! ...ঠিক আছ তো?’

ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল সেসিলি। ‘পায়ে খুব ব্য...’

‘একটু সহ্য করো। ছাত ধসে পড়তে পারে, বেরিয়ে যেতে হবে।’

‘কাজ হয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’ মেয়েটার হাত ধরল রানা। ‘থ্রাস্টার ব্যবহার করে সোজা ওপরে ওঠো।’ নিজের থ্রাস্টার কন্ট্রোল ধরল রানা। ‘তিন গুনলেই রওনা হবে। রেডি?’

মাথা দোলাল সেসিলি। যিরো বলার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল ওপরে।

ওর সঙ্গে যেতে না পেরে হাঁক ছাড়ল রানা, ‘আস্তে আস্তে!’

‘তুমি না বললে...’

‘একমিনিট!’ নষ্ট হয়ে গেছে রানার থ্রাস্টার। সুইচ টিপেও কোনও কাজ হচ্ছে না।

‘কই, এসো?’ তাড়া দিল সেসিলি।

‘পারছি কই, থ্রাস্টার কাজ করছে না।’

‘তোমার সুট কি নষ্ট হয়েছে?’

‘পুরো নষ্ট নয়, নইলে বহু আগেই স্বর্গে চলে যেতাম।’

ফিরে এসে রানার বুকে থাবা বসাল সেসিলি। ‘আমি সিরিয়াস, রানা! এসব সুট খুব যত্ন দিয়ে তৈরি। তারপরও যদি কাজ না করে কোনও সিস্টেম, সেক্ষেত্রে বিকল হয়ে যেতে পারে অন্য সিস্টেমও। তুমি ঠিকভাবে বাতাস পাচ্ছ?’

‘মনে তো হচ্ছে... চুপ হয়ে গেল রানা। শীতল অনুভূতিটা সুটের ভেতর, উরুর কাছে। ‘সর্বনাশ! পানি ঢুকছে।’

দু’জনের মাঝে দেখা দিল ছোট্ট বুদ্বুদ। রানার হেলমেটের কাঁচ স্পর্শ করে হারিয়ে গেল ওপরে।

'রানা, আর যা-ই করো, আমাকে হারিয়ে বোসো না,' হাত বাড়িয়ে সঙ্গীর কনুই ধরল সেসিলি। 'এবার উঠব আমরা।'

পানিতলের ঝড়ে আগেই বেশিরভাগ গিয়ার পড়ে গেছে মেয়েটার ইকুইপমেন্ট বেল্ট থেকে, সহজেই ওটা খামচে ধরল রানা।

ছাতে উঠবে বলে ফুল স্পিডে থ্রাস্টার চালু করল সেসিলি, তবে বাড়তি ওজনের কারণে কমে গেছে গতি।

'গতি কমাও,' ছাতের কাছে এসে সতর্ক করল রানা। 'বাড়ি খেয়ো না এবড়োখেবড়ো পাথরে।'

'দেরি করলে বাতাসের অভাবে মরব,' বলল সেসিলি। অবশ্য শুনল রানার কথা। মুক্ত হাতে ধরতে চাইল ছাত। কী যেন লাগল হাতে। 'প্রায় পৌঁছে গেছি। ছাতে আটকে আছে বাতাস, এয়ার পকেট।' আরেকটু উঠতেই আইভান্নি ছাতে ঠুকে গেল ওর হেলমেট।

ছাত ও পানির মাঝের সংকীর্ণ জায়গাটায় চোখ ভুলল ওরা। সত্যিই পানির ভেতর আটকা পড়েছে বাতাস। অবাক হয়ে দেখল, এখানে আলোও আছে পানিতে ভাসছে শেষবার ফেলা গ্লো স্টিক।

দশ গজ দূরে ঝুলে গেছে ছাত। সেজন্যেই বেরিয়ে যেতে পারেনি বাতাস।

একদিকের দেয়াল দেখাল রানা। 'আমরা ওদিকের ছাতের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে,' আবারও তলিয়ে গেল সেসিলি। ওর বেল্ট ধরে থাকল রানা। দু'জনকে টেনে দক্ষিণ দেয়াল লক্ষ্য করে চলেছে থ্রাস্টার। গ্লো স্টিকের নরম কমলা আলোয় ওরা পৌঁছে গেল ঝুঁকে আসা ছাতের কাছে।

'সাবধান, পাথর পড়তে পারে,' সতর্ক করল রানা।

‘শক্তিশালী বোমা ব্যবহার করলে এমন হতেই পারে,’ বলল মেয়েটা। ছাত স্পর্শ করতে গিয়ে আরও সতর্ক হলো। দেখল বিস্ফোরণে চুরমার হয়েছে আইভরি, কোনও কোনও অংশ ছুরির মত ধারালো।

একই সময়ে হালকা স্রোত টের পেল সেলিলি ও রানা। কমে গেছে পানিতে ভাসমান জঞ্জাল।

‘রানা! আমি বোধহয় ঠিক জায়গা পেয়ে গেছি!’

‘গুড! এবার সাবধানে...’

কড়াৎ আওয়াজ তুলে প্রকাণ্ড একটা পাথরের ব্লক খসে পড়ল ছাত থেকে। সাঁই করে নেমে গেল মেঝে লক্ষ্য করে। সঙ্গে নিল বিশাল এলাকার হাতির দাঁতের কারুকাজ। তার আগে বাড়ি দিয়ে গেছে সেসিলির সুটের পেছনে। পানির ভেতর ডিগবাজি খেল মেয়েটা।

খপ্ করে হাত ধরে ওকে সোজা করল রানা। ‘ঠিক আছ?’ ব্যস্ত হয়ে পরীক্ষা করল সেসিলির সুট। ভাঙা ডিমের মত চ্যাপটা হয়েছে এয়ার ট্যাঙ্কের গোলাকার কেসিং ও রিব্রিদার সিস্টেম। ‘আমার সুট প্রায় খতম, সেসিলি। দম নিতে পারছ?’

দুশ্চিন্তা নিয়ে শ্বাস নিল সেসিলি। ‘কী যেন হয়েছে। বাতাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমার মনে হয় নষ্ট হয়েছে রেগুলেটর!’

মেয়েটাকে মানসিকভাবে স্থির রাখতে তার হাত আবারও ধরল রানা। ‘শান্ত হও, সেসিলি। এবার মন্দির থেকে বেরিয়ে যাব, তারপর খুঁজে নেব জ্যাকে। সোজা উঠব সাগর সমতলে। তাতে লাগবে বড়জোর পনেরো মিনিট। বাতাস বাঁচিয়ে চলতে হবে। ভুলেও উত্তেজিত হবে না, ঠিক আছে?’

‘আচ্ছা,’ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সেসিলি।

ছাতের ভাঙা অংশে পৌঁছে থ্রাস্টার ব্যবহার করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল সেসিলি, পেছনে চলেছে রানা।

বেশ পরিষ্কার বাইরের পানি। চারপাশে আলো দেখবে ভেবেছিল রানা, তা মিথ্যা হলো না। কিন্তু ওসব আলো ওদের পরিচিত নয়।

'আরেকটা সাব!' বলল সেসিলি। একপাশের বালিতে মুচড়ে আছে বিধ্বস্ত ডুবোযান। ওটা নষ্ট হয়ে গেলেও ব্যাটারি সেকশন এখনও পানিরোধক। কারণ ছাড়াই জ্বেলে রেখেছে স্পটলাইট। 'ডোনাটি লুক্কা!'

'আশপাশে কোথাও থাকবে জ্যাঁ,' বলল রানা। মাইকে হাঁক ছাড়ল, 'জ্যাঁ, শুনছ? আমরা মন্দিরের বাইরে! আবারও বলছি, আমরা মন্দিরের বাইরে! শুনছ?'

বন্ধু যোগাযোগ করবে, ভেবেছিল রানা। কিন্তু দশ সেকেণ্ড পেরিয়ে যাওয়ার পর তাড়া দিল সেসিলি, 'কই, এল না তো?'

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল রানা।

এইমাত্র ওপর থেকে এসেছে জোরালো আওয়াজ: 'ক্লং!'

'কী হচ্ছে? ওটা কীসের আওয়াজ?' চমকে গেছে সেসিলি।

'আমি পশ্চিমে, চলে এসো, রানা!' মন্দির থেকে দূরে সরে গেছে মউরোস, দেখা গেল ওর সুটের বাতি। 'রানা, সাগর সমতলে বোমা ফাটিয়ে দ্য_স্লায়েন্টিস্ট ভলিয়ে দিয়েছে ডোনাটি লুক্কা!'

পশ্চিমে তাকাল রানা। চোখের কোণে দেখল ওদের দিকেই নামছে কীসব যেন। সাগর গভীরে যেন জেগে উঠেছে ভয়ঙ্কর কোনও জলদানব। 'ক্যাঁচকোঁচ... ক্লং! ঘ্লং!'

'মন্দির থেকে সরে সোজা ওপরে ওঠো সবাই!' তাড়া দিল রানা।

খপ্ করে ওর হাত ধরেছে সেসিলি। চেয়ে আছে ওপরে।

মন্দিরের ছাত, সাগরতলের কাদা ও বালির মেঝেতে নেমে আসছে নানান ভারী জিনিস। রানার পাশে পড়ল একটা চকচকে

প্লায়ার্স। সাঁতরে সরে গেল ওরা।

'আরেকটু হলে গেছিলাম!' বলে উঠল মউরোস। বোটের মাঝারি এক নোঙর নেমে এসেছে ওর একফুট দূরে।

চারপাশে শুরু হয়েছে ধাতব বৃষ্টি।

মউরোসের দিকে চেয়ে চমকে গেল রানা, ওর বন্ধুর মাথা থেকে কয়েক গজ ওপরে...

'জ্যা! সরে যাও!'

একটু দেরিতে বুঝল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি, সরে যেতে চাইল, কিন্তু যেখানে ছিল, ওখানে নামল দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজের হেলিকপ্টার। চারপাশে ছিটিয়ে গেল কাদা ও বালি।

আর দেখা গেল না মউরোসকে।

'জ্যা!' অসহায় সুরে ডাকল রানা। সাঁতরে যেতে চাইল বন্ধুর শেষ অবস্থান লক্ষ্য করে। কিন্তু শক্ত হাতে ওর কবজি আঁকড়ে ধরল সেসিলি। 'জ্যা!' কবজির ব্যথা ভুলে গেছে রানা।

'ও নেই, রানা!' বলল মেয়েটা, 'আর বেঁচে থাকলে সাগর সমতলে দেখা করবে! এসো! উঠে যেতে হবে!'

ঘুরে সেসিলিকে দেখল রানা। 'আমি ওকে ফেলে যাব না!'

'উপায় নেই, রানা! ওদিকে দেখো!' আকাশের দিকে আঙুল তাক করেছে সেসিলি।

নানান জঞ্জাল পড়ছে সাগরতলে। যন্ত্রপাতি, হ্যাচ কাভার, রেলিঙের টুকরো, এমন কী বাদ পড়েনি দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজের রেইডার ডোম। আবছা আলোয় ওরা দেখল, ওদের দিকেই নামছে হলদে রঙের মস্ত কী যেন।

সাবমারসিবল কিলার-ওয়েইল ডোযার!

একহাতে কোমর জড়িয়ে ধরে মেয়েটার কন্ট্রোল সিস্টেমের বাটন টিপে দিল রানা। ওদেরকে নিয়ে পশ্চিম লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল থ্রাস্টার।

একটু দূরে মন্দিরের ছাতে পড়ল হলদে সাবমারসিবল, ধসিয়ে দিল পাথরের ব্লক। পরক্ষণে সাবমারসিবলের সঙ্গে যোগ দিল ভারী ক্রেন। ওটার একটা অংশ পড়ল রানা-সেসিলির মাত্র কয়েক ফুট দূরে। ছিটকে উঠল পলি ও বালি। আঁধার হয়ে উঠল চারপাশ।

ভীষণ ভয় পেয়েছে সেসিলি। 'রানা! চলো! ওঠো!'

'অসম্ভব!' রানার কণ্ঠে জেদ ও ক্ষোভ। 'আগে দেখব জ্যাঁর কী হয়েছে।'

'শেষে তো মরবে নিজেই!'

'তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু জান থাকতে বন্ধুকে ফেলে পালাব না।'

'তুমি বিপদে পড়লে তোমাকে বাঁচাতে চাইত মউরোস?'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

চুপ হয়ে গেল সেসিলি।

একটা ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল রেডিয়োতে। রানা জানল না, বন্ধুর কথা শুনেছে আহত মউরোস। গর্বে বুক ভরে গেছে ওর। এমন মস্ত হৃদয়ের বন্ধু ক'জন পায়?

সর্বোচ্চ গতি তুলে চলেছে থ্রাস্টার। দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল হেলিকপ্টারের কাছে। যান্ত্রিক ফড়িঙের লেজের কাছে থামল রানা। ধক্ করে উঠল বুক। পলির মেঝেতে পড়ে গলা কাটা মোরগের মত ছটফট করছে জ্যাঁ। পরিষ্কার বোঝা গেল, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।

ওর পাশে নেমে এল রানা। কাদাটে পানির ভেতর দেখছে অস্পষ্ট। কপ্টারের লেজের শেষাংশ পড়ে ভেঙে দিয়েছে মউরোসের ডান গোড়ালির হাড়। চট্ করে বন্ধুর সুট পরীক্ষা করল রানা। শুনল জোরালো আওয়াজ: 'ঢং! ক্লং!'

চিৎকার করল সেসিলি, 'রানা, নামছে দ্য সায়েন্টিস্ট!'

দু'হাতে হেলিকপ্টারের লেজ সরাতে চাইছে রানা, কিন্তু ওটার

ওজন অনেক বেশি।

'সেসিলি, হাত লাগাও!'

নেমে এসে হেলিকপ্টারের লেজের অ্যালিউমিনিয়াম অংশ সরাতে চাইল মেয়েটা। ব্যথায় আহত জন্তুর মত ছটফট করছে মউরোস। ভারী দণ্ড সরিয়ে দিতে গায়ের সমস্ত জোর খাটাল রানা ও সেসিলি। মনে হলো একটু নড়ল জিনিসটা। সত্যিই উঠেছে সামান্য ওপরে। ওই সুযোগে পা টেনে নিল মউরোস।

একহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল রানা, আরেক হাতে সেসিলির কোমর। 'সেসিলি, আপাতত সমান্তরালভাবে চলো পশ্চিম দিকে! ...পরে উঠব!'

কথাটা মানল মেয়েটা, চোখ ওপরে। বুঝে গেছে, কেন সাঁতার কেটে সামনে এগোতে চাইছে রানা।

ওপর থেকে নামছে বিশাল কী যেন, সাদা রঙের!

ডিপ-সি রিসার্চ ভেসেল দ্য সায়েন্টিস্ট! এখনও জ্বলছে ইমার্জেন্সি বাতি। আহত দানবের মত গুঙিয়ে উঠছে ধাতব খোল। প্রকাণ্ড মিসাইলের মত নামছে ওদের দিকে!

থ্রাস্টার কন্ট্রোল বাটন টিপে বুড়ো আঙুলের নখ সাদা করে ফেলল সেসিলি। তিনজনের ভারী ওজন টানতে গিয়ে কমে গেছে থ্রাস্টারের গতি। মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে জাহাজের পেছনের দিকটা, সাগরতলের সঙ্গে চ্যাপ্টা করে দেবে ওদেরকে!

'আমাকে ফেলে যাও, গতি বাড়বে!' তাগাদা দিল মউরোস।

'চুপ! আর একটা কথা বললে মার খাবে!' ধমক দিল রানা। আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল বন্ধুর কোমর। ঘাড় কাত করে ওপরে তাকাল।

আর মাত্র ত্রিশ ফুট ওপরে জাহাজের খোল! ওটার তলা থেকে বেরোতে চাইলে সরে যেতে হবে অন্তত আরও দশ ফুট!

রানার মন বলে দিল, আর কিছুই করার নেই!

তিনজনের দলটা চলেছে জাহাজের তলা দিয়ে...

আর পনেরো ফুট ওপরে রিসার্চ শিপ...

শেষ তিন ফুট আর পেরোতে পারবে না ওরা!

এবার চাপা পড়বে প্রচণ্ড ওজনের নিচে!

তখনই দু' সেকেণ্ডের জন্যে থামল মস্ত জাহাজের পতন। বো ও মাঝের অংশ পড়ল মন্দিরের পাথুরে ছাতে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিড়েখুঁড়ে গেল সমস্ত জোড়া ও ওয়েল্ডিং। ভুস্ করে বেরোল লুকিয়ে থাকা বাতাস। সব রিভেট, পোর্টহোল এমন কী দরজাও বিস্ফোরিত হয়ে ছিটকে গেল গ্রেনেডের শ্র্যাপনেলের মত।

হতবাক রানা-মউরোস-সেসিলি দেখল, মাথার মাত্র একফুট ওপরে জাহাজের প্রপেলার, পরক্ষণে পেছনে পড়ল ওটা!

ওদেরকে টেনে সরিয়ে নিয়েছে থ্রাস্টার!

তৃতীয় সেকেণ্ডে সাগরতলে নামল স্টার্ন!

বিকট আওয়াজে কানে তালা লাগল ওদের। সামলে নেয়ার আগেই খড়কুটোর মত ভেসে গেল শকওয়েভের তোড়ে।

সাগরতলে শুরু হয়েছে ধাতুর করুণ আর্তনাদ। খুব ধীরে কাত হয়ে ক্ষুরের মত মন্দিরের বুকে চেপে বসল জাহাজ। তিন হাজার টন স্টিলের ওজন নেয়ার সাধ্য বিশ্বের কোনও স্থাপত্যের নেই। ভাঙা মন্দিরের ছাত বিস্ফোরিত হতেই প্রধান কক্ষের পানি সরিয়ে জায়গা করে নিল ধাতব সব পাত। ছাত হারিয়ে যেতেই ধসে পড়ল চারদিকের দেয়াল। নানানদিকে ছিটকে গেল বড় সব পাথরখণ্ড।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল আটলান্টিস রাজ্যের প্রধান দুর্গ এলাকা ও পসেইডনের মন্দির।

কিছুক্ষণ পর থামল সব আওয়াজ। রানা টের পেল, ঝনঝন করছে মাথার ভেতর। তখনই উপলব্ধি করল, সত্যিই এখনও বেঁচে আছে! কী যেন ধরে রেখেছে শক্ত করে। পাশে তাকিয়ে দেখল মউরোসের হাত ছাড়েনি। কিন্তু প্রবল তোড়ে অন্য হাত থেকে ছুটে

গেছে সেসিলি! চারপাশে চোখ বোলাল রানা। 'সেসিলি, তুমি কোথায়?'

মউরোস আর ওর সুটের বাতি ছাড়া অন্ধকারে কোনও আলো নেই।

'আমি এখানে,' কয়েক সেকেণ্ড পর এল সেসিলির কণ্ঠ। 'তোমাদের আন্দাজ পাঁচ গজ পেছনে। আসছি।'

ওদিকে তাকাল রানা। 'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'নষ্ট হয়ে গেছে সুটের বাতি, অপেক্ষা করো।' কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল কমলা আভা। মেয়েটার ডানহাতে ছোট এক টুকরো গ্লো স্টিক। 'নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এয়ার সিস্টেম, কঠিন হয়ে উঠেছে বাতাস পাওয়া।'

'এখনও কাজ করছে তোমার থ্রাস্টার?'

'হ্যাঁ। তোমার সুটে যে ফুটো হয়েছে...'

রানা টের পেল, ভিজে গেছে। 'বোধহয় আরও বড় হয়েছে ফুটো।' একবার তাকাল মন্দিরের দিকে। ধ্বংসস্তূপের ভেতর এখনও জ্বলছে জাহাজের কয়েকটা বাতি।

'লাবনীর কথা ভেবে ভয় লাগছে,' দুর্বল শোনাল সেসিলির কণ্ঠ। 'জাহাজে ছিল। ডোনাটি লুক্কা কখনও সাক্ষী রাখে না।'

বন্ধুকে দেখল রানা। যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে আছে মউরোস। 'ব্যথা সহ্য করতে পারবে, জ্যা?'

'আমি ঠিক আছি,' বলল মউরোস। 'এতক্ষণ যখন পেরেছি, আরও অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারব।'

'ওপরে উঠতে হবে, তারপর দেখব কী করা যায়,' বলল রানা। ওর ইশারায় পাশে এসে থামল সেসিলি।

পাশাপাশি হয়ে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরল তিনজন। থ্রাস্টার ব্যবহার করল সেসিলি।

হেলমেটের ছোট্ট ডিজিটাল ডেপ্‌থ্ গজ দেখল রানা।

বড় ধীর গতি তুলে উঠছে ওরা। অর্ধেকের চেয়েও কমে গেছে থ্রাস্টারের গতি। হিসাব কষল রানা। আন্দাজ ত্রিশ মিনিট লাগবে সাগর সমতলে উঠতে। কিন্তু সেসিলির এয়ার সাপ্লাই পুরো নষ্ট হলে...

'শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, সেসিলি?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল সেসিলি, 'হিসহিস শব্দ শুনছি রেগুলেটরে। পুরো সাপ্লাই পাচ্ছি না।'

'অনুভূতিটা কেমন সেটা জানাও।'

'মাথা ঘুরছে। আর মনে হচ্ছে বমি হবে।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। হাইপোক্সিয়ার প্রথম সিম্পটম। কম অক্সিজেন পাচ্ছে সেসিলি। সারফেসে ওঠার আগেই হারাতে পারে জ্ঞান। সেক্ষেত্রে মেয়েটার থ্রাস্টার চালাতে হবে ওকে। ওই বাটন এমন নয় যে ওটার ওপর কিছু চাপিয়ে দিলেই হবে। 'জ্যা, ব্যথার কী অবস্থা?'

'তাবা-তাবা হয়ে যাচ্ছি।'

'প্রয়োজনে তোমার কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিলে, তখন জাপ্টে ধরে রাখতে পারবে আমাকে?'

'ঠিক আছে, পারব।'

'সেসিলি, বেশি মাথা ঘুরলে বলবে। তখন থ্রাস্টার চালাব আমি। চিন্তা কোরো না। একটু পর উঠে যাব ওপরে।'

'আসলে কী হয়েছে, এমন লাগছে কেন আমার?' ঘুম ঘুম স্বরে বলল সেসিলি।

'কিছুই হয়নি।'

নীরবে কয়েক মিনিট সাগর সমতলের দিকে উঠল ওরা। মাঝে মাঝে হেডফোনে মউরোসের চাপা গোঙানি শুনছে অন্য দু'জন।

ডেপথ গজ দেখল রানা।

এখনও উঠতে হবে ছয় শ' পঞ্চাশ ফুট!

‘রানা?’ বলেই চুপ হয়ে গেল সেসিলি।

‘হ্যাঁ, বলো,’ সতর্ক হয়ে গেছে রানা।

‘আমার মনে হয় একটু ঘুমাতে হবে।’

‘আর একটু জেগে থাকো।’

‘তুমি জানো, ওই লুক্কা কত ভয়ঙ্কর লোক?’

‘হ্যাঁ, জানি।’

‘আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।’

‘সেজন্য শাস্তি পেতে হবে তাকে।’

হাই তুলল সেসিলি। ‘আউ... জানে না, আমরা কত কাছে পৌঁছে গিয়েছি... আর ঠেকাতে পারবে না আমাদেরকে।’

‘কীসের কাছে পৌঁচেছ?’ অবাক হয়েছে রানা। ‘সেসিলি?’

জবাব নেই। থেমে গেছে থ্রাস্টারের পাখা। ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা।

‘যাহ্, ঘুমিয়ে গেছে,’ মউরোসকে বলল রানা।

‘জানো, কত গভীরে?’ জানতে চাইল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি। ‘প্রায় ছয় শ’ ফুট নিচে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

ওদের সুটের ওপর কমপক্ষে টোয়েন্টি অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার। রানার সুটের ফুটো আরও বড় হলে মরবে করুণভাবে।

সেসিলির কোমর জাপ্টে ধরে মউরোসের কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা। বাটন টিপে থ্রাস্টার চালু করার আগে বন্ধুকে বলল, ‘এখন থেকে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে রাখবে।’

‘আচ্ছা।’

‘রেডি?’

‘হ্যাঁ।’ রানার কোমর জাপ্টে ধরল মউরোস।

মন্থর গতিতে পানি কেটে উঠছে তিনজনের ভাঙাচোরা দল। একজন ঘুমন্ত, আরেকজন আহত, তৃতীয়জনের সুটের ফাটল

বাড়লে মরবে মাত্র এক সেকেণ্ডে।

সুটের ভেতর শীতল হয়ে আসছে রানার দেহ। একবার শিউরে উঠল। ফুল পাওয়ারে ব্যবহার করছে থ্রাস্টার। ডিজিটাল ডেপথ গজ দেখাচ্ছে ধীরে ধীরে উঠছে ওরা। নিজেরা সাঁতার কেটে গতি বাড়াবে, সে সাধ্য নেই। প্রশিক্ষণ বা শারীরিক শক্তি কাজে আসছে না রানার। বড় দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। সাগরের চাপ ও শীতলতা খেয়ে ফেলছে ওর সব শক্তি।

ওরা পৌঁছে গেল পাঁচ শ' ফুট গভীরতায়।

কিছুই দেখা গেল না ঘুটঘুটে আঁধার ছাড়া।

খুব শীত লাগছে রানার। অবশ হয়ে আসছে দেহ।

চার শ' ফুট গভীরতায় প্রথমবারের মত ওপরে দেখল আবছা আলো। যেন গাঢ় নীল কালিভরা দোয়াত থেকে এল এক ওয়াটের সামান্য বাতি। আরও কিছুক্ষণ পর ওদের সুটের আলোয় দেখা গেল নানান মাছের ঝাঁক, শীতল অনাগ্রহী চোখে দেখল বিদঘুটে দলটাকে।

হেলমেটে হেলমেট ঠেকিয়ে সেসিলিকে দেখল রানা। চোখ বুজে আছে মেয়েটা। যেন তলিয়ে গেছে শান্তির ঘুমে। বোঝার উপায় নেই শ্বাস নিচ্ছে কি না। নাকের পাটা লক্ষ্য করেও কিছু বোঝা গেল না। হয়তো মারা গেছে নীরবে।

দু' শ' ফুট গভীরে পৌঁছে ওপরে সূর্য দেখল রানা ও মউরোস। উজ্জ্বল আলোর এক চাদর বিছিয়ে পড়েছে চারপাশে। থ্রাস্টারের গুণে একফুট একফুট করে উঠছে ডেপথ গজের কাউন্টার।

ওটা দেখতেই থেমে গেল থ্রাস্টার। ব্যস্ত হয়ে কন্ট্রোল বাটন টিপল রানা। ভেবেছিল, বাটন থেকে সরে গেছে অবশ আঙুল। তা নয়, আর ঘুরল না নিচের পাখা।

সাবমারসিবলের গতির সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে ডিপ সুট। কিন্তু থ্রাস্টার নষ্ট হলে নিজ থেকে উঠবে, তার উপায় নেই।

ফুরিয়ে গেছে ব্যাটারির ক্ষমতা।

এখনও পুরো এক শ' ফুটেরও বেশি নিচে রয়ে গেছে ওরা।

বুঝে গেছে সমস্যা কোথায়, হতাশ হয়ে বলল মউরোস, 'মরুক শালার থ্রাস্টার!'

'সাঁতার কেটে উঠতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হয়তো, কিন্তু মনে হবে আছি প্রতিটা মুহূর্ত নরকে। শীতের ভেতর ভাঙা হাড়ে এমনিতেই দারুণ ব্যথা!'

চুপ করে থাকল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তা হলে রওনা হও, আমি আসছি সেসিলিকে নিয়ে।'

'কাজটা খুব কঠিন, পারবে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মউরোস।

'পারতে হবে,' কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ। 'আগে দেখব ঘুম ভাঙাতে পারি কি না। সামান্য সাহায্য পেলেও তা কাজে আসবে।' দু'হাতে ধরে সেলিলিকে ঝাঁকি দিল ও। চোখ মেলল না মেয়েটা। আর কিছু করার নেই। 'রওনা হয়ে যাও, জ্যা!'

ডানহাতে সেসিলির কোমর জড়িয়ে ধরে ফিন পরা দু'পা নাড়তে লাগল রানা। ভাঙা পা নিয়েও মউরোসের গতি ওর চেয়ে বেশি। দশ ফুট উঠতেই রানার মনে হলো, অন্তত দশ কেজি বেড়ে গেছে মেয়েটার ওজন। বুঝে গেল, দুটো ডিপ সুটের ওজন নিয়ে ওঠা, আড়াই শ' পাউণ্ডের কাউকে কাঁধে তুলে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাওয়ার মতই কঠিন।

নব্বুই ফুট... আশি... সত্তর...

ওপরে উঠতে গিয়ে বারবার রানার চোখ পড়ছে ডেপথ কাউণ্টারে। প্রতিটি ফুট যেন এক শ' ফুটেরও বেশি। বারবার মনে হচ্ছে, একটু না থামলে মরেই যাবে। এখন দরকার একটু বিশ্রাম। ভীষণ ক্লান্ত হাত-পায়ের মাংসপেশি। কিন্তু থামল না রানা। মুক্ত বাতাসে পৌঁছে দিতে হবে সেসিলিকে।

চল্লিশ... ত্রিশ...

ওই যে, দশ ফুট ওপরে মউরোস!

ঢেউয়ের ফাঁক দিয়ে আসছে লালচে রোদ। নিচে নামছে ডেপথ গজ কাউন্টার... দশ... নয়... আট...

ওপরে ঢেউয়ের দুলুনি টের পেল রানা। সেসিলির সুটের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে ওর সুটের। আর পাঁচ ফুট... চার...

তিন মাইল ফুলস্পিডে দৌড়ে আসা চিতার মত হাঁপিয়ে চলেছে রানা। এবার যে কোনও সময়ে হাল ছেড়ে দেবে...

ভুস্!

সাগর সমতলে উঠে এল রানা। দিগন্তের কাছে লাল সূর্য। ওর হেলমেট থেকে গড়িয়ে পড়ছে পানি। শুনল: 'শাবাশ!'

সামান্য দূরে সাঁতার কাটছে মউরোস। তীব্র ব্যথায় কুঁচকে আছে চেহারা।

গভীর সাগরে সময়ের অভাব ছিল, এবার সেসিলির দিকে মনোযোগ দিল রানা। নীল হয়ে গেছে মেয়েটার ত্বক। সুট খোলা জরুরি, কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব। ঠিকভাবে খুলতে হলে সাহায্য লাগবে অন্তত দু'জনের। সাঁতার কাটছে জখমী মউরোস, সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু হাল ছাড়ল না রানা, খামচে ছিঁড়তে চাইল সেসিলির ঘাড়ের কাছের সিল। অবশ আঙুলে ফস্কে যেতে চাইছে কঠিন সব গিঁঠ। কনুইয়ের ভাঁজে সেসিলির হেলমেট ধরল ও, মোচড় মেরে খুলতে চাইল।

ঘুরল হেলমেটের প্যাঁচ। উঠে আসছে লকিং পিন। কয়েক সেকেণ্ড পর সেসিলির হেলমেট খুলে সাগরে ছুঁড়ে ফেলল রানা।

শিথিল ভঙ্গিতে কাঁধের কাছে ঝুলছে মেয়েটার মাথা।

একহাতে ধরে ওকে ভাসিয়ে রেখেছে রানা, অন্যহাতে আলতো চাপড় দিল গালে। 'সেসিলি, জেগে ওঠো!' অজ্ঞান দেহের থুতনিতে চুমু দিচ্ছে ঢেউ। মুখে মুখ রেখে শ্বাস চালু করতে হবে। কিন্তু নিজের হেলমেট খুলতে পারবে না রানা বা মউরোস, ছেড়ে

দিলেই টুপ করে ডুববে মেয়েটা।

'সেসিলি, জেগে ওঠো!'

বড় করে দম নিল মেয়েটা। কাশল দু'বার, তারপর হাঁ করে দম নিল। তিরতির করে কেঁপে উঠেই খুলে গেল চোখ। ফিসফিস করে বলল, 'কে, রানা?'

'তাই তো মনে হয়,' বলল রানা। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে দেহ। 'আমরা ওপরে। তুমি ঠিক আছ?'

'অসুস্থ লাগছে... মাথায় খুব ব্যথা।'

'আসল কথা বেঁচে থাকা। হাত লাগাও, খোলো আমার মাথার বালতি।'

একটু দূরে এক পায়ে সাঁতার কেটে ভেসে আছে মউরোস, মুখ খুব শুকনো। চুপচাপ দেখছে রানার হেলমেটের গিঁঠ খুলছে মেয়েটা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'জানো, এত কিছু করেও কোনও লাভ হলো না?'

'কেন লাভ হবে না?' আপত্তির চোখে ওকে দেখল সেসিলি। পরক্ষণে তাকাল চারপাশে। বুঝে গেছে। 'ওহ্! আমরা আছি আটলান্টিকের মাঝে!'

'আমরা উঠে এসেছি, কিন্তু আমাদের জাহাজ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে এখন সাগরের নিচে,' বলল মউরোস। 'সাঁতার কেটে কোথাও যাওয়ার নেই।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রানা। 'আমরা সাঁতার কাটব না।'

'তো এমনিতেই হাল ছেড়ে তলিয়ে যাব? এ-ও তো অসম্ভব!'

'কষ্ট পেয়েই মরতে হবে,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সেসিলি।

এবার হাত তুলে দেখিয়ে দিল রানা। 'ওই দেখো, বৈঠা মেরে আমাদের দিকে আসছেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড।'

ঘুরে তাকাল মউরোস ও সেসিলি।

মাত্র এক শ' গজ দূরেই লাইফবোট। বোটের ডগায় পরিষ্কার দেখা গেল ক্যাপ্টেনের সাদা ইউনিফর্ম।

'আশ্চর্য!' নিচু স্বরে বলল সেসিলি। 'ওদের মেরে ফেলল না কেন ডোনাটি লুক্কা? শত্রুদের সবসময় তা-ই করে ও। ...ওহ্, মাই গড!' খপ্ করে রানার বাহু ধরল মেয়েটা। 'লাবনী! লাবনীকে নিয়ে গেছে বদমাসটা!'

প্রশ্ন তুলল রানা: 'সে চেয়েছিল খুন হোক লাবনী, তা হলে মনোভাব পাল্টে নেবে কেন?'

'ব্রাযিলের মন্দিরের ব্যাপারে জরুরি কিছু জানে লাবনী,' বলল সেসিলি, 'এতই গুরুত্বপূর্ণ, ওটা পেতে হয়তো চুক্তি করেছে লোকটা। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিয়েছে জাহাজের ক্রুদেরকে। একটু পর ওদের কাছ থেকে জেনে নেব কী হয়েছে। দাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি তোমার শিরস্ত্রাণ।' আবারও রানার হেলমেট খুলতে হাত ওপরে তুলল।

কিন্তু বাধা দিল রানা। 'আপাতত থাক আমার হেলমেট। বোটে উঠে খুলব।'

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল মউরোস। 'আগে খুললে কী হবে?'

'কারণ, তিনজনের ভেতর আমার সুটের রেডিয়ো এখনও ঠিক আছে। ডেকে আনতে হবে না অন্য জাহাজ?'

পাঁচ মিনিট পর লাইফবোটে বসে বুক ভরে সাগরের তাজা বাতাস টেনে নিল রানা। ওর ধারণাই ঠিক: সাগরে কোনও রেডিয়ো ছাড়াই ক্রুদের নামিয়ে দিয়েছে ডোনাটি লুক্কা। কিন্তু ভাসমান জঞ্জালের মাঝ দিয়ে এসে রানাদের তুলে নিয়েছে দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজের ক্রুরা। এরই ভেতর মউরোসের গোড়ালির চিকিৎসা করছেন ডাক্তার। এদিকে রানার ডিপ সুটের রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার নিয়ে কাজে নেমেছে ইঞ্জিনিয়ার। কিছুক্ষণের ভেতর তৈরি হলো অল্প রেঞ্জের রেডিয়ো। খুব যে শক্তিশালী রেডিয়ো

দরকার, তা-ও নয়। ম্যারিটাইম স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী, ব্যস্ত এলাকা গালফ অভ কেডিয। ক্যাপ্টেনকে রানা জানাল, আপাতত ডিসট্রেস কল না পাঠানোই ভাল। কে জানে, হয়তো সবচেয়ে কাছের জাহাজ ওই ডোনাটি লুক্কারটাই!

ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডের কাছ থেকে ওরা শুনল, কী ঘটেছে দ্য সায়েন্টিস্ট জাহাজে।

'তা হলে আপনাদেরকে বাঁচাতে ডোনাটি লুক্কার হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছে লাবনী?' জানতে চাইল সেসিলি।

মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন। 'যদিও লোকটা বলেছে, এর পরেও খুন করবে মিস আলমকে। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁর প্রতি।'

চুপ করে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে রইল সেসিলি।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'এখনও বেঁচে আছে। এখনই সব বলে দেবে না লোকটাকে, সময় নেবে। দেখো, আমরা খুঁজে বের করব লাবনীকে।'

'কী করে?' হতাশ কণ্ঠ সেসিলির। 'বন্দর পর্যন্ত পিছু নিলেও তো ততক্ষণে জাহাজ থেকে নেমে যাবে লুক্কা। হয়তো উঠবে কোনও হেলিকপ্টারে। বা স্পিড বোট ব্যবহার করে চলে যাবে অন্য কোথাও। আমরা ছুঁতেও পারব না তাকে।'

'কোনও না কোনও জরুরি তথ্য পাব,' চুপ হয়ে গেল রানা।

রাতের প্রথম ঝিকিমিকি নক্ষত্র হাসল পরিষ্কার আকাশে।

'আসলে, ডক্টর আলম আপনার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গেছেন,' রানার উদ্দেশে বললেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। 'অবশ্য বুঝিনি কী বলতে চেয়েছেন। শুধু বলেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা হলে যেন জানাই।'

'কী বলেছে?' সোজা হয়ে বসল রানা।

'বেশি কিছু না। উনি নাকি দূর এক দেশ থেকে আপনাকে পোস্টকার্ড পাঠাবেন।'

'পোস্টকার্ড?' রানার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল সেসিলি।

নিঃশব্দে হাসছে রানা। চেয়ে আছে দূরের সাগরে।

'কী হয়েছে, হাসছ যে?' জানতে চাইল সেসিলি।

সাগর থেকে চোখ সরিয়ে মেয়েটাকে দেখল রানা। 'কারণ লাবনী জানিয়ে দিয়েছে, ঠিক কোথায় চলেছে।'

চব্বিশ

তিব্বতীয় হিমালয়ের প্রকাণ্ড সব চূড়ার মাঝের আকাশ ব্যবহার করে খাপাটি খাপাটি আওয়াজে ছুটে চলেছে হেলিকপ্টার। একটু পর আসবে পাহাড়ি ভোর। পুবে আবছা আলো দেখল লাবনী। এয়ারক্রাফটের পেছনের অংশে বসিয়ে ওকে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র এক লোক। উল্টো দিকের সিটে বসেছে ডোনাটি লুক্কা, হেণ্ড্রিক ড্রেক ও জিম করেলি। দুর্নীতিপরায়ণ প্রফেসরের সাহস হয়নি যে লাবনীর সঙ্গে কথা বলবে। চোখে চোখ পড়লেই অন্য দিকে তাকাচ্ছে সে।

পেছনের হেলিকপ্টারে করে আসছে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র কমাণ্ডো। তাদের সঙ্গে আছে প্রকাণ্ড এক ক্রেট। ওটা যে ভাল কাজের জন্যে আনা হচ্ছে না, তা বুঝে গেছে লাবনী।

ওকে তাড়া দিল লুক্কা, 'বলছিলেন বিস্ফোরিত হলো...'

'হ্যাঁ,' মনের চোখে ব্রাযিলের মন্দিরের দেয়ালচিত্র দেখল লাবনী। 'তলিয়ে যেতে শুরু করেছে দ্বীপ। আর জেগে উঠেছে উত্তরদিকের আগ্নেয়গিরি। ওরা জানত মন্দিরের দেয়ালে কী লেখা।

কিন্তু মনে হয় না জানত কত দ্রুত ধ্বংস হবে দ্বীপ।'

'আরও অনেক আগেই ধ্বংস হওয়া উচিত ছিল,' বলল লুক্কা। 'তা হলে আর পালাতে পারত না।'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল লাবনী। 'আসলে আপনার সমস্যাটা কী, মিস্টার লুক্কা? আটলান্টিয়ানদের এত ঘৃণা করেন কেন? আজ থেকে এগারো হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়েছে তাদের সাম্রাজ্য, অথচ আপনার জন্মের রাগ গেল না?'

'ওই সাম্রাজ্য আসলে পুরো বিনষ্ট হয়নি, ডক্টর আলম,' বলল লুক্কা। 'আজও আছে ওটা।'

'তাই? তা হলে কোথায় সেই অদৃশ্য আটলান্টিয়ান রাজ্য?'

টিটকারি পাত্তা দিল লুক্কা। 'আপনি অদৃশ্য রাজ্যের কথা বলছেন? চোখের সামনে দেখবে না কেউ। কিন্তু আছে। তাতে কোনও ভুল নেই। আমাদের মাঝেই বিরাজ করছে এসব আটলান্টিয়ান। প্রথম সুযোগে দখল করবে পৃথিবীর ক্ষমতা। তাদের ধারণা: অন্যরা অনেক নিচু জাতের মানুষ। আগের মত অস্ত্র দিয়ে দেশ দখল করছে না, এখন তাদের হাতিয়ার বিপুল সম্পদ।'

'মস্ত ষড়যন্ত্রের রহস্যকাহিনি ফেঁদে বসেছেন,' ভুরু কুঁচকে ফেলল লাবনী। 'এরপর বলবেন আটলান্টিয়ানরা ছিল ইলিউমিনাটি।'

মাথা নাড়ল লুক্কা। 'বরং আমরাই আসলে ইলিউমিনাটি। অন্তত মনটা পবিত্র।'

'আর ওরা?' অবাক হয়ে লোকটাকে দেখল লাবনী।

'ওরা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পশু। ষোলো শতাব্দী থেকে তৈরি হয়েছে বহু সেক্ট। আর ইলিউমিনাটি শব্দটা এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। কিন্তু আমাদের সংগঠন: "ব্রাদারহুড অভ স্যালাসফোরাস বা বাতি-ধারক"-এর নাম এসেছে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা থেকে।'

'প্রাচীন গ্রিক?' লোকটার পাগলাটে কথা শুনে চট্ করে জিম

করেলিকে দেখল লাবনী। বদমাস প্রফেসর চুপ করে আছে, সাধ্য নেই যে লাবনীর চোখে চোখ রেখে কথা বলবে। তবে বোঝা গেল, লুক্কার কথার ওপর আস্থা আছে তার। 'তা হলে বলতে চান, আপনি গোপন এক অ্যান্টি-আটলান্টিস সঙ্ঘের নেতা? আপনারা হাজার বছর ধরে লড়ছেন তাদের বিরুদ্ধে? এসব বললে পাগলও হেসে খুন হয়ে যাবে!'

'হাজার বছর নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করছে ব্রাদারহুড অভ স্যালাসফোরাস,' জোরের সঙ্গে বলল লুক্কা। 'আশা করি জানেন ক্রিটিয়াসের কথা— নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ওখানে লেখা আছে অ্যাথেনিয়ানদের বিরুদ্ধে আটলান্টিসের রাজার যুদ্ধের কথা?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। "দুই পক্ষের ওই লড়াই শুরু হয় পিলার্স অভ হেরাকেলসের বাইরে ও ভেতরে"। কিন্তু ওসব নিয়ে লেখা হয়েছে টিমেউস-এ বড়জোর কয়েকটি লাইন।'

মাথা নাড়ল লুক্কা। 'না। আরও অনেক কথা রয়ে গেছে।'

'ক্রিটিয়াস কখনও শেষ করা হয়নি।'

'গোপন করা হয়েছে ক্রিটিয়াসের বহু কিছুই,' বলল লুক্কা। 'তা করেছে ব্রাদারহুড। পুরো এক চ্যাপ্টার ছিল দুই রাজ্যের লড়াইয়ের ওপর। তাতে লেখা ছিল, কীভাবে অ্যাথেনিয়ান আর তাদের মিত্ররা মেডিটারেনিয়ান এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয় দখলদারী শক্তিকে। বর্ণনা করা হয়, কীভাবে আটলান্টিসের ওপর উল্টো হামলা করে অ্যাথেনিয়ানরা। আর তখনই দ্বীপে আটকা পড়ে তারা। তাদের নিয়ে তলিয়ে যায় ওই দ্বীপ।'

'টিমেউসের সঙ্গে মেলে না এ তথ্য,' আপত্তি তুলল লাবনী। 'লেখা হয়েছিল: "মাত্র একদিন ও একরাতে ভেতর শেষ হয়ে যায় যুদ্ধবাজরা, সাগরের নিচে নিমজ্জিত হয় ওই দ্বীপ।" ওই দুটো ঘটনা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা।'

'ক্রিটিয়াসের মূল লেখা অনুযায়ী, ও-দুটো আলাদা বিষয় নয়, একইসঙ্গে ঘটে।'

'কিন্তু...' বলতে শুরু করেছিল লাবনী, কিন্তু লুক্কার একটু আগের কথা মনে পড়তেই থেমে গেল। দুই সেকেণ্ড পর বলল, 'আপনি বলছেন মূল লেখার কথা? অর্থাৎ প্লেটোর নিজ মুখে বলা কথার ওপর ভিত্তি করে লেখা?'

'আপনি জানেনও না কত তথ্য আছে আমাদের ভল্টে,' বলল লুক্কা, 'যেমন আছে সম্পূর্ণ ক্রিটিয়াসের পাণ্ডুলিপি। এ ছাড়াও আটলান্টিসের ওপর লেখা প্লেটোর তৃতীয় ডায়ালগ্স্— হারমোক্রেট্স্।'

'কিন্তু হারমোক্রেট্স্ তো কখনও লেখাই...'

'দুনিয়াকে তা-ই বুঝিয়েছি ব্রাদারহুডের আমরা। হাজার বছর চেয়েছি কখনও যেন না পাওয়া যায় আটলান্টিস। আটলান্টিয়ান উত্তরপুরুষরা যেন আবারও জড় না হয়, সেজন্যে বহু কিছুই করতে হয়েছে আমাদেরকে। তাদের ঠেকাতে হাত গুটিয়ে নেই আমরা।'

'অর্থাৎ, প্রয়োজনে খুন করছেন আপনারা,' ভুরু কুঁচকে গেল লাবনীর।

'এজন্যে গর্বিত নই আমরা, কিন্তু কখনও কখনও বাধ্য হয়েই বাঁকা করতে হয় আঙুল,' বলল লুক্কা। 'আবার কখনও শুধু প্রতিশোধ নিয়েছি।'

'পাগলের মত এসব কী বলছেন... থেমে গেল লাবনী। মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, বহুকাল ধরেই পৃথিবীর সেরা আকর্ষণীয় কিংবদন্তী আটলান্টিস, কিন্তু বাস্তবে তো ওটা বড়জোর মৃত এক শহরের ধ্বংসস্তূপ— আর্কিওলজিকাল সাইট!'

সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লুক্কা। 'ওই শহর হয়তো মৃত, কিন্তু ওটার কারণে যেসব তথ্য বেরোতে পারে, সেগুলো কিন্তু আজও বিপজ্জনক ও জীবন্ত, ডক্টর আলম। যিশুর জন্মের নয় হাজার পাঁচ

শ' বছর আগেও এভাবেই মস্ত বিপদে ছিল পৃথিবী। আটলান্টিস পাওয়া গেলে আবারও একত্র হবে আটলান্টিয়ান উত্তরপুরুষরা, বিশ্বে সৃষ্টি হবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অশুভ শক্তি।'

'এরই ভেতর আবিষ্কার হয়েছে আটলান্টিস,' চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল লাবনী। 'তা করেছি আমি। ডিপ-সি রিসার্চ ভেসেল দ্য সায়েন্টিস্টের প্রত্যেকে তা জানে। আপনি কি ভাবছেন তাদের সবার মুখ বন্ধ করতে পারবেন?'

'ওই সাইট পাওয়া গেলেও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ওখানে রয়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর সব তথ্য,' বলল লুক্কা। একবার দেখল প্রফেসর করেলিকে। 'এদিকে নানান জায়গায় প্রভাব খাটাতে পারবে ব্রাদারহুড। দুনিয়ার বেশিরভাগ অ্যাকাডেমিককে সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারব আমরা।'

'ও, এজন্যেই আমার সব কথা শোনার আগেই করেলি নাকচ করে দিয়েছিল প্রস্তাব?' রাগ চাপল লাবনী। 'সর্বক্ষণ আপনাদের পকেটে ছিল লোকটা!'

'তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, তাই আগেই বাধা দিয়েছি,' বলল করেলি। 'এখনও জানি না, কেন প্রথম থেকেই তোমাকে খুন করতে চাইত ওরা।'

'এতবড় সাহায্যের জন্যে অঢেল ধন্যবাদ।'

লাবনীর টিটকারি বুকে লেগেছে করেলির। মেয়ের বয়সী ছাত্রীর চোখে চোখ রাখতে পারল না, মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

'এ ছাড়া, নব্য নাযিরা চাইছে আবিষ্কার হোক আটলান্টিস,' বলল লুক্কা, 'তাদের ধারণা, আটলান্টিয়ানদের উত্তরপুরুষ তারা, ধমনিতে বইছে নীল রক্ত। কিন্তু একবার এসব প্রাচীন শহর বা মন্দির ধ্বংস করে দিলে কোনও প্রমাণই থাকবে না। আপনার তথ্য ঠিক হলে, তিব্বতের মন্দির ও শহর ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমরা।

তখন আর কখনও একত্র হবে না নাযি বা আটলাণ্টিয়ানরা। সেক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মহাযুদ্ধও হবে না।'

'ডেনিয়েলসনরা যুদ্ধবাজ মানুষ নন,' আপত্তির সুরে বলল লাবনী। 'আমার ধারণা, তাঁরা মানব-প্রেমিক। নইলে কোটি কোটি টাকার ওষুধ পৃথিবী জুড়ে বিলি করতেন না।'

কর্কশ শব্দে হাসল লুক্কা। 'ডেনিয়েলসন মানব-প্রেমিক? হাহ্! নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে এসব করছে। একমাত্র উদ্দেশ্য: রাজা হবে আটলাণ্টিয়ান রাজ্যের। আপনি কি ভাবছেন, ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় ওষুধ দিয়ে দুস্থদের চিকিৎসা দিচ্ছে সে?'

'তা হলে কী করছে?'

'ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে গোপন মেডিকেল প্রজেক্ট চালাচ্ছে। খুঁজে বের করছে আটলাণ্টিয়ান জেনোমধারী মানুষদেরকে।' মাথা নাড়ল লুক্কা, 'আপনি নিজেও তাদের একজন। হ্যাঁ, ভাল করেই জানি, টেস্ট করেছে ওরা আপনার ডিএনএ। পনেরো বছর ধরে এ কাজ করছে। শত শত কোটি ডলার ব্যয় করেছে আটলাণ্টিস খুঁজতে। যা করেছে, তার সামান্য অংশই প্রকাশ পেয়েছে। খুব কম মানুষ জানে, পৃথিবীর রাজা হতে চাইছে লোভিস ডেনিয়েলসন। আপনাকে কিছুই বুঝতে দেয়নি তার মেয়ে। আপনি প্রথম মানুষ নন যে খুঁজেছেন আটলাণ্টিস। ওরা পৃথিবীর নানান জায়গায় আগেও এক্সপিডিশন পাঠিয়েছে।'

'আর এক্সপিডিশনের নিরীহ মানুষগুলোকে খুন করেছেন আপনারা?' লুক্কার চেহারা দেখে সব বুঝে গেল লাবনী। 'হায়, আল্লা!'

'আগেও বলেছি, বহু কিছুই করতে হয়েছে বা করতে হবে, এতে মন ছোট হয়েছে বা হবে, কিন্তু যা করতেই হবে, তা করব আমরা। জেনে রাখুন, আপনার কারণে অনেক এগিয়ে গেছে

তাদের পরিকল্পনা।'

'কী সেই পরিকল্পনা?'

'বিস্তারিত জানা নেই। লোভিস ডেনিয়েলসনের সংগঠনের গভীরে ঢোকার আগেই খুন হয়ে গেছে আমাদের বেশ কয়েকজন গোয়েন্দা। শুধু এটা জানি, আটলান্টিস আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয় তার প্ল্যান। খুঁজছে নির্দিষ্ট এক আটলান্টিয়ান আর্টিফ্যাক্ট। কিন্তু ব্রাদারহুডের একজন বাঁচলেও সে ধ্বংস করবে ওই আর্টিফ্যাক্ট।' এয়ারক্রাফটের জানালায় টোকা দিল লুক্কা। 'পৌঁছে গেছি সোনালি চূড়ার খুব কাছে।'

বাইরে চেয়ে ভোরের প্রথম সোনালি আলো দেখল লাবনী। হিমালয়ের চূড়ার দিকে উঠছে সূর্য।

পশ্চিমে তিনটে চূড়ার মাঝেরটা এখন ঝিলিমিলে কমলা লেলিহান আগুনে পুড়ছে! এমন কী সাধারণ কালো পাথর বা সাদা বরফও উড়াসিত সোনালি-লালচে আলোয়।

লাবনীর মনে হলো, ওরা উড়ে চলেছে সোনার-পাহাড় বিজয় করতে! 'আল্লা-কী সুন্দর!' ফিসফিস করল ও।

'কিংবদন্তীর স্বর্ণ-চূড়া,' বলল লুক্কা। 'স্থানীয় লোককথায় বলা হয়েছে, ওখানে আছে হাজার হাজার কোটি টাকার ধন। আহনেনেরবের সদস্যরা ভাবত, ওই চূড়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে আটলান্টিসের। একই কথা ভাবতেন আপনার বাবা-মাও।'

তীক্ষ্ণ চোখে লুক্কাকে দেখল লাবনী। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পাইলটের উদ্দেশে নির্দেশ দিল লোকটা।

পাহাড়ের কোলে নামতে লাগল হেলিকপ্টার। কিছুক্ষণ পর বরফে ছাওয়া চওড়া এক কার্নিশে স্থির হলো যান্ত্রিক ফড়িং।

'চাঁদের পথ!' কপ্টার থেকে নেমে পড়তেই মুড়মুড় করে লুক্কার পায়ের নিচে ভাঙল তুষার। 'ভাবিনি আবারও আসব এখানে।'

কোটে ভালভাবে শরীর জড়িয়ে নামল লাবনী। পিছনে ছায়া

হয়ে থাকল ওর গার্ড। 'আগেও এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, ভেবেছি এখানে মূল্যবান কিছু নেই। এখন বুঝছি, মস্ত ভুল করেছি।' জিম করেলির কাঁধে হাত রাখল ডোনাটি লুক্কা। 'আমাদের বোধহয় উচিত ছিল চারপাশ ভাল করে দেখা, সেক্ষেত্রে দু'জনেরই সময় বাঁচত।'

'ও, আপনি তো আগেও এসেছেন?' করেলির দিকে তাকাল লাবনী। জবাবে মৃদু হাত নাড়ল লোকটা। মুখে কিছু বলতে যেন দ্বিধা আছে।

'করেলি এসেছিল আপনার বাবা-মার সঙ্গে,' বলল লুক্কা।

হতবাক হয়ে তাকে দেখল লাবনী।

'লুক্কা, প্লিয,' কাতর অনুরোধ করল করেলি। 'দরকার কী অতীত...'

কড়া চোখে তাকে দেখল লুক্কা। 'বহু কাজ করেছি, যার জন্যে গর্বিত নই, কিন্তু যা করেছি তা গোপন করতে আপত্তি আছে আমার। একই কাজ করা উচিত তোমার, জিম।'

'প্রফেসর করেলি?' প্রৌঢ় লোকটার সামনে থামল লাবনী। গার্ডের অস্ত্রের ভয় উড়ে গেছে মন থেকে। 'কী বলছে মিস্টার লুক্কা? আপনি এসেছিলেন আমার বাবা-মার সঙ্গে। তাঁদের ব্যাপারে কী কথা চেপে গেছেন আমার কাছে?'

ঘুরে দাঁড়াতে চাইল করেলি। 'আসলে... আমি... লাবনী, দুঃখিত...'

খপ্ করে তার কোটের ল্যাপেল ধরল লাবনী। 'আসলে কী হয়েছিল আমার বাবা-মার?'

'আমার সঙ্গে আসুন, ডক্টর আলম,' বলল লুক্কা। হাত তুলে দেখিয়ে দিল ঢালু হয়ে ওপরে যাওয়া কার্নিশ।

হ্যাঁচকা টানে জিম করেলির কাছ থেকে লাবনীকে সরিয়ে নিল হেণ্ড্রিক ড্রেক। এত শীতের ভেতরেও দরদর করে ঘামছে প্রফেসর।

পিঠে ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়াল ড্রেক লাবনীকে।

চড়াই বেয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল সবাই। গায়ে ধারালো সব বরফ ছিটিয়ে পেছনে নেমে পড়ল দ্বিতীয় হেলিকপ্টার। আগে আগে হাঁটছে ডোনাটি লুক্কা। গভীর মনোযোগ দিয়েছে সামনের পাহাড়ি দেয়ালে। আরও কিছুক্ষণ উঠে যাওয়ার পর থামল এক জায়গায়। নির্দিষ্ট দিকে তাক করল আঙুল। 'ওই যে!'

হাত অনুসরণ করে প্রথমে অস্বাভাবিক কিছু দেখল না লাবনী। সামনে দেয়ালের মত ন্যাড়া, কালো পাথর ও সাদা তুষার। খাড়াভাবে উঠেছে পাহাড়ের ওই অংশ। কয়েক সেকেণ্ড পর ওখানে নীল-ধূসর পাহাড়ি গায়ে চোখে পড়ল কালো কিছু পাথর।

পাথরের দেয়ালের মাঝে সরু একটা ফাটল।

'ভেতরে হয়তো গুহা আছে,' মন্তব্য করল ড্রেক। সুড়ঙ্গ বা গুহার মুখ হলেও ওটা বড়জোর একফুট চওড়া।

'পাথর ধসে এমন হয়েছে,' বলল লুক্কা. 'ওরা খোঁড়ার যন্ত্রপাতি এনেছে তো?'

গলা উঁচু করে একের পর এক নির্দেশ দিল ড্রেক। কয়েক মিনিটের ভেতর দ্বিতীয় হেলিকপ্টার থেকে হাজির হলো দশজন লোক। আলগা পাথরের স্তূপ সরাতে কাজে নেমে পড়ল তারা। কোদালের আঘাতে নিচে গিয়ে পড়তে লাগল তুষার ও পাথর। কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এল একটা সুড়ঙ্গ। তবে কাজ চালিয়ে যেতে বলল লুক্কা। 'আরও চওড়া করতে হবে সুড়ঙ্গের মুখ, নইলে ভেতরে ঢুকবে না বোমা।'

'বোমা?' চমকে গেল লাবনী। 'কীসের বোমা?'

শান্ত চোখে ওকে দেখল ডোনাটি লুক্কা। 'এটা কোনও আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশন নয়, ডক্টর আলম। আটলান্টিসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সবকিছু ধ্বংস করতে এসেছি আমরা। পাহাড়ের বুকে যা আছে, আর কখনও সেসব দেখবে না কেউ।'

'মাথা খারাপ বলেই অমূল্য সব আর্টিফ্যাক্ট নষ্ট করতে চাইছেন!' রেগে গিয়ে বলল লাবনী। 'এসব করছেন, কারণ মনে হয়েছে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে আপনাদের বিরুদ্ধে। আসলে বদ্ধ উন্মাদ আপনারা!'

'আর সেই ষড়যন্ত্র শেষ হবে এখানেই,' হাসল লুক্কা, 'আটলাণ্টিয়ানদের শেষ এই মন্দির আর শহর ধ্বংস হলে, আর কখনও প্রাচীন কোনও আটলাণ্টিয়ান সভ্যতার খোঁজ পাবে না লোভিস ডেনিয়েলসন।'

'তারপর কী করবেন, অলস জীবন কাটাবেন বাহামায় গিয়ে? নাকি তখনও মানুষ খুন করে বেড়াবেন? ভাববেন, ওসব লোকের ডিএনএ অন্যরকম, তাই মেরে ফেলতে হবে?'

লাবনীর কথার জবাব দিল না লুক্কা। শাবল ও কোদালের মাধ্যমে চওড়া করা হচ্ছে প্যাসেজ। পরের কয়েক মিনিট লোকদের কাজ দেখল সে, তারপর সন্তুষ্ট হলো। 'ঠিক আছে, নিয়ে এসো বোমা। আমরা ভেতরে ঢুকছি।'

কপ্টারের দিকে চলল তার লোক, এদিকে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল ডোনাটি লুক্কা। পিছু নিল ড্রেক ও করেলি। তাদের পর ঠেলে নেয়া হলো লাবনীকে। ওকে পাহারা দিচ্ছে দুই সশস্ত্র গার্ড। অন্ধকার প্যাসেজে জ্বলে উঠেছে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট। লাবনীর মনে হলো, পাহাড়ের গভীরে ঢুকে গেছে প্রাকৃতিক এই সুড়ঙ্গ।

'দেখুন,' বলল ড্রেক। আলো ফেলেছে সামনে।

ওদিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে গেল লাবনীর।

মেঝেতে পড়ে আছে মানুষের লাশ!

শুষ্ক পাঁচটা দেহ। পার্চমেন্ট কাগজের মত কুঁচকে গেছে ত্বক। একদিকের দেয়ালে যেভাবে ঠেস দিয়ে বসে আছে, তাতে লাবনী বুঝল খাবারের অভাব আর প্রচণ্ড শীতে মারা গেছে তারা। কিন্তু পরে কেউ এসে তল্লাসী করেছে এদের মৃতদেহ।

'আহনেনেরবের চতুর্থ এক্সপিডিশন,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল লুক্কা। 'জার্গেন ক্রাউস আর তার লোক। মরোক্কো থেকে তারা গিয়েছিল ব্রাযিলে, তারপর এসেছে তিব্বতে।'

'চতুর্থ এক্সপিডিশন?' ভুরু কুঁচকে গেল লাবনীর। 'তাদের মাত্র তিনটা এক্সপিডিশনের কথা শুনেছি।'

'রেকর্ড হয়েছে তিনটিই, তবে পাওয়া গেছে আরও ডকুমেন্ট। তাতে লেখা ছিল এ দেশে অভিযানের কথা।' অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল ডোনাটি লুক্কা। 'সেগুলোর কিছু কাগজ পেয়ে আপনার বাবা-মা এসেছিলেন এই স্বর্ণ-চূড়ার কাছে। তারপর এখানে।'

'তাঁরা এখানে এসেছিলেন?' বলল লাবনী, দ্বিধান্বিত। হঠাৎ করেই ওর বুকে চেপে বসল কেমন একটা ভয়।

'আসুন আমার সঙ্গে,' ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পথ দেখাল ডোনাটি লুক্কা। তার ইঙ্গিতে লাবনীর কাঁধ ধরে সামনে বাড়ল ড্রেক। লেজ নাড়া কুকুরের মত পেছনে আসছে জিম করেলি। মুখে ফুটে উঠেছে ভয়।

তার চোখে আরও কিছু দেখেছে লাবনী।

ভয়ঙ্কর পাপ, না দোজখের ভয়?

লুক্কার পেছনে হেঁটে ওরা পৌঁছে গেল প্যাসেজের শেষমাথায়।

সামনেই মস্ত এক সমাধিকক্ষ।

আক্রমণাত্মক স্থাপত্য ও দেয়ালের গ্লোযেল লিপি বলে দিল, এ সমাধি আটলান্টিয়ান। কিন্তু ওদিকে মন না দিয়ে অন্যকিছু দেখছে লাবনী। একটু দূরে চেম্বারের মেঝেতে কয়েকটা লাশ।

নাযিদের মত ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃত্যু হয়নি তাদের, খুন হয়েছে অজস্র গুলির আঘাতে। মৃতদেহগুলোর পেছনের পাথুরে দেয়ালে রক্ত শুকিয়ে যাওয়ার খয়েরি দাগ ও বুলেট লাগার গর্ত।

আর মৃতদেহগুলোর ভেতর একজন...

হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল লাবনী, নইলে কেঁদে উঠত।

ফিসফিস করে বলল, 'না...'

ওর দিকে ঘুরল লুক্কা। ইশারা করল ড্রেককে। দাঁড়িয়ে পড়তে চাইল লাবনী, কিন্তু ওর হাত ধরে সামনে বাড়ল নিষ্ঠুর লোকটা।

'না!' ফুঁপিয়ে উঠল লাবনী, ভয় ও কষ্টে ফেটে যেতে চাইছে বুক। না, বাবা-মার লাশ দেখবে না! ওঁরা বেঁচে আছেন ওর মনে। তবুও চোখদুটো দেখে ফেলল সব।

শীতে চামড়ার মত বাদামি হয়েছে ওর বাবা-মার ত্বক। বহু আগেই গলে গেছে চোখ, ওখানে শূন্য অক্ষিকোটর। তবুও চেনা যায় তাঁদেরকে। গত চারটে বছর প্রতি দিন বহুবার তাঁদের কথা ভেবেছে লাবনী।

বাবা-মা একদিন ফিরবেন।

অ্যাভালাঞ্চে মারা পড়েননি তাঁরা।

কিন্তু সব মিথ্যা!

এখানে এসে খুন হয়েছেন তাঁরা।

লাবনীকে এগোতে বাধ্য করল ড্রেক।

ডোনাটির ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল রোমহর্ষক দৃশ্য। লাবনী ভাবল, লাথি দিয়ে ড্রেকের কাছ থেকে ছুটে যাবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে লুক্কার ওপর। কিন্তু শরীরে কোনও শক্তি পেল না। ওর চোখে চোখ পড়তেই অন্যদিকে তাকাল লুক্কা।

'খুন করেছ আমার বাবা-মাকে!' চিৎকার করে উঠল লাবনী। 'তুমি খুনি! তুমি জানোয়ারের চেয়েও খারাপ! আমি খুন করব তোমাকে!' ওর দু'পাশে সতর্ক হয়ে উঠল দু'গার্ড, প্রয়োজনে রক্ষা করবে বসকে।

কিন্তু হাতের ইশারায় তাদেরকে নিরস্ত করল ডোনাটি লুক্কা। এক পা পিছিয়ে গেল লোক দু'জন।

প্রকাণ্ড ঘরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল অসহায় মেয়েটার চিৎকারের প্রতিধ্বনি।

রাগ ও দুঃখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল লাবনী।

'আমি দুঃখিত,' নিচু স্বরে বলল লুক্কা। 'এ ছাড়া উপায় ছিল না। আটলান্টিয়ানদের গোপন তথ্য তুলে দেয়া যাবে না লোভিস ডেনিয়েলসনের হাতে।'

'কীসের গোপন তথ্য?' তিক্ত কণ্ঠে বলল লাবনী। 'এখানে কিছুই নেই এই সমাধি ছাড়া!' ওর সরু চোখ থেকে ঝরল ডোনাটি লুক্কার প্রতি ঘৃণা। 'কোনও কারণ ছাড়াই আমার বাবা-মাকে খুন করেছ তুমি, কুকুরের বাচ্চা!'

'না...' চারপাশের দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল লুক্কা। 'চারবছর আগে ভেবেছি এখানে কিছুই নেই। অনেক আগেই লুঠ হয়েছে সব। কিন্তু ব্রাযিলের মন্দিরের দেয়ালের লিপি ঠিক। এখানে আছে আরেকটা মন্দির ও শহর।' তার দুই গার্ডের দিকে ফিরল সে। 'প্রতিটা দেয়ালের প্রতি ইঞ্চি খুঁজবে। এমন কিছু, যেটা দেখলে মনে হবে ওদিকে দরজা আছে। কোনও ফাটল, আলগা পাথর বা চাবির গর্ত— কিছু যেন না এড়ায় চোখ!'

তার নির্দেশ পালন করল দু'গার্ড।

নিজেও লুক্কা গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল দেয়াল।

লাবনীকে পাহারা দিল ড্রেক।

হৃদয় ভরা যন্ত্রণা নিয়ে ফুঁপিয়ে চলেছে লাবনী। একটু পর শীতল ও নিস্পৃহ মুখোশের মত হলো ওর মুখ। শুধু জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে চোখদুটো।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ডোনাটি লুক্কার উদ্দেশে চিৎকার করল এক গার্ড। সবাই এগিয়ে গেল তার দিকে। সাবধানে দুটো কলামের মাঝের দেয়ালে সূক্ষ্ম ফাটল দেখাল লোকটা।

'দরজা,' মন্তব্য করল লুক্কা। হাত বোলাল সরু ফাটলে। 'মনে হচ্ছে না বাইরে থেকে খোলা যাবে। ভেঙে ঢুকতে হবে।'

গার্ডদের একজনকে পাঠানো হলো কপ্টার থেকে দরকারী

ইকুইপমেন্ট আনতে। এরই ভেতর হাজির হলো লুক্কার আরও লোক। তারা নিয়ে এসেছে কার্ট ভরা বিরাট এক ক্রেট। দ্বিতীয় হেলিকপ্টারে ওটাকে তুলতে দেখেছিল লাবনী। এরপর কী ঘটবে বুঝতে পেরে শীতল এক স্রোত নামল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। ওই ক্রেটের অর্ধেক বোমা থাকলেও, আকারে হবে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের চেয়েও বড়।

কিন্তু দেয়ালে যে বোমা বসাতে চাইল লুক্কা, ওটা অনেক ছোট। পাথরের দেয়াল ড্রিল করে তৈরি হলো মুঠোর মত এক গর্ত। কাজ শেষ হলে ওখানে গুঁজে দিল লুক্কা বোমা— রুপার ডলারের মত পেটমোটা এক ডিস্ক।

'ওই বোমা দিয়ে দেয়াল উড়িয়ে দেবেন?' কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'হ্যাঁ।'

'লাশের কী হবে?' মৃতদেহ দেখাল লাবনী। 'ক্ষত-বিক্ষত করবেন লাশ? খুন করেছেন তাতে চলবে না, এবার বিকৃত করতে হবে মানুষগুলোকে?'

নাক দিয়ে অধৈর্য শব্দ করল হেণ্ড্রিক ড্রেক। কিন্তু থমকে গেছে ডোনাটি লুক্কা। লাবনীর কথাগুলো ভাবছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ড্রেক, কয়েকজনকে বলো লাশগুলোকে বাইরের প্যাসেজে নিয়ে গিয়ে রাখতে।'

'খামোকা সময় নষ্ট, লুক্কা,' বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল ড্রেক। 'মেয়েটাকে নিয়ে ভাবতে হবে না, আসল কথা ঠিকভাবে কাজ শেষ করা। যারা আগেই মরে গেছে, তাদের নিয়ে ভেবে কী লাভ!'

'ডক্টর আলম ঠিকই বলেছে। সরিয়ে ফেলো।'

ভুরু কুঁচকে আদেশ পালন করল ড্রেক। দলের কয়েকজনকে নির্দেশ দিল।

তারা সরাতে লাগল মৃতদেহ।

চুপ করে তাদের কাজ দেখছে লাবনী, গা জ্বলে যাচ্ছে রাগে। তিব্বতীয়দের এক লাশ তুলল একজন, খুব হালকা ওই মৃতদেহ। যেন শিশু বয়সে মরতে হয়েছে তাকে। তা নয়, আসলে আর সব লাশ... ওর বাবা-মার দেহ... সব হয়ে গেছে তুষের মত হালকা। কষ্টে গলার ভেতর কী যেন আঁকড়ে আসতে চাইল লাবনীর। মনে হলো আটকে আসছে দম। শক্ত হতে হবে, ভাবল। কোনওভাবেই ভেঙে পড়বে না শত্রুদের সামনে।

মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হলে আবারও বিস্ফোরকের দিকে মনোযোগ দিল ডোনাটি লুক্কা। বোমায় টাইমার লাগিয়ে দেয়ার পর পিছিয়ে এল। লাবনীকে নিয়ে মস্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গুহার মুখে চলে এল সবাই।

'সিএল-টোয়েন্টি,' লাবনী জানতে না চাইলেও বলল ড্রেক, 'মানুষের তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী কেমিকেল বিস্ফোরক। একটা ওরিও বিস্কুটের সমান পরিমাণ বিস্ফোরক অনায়াসেই ফুটো করে দেবে ছয় ইঞ্চি আর্মার প্লেট।'

'তাতে আমার খুশি হওয়া উচিত?' তিক্ত স্বরে বলল লাবনী।

'তা হয়তো না, কিন্তু কানে হাত চাপা দিতে চাইতে পারো।'

লাবনী দেখল অন্যরাও তা-ই করেছে। দেরি না করে দু'কানে হাত চাপা দিল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর মনে হলো কানদুটো ফেটেই গেছে প্রচণ্ড আওয়াজে। সামনের ঘর থেকে ছিটকে বেরোল ধুলো-বালির মেঘ।

সবার আগে রওনা হলো ডোনাটি লুক্কা, ধুলোর ভেতর দিয়ে দূরে গেছে তার হাতের ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো। নির্দেশ দিল সে, 'দরজার সামনে থেকে সব আবর্জনা সরিয়ে ফেলো, ভেতরে ঢোকাতে হবে বোমা। ড্রেক, করেলি, ডক্টর আলম, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

লাবনী অবাক হয়ে দেখল, ওর সঙ্গে চলেছে দুই গার্ড।

ঘরে ঢুকে ওরা দেখল, একটু আগে মনে হয়েছে নিরেট পাথুরে দেয়াল, কিন্তু এখন সেখানে বড় এক গর্ত। সমাধির চারদিকে ছিটিয়ে গেছে পাথরের দরজার কবাটের ভাঙা টুকরো। অন্য কবাট আস্ত হলেও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত।

দেয়ালের বড় গর্তের ওদিকে ঘুটঘুটে আঁধার।

জঞ্জাল পেরিয়ে ওদিকে গেল লুক্কা, সঙ্গে অন্যরা। মসৃণভাবে নেমে গেছে পাথরের মেঝে। সবাই বুঝল, ওরা চলেছে পাহাড়ের আরও অভ্যন্তরে।

অবাক হয়ে লাবনী টের পেল, বাতাস শীতল ও পরিষ্কার। বদ্ধ জায়গায় যে প্রাচীন আমলের বাসি গন্ধ থাকে, তা এখানে নেই। নিশ্চয়ই ওদিকে কোনও খোলা দরজা বা গুহা আছে। তা যদি না-ও থাকে, যেভাবেই হোক ভেতরে ঢুকছে তাজা বাতাস।

প্রথম গুহা বা সুড়ঙ্গের মতই চওড়া হলো দীর্ঘ, প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ। সেই আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে এত বড় সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হলে লাগত বহু বছর।

সামনে আরও চওড়া হয়েছে টানেল।

'ওদিকে বোধহয় বড় কোনও ঘর,' বলল লুক্কা। তার হাতের ফ্ল্যাশলাইটের ছড়ানো আলো ছোট করে একটা কয়েনের সমান করে নিল সে। সবাই খেয়াল করল, বুটের প্রতিধ্বনি নেই আর। কিন্তু তা হওয়ার কথা নয়। ওরা আছে পাহাড়ের গভীরে।

সামনে বোধহয় আছে মস্ত কোনও ঘর বা হলরুম।

তা নয়, আরও কিছু দূর যাওয়ার পর পাওয়া গেল চওড়া এক পাকা রাস্তা। ওদের টর্চের আলো বাধা পেল না কোথাও। তারপর দু' পাশে দেখা দিল পাকা সব একতলা, দোতলা ও বহুতল দালান। চকচক করছে সোনা ও অরিচালকামে কারুকাজ করা সব পিলার। কোনও কোনও বাড়ির পিলার এতই ওপরে উঠেছে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো পৌঁছুল না শেষমাথায়।

'জেসাস, সেই যুগের তুলনায় প্রকাণ্ড শহর,' মন্তব্য করল ড্রেক। মুখের সামনে মাইকের মত হাত রেখে চিৎকার করল, 'হ্যালো!' কয়েক সেকেণ্ড পর ফিরল আবছা প্রতিধ্বনি।

'আরও আলো লাগবে,' বলল ডোনাটি লুক্কা।

মাথা দুলিয়ে পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক নামাল ড্রেক, ব্যাগ থেকে বের করল পেটমোটা ফ্লেয়ার গান। ওটা লোড করে ওপরে নল তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। দু' সেকেণ্ড পর উজ্জ্বল লালচে আলো ছড়াল ফ্লেয়ার, ওটার ওজন নিল ছোট্ট এক প্যারাশুট, মৃদু বাতাসে দুলতে দুলতে নামছে।

লালচে আলোয় চারপাশ দেখে হতবাক হয়ে গেছে সবাই।

কয়েক সেকেণ্ড পর বিড়বিড় করল লাবনী, 'হায়, আল্লা!'

পঁচিশ

চোখের সামনে পাহাড়ি গুহার ভেতর প্রাচীন এক শহর দেখে হতভম্ব হয়েছে ওরা সবাই। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাসের দৃশ্য!

ফ্লেয়ারের লালচে আলোয় চট্ করে বুঝে গেল লাবনী, শহরের পেছনের দিকে ওটা কী— দ্য টেম্পল অভ পসেইডন! ব্রাযিলের মন্দিরের মত একাকী নয়, চারপাশে আরও সব দালান। ওগুলো আকারে ছোট, কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়। আর্কিটেকচারাল ধরন বা অনমনীয়, অভিজাত শিল্প দেখারই মত। কিন্তু এসবের ভেতর আছে নিষ্ঠুর কী যেন।

হাজার মাইল দূরে আবারও গড়া হয়েছিল প্লেটোর বর্ণিত আটলাণ্টিসের দুর্গ-শহর। ব্রাযিলের জঙ্গলে আটলাণ্টিয়ানদের সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ দেখেছে ওরা, কিন্তু এখানে সময়কে কাঁচকলা দেখিয়ে নিখুঁতভাবে রয়ে গেছে সব প্রাসাদ ও মন্দির। কোথাও নেই ক্ষয়ের কোনও চিহ্ন। মনে পড়ল: ব্রাযিলে সেদিন পাশে ছিল দু'জন প্রিয় মানুষ; রানা, সেসিলি— আজ কোথায় ওরা? সাগরের আট শ' ফুট নিচে মারা গেছে জাহাজে চাপা পড়ে?

কয়েক সেকেণ্ড পর লাবনী বুঝল, সম্পূর্ণ নিখুঁত নয় সামনের দৃশ্য। যত বড়ই হোক মস্ত গুহা, এখানে এঁটে যাওয়ার উপায় ছিল না সত্যিকারের দুর্গ-শহর। অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে পসেইডনের মন্দির। পেছন দিক ঠেকে গেছে গুহার দেয়ালে। ওই দেয়াল খুঁড়ে মন্দির বড় করতে চেয়েছে আটলাণ্টিয়ানরা, ফলে সম্ভবত মন্দিরের ভেতরের চেম্বার বেরিয়ে গেছে পাহাড় থেকে বাইরে।

ফত-ফত্ আওয়াজ তুলে নিভে গেল ফ্লেয়ার। আবারও ঘুটঘুটে আঁধার নামল প্রকাণ্ড গুহায়। আবারও ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে নিল ডোনাটি লুক্কা ও তার দলের লোক।

'এ... অবিশ্বাস্য,' বলল করেলি, 'লুক্কা, আমাদের উচিত চারপাশের ছবি তুলে রাখা। এ গুহায় আছে পানির নিচে হারিয়ে যাওয়া সত্যিকারের আটলাণ্টিসের ভাঙা দালানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সব স্থাপত্য!'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে এককথায় মানা করল লুক্কা, 'এসবের কোনও প্রমাণ বা চিহ্ন থাকবে না। কিছুই না! আটলাণ্টিয়ানদের উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ শেষ করতে হবে।' করেলির দিকে পিঠ রেখে ড্রেককে বলল সে, 'এই রাস্তা গেছে সোজা পসেইডনের মন্দিরে। ওদেরকে বলো, ওরা যেন বোমা নিয়ে আসে।'

'ওই বোমা কত বড়?' জানতে চাইল করেলি।

'এক হাজার পাউণ্ডের ফিউয়েল-এয়ার এক্সপ্লোসিভ,' তাকে

বলল ড্রেক, 'সিএল-টোয়েন্টি এক্সপ্লোসিভের কোর পঞ্চাশ পাউণ্ডের। ধ্বংস-ক্ষমতা বলতে গেলে প্রায় ট্যাকটিকাল নিউক্লিয়ার মিসাইলের সমান।'

'মাই গড,' হাঁ হয়ে গেল করেলি।

'এবার ভাবুন কাদের সঙ্গে মিশে কত ক্ষমতা অর্জন করেছেন,' শীতল সুরে বলল লাবনী। 'এরা ঠাণ্ডা মাথার খুনি। সৃষ্টিকে ধ্বংস করছে অবলীলায়। নিশ্চয়ই এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে আপনার?'

'লাবনী, প্লিয,' করুণ সুরে বলল করেলি, এগিয়ে গেল ছাত্রীর দিকে। 'আমি সত্যিই দুঃখিত, কখনও ভাবিনি ফেরদৌস আর লিলিয়ার হত্যার সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে যাব। ওদের সঙ্গে এসেছি, কারণ ভেবেছিলাম ওরা কিছুই পাবে না।'

'আর যখন বুঝলেন তাঁরা ঠিক পথেই আছেন, বেঈমানি করলেন,' ঠাণ্ডা চোখে ডোনাটি লুক্কাকে দেখল লাবনী। আবার চোখ রাখল করেলির ওপর। 'কিন্তু কখনও ভুলব না, ক্ষমাও করব না, ওঁরা মারা গেছেন আপনার জন্যে, করেলি। তাঁদের খুনের দায় আপনার ওপরেই বর্তায়! আপনার মত নোংরা মনের কুকুরের বাচ্চা আগে কখনও দেখিনি!'

গার্ডরা নড়ে ওঠার আগেই ঘুরে কষে জিম করেলির গালে চড় বসাল লাবনী। এতই জোরে, ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল ওর হাতের তালু। সন্তুষ্ট চোখে দেখল, মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়েছে লোকটা। নাকের পাটা ফেটে টপটপ করে নামছে রক্ত। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে লাবনীর দিকে চেয়ে আছে করেলি।

হ্যাঁচকা টানে লাবনীকে পিছিয়ে নিল দুই গার্ড। অবাক চোখে ওকে দেখছে ড্রেক। টেনে তুলল প্রফেসরকে। 'গায়ে জোর আছে মেয়েটার, কী বলেন? মাসুদ রানা বোধহয় শিখিয়ে দিয়েছে কীভাবে চড়াতে হয়!'

বাইরে থেকে রেডিয়োতে ডোনাটি লুক্কাকে জানানো হলো, সুড়ঙ্গ দিয়ে বোমা আনতে কমপক্ষে পনেরো মিনিট লাগবে। চট্ করে হাতঘড়ি দেখল লুক্কা। চোখ তুলে দেখল করেলিকে, তারপর লাবনীকে। 'করেলি, ডক্টর আলম, চারপাশ দেখতে চাইলে পনেরো মিনিট সময় পাবেন। আমি এককথার মানুষ, ধ্বংস করবই। কিন্তু আটলান্টিয়ানদের শেষ শহর আর মন্দির ঘুরিয়ে দেখাতে আপত্তি নেই।'

'খুন করার আগে সব দেখতে দেবেন, এই তো?' তিক্ত হাসল লাবনী।

'আগেই বলেছি, আমি এককথার মানুষ।'

'এ কথা শুনে এখন থেকে রাতের ঘুম ভাল হবে আমার।'

আরেকটা ফ্লেয়ার জ্বালল ড্রেক।

দুর্গ-শহরের দিকে চলল ওরা।

আবিষ্কারের আনন্দ ও উত্তেজনা বুকে, আবার ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে, এত অল্প বয়সে মেরে ফেলা হচ্ছে ওকে— উথালপাতাল সব অনুভূতির ভেতর পড়ে কেমন যেন অস্থির লাগল লাবনীর। মনে পড়ল রানার নিষ্ঠুর কিন্তু লোভনীয় ঠোঁট আর চোখের মায়াভরা কুচকুচে কালো মণি। মানুষটা মরেই গেল? নাকি বেঁচে আছে? সে কি আসবে এখানে? তা-ই বা কী করে হয়? জানবে কী করে ও আছে এখানে? নিজেই হয়তো সাগরে ডুবে মরেছেন ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড। প্রাণে বাঁচলেও রানা জানবে না, মেসেজ দিয়েছিল ও ক্যাপ্টেনের কাছে। কাজেই, আসছে না রানা। কেউ নেই যে ওকে রক্ষা করবে। মরতেই হচ্ছে!

পাষাণে বুক বেঁধে নীরবে হাঁটছে লাবনী। মনোযোগ দিল চারপাশে। কাঁপা কাঁপা, কর্কশ লালচে আলোয় দেখল টেম্পল অভ পসেইডনের সামনে ঢিবির ওপর আরেকটা দালান। ওটা অনেক ছোট। গুহার মেঝে থেকে অনেকটা ওপরে। ওটাকে ঘিরে রেখেছে

পনেরো ফুট উঁচু দেয়াল। ওই দেয়াল...

'সোনা,' চাপা কণ্ঠে বলল ড্রেক, 'টনকে টন! আজকাল প্রতি আউন্স বোধহয় আট শ' বা নয় শ' ডলারেরও বেশি? এখানে আছে শত শত বিলিয়ন ডলারের মাল!'

'সাবধান, ড্রেক,' সতর্ক করল লুক্কা। 'এসব ভাবতে গিয়েই বেঈমানি করেছিল মিশকিন। ব্রাদারহুড এখানে লাভ করতে আসেনি, এসেছে সব ধ্বংস করতে।'

খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে সোনার প্রাচীরের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। ছোট দালানটাকে ঘিরে রেখেছে দেয়াল, মনে হলো না ভেতরে ঢোকার কোনও পথ আছে।

'ওটা পসেইডনের স্ত্রী দেবী ক্লেইটোর,' বলল লাবনী। 'প্লেটো বলেছিলেন কোনও পথে ঢোকা যেত না ওই মন্দিরে।'

'কে বলেছে?' নিজের গিয়ার থেকে গ্র্যাপলিং গান নিল ড্রেক। 'এবার দেখব ঠেকায় কোন্ শালা!'

'না।' ডোনাটি লুক্কার একটামাত্র কথায় থমকে গেল হেণ্ড্রিক ড্রেক।

'অসুবিধে কী,' বলল লাবনী। 'ভেতরে কী আছে জানতে কৌতূহল হচ্ছে না আপনার? আটলান্টিসের নতুন সভ্যতা আবারও বিকশিত হচ্ছিল এখানে। হয়তো মন্দিরে আছে আটলান্টিস থেকে আনা সত্যিকারের আর্টিফ্যাক্ট। আপনারা জানতে চান না কীসের শেষ দেখতে এত বছর ধরে লড়ছেন? জেনে নেবেন না কে বা কারা আপনাদের শত্রু?'

চিন্তিত চেহারায় স্বর্ণ-প্রাচীর দেখল ডোনাটি লুক্কা। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা দোলাল ড্রেকের উদ্দেশে। এবার যন্ত্র থেকে গ্র্যাপনেল সরিয়ে ফেলল ড্রেক, টেনে বের করল কেবল। যথেষ্ট কেবল বেরিয়ে আসার পর পিছিয়ে গিয়ে গ্র্যাপনেল ফেলল দেয়ালের ওদিকে। কেবল টেনে আনতেই আটকে গেল হুক।

'ঠিক আছে, দেখা যাক ওদিকে কী,' কেবল বেয়ে উঠতে লাগল ড্রেক। লাবনীর এক গার্ডও দেয়ালের ওদিকে ফেলল কেবল। ড্রেকের চেয়ে অনেক সতর্ক ভঙ্গিতে উঠতে লাগল সে।

দেয়ালের মাথায় চড়ে পেটে ভর দিয়ে শুল ড্রেক। 'ডক্টর আলম, এবার তুমি এসো।' দ্বিতীয় গার্ডের দিকে ইশারা করল সে। দু'হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে লাবনীকে তুলে দিল লোকটা। ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে দিল ড্রেক।

'ড্রেক, জানো, ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে ফেললে ঘাড় ভেঙে মরবে তুমি?' দেয়ালে উঠে বিড়বিড় করল লাবনী।

'আর তুমি জানো, দুই পায়ে গুলি করে তোমাকে ফেলে যেতে পারি?' জবাব দিল ড্রেক। 'সেক্ষেত্রে সময় লাগবে মরতে। তারপর ফাটবে বোমা।' লাবনীকে ধরে ওদিকে নামাল সে।

এরপর করেলি, বেকায়দাভাবে তাকে টেনে তুলল ড্রেক। তারপর উঠল লাবনীর দ্বিতীয় গার্ড। শেষে উঠল ডোনাটি লুক্কা। লাবনী বিস্মিত হলো বয়স্ক লোকটার ক্ষিপ্রতা দেখে। ওর মনে পড়ল লোভিস ডেনিয়েলসনের কথা। কী মিল দু'জনের! যেন যমজ দুই ভাই!

ঢালু টিবির বুকে সিঁড়ির ধাপ উঠেছে মন্দিরের দরজায়। এখানে এসে আবারও দলের নেতৃত্ব নিল লুক্কা। ঠিক পেছনেই লাবনী, কৌতূহলী।

অবাক হতে হলো ওদেরকে। মন্দিরের ভেতর তেমন কিছুই নেই। প্রথম ঘরে এক জোড়া সোনার মূর্তি। দু'জনের একজন পসেইডন। কিন্তু নিজের মন্দিরে যে বিশাল আকার নিয়ে বিরাজ করে, সে-তুলনায় এখানে এসে অনেক খাটো হয়ে গেছে বেচারা। অবশ্য, এখনও তার আকার সাধারণ মানুষের চেয়ে বড়। ক্রেইটোর মুখোমুখি হয়েছে। পেছনে কারুকাজ করা ছোট এক সমাধি।

'মৌসোলিয়াম,' বলল লাবনী। ঘরের পেছনে দামি সব রত্ন ও

সোনা দিয়ে কারুকাজ করা প্রকাণ্ড দুটো পাথরের শবাধার।

'এসব কার?' আনমনে বলল ড্রেক। একটা শবাধারের পায়ের কাছে আলো ফেলতেই দেখা গেল গ্লোযেল অক্ষর। 'কী লিখেছে?'

একই সময়ে অনুবাদ করল লাবনী ও করেলি। বিড়বিড় করল করেলি, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বলল লাবনী: '"এখানে ঘুমিয়ে আছেন নতুন এই আটলান্টিসের শেষ রাজা জাস্টর।"' আগের যুগের গ্লোযেলের অক্ষর এখানে এসে একটু কাত হয়েছে। দ্বিতীয় শবাধারের পাশে থামল লাবনী। 'আর ইনি তাঁর স্ত্রী রানি... ল্যাসিয়া।'

'শেষ রাজা?' বিড়বিড় করল করেলি। 'তার উত্তরপুরুষ ছিল না? সেক্ষেত্রেও তো দরবারে বসার কথা অন্য কারও!'

'ফ্ল্যাশলাইট দেখি,' ড্রেকের দিকে হাত বাড়াল লাবনী। ওটা পেয়ে ঝুঁকে গেল শেষ কয়েক লাইন পড়ার জন্যে।

'অসুস্থ হয়ে মরছিল ওরা,' পড়তে পড়তে বলছে লাবনী। 'ওরা ভেবেছিল পাহাড়ি এ এলাকা প্রাকৃতিক দুর্গের মত, এখান থেকেই বড় করে তুলবে নতুন এই সাম্রাজ্য, শাসন করবে হিমালয়ের চারপাশের এলাকা। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি।'

'কী হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল লুক্কা।

'শেষপর্যন্ত যা হয় প্রতিটি সাম্রাজ্যের,' বলল লাবনী, 'আরাম আয়েস করতে করতে অলস হয়ে গেল সবাই। ধার থাকল না মগজের। হয়তো ভেবেছিল, যাদের এলাকা দখল করবে, তাদের কাছ থেকেই পাবে সব দরকারী জিনিস। কিন্তু খুব কঠিন এ এলাকা।' পড়তে পড়তে মৃদু হেসে ফেলল। "বিশাল ও ক্ষমতাশালী দেশের আটলান্টিয়ান মানুষ... চলে গেল এ এলাকা ছেড়ে। শুধুমাত্র রাজা-রানির জন্যে রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা মারা যেতেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সবাই। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল শহরের পথ। কে জানে, হয়তো রাজা আর রানিকে নিজেরাই

। য় দিয়ে মেরে ফেলেছিল, যাতে তাড়াতাড়ি ভাগতে পারে এখান থেকে।'

'তারা গেছে কোথায়?' জানতে চাইল ড্রেক।

'মিস্টার লুক্কা যা ভেবেছে, প্রায় তা-ই হয়েছে,' বলল লাবনী। 'অন্যান্য দেশের সমাজে মিশে গেল তারা। তবে... তারা দখল করতে যায়নি নতুন দেশের ক্ষমতা। যেমনভাবে অন্য দেশে হাজির হয় গরীব মানুষ, সেভাবে তারা হয়েছিল ভিন দেশে অভিবাসী আর উদ্বাস্তু। নতুন সমাজের সবচেয়ে নিচু স্তরে স্থান হয়েছিল তাদের।'

'এ অসম্ভব!' লাবনীর কথা শুনে রেগে গেল ডোনাটি লুক্কা।

'যা লিখেছে, নিখুঁতভাবে অনুবাদ করলে তা-ই বোঝায়,' বলল করেলি, 'যারা লিখেছে, ভাল করেই জানত একদম পঙ্গু হয়ে গেছে তাদের সমাজ। ওই জাতিকে রক্ষা করতে চাইলে একমাত্র উপায় ছিল অন্যান্য সমাজে মিশে যাওয়া।'

কণ্ঠের রাগ গোপন করল না লাবনী: 'যাহ্, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল আপনার ষড়যন্ত্রের থিয়োরি, ডোনাটি লুক্কা! যার অস্তিত্বই নেই, তার বিরুদ্ধে হাজার বছর ধরে খামোকাই তড়পে বেড়াল আপনাদের ব্রাদারহুড!'

'না, আপনি ভুল বলছেন!' চড়া কণ্ঠে প্রতিবাদ করল লুক্কা। 'যারা ওদেরকে খুব নিচু স্তরের মানুষ ভাবত, তাদের অধীনতা স্বীকার করেনি আটলান্টিয়ানরা। তাদের রক্তেই ছিল না তা। হয়তো নতুন সমাজের মই বেয়ে উঠতে গিয়ে লেগেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম, কিন্তু তারপরেও তারা উঠে গেছে ক্ষমতার চূড়ায়।'

'আপনার কথার কোনও সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন?' ফ্ল্যাশলাইটের আলো ডোনাটি লুক্কার চোখে-মুখে ফেলে উঠে দাঁড়াল বিরক্ত লাবনী। 'হতে পারে আটলান্টিয়ান উত্তরপুরুষদের ডিএনএ ট্রেস করছেন লোভিস ডেনিয়েলসন। খুঁজছেন পৃথিবীর সেরা ইতিহাস বা কোথায় আছে আটলান্টিস। কিন্তু তার মানে

এটা নয় যে তিনি দখল করতে চাইছেন পৃথিবী!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে লাবনীকে দেখল লুক্কা। 'আপনি জানেনও না কী করতে চলেছে লোভিস ডেনিয়েলসন!'

'আপনার চেয়েও খারাপ কিছু করতে পারবেন না!'

সরু হয়ে গেল লুক্কার চোখ। 'আসলে জানেন না...'

রেডিয়ো থেকে আসা বার্তা শুনে থেমে গেল সে।

'ওরা বোমা নিয়ে এসেছে,' বলল ড্রেক।

'যে-কোনও সময়ে ডেটোনেশনের জন্যে তৈরি রাখতে বলো,' ধমকে উঠল লুক্কা। 'তোমরা বেরোও এখান থেকে!' মন্দিরের দরজার কাছে চলে গেল সবাই। কিন্তু লাবনীর দিকে হাতের ইশারা করল লুক্কা। 'আপনার কোথাও যেতে হবে না।'

'বুঝলাম না।' অবাক হয়েছে লাবনী।

'এখানেই থাকছেন। বিদায় নেবেন রাজা-রানির সঙ্গে।'

ডোনাটি লুক্কার কথার গূঢ় অর্থ বুঝে কেঁপে গেল লাবনী। বরফের মত একটা হাত যেন চেপে ধরেছে ওর হৃৎপিণ্ড। 'একমিনিট, আপনি আমাকে এখানে রেখে যাবেন? না... একটু পরে তো বোমা ফাটবে!'

হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল ড্রেক। লাবনীকে বলল, 'তুমি চাইলে এক গুলিতে খুলি উড়িয়ে দিতে পারি। কোনও ব্যথাই পাবে না।'

'না,' মাথা নাড়ল লুক্কা। 'তার চেয়ে অনেক ভাল বোমা। এক সেকেণ্ডে বাষ্প হবেন।'

'আমি কি এত ভাল সব প্রস্তাবে খুশিতে নাচব?' ভয়ে কাঁপছে লাবনী, 'আপনারা এভাবে আমাকে ফেলে যেতে পারেন না!'

'পারি না কে বলেছে? ভাল থাকুন!' লাবনীর পায়ের কাছে জ্বলন্ত একটা গ্লো স্টিক ফেলল লুক্কা, পরক্ষণে ড্রেকের সঙ্গে বেরিয়ে গেল মন্দির ছেড়ে। পিছু নিল অন্যরা। একবার লাবনীকে

দেখে নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেল করেলি, চেহারায় সত্যিই দুঃখ।

লাবনীর মনে হলো দৌড়ে পিছু নেবে অন্যদের। হাঁচড়ে পাছড়ে পেরিয়ে যাবে সোনার দেয়াল। কিন্তু তা সম্ভব নয়। বেরোতে গেলেই গুলি খেয়ে মরবে। ওর মন বলল, হাল ছেড়ে দিয়ো না! কিন্তু তার পরেও হার মেনে নিতে হলো। রাজার শবাধারের পাশে হেলান দিয়ে ধুলো ভরা পাথুরে মেঝেতে বসে পড়ল মেয়েটা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে দেয়াল পেরিয়ে গেল লোকগুলো। চুপচাপ বসে থাকল লাবনী। ভাবছে, কী করা উচিত। কীভাবে মরবে? কত কষ্ট হবে? সমাধির ভেতর আটলান্টিসের রাজা-রানির সঙ্গে বাষ্প হয়ে যাবে?

বড় করে শ্বাস ফেলল লাবনী। হাতে তুলে নিল গ্লো স্টিক। অসুস্থকর সবুজ কটকটে আলোর দিকে তাকাল। এবার কী করা উচিত? ওর চোখ পড়ল শবাধারে লেখা বাণীর ওপর। মন থেকে ভয় দূর করতে পড়তে লাগল। আশ্চর্য, এভাবে শেষ হয়ে গেল প্রতাপশালী মস্ত দেশ আটলান্টিস! আর সব সভ্যতার মতই, ক্ষমতাশালীদের দুর্নীতি একসময়ে দুর্বল করে দিয়েছে সমাজের ভিত্তি, এসেছে পতন। শেষে ওই সাম্রাজ্যের স্থান হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। হয়তো এটাই উচিত, চিরকালের জন্যে রয়ে গেল আটলান্টিসের কিংবদন্তী, পৃথিবীর সেরা রহস্য!

এসব ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর ধক-ধক লাফানি কমছে, তা নয় দেয়ালের ওদিকে আওয়াজ। ঠুং-ঠাং শব্দে ক্রেটের জিনিস বের করছে লুক্কার লোক। বোমা ফাটাবে তারা। লাবনী ভাবল, আর কতক্ষণ বাঁচব? পনেরো মিনিট? না দশ?

কী অর্থ জীবনের? জন্মানো আর মরা?

বাইরে চেঁচামেচি। মুখ তুলে স্বর্ণ-প্রাচীরের দিকে তাকাল লাবনী। পাল্টে গেছে লোকগুলোর চিৎকারের সুর।

ভয় পেয়েছে?

উত্তেজিত?

উদ্বিগ্ন?

গ্লো স্টিক হাতে মন্দির থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল লাবনী, থামল সোনার দেয়ালের কাছে। মন দিল লোকগুলোর কথায়। পাল্টা কী যেন জিজ্ঞেস করল ডোনাটি লুক্কা।

রেডিয়োতে কথা বলছে হেণ্ড্রিক ড্রেক।

কিন্তু বেতারের মাধ্যমে এল না পাল্টা জবাব।

পরিষ্কার শুনল লাবনী, চিৎকার করে বলল ডোনাটি লুক্কা: 'ঠিক আছে, চালু করো টাইমার!'

জমাট আতঙ্কে বুক আঁকড়ে এল লাবনীর।

রাস্তায় বেশ কয়েকজনের ছুটন্ত পদশব্দ। দূরে হারিয়ে গেল টানেলের দিকে।

'হায়, আল্লা, আমাকে পথ দেখাও!' বাঁচার আকুতি কাজ করছে লাবনীর বুকে। মন্দিরের বাইরে দেয়ালের পাশ দিয়ে দৌড়ে একচক্কর কেটে এল। না, কোনও দরজা নেই!

সোনার প্রাচীর মস্ত আঙটির মত ঘিরে রেখেছে মন্দির!

কিন্তু মন্দিরের ভেতর...

হয়তো গোপন কোনও পথে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। বা পথ গেছে পসেইডনের মন্দিরে! আরেক দৌড়ে মন্দিরে ঢুকল লাবনী। সামান্য আলোর মত এক চিলতে আশা কাজ করছে ওর বুকে।

কিন্তু নিভে গেল তা-ও।

মন্দিরের ভেতরের দেয়াল ও মেঝে নিরেট পাথরের।

পথ থাকতে পারে শবাধারের ভেতর!

ক'সেকেণ্ড চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল লাবনী, শবাধারের পাথরের ডালা অনেক বেশি ভারী!

এক পল এক পল করে পেরোতে লাগল সময়। একটু পর ডেটোনেট হবে বোমা!

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লাবনী।

বোমা নয়, আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন!

দূরে কর্কশ, খ্যাট-খ্যাট আওয়াজ তুলছে অটোমেটিক অস্ত্র। আওয়াজটা আসছে এদিকেই!

কী হচ্ছে আসলে? সিঁড়ি বেয়ে নেমে দেয়ালের পাশে থামল লাবনী। প্রকাণ্ড গুহায় বেশ কয়েকটা অস্ত্রের হুঙ্কার। ভোঁতা একটা বিস্ফোরণ। গ্রেনেড? আরেকটা! চিৎকার করে উঠল কে যেন! মাঝপথে থেমে গেল। বিস্ফোরিত হলো আরেকটা বোমা।

গুহার আকাশে উঠল ফ্লেয়ার, চারপাশে ছিটিয়ে দিল লালচে আলো। আরেক দৌড়ে সিঁড়ির ওপরের ধাপে থামল লাবনী। এবার হয়তো দেখতে পাবে দেয়ালের ওদিকে।

দলের কয়েকজনকে নিয়ে মন্দিরের দিকেই ছুটে আসছে ডোনাটি লুক্কা। তার দলে লোক কমে গেছে। বারবার থেমে পেছনে গুলি করছে তারা। ওদিক থেকে তেড়ে আসছে একদল লোক। সংখ্যায় বেশি। ছড়িয়ে পড়েছে গুহার ভেতর। আড়াল নিচ্ছে বাড়িঘরের। তাদের অস্ত্রের মাযল থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে লালচে আগুন। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডোনাটি লুক্কার এক লোক, গুলি লেগেছে পিঠে।

ফাঁপা আওয়াজ তুলল কী যেন। ডোনাটি লুক্কা আর তার দলের সামনে পড়েই বিস্ফোরিত হলো বোমা। হামলাকারীরা ব্যবহার করছে গ্রেনেড লঞ্চার! বোমার বিস্ফোরণ চারপাশে ছিটিয়ে দিল পাথর ও জঞ্জাল। ভয়ে পেয়ে ঝুপ্ করে বসে পড়ল লাবনী।

নিজেদের বোমার কাছে পৌঁছতে পাগল হয়ে উঠেছে ডোনাটি লুক্কা। কিন্তু তার গন্তব্য অনেক দূরে, সামনে পড়ছে গ্রেনেডিয়ারদের বোমা।

ব্রাদারহুডের লোকদের চেয়ে সংখ্যায় ভারী অন্য দল, সঙ্গে

শক্তিশালী সব অস্ত্র। অনায়াসেই গুলি করে সাফ করছে ডোনাটি লুক্কার লোক। পালাবার উপায় নেই তাদের। মাঝে পড়ছে ফ্ল্যাশ গ্রেনেড, চারপাশে বিদ্যুৎশিখার মত আলো। অন্ধ হয়ে গেছে লোকগুলো, কান ফাটছে আওয়াজে। চালু হলো মেশিনগান। প্রাচীন সব প্রাসাদের দেয়ালে লাগছে অজস্র গুলি। লুকিয়ে পড়া ডোনাটি লুক্কার লোক নিরাপদ নয়। গায়ের কাছে পড়ছে গ্রেনেড। বজ্রপাতের মত গুরুগম্ভীর আওয়াজে ধসে পড়ল একটা প্রাসাদ। মৃত্যুচিৎকার মাঝপথে থেমে গেল কারও।

চারপাশে নারকীয় পরিবেশ। বিকট সব আওয়াজ। তার ওপর দিয়ে শুনল লাবনী হেণ্ড্রিক ড্রেকের চিৎকার: 'সিয ফায়ার! সিয ফায়ার!' কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে গেল সব আওয়াজ।

আত্মসমর্পণ করছে ডোনাটি লুক্কার লোক!

অন্য দলের দৌড়ে আসার পদশব্দ শুনে গলা উঁচিয়ে ডাকল লাবনী। একেকবারে তিন ধাপ করে উঠে গেল মন্দিরের কাছে। 'এই যে! আমি এখানে! বাঁচাও! বের করো আমাকে এখান থেকে!'

কয়েক সেকেণ্ড পর বাইরে থেকে কথা বলল কয়েকজন। সোনার প্রাচীরের এদিকে পড়ল গ্র্যাপনেল। কাঁপতে লাগল রশি। কেবল বেয়ে দেয়ালে উঠে আসছে কেউ।

কয়েক সেকেণ্ড পর দেয়ালের ওপর দেখা দিল উজ্জ্বল আলো। তখনই জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখল লাবনী। ওর দিকে চেয়ে হাসছে মাসুদ রানা!

'আরে, শেষে মন্দিরের উপাসিকা হয়ে গেলে?'

'ওহ্, রানা!' খুশিতে কেঁদে ফেলল লাবনী। 'কী যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে!'

'লোকটা তা হলে আমি অত খারাপ নই?'

'না! তুমি পচা!'

ছাব্বিশ

'তুমি সুস্থ তো?' লাবনীকে দেয়ালের বাইরে এনে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। খুব ভাল লাগছে বেঁচে আছ! বুঝলাম, দু'চারটে জাহাজ ডুবে গেলেও মরে না মাসুদ রানা!'

'তাই তো মনে হচ্ছে!'

জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'মউরোস আর সেসিলির কী হয়েছে? ওরা ঠিক আছে?'

'সেসিলি সুস্থ। পায়ের গোড়ালি ভেঙে গেছে মউরোসের। আপাতত বিশ্রাম নিতে হবে।' পথের দিকে তাকাল রানা। 'রওনা হয়ে গেছে সেসিলি।'

'ও এখানে এসেছে?' বুকে উত্তেজনা টের পেল লাবনী। এবার মেয়েটা দেখবে সত্যিকারের আটলান্টিয়ান সভ্যতা!

'ওকে বলেছি পেছনে থাকতে। গোলাগুলি শেষ, এবার চলে আসবে।'

গ্লো স্টিক আর ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দিন হয়ে গেছে চারপাশ। এরই ভেতর বন্দি হয়েছে ডোনাটি লুক্কার দলের সবাই। রাস্তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। লুক্কা, ড্রেক, করেলিসহ দলে তারা আটজন। সবার হাত মাথার পেছনে। কালো কমব্যাট গিয়ার ও আর্মার পরনে বারোজন কমাণ্ডো পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে। চারদিক ঘুরে দেখছে দলের আরও অন্তত দশজন

কমাণ্ডো। কাউকে চিনল না লাবনী। 'তোমার সঙ্গে এরা কারা, রানা?'

'ডেনিয়েলসনের সিকিউরিটি ফোর্স। অ্যালরিক জ্যাগারের নেতৃত্বে রেইভেন্সফিওর্ড এলাকা পাহারা দেয়। প্রত্যেকের আছে মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ড। বাংলাদেশ আর্মির দেশপ্রেমিক, দুর্ধর্ষ কমাণ্ডোদের মত না হলেও যথেষ্ট দক্ষ। নিজের লোক সঙ্গে আনতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু হাতে সময় ছিল না। দেরি না করে রওনা হই এখানে আসার জন্যে।'

'সত্যি যে সময় মত আসতে পেরেছ, সেটাই আমার কপাল,' একটু দূরের মস্ত বোমা দেখাল লাবনী। ওটা দেখতে অনেকটা পানি গরম করার বয়লারের মত। 'উড়িয়ে দিত সব।'

'জানি। কয়েক মিনিট আগে টাইমার বন্ধ করেছি আমরা।'

'মিনিট?' শিউরে উঠল লাবনী। বুঝে গেছে, খুব কাছ দিয়ে ঘুরে গেছে সাক্ষাৎ যম। 'আমার মনে হয় ওটার সুইচ বন্ধ করে দেয়াই ভাল।'

'পয করা হয়েছে, চিন্তা কোরো না,' লাবনীর চোখে ভয় দেখে বলল রানা, 'ওটা চালু করবে না কেউ।'

'আমাকে খুঁজে পেলে কী করে?'

মৃদু হাসল রানা। 'পেয়ে যাই তোমার দেয়া পোস্টকার্ডের খবর। মনে ছিল ওই গ্রামের নামটা।'

'কপাল ভাল আমার,' বলল লাবনী। 'তিব্বত বড় দেশ। যদি ভুলে যেতে গ্রামের নাম, এখানেই মরতাম।' ভাবতে গিয়ে অবাক লাগল ওর, ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডকে ওই তথ্য দেয়া ছিল প্রায় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না, স্পষ্ট কিছু বললে ক্যাপ্টেন আর ওকে মেরে ফেলত ডোনাটি লুক্কা। আবারও মুখ খুলল, 'তোমাদেরকে জানাতে পারিনি আটলান্টিস থেকে পাওয়া নতুন সব তথ্য। ওগুলোর জন্যেই গঙ্গা নদী অনুসরণ করে

এসেছি হিমালয়ে, তারপর খুঁজে নিয়েছি স্বর্ণ-চূড়া।'

'এসব তথ্য লাগত না,' বলল রানা। 'মিস্টার ডেনিয়েলসন যোগাযোগ করেন চাইনিজ সরকারের ক্ষমতাশালী এক নেতার সঙ্গে। এ দেশে ঢুকতে অসুবিধা হয়নি আমাদের। তোমার ওই গ্রাম থেকে এসেছি হেলিকপ্টারে চেপে। গ্রামের মানুষ মনে রেখেছিল তোমার বাবা-মার কথা। লোককথা শুনে এখানে আসতে চাইবে, এমন আর কাউকে দেখেনি ওরা। ওদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি কোথায় আসতে হবে। আর তারপর এসে দেখলাম পাহাড়ের কার্নিশে বসে আছে ডোনাটি লুক্কার হেলিকপ্টার। দুটোই বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছি।' ভুরু কুঁচকে বন্দিদের দেখল রানা।

'এবার এদের কী করবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'এখনও জানি না। দায়-দায়িত্ব নেবেন দেখা যাক, হয়তো মিস্টার ডেনিয়েলসন।'

'লাবনী!'

ওর নাম শুনে ঘুরে দাঁড়াল লাবনী। প্রায় দৌড়ে আসছে সেসিলি, পরনে সাদা, ভারী কোট। কাঁধে পড়ে চিকচিক করছে সোনালি চুল। বন্দিদের পাশ কাটিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল লাবনীকে। 'ওহ্, গড! কী যে ভাল লাগছে, তুমি ঠিক আছ!'

'পুরো সুস্থ!' হাসল লাবনী। 'আমিও খুশি যে সাগরের তলা থেকে উঠে আসতে পেরেছ! ডোনাটি লুক্কা যখন জাহাজ ডুবিয়ে দিল, মনে হয়েছিল আর কখনও দেখা পাব না তোমাদের!'

'প্রায় মরেই গিয়েছিলাম,' লাবনীকে ছেড়ে এক পা পিছিয়ে গেল সেসিলি। 'রানা না থাকলে ঠিকই মরতাম।'

দুষ্টুমি ভরা কণ্ঠে বলল লাবনী, 'তো এখন "মিস্টার রানা"-র বদলে শুধু রানা?'

লাজুক হাসল সুন্দরী সেসিলি। 'আসলে, রানা ছয়বার প্রাণ বাঁচাবার পর ভাবলাম, প্রথমবারেই যে পরিমাণ কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত

ছিল, তা মোটেও প্রকাশ করিনি আগে। তখন নিজেকে কেমন ছোট মনে হলো।' রানার দিকে চেয়ে হাসল। 'সত্যি, অনেক ধন্যবাদ, রানা!'

মৃদু নড করল রানা।

'সেসিলি দেখেছ, আমরা কী পেয়েছি?' হাত তুলে চারপাশ দেখাল লাবনী।

'এ শুধু তোমার একার প্রাপ্তি,' শুধরে দিল সেসিলি। নরওয়েজিয়ান ভাষায় কালো পোশাকধারী এক কমাণ্ডোকে নির্দেশ দিল। ওপরে ফ্লেয়ার ফায়ার করল লোকটা। অপ্রাকৃতিক লাল আলোয় দেখা গেল চারপাশের বাড়িঘর, প্রাসাদ ও মন্দির। 'নতুন করে গড়ে তুলেছিল ওরা আটলাণ্টিসের দুর্গ-শহরের মত নগরী। প্রায় নিখুঁত...'

একটু দূরে ধসে পড়েছে একটা দালান। ওদিকে চেয়ে বলল রানা, 'দুঃখিত, গ্রেনেড গিয়ে পড়েছিল ওটার ওপর।'

ওর বাহু চাপড়ে দিল লাবনী। 'একটু আগে যা অবস্থা ছিল! যে-কেউ খুন হয়ে যেতে পারত। তোমার কোনও দোষ নেই। আর্কিওলজিকাল এই ক্ষতি মেনে নিতেই হবে।'

'আরেকটা টেম্পল অভ পসেইডন, ভাবা যায় না!' একটু দূরের মন্দির দেখছে সেসিলি।

'আরও অদ্ভুত কিছু আছে,' বলল লাবনী। সোনার দেয়ালের ওদিকের ছোট মন্দির দেখাল। 'ভাবতেও পারবে না এটা কী।'

'টেম্পল অভ ক্লেইটো?' জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

মাথা দোলাল লাবনী। 'একইসঙ্গে মৌসোলিয়াম! ভাবতেও পারবে না ভেতরে কী! আটলাণ্টিসের শেষ রাজা আর তার রানির কফিন!'

খুশিতে ঝলমল করে উঠল সেসিলির মুখ, কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারল না। তারপর সামলে নিল নিজেকে। 'তুমি ঠিক জানো

তো? তাদেরই কফিন?'

'ডালা খুলে দেখিনি, কিন্তু কফিনের পায়ের কাছে লেখা আছে সে সময়ে কী হয়েছিল।'

বলে উঠল কর্তৃত্ব ভরা গম্ভীর এক কণ্ঠ: 'চলুন, দেখাবেন।'

ঘুরে চেয়ে লাবনী দেখল হেঁটে আসছেন লোভিস ডেনিয়েলসন, পরনে সাদা কোল্ড ওয়েদার গিয়ার। এক পলক দেখলেন ডোনাটি লুক্কা ও তার লোকদেরকে। হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে সবাইকে। যে দল পাহারা দিচ্ছে, তাদের নেতৃত্বে পেশিবহুল এক যুবক। আপাতত থেমে অপেক্ষা করছে ডেনিয়েলসনের জন্যে। লাবনীর মনে পড়ল, ওই লোকের নাম অ্যালরিক জ্যাগার। ক্রু-কাট সোনালি চুলের জার্মান।

'ফার,' বিনয় প্রকাশ পেল সেসিলির কণ্ঠে।

লাবনী বুঝে গেল, সেসিলির বাবা প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখেন মেয়ের ওপর।

ভদ্রলোক আঙুল তাক করলেন টেম্পল অভ ক্লেইটোর দিকে। 'কফিন কি ভেতরে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লাবনী, 'কিন্তু ভেতরে ঢুকতে হলে দেয়াল টপকে...'

তুড়ি বাজালেন ডেনিয়েলসন। স্বর্ণকেশী জ্যাগার পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলল ব্যাকপ্যাক। ওটার ভেতর থেকে নিল গোল ইলেকট্রিক করাত। সোজা গিয়ে থামল দেয়ালের সামনে। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল সোনার প্রাচীর, যেন খুঁত পাবে। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখে সেফটি গগল্স্ পরে নিয়ে চালু করল করাত। তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে সোনার দেয়ালের বুক চিরতে লাগল ধারালো ফলা।

'এতে কাজ হবে, কিন্তু...' চুপ হয়ে গেল লাবনী। কষ্ট পেয়েছে প্রাচীন আর্কিওলজিকাল সাইট নষ্ট হতে দেখে। কয়েক সেকেণ্ড পর তা-ই বলল মুখে, 'আমাদের উচিত আরও অনেক সাবধানে কাজ

করা। আগের মতই রাখতে হবে এই সাইট।'

'আমার প্রথম কাজ, যে জন্যে এসেছি, সেটা হাতে পাওয়া,' বললেন ডেনিয়েলসন। জ্যাগারের দিকে তাকালেন। 'দেয়াল কাটতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আর বড়জোর দু'এক মিনিট,' জবাব দিল জ্যাগার।

'তা হলে এদিকের অন্যান্য বিষয় গুছিয়ে নেয়া উচিত,' দু'হাত থেকে গ্লাভ্‌স্‌ খুলে ওগুলো দিয়ে বামহাতের তালুতে চাপড় দিলেন ডেনিয়েলসন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত দেখা হলো তোমার সঙ্গে, ডোনাটি লুক্কা।'

'হ্যাণ্ডশেক করছি না বলে দুঃখিত,' খেঁকিয়ে উঠল লুক্কা।

সরে গিয়ে জায়গা করে দিল গার্ডরা, লুক্কার সামনে গিয়ে থামলেন ডেনিয়েলসন। 'ভাবছি, তোমাকে নিয়ে কী করা যায়। যুদ্ধে মরলে সেটাই বোধহয় ভাল ছিল।'

'যা খুশি করো, তবে ভুলেও ভেবো না হারাতে পারবে ব্রাদারহুডকে। যা করবে, তাতেই বাধা দেবে ওরা।'

হাসলেন ডেনিয়েলসন। 'না, তা পারবে না। বিশেষ করে ওই মন্দিরের ভেতরের জিনিসটা পাওয়ার পর।' কয়েক সেকেণ্ড মৌসোলিয়াম দেখলেন তিনি। 'সত্যি বলব, আমার লোভ হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে দেয়ার। সেক্ষেত্রে পুরোপুরি বুঝতে কাকে বলে ব্যর্থতা। দেখতে তোমার সংগঠনের অসহায়ত্ব। কিছুই করতে পারবে না তুমি বা আর কেউ। এত মানুষকে খুন করলে একেবারেই বেহুদা।'

ঠোঁট বাঁকা হলো ডোনাটি লুক্কার; মুখে টিটকারির হাসি। 'তুমি ভেবেছ আমাকে খুন করলেই শেষ হয়ে যাবে ব্রাদারহুড?'

'ভাবতেও পারবে না এরপর কী হবে।' চওড়া হাসলেন ডেনিয়েলসন। 'এখন মনে হচ্ছে, তোমার লোকদের ব্যাপারে এত দুশ্চিন্তা না করলেও চলত।'

'যা খুশি করো আমাকে নিয়ে, কিন্তু নিজেও বাঁচবে না,' বলল লুক্কা।

'কিছুই করব না,' বললেন ডেনিয়েলসন, 'যা করার করবেন ডক্টর আলম। মনে করি না তোমাকে বাঁচতে দেবেন।'

'মানে?' অবাক চোখে ডেনিয়েলসনকে দেখল লাবনী।

ওর সামনে এসে নরম সুরে বললেন ডেনিয়েলসন, 'ডক্টর আলম... লাবনী। ওই লোক নিজ হাতে খুন করেছে তোমার বাবা-মাকে। যা করেছে, সেজন্যে শাস্তি পেতে হবে তাকে। প্রতিশোধ নেয়া কখনও অন্যায় নয়।'

'সত্যিকারের অপরাধী আসলে তুমি, ডেনিয়েলসন!' চিৎকার করে বলল ডোনাটি লুক্কা।

তার বুকে লাথি মেরে কাত করে রাস্তায় ফেলল এক গার্ড।

শ্বাস আটকে গেছে ইতালিয়ান লোকটার, খাবি খেল।

'আসলে...' ডোনাটি লুক্কাকে দেখল লাবনী। 'যা করেছে, সেজন্যে এই লোকের বিচার হবে না আদালতে?'

'কে করবে সেই বিচার? আইনের অনেক ওপরে সে। গোটা পৃথিবী জুড়ে খুন করেছে বহু মানুষকে।' জ্যাকেটের চেইন খুলে ভেতরে হাত ভরলেন ডেনিয়েলসন। 'যেভাবে খুন করেছে, সেই একইভাবে নিজেরও খুন হয়ে যাওয়া উচিত ওর।' পিস্তল বের করে হ্যামার তুলে লাবনীর হাতে অস্ত্রটা গুঁজে দিলেন তিনি। 'আপনার প্রতি যত অন্যায় করেছে, হাজার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তাতে আমার মনে হয় না আপনার আপত্তি থাকবে ওকে গুলি করে মারতে।'

চুপচাপ শুনছে ও দেখছে রানা, কুঁচকে গেছে ভুরু।

একবার হাতের পিস্তল দেখল লাবনী, চোখ তুলে দেখল রানাকে, তারপর ওর চোখ স্থির হলো ডেনিয়েলসনের চোখে। লোকটা অত্যন্ত গম্ভীর।

'নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া উচিত হবে না কারও,' প্রথমবারের মত মুখ খুলল রানা। 'ওটা বিচার নয়। মিস্টার ডেনিয়েলসন, ঠিক বলেছেন জঘন্য হত্যাকারী ওই লুক্কা, কিন্তু আপনি আশা করতে পারেন না যে খুন করে নিজেও হত্যাকারী হবে লাবনী।'

'দয়া করে এসবের বাইরে থাকুন, মিস্টার রানা,' সতর্ক করে দেয়ার সুরে বললেন ডেনিয়েলসন। 'কী করবেন সে সিদ্ধান্ত শুধু মিস আলমের।'

রেগে গেলেও রানা ঠিক করল আপাতত দেখবে কী হয়।

একবার লাবনী, একবার রানা, আরেকবার বাবাকে দেখছে সেসিলি, দ্বিধান্বিত। থমথমে নীরবতা চারপাশে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল মেয়েটা, 'বাবা আপনাদের চেয়ে অনেক ভাল করে জানেন কী করা উচিত।'

লাবনীর বাহুতে আলতো হাত রাখলেন ডেনিয়েলসন। প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'সব তোমার ওপর, লাবনী। ভাল করেই জানো, কী করেছে লুক্কা। সেজন্যে কী হওয়া উচিত শাস্তি, তা-ও অজানা নেই তোমার।' ট্রিগারের ওপর মেয়েটার তর্জনী বসিয়ে দিলেন তিনি। 'তোমার বাবা-মাকে ও খুন করেছে এই গুহার ভেতর। শাস্তি তুমি তাকে দিতেই পারো। তাতে কোনও অন্যায় নেই।'

রানা তৈরি হয়ে গেল, প্রয়োজনে বাধা দেবে ওকে।

দরদর করে চোখ থেকে গালে নামছে লাবনীর অশ্রু। দৃঢ়বদ্ধ হলো চোয়াল, কাঁপছে পিস্তল ধরা হাত। ডেনিয়েলসনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা ডোনাটি লুক্কার দিকে তাকাল ও।

'ফার...' শুরু করেছিল সেসিলি, কিন্তু চোখের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলেন ডেনিয়েলসন। সরে গেলেন লাবনীর কাছ থেকে।

পিস্তলটা খুব ভারী আর ঠাণ্ডা মনে হলো লাবনীর। চুপচাপ ওকে দেখছে ডোনাটি লুক্কা। চোখে ভয় বা রাগ নেই। এক পা সামনে বাড়ল লাবনী।

দেড় ফুট দূরেই রানা। ট্রিগার টেপার আগেই পিস্তল কেড়ে নেবে, ঠিক করল ও। সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নরম সুরে বলল, 'লাবনী, কাজটা কোরো না।'

পিস্তল তুলে ডোনাটি লুক্কার বুকে তাক করল লাবনী, তারপর লোকটার কপালে। টানটান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে হেণ্ড্রিক ড্রেক। একমাত্র অক্ষত চোখে দুশ্চিন্তা।

পাল্টা লাবনীকে দেখছে ডোনাটি লুক্কা। একটু আগেও খুন করতে চেয়েছে এই মেয়েকে, কিন্তু পাল্টে গেছে পাশার দান। এবার বাবা-মার খুনের বদলা নেবে মেয়েটা।

লাবনী ভাবছে, এই লোক খুন করেছে বাবা-মাকে। আরও কত মানুষকে হত্যা করেছে, তার হিসাব নেই!

ঝাপসা হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। চোখ পিটপিট করে সরিয়ে দিল অশ্রু। চুপচাপ শীতল চোখে ওকে দেখছে লুক্কা।

ট্রিগারে চেপে বসছে লাবনীর আঙুল। এবার...

পিস্তল নামিয়ে ফেলতে চাইল লাবনী, কিন্তু একই সময়ে ঝট্ করে সামনে বেড়ে ওর হাত থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিল রানা। আস্তে করে নামিয়ে দিল হ্যামার।

'আমি খুনি নই,' ফুঁপিয়ে উঠল লাবনী। 'ভুল ভেবেছেন, মিস্টার ডেনিয়েলসন। আটলাণ্টিয়ান ডিএনএ নিয়ন্ত্রণ করে না আমাকে। চাইলেও পারব না কাউকে খুন করতে। আর করবই বা কেন? আমি তো মানুষ।'

খুব হালকা সুরে বললেন ডেনিয়েলসন, 'অবশ্যই তুমি খুন করতে পারবে না। গুড।' হাত বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। সামান্য দ্বিধা করে পিস্তলটা তাঁর হাতে দিয়ে দিল রানা। 'তুমি

বোধহয় জানো না, লাবনী, আসলে পিস্তলে গুলিই রাখিনি।'

'মানে...' অবাক হয়েছে লাবনী। 'আপনি আমাকে পরীক্ষা করছিলেন?'

'দুঃখিত, আসলে বুঝতে চেয়েছি তুমি কেমন মেয়ে।'

বাবা আর লাবনীর মাঝে থেমে একটা দেয়াল তৈরি করল সেসিলি, রেগে গেছে। 'ফার, তোমার উচিত ছিল না লাবনীকে এভাবে কষ্ট দেয়া! আগেই তোমাকে বলেছি ও কেমন মেয়ে!'

'আমি দুঃখিত,' আবারও নরম সুরে বললেন ডেনিয়েলসন। 'আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম।'

স্বর্ণ-প্রাচীরে থেমে গেছে করাতের খ্যার-খ্যার আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পর ভারী 'ধুপ্!' শব্দ হলো। মন্দিরের দিকে পড়েছে সোনার দেয়ালের একাংশ।

'এদের পাহারা দাও,' গার্ডদের নির্দেশ দিয়ে কাটা দেয়ালের সামনে থামলেন ডেনিয়েলসন, জ্যাগারের কাছ থেকে ফ্ল্যাশ-লাইট নিয়ে পেরিয়ে গেলেন গোলাকার গর্ত। ওদিকে গিয়ে ঘুরে তাকালেন সেসিলি ও লাবনীর দিকে। 'এসো তোমরা।'

একে একে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকল সেসিলি ও লাবনী। ওদের পর রানা। লাবনী লক্ষ করল, ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখছেন ডেনিয়েলসন। এবার এল জ্যাগার। ওখানেই থামল সে। মনে হলো গর্ত পাহারা দেবে।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে ঢুকলেন ডেনিয়েলসন। কয়েক সেকেণ্ড পর লাবনী। এরই ভেতর রাজার কারুকাজ করা শবাধারের লেখা পড়ছেন বিলিয়নেয়ার। দু'হাতে তুলতে চাইলেন ভারী ডালা। 'জ্যাগার, এসো তো!'

কয়েক মুহূর্ত পর মন্দিরে ঢুকল সোনালি চুলের লোকটা, হাতে শাবল। ডেনিয়েলসন আর সে মিলে তুলতে চাইল শবাধারের ডালা, তাদের পাশে হাত লাগাল রানাও।

তিনজনের চেষ্টাও যেন কিছুই নয়। শাবলে নিজের দেহের ওজন চাপাল জ্যাগার। তাতে সামান্য নড়ল ডালা।

'আসুন, একসঙ্গে তুলতে হবে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'এক... দুই... তিন!'

আবারও গায়ের জোর খাটাল তিনজন। এবার খানিকটা সরে গেল ডালা। আরেক ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে দু'টুকরো হলো। আর্কিওলজিকাল আর্টিফ্যাক্ট নষ্ট হতে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল লাবনী।

কফিনের ভেতরে আলো ফেললেন ডেনিয়েলসন। 'মাই গড! দেখো!'

তাঁর পাশে থামল লাবনী ও সেসিলি। কফিনের ভেতর এক লোকের বিকৃত মুখ দেখে রীতিমত ভয় পেল ওরা। ভীষণ কষ্ট পেয়ে মরেছে লোকটা। লাবনীর মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে। হাজার হাজার বছর পাথরের কফিনে থেকে কালচে হয়ে শুকিয়ে গেছে লাশ। গলে যাওয়া ঠোঁটে চেপে বসেছে বড় বড় হলদে দাঁত।

'মামি হয়ে গেছে,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা দোলাল লাবনী।

আরও মনোযোগ দিয়ে লাশ দেখছেন ডেনিয়েলসন। 'আটলান্টিসের শেষ রাজা...' কোটের ভেতর থেকে ছোট একটা পাউচ বের করলেন তিনি। ওটা থেকে সুঁচের মত কী যেন নিয়ে সাবধানে জিনিসটা দিয়ে ফুটো করলেন মৃত রাজার বিশীর্ণ ত্বক। রানা ও জ্যাগারকে বললেন, 'এবার খুলতে হবে অন্য কফিন।'

'দরকার কী,' বলল রানা। 'আপাতত থাক না এখানে।'

'প্লিয, কাজটা করুন,' চাপা স্বরে বললেন ডেনিয়েলসন। অন্যহাতে রাখলেন সুঁচের মত জিনিসটা। পাউচ থেকে নিলেন স্ক্যালপেলের মত কী যেন। ঝুঁকে গেলেন মৃত রাজার মুখের ওপর। মনে হলো অপারেশন করবেন দক্ষ কোনও সার্জন।

'কী করছেন?' জানতে চাইল লাবনী। ওর মনে হয়েছে, ক্ষতি হবে মামির। 'স্ট্যাণ্ডিং প্র্যাকটিস কিন্তু এসব নয়।'

'আমার চাই ডিএনএ স্যাম্পল,' বললেন ডেনিয়েলসন। তাঁর ভাব দেখে মনে হলো, সবই খুলে বলে দিয়েছেন মামির গাল কেটে ভেতরে ঢুকল স্ক্যালপেল। ওদিকে অন্য শবাধারের খুরে ডালা সরে যাওয়ার কর্কশ আওয়াজ হলো। সাবধানে মেঝেতে ডালা নামিয়ে রাখল রানা আর জ্যাগার।

'আমাদের উচিত হচ্ছে না...' চুপ হয়ে গেল লাবনী। উঁকি দিয়েছে দ্বিতীয় কফিনে। ওদিকে রাজার ঠোঁটের একাংশ কেটে প্লাস্টিকের কন্টেইনারে রাখলেন ডেনিয়েলসন।

রানি ল্যাসিয়াও ভাল নেই। ছেঁড়া কাঁথার মত পোশাকের জন্যে বোঝা গেল এই লাশ মহিলার।

'আরে, এ তো ক্যামিলা পার্কার-বৌল্‌স!' চমকে গেছে সেসিলি। 'তারই চেহারা নিয়ে এখানে লুকিয়ে আছে!'

'সেসিলি,' নিজের অপারেশন থেকে চোখ তুললেন না ডেনিয়েলসন। 'আমার মনে হয় তোমার উচিত লাবনীকে নিয়ে হেলিকপ্টারের কাছে চলে যাওয়া। সেটাই ওর জন্যে নিরাপদ।'

অবাক চোখে বাবাকে দেখল সেসিলি। 'বিপদ হবে কেন? ডোনাটি লুক্কার লোকদের পাহারা দিচ্ছে আমাদের লোক।'

'নিশ্চিত হতে চাই। যাও, সেসিলি। ওকে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি,' আপত্তি তুলল লাবনী। 'অন্যান্য মন্দির দেখব না আমরা?'

'এই সাইট সিকিয়োর করার পর যে-কোনও সময়ে ফিরতে পারব। নিশ্চয়ই বুঝছ, লাবনী, এটা কোনও আর্কিওলজিকাল সার্ভে নয়, রেসকিউ মিশন। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ইকুইপমেন্ট নেই। পরেরবার আসব প্রস্তুতি নিয়ে।'

'অথচ ঠিকই সঙ্গে এনেছ তোমার সার্জিকাল... বাবার সঙ্গে

তর্ক করতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে চুপ হয়ে গেল সেসিলি।

কড়া চোখে ওকে দেখলেন ডেনিয়েলসন। 'তোমার সঙ্গে বাড়তি কথায় যেতে চাই না, সেসিলি। আগেও বলেছি, সবসময় লাবনীর নিরাপত্তার বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবে। সেক্ষেত্রে নিয়ে যাও ওকে হেলিকপ্টারের কাছে।'

আপত্তি তুলতে গিয়েও চুপ থাকল সেসিলি। দু' সেকেণ্ড পর বলল, 'ঠিক আছে, ফার। লাবনী, এসো।'

'ডোনাটি লুক্কার দলের কী হবে?' সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'ওদেরকে চাইনিজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব,' বললেন ডেনিয়েলসন। স্যাম্পল কন্টেইনার বন্ধ করে দ্বিতীয় কফিনের পাশে থামলেন। 'চাইনিজদের এলাকায় খুন করেছে, বিচারের দায়িত্ব তারাই নেবে।'

'চার বছর... কঠিন হবে কিছু প্রমাণ করা,' বলল লাবনী।

'আপনি না বলেছিলেন ডোনাটি লুক্কা আইনের উর্ধ্বে?' জানতে চাইল রানা।

'চাইনিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল,' বললেন বিলিয়নেয়ার। সেসিলি ও লাবনীকে দেখলেন। 'প্রিয়, তোমরা হেলিকপ্টারের কাছে যাও। এদিকের কাজ শেষ করে আসছি আমরা।'

'ঠিক আছে,' হতাশ সুরে বলল সেসিলি। বান্ধবীর হাত ধরে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

যাওয়ার পথে একবার রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল লাবনী। পাল্টা হাত নাড়ল রানা, গম্ভীর।

মন্দির থেকে বেরিয়ে সোনার দেয়ালের গর্ত পেরিয়ে রাস্তায় নামল সেসিলি ও লাবনী। 'বাবা ঠিকই বলেছেন,' বলল নরওয়েজিয়ান মেয়েটা। 'পুরো সাইট সিকিয়োর করার আগে এ

দিকটা পুরোপুরি নিরাপদ নয়।'

'আমার মনে হয়েছে, তুমিও মিস্টার ডেনিয়েলসনের সঙ্গে একমত নও,' বলল লাবনী।

'আসলে হতাশ হয়েছি,' স্বীকার করল সেসিলি। 'তোমার মতই আমিও চেয়েছিলাম চারপাশ ঘুরে দেখতে। কিন্তু...' বন্দিদের পাহারায় থাকা কালো ইউনিফর্ম পরা গার্ডদের দেখল সে। 'বাবার কথাই ঠিক, এদিকটা নিরাপদ নয়।'

পাহারা দিয়ে হেলিকপ্টারের কাছে ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাবার দু'জন লোককে নির্দেশ দিল সেসিলি।

প্রকাণ্ড গুহার ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গের দিকে চলল ওরা।

'পেয়েছি,' দ্বিতীয় প্লাস্টিকের কন্টেইনারের মুখ বন্ধ করলেন ডেনিয়েলসন। দুই পাউচ চলে গেল তাঁর কোটের ভেতর। 'ব্যস, যেজন্যে এসেছি, সে কাজ শেষ।'

'আপনি বলেছিলেন উদ্ধার করতে এসেছেন লাবনীকে,' বলল রানা। হয়ে উঠেছে কৌতূহলী।

ওর কথার জবাব দিলেন না ডেনিয়েলসন। নীরবে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। তাঁর পিছু নিল রানা। সোনার দেয়াল পেরিয়ে এল ওরা। একটু আগে বিদায় নিয়েছে সেসিলি ও লাবনী। এখনও ডোনাটি লুক্কা আর তার লোক বসে আছে হাঁটু গেড়ে।

নিচু স্বরে নিজেদের ভেতর আলাপ করছেন ডেনিয়েলসন ও অ্যালরিক জ্যাগার।

পাঁচ মিনিট সময়ে আটকে আছে টাইমার। বোমার সামনে থামল রানা। ডেনিয়েলসনের উদ্দেশে বলল, 'আমাদের বোধহয় বোমা ডিযআর্ম করা উচিত।'

'একটু পরে এ নিয়ে ভাবব,' জবাব দিলেন বিলিয়নেয়ার। আবার নিচু স্বরে আলাপ করতে লাগলেন জ্যাগারের সঙ্গে।

বন্দিদের কাছে এসে হেণ্ড্রিক ড্রেকের সামনে থামল রানা। প্রাক্তন বন্ধুর দুই হাত মাথার পেছনে।

'ড্রেক, তুমি ব্রাদারহুডে কেন?'

'কারণ এরাই ভাল দল, রানা,' চাপা স্বরে বলল ড্রেক। ফ্ল্যাশলাইটের মত জ্বলছে তার চোখ।

'নিরীহ মানুষ খুন করা, বোমা মারা, বা জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া কাজের কাজ, তা-ই না?' মাথা নাড়ল রানা। 'উন্মাদ হলে?'

'ভালর জন্যেই এসব করেছে এরা! বিশ্বাস করো...'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল রানা।

থামল না ড্রেক। 'যা করেছি, সেজন্যে গর্বিত নই। কিন্তু সবচেয়ে ভালটাই করতে চেয়েছি। অন্য কাজ হয়তো ছিল আরও হাজার গুণ খারাপ। ডেনিয়েলসন যা চাইছে, সেটা ভয়ঙ্কর।'

'যা দরকার, সেটা পেয়ে গেছি,' ড্রেকের উদ্দেশে বললেন ডেনিয়েলসন।

'সেটা কী?' তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লুক্কা, 'আটলাণ্টিয়ান শেষ শহর? পেয়েছ তাদের ডিএনএ। এবার ওটা দিয়ে কী করবে?'

ভুরু কুঁচকে লুক্কাকে দেখলেন ডেনিয়েলসন। কয়েক সেকেণ্ড পর ফুটে উঠল ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'আরেকটু হলে তোমাকে কবরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম কিছুই না জানিয়ে। সেটা ভাল হতো না।' হাসি মুছে পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল চেহারা। 'এবার নতুন করে পৃথিবী গড়ে নেব। ওই সমাজের উঁচু পর্যায়ে ক্ষমতা থাকবে শুধু নিখাদ আটলাণ্টিয়ান রক্তের মানুষের। শেষ করে দেয়া হবে অর্থহীন আবর্জনার মত ফালতু মানুষগুলোকে।'

মুখ আমসি হয়ে গেছে ডোনাটি লুক্কার। কাঁপা সুরে বলল, 'মাই গড! যা মনে করেছি, তার চেয়েও বড় উন্মাদ তুমি! তার মানে নিজের মত ডিএনএর মানুষদেরকে খুঁজছিলে না? চাও নিজেদেরকে ইমিউনাইয করতে? তোমার ল্যাব... ওখানে বসে

তৈরি করবে বায়োওয়েপন্স?'

চুপ করে দু'জনের কথা শুনছে রানা, বুকের ভেতর শিরশির করছে। মানব-সভ্যতার ওপর ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘনিয়ে আনতে চায় লোভিস ডেনিয়েলসন?

'তোমাদের ব্রাদারহুড হেরে গেল, ডোনাটি লুক্কা!' পিস্তল বের করেই শত্রুর কপালে গুলি করলে ডেনিয়েলসন।

লাবনীকে মিথ্যা বলেছে লোকটা, গুলি ছিল পিস্তলে!

'কড়াৎ!' শব্দে চারপাশের দালান থেকে ফিরল প্রতিধ্বনি।

বুলেটের প্রচণ্ড আঘাতে দু'ভাগ হয়ে গেছে লুক্কার করোটি। পেছনে ছিল প্রফেসর জিম করেলি, চোখে-মুখে কাঁচা হলদে মগজ পড়তেই করুণ এক আর্তনাদ ছাড়ল সে। লাফ দিয়ে উঠেই পালাতে চাইল, কিন্তু তার বুকে লাথি মেরে ফেলে দিল এক গার্ড।

একইসঙ্গে কয়েকটা চিন্তা এল রানার মনে। রক্ষা করতে হবে লাবনীকে। সে আছে গুহার বাইরে। নিজেকেই বা বাঁচাবে কী করে? দরকার অস্ত্র!

'গার্ড্স্!' নির্দেশ দিল ডেনিয়েলসন।

আগেই রানা ও অন্যদের দিকে এমপি-সেভেন তাক করেছে অন্তত দশজন গার্ড।

ধমকে উঠল ডেনিয়েলসন: 'জিম করেলিকে তোলো!'

ভীষণ ভয়ে কুঁকড়ে গেছে প্রফেসর। ঘাড় ধরে তাকে টেনে তুলল গার্ড।

'আমাকে ছেড়ে দাও!' ফুঁপিয়ে উঠল করেলি।

'চুপ!' আরেক ধমক দিল বিলিয়নেয়ার। 'আমরা তোমাকে সঙ্গে নেব। সরিয়ে নাও ওকে এখান থেকে!'

দু'জন গার্ড টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল জিম করেলিকে।

'নিজ হাতে আইন তুলে নেয়ার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?' ডেনিয়েলসনের কাছে জানতে চাইল রানা।

'সে অধিকার আমি নিজেই দিয়েছি নিজেকে, মিস্টার রানা,' বলল লোকটা। 'যেজন্যে এসেছি, তা পেয়ে গেছি।' আবারও পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল তার চেহারা। 'আপনাকে আর দরকার পড়বে না আমার।' নরওয়েজিয়ান ভাষায় কী যেন নির্দেশ দিল সে।

এক সেকেণ্ড পর রানার হোলস্টার থেকে ওয়াইল্ডি তুলে নিল অ্যালরিক জ্যাগার। ওরই অস্ত্রের মাযল দিয়ে খোঁচা দিল পিঠে।

বসিয়ে রাখা হয়েছে বন্দিদের। তাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো রানাকে।

'এখানে কাজ শেষ,' বলল ডেনিয়েলসন। জ্যাগারের দিকে তাকাল। 'নতুন করে চালু করো টাইমার।'

'সময় মাত্র পাঁচ মিনিট,' বলল জ্যাগার, 'এরই ভেতর বেরিয়ে যেতে পারব আমরা?'

'সম্ভব, যদি দৌড়ে বেরিয়ে যাই।'

'আপনি না এসেছেন লাবনীকে উদ্ধার করতে আর এই সাইট আবিষ্কার করতে?' সময় আদায় করতে চাইল রানা। 'কিছুই তো থাকবে না বোমা ফাটলে!'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেনিয়েলসন। 'এসব কিছুই লাগবে না। পৃথিবীর সব প্রাচীন ধনরত্নের চেয়েও অনেক জরুরি ওই ডিএনএর স্যাম্পল।' মাথার ইশারা করল। 'জ্যাগার, চালু করো টাইমার।'

রানার পেছনে বসে থাকা ড্রেক বিড়বিড় করল, 'জানি. লোভিস ডেনিয়েলসন ভয়ঙ্কর, নীচ কুকুর, তোমাকে বুঝি বলিনি?'

'তারমানে বোমার সঙ্গে রেখে যাবেন আমাদের?' লোকটার কাছে জানতে চাইল রানা। আগেই বুঝে গেছে: ওদেরকে বাঁচতে দেবে না এরা।

'না, তা করব না,' বলল ডেনিয়েলসন। 'আগে খুন করব, যাতে কাউন্টডাউন বন্ধ করতে না পারো। ...তোমরা রেডি?'

তার লোকদের প্রতিটি অস্ত্রের মাযল পেয়ে গেল টার্গেট।

রানা দেখল, ওর বুকে তাক করা হয়েছে দুটো সাবমেশিন গানের মাযল। দ্রুত ভাবছে ও। এখন দরকার কার্যকরী কোনও প্ল্যান।

কিন্তু অস্ত্র নেই ওর কাছে। কেউ নেই যে পাশে লড়বে।

কিন্তু...

মনে হলো গুলি লাগবে বলে ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে রানা, ধাক্কা খেল হাঁটু গেড়ে বসে থাকা ড্রেকের সঙ্গে। নিচু স্বরে বলল, 'তৈরি হও!'

সামান্য নড়ে বসল ড্রেক, দু'হাত উঠে গেল রানার কোমরে। কড়ে আঙুল পেয়ে গেল নির্দিষ্ট জিনিস।

বড় করে দম নিয়ে গুলির নির্দেশ দিতে গেল ডেনিয়েলসন, আর তখনই রানার বেল্ট থেকে ফ্ল্যাশ গ্রেনেড নিয়েই পিন খুলে ফেলল ড্রেক। দু'হাতে কান চেপে ধরল রানা আর সে। এক সেকেণ্ড পর পেছনের মেঝেতে 'ঠং' শব্দে পড়েই গড়িয়ে গেল কালো ধাতুর সিলিণ্ডার।

ডেনিয়েলসনের লোকদের চোখ গেল ওদিকে।

ওই একই মুহূর্তে জ্বলে উঠল গ্রেনেডের ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল সাদা অ্যালিউমিনিয়াম ও পটাসিয়াম পারক্লোরেট। পরক্ষণে তালা লেগে গেল সবার কানে। যারাই চেয়েছে ওই গ্রেনেডের দিকে, আপাতত অন্ধ হয়ে গেছে তারা। বিপজ্জনক গ্রেনেড না হলেও ওটার বিস্ফোরকের শকওয়েভে হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়েছে সবচেয়ে কাছের দুই গার্ড।

'ড্রেক!' বলেই পরের সেকেণ্ডে চোখ খুলল রানা। কাজে এল ওর কঠোর ট্রেনিং। জানা আছে কী করতে হবে। বন্দিদের ঘিরে রাখা একদল গার্ড ও ডেনিয়েলসন আপাতত অন্ধ ও হতভম্ব। কিন্তু একটু দূরে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অন্যান্য গার্ড।

রানার প্রথম ঘুষি নামল কাছের গার্ডের নাকে। মুড়মুড় করে হাড় ভেঙে চ্যাপ্টা হলো ওটা। রানার পেছনে লাফিয়ে উঠেই আরেক গার্ডের অ্যাডাম্‌স্ অ্যাপেল চুর করে দিল ড্রেক।

গার্ডের হাত থেকে এমপি-সেভেন কেড়ে নিয়েছে রানা। অস্ত্রটা ঘুরিয়েই একরাশ গুলি করল গার্ডদের বুকে এমপি-সেভেনে ৪.৬ মিলিমিটার অ্যামিউনিশন ব্যবহার করা হয় বলে অনায়াসেই ভেদ করে বডি আর্মার। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে খুন হলো ডেনিয়েলসনের চারজন গার্ড। পড়ে যাওয়ার আগেই দেখা গেল তাদের আর্মারের ফুটো দিয়ে ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত। নানান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দূরের গার্ডরা। নিজেদের লোক মরবে বলে গুলি করতে পারছে না।

রানার পেছনে তার দিকের গার্ডদের লক্ষ্য করে দফা গুলি করল ড্রেক। পড়ে গেল তিন গার্ড। বন্দিদের ঘিরে রাখা তাদের বৃত্তাকার দেয়াল ভেঙে গেছে।

রানা দেখল, বন্দিদের ক'জন গ্রেনেডের আলো ও আওয়াজ থেকে রক্ষা পেয়েছে, তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুর ওপর। অন্যরা ডেনিয়েলসনের গার্ডদের মতই হতভম্ব।

ডোনাটি লুক্কার লোকগুলোকে সাহায্য করার উপায় নেই, জানে রানা। এখন যে যার মত বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

ঘুরেই ডেনিয়েলসনকে দেখল রানা। মাথা চেপে ধরে একই জায়গায় কুমারের চাকার মত ঘুরপাক খাচ্ছে লোকটা। ওর মনে হলো, তাকে মেরে ফেললে হয়তো থামবে এই লড়াই। ওদিকে অস্ত্র তাক করতেই কোত্থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলিয়নেয়ারকে নিয়ে দূরের রাস্তায় পড়ল এক গার্ড। গুলি করল রানা, কিন্তু মাত্র দুটো বুলেট বেরোবার পরেই ক্লিক শব্দ তুলে থেমে গেল এমপি-সেভেন। ফুটো হয়েছে গার্ডের পিঠ, কিন্তু ডেনিয়েলসন পর্যন্ত পৌঁছায়নি বুলেট।

বস্ পড়ে গেছে দেখে শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলি করবে অন্যান্য

গার্ড। মৌসোলিয়ামের পেছনে দ্য টেম্পল অভ পসেইডনের দিকে চট্ করে চোখ গেল রানার। আগের দুই মন্দির ছিল একইরকম, এটাও বোধহয় তা-ই। ঘুরেই কাছের শেষ গার্ডের মুখে কনুই নামাল রানা, পরক্ষণে ঘুরেই ঝেড়ে দৌড় দিল। চিৎকার করে বলল, 'হেণ্ড্রিক! পসেইডনের মন্দির!'

কে অনুসরণ করছে, তা বোঝার সময় রানার নেই, উড়ে চলল সোনার দেয়ালের পাশ দিয়ে। দেখল বোমার সামনে ঝুঁকে টাইমার চালু করছে অ্যালরিক জ্যাগার।

আপাতত তাকে ঠেকাতে পারবে না রানা। পেছনে গুলি শুরু করেছে গার্ডরা! হিস-হিস শব্দে কানের পাশ দিয়ে কয়েকটা বুলেট যেতেই দেয়াল থেকে সরে পসেইডনের মন্দির লক্ষ্য করে ছুটল রানা।

সাতাশ

দেবীর মন্দিরের স্বর্ণ-প্রাচীরকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে দৌড়ে চলেছে রানা। কিন্তু ক'সেকেণ্ড পর থাকবে না এ সুযোগ, পিছু নিয়ে কোণঠাসা করবে ডেনিয়েলসনের গার্ডরা।

পেছনে বুটের আওয়াজ। হেণ্ড্রিক ড্রেক। আরও আসছে তার দুই লোক। রানার বুকে ঝুলন্ত ফ্ল্যাশলাইটের আলো উদ্দাম নাচছে মন্দিরের দেয়ালে।

ভোঁতা শব্দ তুলে স্বর্ণ-প্রাচীরে লাগছে বুলেট। আর্তচিৎকার ছাড়ল কে যেন। থামল একজনের ছুটন্ত পদশব্দ, এল ধুপ করে

রাস্তায় পড়ার আওয়াজ।

ঘুরেও দেখল না রানা। সামনেই পসেইডনের মন্দিরের প্রবেশদ্বার, যেন মস্ত কোনও দানবের মুখের কালো চৌকো হাঁ। প্রায় ওর সঙ্গে ছুটছে ড্রেক। আগেও খুব দ্রুত দৌড়াতে পারত সে।

অস্ত্রের হুঙ্কারের ওপর দিয়ে শোনা গেল ডেনিয়েলসনের চিৎকার: 'খুন করো! একটাও যেন বাঁচতে না পারে!'

আরেক দফা গর্জন ছাড়ল এমপি-সেভেন। গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই এল আর্তচিৎকার। অসহায় বন্দিদেরকে মেরে ফেলছে ওরা!

রানা ও ড্রেকের চারপাশে শুরু হলো কালো টানেল, ঢুকে গেছে মন্দিরের অনেক ভেতরে।

এত কাছ দিয়ে গেল বুলেট, ওটার তাপ মাথার চামড়ায় টের পেল রানা।

'কুকুরের বাচ্চারা!' রানার পেছনে ছুটতে ছুটতে বলল ড্রেক, 'ওরা খুন করছে আমার লোকদের!'

'ওই একই কাজ করতে তুমি নিজেও,' দৌড় না থামিয়ে টানেলের প্রথম বাঁকের কাছে পৌঁছে গেল রানা। দেখেছে পেছনে কমলা আলো। অনুসরণকারীরা পৌঁছে গেছে টানেলে। একরাশ গুলি লাগল বাঁকের দেয়ালে। ড্রেকের পেছনের লোকটা ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। পাশের দেয়ালে মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার শেষ করুণ নৃত্যের ছায়াছবি দেখল ছুটন্ত রানা!

বিরাট এক লাফে বাঁক পেরিয়ে গেল ও। পরের সেকেণ্ডে ওর পায়ের কাছে পড়ল ড্রেক। দেয়ালে লাগল কয়েকটা বুলেট। চারপাশে ছিটিয়ে গেল পাথরের স্প্লিন্টার। চোখ আড়াল করেছে রানা। দু' সেকেণ্ড পর ওয়েবিং থেকে নিল হ্যাণ্ড গ্রেনেড। পিন খুলতেই লাফ দিয়ে সোজা হলো চামচ। তিন পর্যন্ত গুনে বাঁকের ওদিকে গ্রেনেড ফেলল রানা।

কাছে পৌঁছে গেছে ছুটন্ত সব বুট।

বুম!

চারপাশ ভরে গেল খেপা বোলতার মত গুঞ্জন তোলা শ্র্যাপনেলে। মেঝেতে শুয়ে পড়ে ক্রল করছে রানা, কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের সঙ্গে নিল ড্রেককে। কয়েক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল। পেছনে ছুটে আসা বুটের আওয়াজ এখন নেই।

উঠে তার এমপি-সেভেন কুড়িয়ে নিল ড্রেক। 'ধন্যবাদ, রানা।'

'ধন্যবাদ দেয়ার মত কিছু হয়নি,' বলল গম্ভীর রানা।

'বাঁচিয়ে দিয়েছ। আমি কৃতজ্ঞ। তোমার জন্যে মরতেও আপত্তি করব না।'

'হঠাৎ মনোভাব পাল্টে নেয়ার কারণটা কী?' জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ড্রেক। 'বনি ক্রো বলেছিল রেপ করেছ ওকে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'তা-ই?' ওই মেয়ে ছিল ড্রেকের প্রেমিকা।

'হ্যাঁ।'

'বেশ ক'বার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ আমার জন্যে,' বলল রানা। 'একবারও ভাবলে না, বন্ধুর নামে মিথ্যা বলছে কি না তোমার প্রেমিকা?'

চোখ অন্য দিকে সরিয়ে নিল ড্রেক। ইউ.এন.ও.-র অ্যান্টি-টেরোরিস্ট দলের মিশনে কমপক্ষে দশবার ওর প্রাণ রক্ষা করেছে রানা। 'আসলে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'কাজেই ভাবলে বন্ধুকে খুন করতে হবে?'

'হুঁ। দু'বার। একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিলে।'

'বুঝতে পারলাম কাজটা কার।' নিষ্পলক চোখে ড্রেকের চোখ দেখল রানা। প্রাক্তন বন্ধুর চোখে নিখাদ লজ্জা। 'তুমি শহরে ছিলে

না, একরাতে আমার সঙ্গে বিছানায় যেতে চাইল বনি। স্রেফ বিদায় করে দিই। কখনও ভাবিওনি কোনও বন্ধুর প্রেমিকা এমন অন্যায় প্রস্তাব দেবে। খুবই বিরক্ত হই।'

'সবই বুঝেছি, কিন্তু পরে। ক'দিন আগে ধরা পড়ল এক প্রেমিককে নিয়ে আমারই বেডরুমে। খুন করেছি ওদের দু'জনকেই। ওই মেয়ের জন্যে খুব ছোট হয়ে গেছি, আমার তো উপায় নেই যে ফিরে পাব তোমার বন্ধুত্ব। বারবার মনে হচ্ছে আমি ভয়ঙ্কর এক বেঈমান। তাই ভাবছি, যদি তোমার কোনও কাজে আসি, তাতে হয়তো পাপ মোচন হবে আমার।'

উঠে ড্রেককে টেনে তুলল রানা। 'চলো, হাতে সময় নেই, পাঁচ মিনিট পর উড়ে যাবে চারপাশের সবকিছু!'

'আমাদের বোমা তৈরি!' বলল অ্যালরিক জ্যাগার, 'ডিসেবল করেছি কণ্ট্রোল প্যানেল। এবার আর ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

'বাঁচতে চাইলে দৌড়াও!' জিম করেলির উদ্দেশে বলেই বাইরে যাওয়ার টানেল লক্ষ্য করে দৌড় লাগাল ডেনিয়েলসন। ভীষণ ভয় নিয়ে তার পেছনে ছুটল প্রফেসর।

শক্তি পরীক্ষার ঘরে ঢুকে থামল রানা ও ড্রেক। পাথরের বেঞ্চের ওপরে এখন কাঠের হ্যাণ্ডেল নেই। হাজার হাজার বছর আগেই গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়েছে ওই জিনিস।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রানা। হ্যাণ্ডেল না থাকলেও ছাতে রয়ে গেছে জং ধরা সব বর্শা। 'ভেবেছি এতদিনে ক্ষয় হয়েছে।'

'ওগুলো কীজন্যে রাখা?' জানতে চাইল ড্রেক।

'গা ফুটো করতে। পিছিয়ে থামো প্যাসেজে।' বেল্ট থেকে শেষ গ্রেনেড নিয়ে ওটা ঘরের মাঝে ফেলল রানা। ড্রেকের পিছু নিয়ে থামল বাঁকের ওদিকে।

পরক্ষণে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। ঘরের ভেতর নানানদিকে ছুটল জং ধরা বর্শার হাজার হাজার ধারালো টুকরো। কয়েক সেকেণ্ড পর থামল ধাতব ঝড়। সাবধানে ওদিকে উঁকি দিল রানা। মাত্র কয়েকটা বর্শা এখনও রয়ে গেছে ছাতে। 'ঠিক আছে, ড্রেক! এক দৌড়ে পেরিয়ে যাবে ঘর!'

'তা না করলে?'

'মরবে চ্যাপটা হয়ে। ওয়ান, টু, থ্রি!'

বর্শার দণ্ডের মাঝ দিয়ে ঝড়ের বেগে দৌড় লাগাল রানা। যে-কোনও সময়ে গায়ে বিঁধবে জং ধরা তীক্ষ্ণধার টুকরো। তার চেয়েও বড় কথা, এখন যে-কোনও সময়ে নামবে ছাত! 'এবার শুরু হবে বিপদ! থামবে না!'

"ক্লাঙ্ক!"

রানার পায়ের নিচে সামান্য ডেবে গেল পাথরের স্ল্যাব।

প্রাচীন ফাঁদের এই অংশ এখনও কাজ করছে। গুঙিয়ে উঠে নামতে লাগল ছাতের চৌকো সব পাথুরে ব্লক। ঝরঝর করে পড়ছে রানা ও ড্রেকের মাথায় ধুলোবালি।

'কী শুরু হলো?' ভীত সুরে বলল ড্রেক।

'বুবি ট্র্যাপ! দৌড়ে ঘর পেরিয়ে যাও, নইলে তেলাপোকার মত চ্যাপটা হবে!'

ছাত থেকে নেমে আসা বর্শার দণ্ড এড়িয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে রানা। বডি আর্মার থেকে খুলে নিল বাতি। ব্রাযিলের মন্দিরের ওই ঘরের বেঞ্চে ওজন নেয়ার জন্যে ও নিজে ছিল. কিন্তু এই ঘরের বেঞ্চ খালি। অনেক দ্রুত নামছে ছাত। কিন্তু রানা বা ড্রেকের গতিও ক্ষিপ্র চিতার মত।

সরু ঘর পেরোতে লাগবে মাত্র কয়েক ফুট, কিন্তু সামনের দুটো বর্শা এখনও আস্ত। ও-দুটোর মাঝ দিয়ে যেতে হবে। সরু জায়গা।

বুটের তলা দিয়ে কাছের বর্শার ওপর লাথি বসাল রানা। 'খটাং!' শব্দে দু'টুকরো হলো বর্শা। ওপরের অংশ খসে এল ছাত থেকে, চিরে দিল রানার গোড়ালির মাংস।

কিন্তু থামার উপায় নেই ওর। ব্যথা পাত্তা না দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। পেছনের ছাত নামছে দ্রুত। নিরাপদ প্যাসেজে থেমে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় কোনও লিভার বা সুইচ খুঁজল রানা। কিছু থাকার কথা এদিকে।

'রানা!' পেছনে কাতরে উঠল ড্রেক। 'সাহায্য করো!'

ঘুরে দেখল রানা, অনেক নেমে এসেছে ছাত। লম্বা লোক বলে ড্রেক আসছিল প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে, কিন্তু তার খালি হোলস্টারে নাক গুঁজেছে ভাঙা এক বর্শার লোহার হাতল।

রানা ফিরতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে মরবে ছাতের নিচে চাপা পড়ে। বাঁচবে না ওরা কেউ!

'রানা!'

আরেক দৌড়ে আবারও ঘরে ঢুকল রানা। ড্রেকের আর্তি পাত্তা না দিয়ে কী যেন খুঁজল দেয়ালে। পরের মুহূর্তে পেয়েও গেল।

ওই যে!

পাথরের মাঝে কালো এক গর্ত।

চৌকো গর্তে হাত ভরে দিল রানা।

কিন্তু ভেতরে আছে শুধু ভাঙা কীসের যেন টুকরো।

ছাতের কারণে বাধ্য হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে রানা। আর কয়েক সেকেণ্ড পর গর্ত পেরিয়ে নামবে ছাত, চুরমার করে দেবে ওর হাত। এরপর মরতে হবে করুণভাবে।

ধুশ্‌শালা! কাঠ না, কঠিন ধাতু দিয়ে তৈরি করা উচিত এসব মেকানিজম, ভাবল রানা। কনুই ঢুকিয়ে দিল গর্তের গভীরে। আঙুল খুঁজছে কিছু ধরার জন্যে।

কাঠের টুকরো, ঠাণ্ডা পাথর... ধাতু!

কীসের যেন লিভার! বোধহয় কোনও সুইচের অংশ। ওটা সব ক'টা আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরল রানা, পরক্ষণে হ্যাঁচকা টান দি। নিজের দিকে।

নড়ে উঠল গোল জিনিসটা!

সরে এল মাত্র এক ইঞ্চি। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট। ফাঁপা একটা আওয়াজ উঠল পাথরের দেয়ালের ভেতর। থেমে গেছে ছাতের নেমে আসা।

ছাত থেকে ঝরঝর করে ধুলোবালি পড়ছে রানার গায়ে-মাথায়। গর্তের ভেতর থেকে হাত বের করে দেখল দরদর করে রক্ত পড়ছে তালু কেটে। জং ধরা বর্শার চেয়েও অনেক ধারালো ছিল গর্তের ভেতরের ধাতব ওই গোলাকার চাকা।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে আলো ফেলল নির্দিষ্ট জায়গায়। ব্রাযিলের মন্দিরে ওখানে ছিল বেরোবার দরজা। লম্বাটে দুই পাথরের ব্লকের মাঝে দেখা গেল সরু এক ফাটল। বুট পরা পায়ে ডানদিকের স্ল্যাবে লাথি দিল রানা। হড়কে সামান্য সরল পাথুরে কবাট।

'একটু সাহায্য আশা করতে পারি?' খুব নিচু স্বরে বলে উঠল কেউ।

কুঁকড়ে শুয়ে ভীষণ অস্বস্তির ভেতর আছে ড্রেক। ছাতের ভারী এক স্ল্যাব চেপে বসেছে তার পিঠে। ব্রাযিলের মন্দিরের মেশিনারির মত কাজ হচ্ছে না এখানে, ওপরে উঠছে না ছাত।

ড্রেকের দিকে সুস্থ হাত বাড়িয়ে দিল রানা। ওটা ধরার পর পেছাতে লাগল। ক'সেকেণ্ড মনে হলো ফাঁদে আটকা পড়েছে ড্রেক, তখনই 'টুং!' শব্দে ভাঙল হোলস্টারে নাক গুঁজে রাখা বর্শা। পিছলে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে এল ড্রেক। পরের সেকেণ্ডে তাকে স্ল্যাবের তলা থেকে টেনে বের করে নিল রানা।

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল ড্রেক।

'সাবধান, মেঝেতে আরও বর্শার ফলা আছে,' বলে কবাটের

ি কে ক্রল শুরু করল রানা। বেরিয়ে এল পরবর্তী প্যাসেজে।

পিছু নিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল ড্রেক। 'হাতে কয় মিনিট?'

'সাড়ে তিন মিনিট! চলো!'

'এত কম সময়?' রানার পাশে ছুটতে লাগল ড্রেক।

হতাশ নয় রানা, জবাব দিল না। ব্রাযিলের মন্দিরের মতই একইরকম প্যাসেজ। হয়তো বেরোতে পারবে বোমার আওতার বাইরে।

পাল্টে গেছে ওদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি।

সামনে পারদর্শিতার এলাকা।

প্যাসেজ পেরিয়ে চারপাশ দেখে নিল রানা। পুকুর নেই, মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীর পানিতে বেরঙা শেওলা। অনপুস্থিত কুমির বা পিরানহা।

ডানদিকে তাকাল রানা। ওদিকে বেরোবার দরজা আছে। কিন্তু সেতু নেই। তার বদলে আছে কঙ্কালের মত ভাঙাচোরা, ঘুনে ধরা ধ্বংসাবশেষ।

'পরিখা পেরোতে হবে,' বলল রানা। লাফিয়ে নেমে পড়ল খাদের ভেতর।

ওর পর নেমে জানতে চাইল ড্রেক, 'সময়?'

'দু'মিনিটের সামান্য বেশি।'

সেতুর কঙ্কালের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। দেয়ালে চোখ বোলাল রানা। হয়তো লাফিয়ে ধরতে পারবে সরু কিনারা। কিন্তু কঠিন হবে পাথুরে দেয়াল বেয়ে ওঠা।

'হাতের ওপর উঠব,' বলল ড্রেক।

আপত্তি করল না রানা, হাঁটু গেড়ে বসল। ওর দুই তালুর ওপর পা রাখল ড্রেক। তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। তিন সেকেণ্ড পর দেয়াল পেরিয়ে হারিয়ে গেল ড্রেক। ঘুরে বসে বাড়িয়ে দিল হাত। চট্ করে দেয়ালে উঠে এল রানা। দেখল হাতঘড়ি। 'দৌড়াও,

ড্রেক!'

চওড়া প্যাসেজে পাশাপাশি ছুটছে ওরা, কয়েক মুহূর্তে পৌঁছে গেল বুদ্ধির ঘরে। রানার মনে আছে, কোথায় আছে ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়ার মেকানিযম।

ঘরে ঢুকে দিক ঠিক করে নিল। 'দেয়ালের গোপন সুইচ...' মাঝপথে থেমে গেল। আলো পড়েছে পাথুরে দেয়ালে। ওখানে সরু কোনও ফাটল নেই!

'যাহ্!' অন্যান্য দেয়ালে ফাটল খুঁজছে রানার চোখ। এই মন্দিরের নির্মাতারা পুরনো ডিযাইন পাল্টে নিয়েছে!

না, চার দেয়ালের কোনও কোণেই ফাটল নেই!

'এবার?' রানার দিকে তাকাল ড্রেক।

বেরিয়ে যাওয়ার মস্ত পাথুরে দরজায় আলো ফেলল রানা। এখানেও আছে খোদাই করা সিম্বল। পাশেই মাপযন্ত্রের কোলে মার্বেলের মত আকৃতির সীসার সব বল। ছাত জুড়ে বর্শা ভরা খাঁচা। মাপযন্ত্রে ওজন তুলে একবার লিভার টেনে দিলেই...

হোটেলে কী যেন বলেছিল লাবনী এসব অঙ্ক সম্পর্কে?

সীসার বলের হিসাবও কষে দেখিয়েছিল।

কী যেন ছিল জবাবটা?

ভুরু কুঁচকে প্রাণপণে মনে করতে চাইল রানা।

বেয়াল্লিশ...

না-না, চল্লিশ!

ওজন মাপের জায়গাটা দেখাল রানা। 'চল্লিশটা বল রাখতে হবে!' তুলে নিল বেশ কয়েকটা বল। ভারী। 'ভুল যেন না হয়!'

নিজেও বল তুলে রানার হাতে দিল ড্রেক।

'হিসাব ভুল হলে?'

'মরব!' দশটা বল গুনে ট্রেতে রাখল রানা। আবার ওর হাতে বল তুলে দিল ড্রেক। গুনে গুনে দশটা ফেলল রানা। পরের কয়েক

সেকেণ্ডে রাখল ওরা আরও বিশটা বল।

চল্লিশটা হয়েছে।

লিভার ধরে একবার ড্রেককে দেখল রানা, মনে মনে বলল, 'লাবনীর হিসাব ঠিক হলেই হয়, নইলে আমরা...' হ্যাঁচকা টান দিল ও লিভারে।

"ক্লিঙ্ক!"

কবজা সরে যেতেই সামান্য খুলে গেল দরজা।

রানা ও ড্রেক মিলে সরিয়ে ফেলল কবাট।

'দৌড় দাও!' বলেই ছুট লাগাল রানা। পেছনে ড্রেক। প্যাসেজের শেষপ্রান্তের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। এত সময় নেই যে ঘড়ি দেখবে। তবে রানা বুঝল, হাতে আছে বড়জোর তিরিশ সেকেণ্ড, তারপর ফাটবে বোমা।

মন্দিরের প্রধান ঘরে চারপাশে উপচে পড়ছে ধনরাশি। ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে সব। এসব চাই না ওদের। শুধু পৌঁছুতে হবে পসেইডনের মূর্তির কাছে। ওটারই পেছন দিকে সিঁড়ি।

ছুটে যাওয়ার সময় ভাবল রানা, শেষ ঘরের আর্কিটেকচারাল পরিবর্তনের বাইরে আর কোনও পরিবর্তন করেনি তো প্রাচীন লোকগুলো?

'ওঠো!' একেকবারে সিঁড়ির তিনটা করে ধাপ পেরোতে লাগল রানা। খিঁচ ধরছে পায়ের পেশি। দরদর করে ঘামছে বলে জ্বলছে গোড়ালির ক্ষত। কিন্তু কোনও দিকে খেয়াল নেই। 'সামনেই একটা শাফট থাকার কথা!'

'থাকার কথা? না থাকলে?' হাঁপিয়ে চলেছে ড্রেক।

'মামলা কোরো আমার নামে!' সিঁড়ির ওপরের ধাপ পেরিয়ে গেল ওরা। সামনেই বেদি ঘর। চকচকে সোনাদানা দেখার সময় নেই, রানার এখন চাই শুধু ওই শাফট!

ওই যে!

মাত্র তিন সেকেণ্ড পর পাহাড়ি মস্ত গুহার ভেতর প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে দেয়া আওয়াজে ফাটল ফিউয়েল-এয়ার বোম। শকওয়েভ ছড়িয়ে যেতেই কাত হয়ে তাসের ঘরের মত শুয়ে পড়ল সব মন্দির ও প্রাসাদ। পরক্ষণে তৈরি হলো বিশাল বড় এক আগুনের গোলা। এতই তাপ তার, যা স্পর্শ করছে, গলিয়ে ফেলছে মুহূর্তে।

এমন কী দ্য টেম্পল অভ পসেইডনের প্রাচীন, পুরু প্রাচীরও টিকল না আধুনিক অস্ত্রের কাছে। চোখের পলকে গুঁড়ো হয়ে গেল টনকে টন ওজনের মস্ত সব পাথরের ব্লক।

বিস্ফোরণের প্রথম ধাক্কা খেয়েই ধসে পড়ল প্রকাণ্ড, পাহাড়ি গুহা। ছাত থেকে পড়া লাখ লাখ টন ওজনের মস্ত সব পাথর মুহূর্তে চাপা দিল দুর্গ-শহরকে।

এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি তুলে আসা শকওয়েভের আওয়াজ শুনল রানা। বোমার আঘাত পৌঁছে যাওয়ার আগেই বেদি ঘরে ঢুকল প্রচণ্ড গতির হাওয়া।

মাত্র কয়েক পা দূরে যাজকের গর্ত বা শাফট!

ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ওটার ভেতর। ওই পথ বুজে গেছে কি না, জানার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে মরবে ও।

আটলাণ্টিসের শাফটের মত খাড়া নয় এই মন্দিরের শাফট। ষাট ডিগ্রি ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচে। রানার পর পর নামল ড্রেক। চারপাশে ওরা অনুভব করল প্রচণ্ড এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মাতম।

আবছাভাবে নির্দেশ শুনেছে দুই হেলিকপ্টারের পাইলট, আকাশে ওঠার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। এইমাত্র হেলিকপ্টার থেকে দেখল লাবনী ও সেসিলি, ছিটকে গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে এল লোভিস

ডেনিয়েলসন। তার সঙ্গে রয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন। তুষারের ভেতর ছুটে আসছে তারা হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে।

ডেনিয়েলসন ও জ্যাগার কেবিনে লাফিয়ে উঠতেই বলল সেসিলি, 'মাই গড!'

লাবনী দেখল, দু'জন লোক প্রায় ছুঁড়ে দিল প্রফেসর করেলিকে দ্বিতীয় হেলিকপ্টারের ভেতর। 'কী হয়েছে?'

'রওনা হও!' ব্যস্ত কণ্ঠে পাইলটকে বলল ডেনিয়েলসন। 'মুক্ত হয়ে আবারও বোমার টাইমার চালু করেছে ডোনাটি লুক্কা! কোনওভাবেই ঠেকাতে পারিনি!'

'রানা কোথায়?' চমকে গেছে লাবনী।

'মারা গেছে! ওরা খুন করেছে!'

গলার ভেতর বড় একটা দলা আটকে গেল লাবনীর। 'খুন? মেরে ফেলেছে ওকে?'

বিস্মিত দেখাল সেসিলিকে।

'তাড়াতাড়ি আকাশে ওঠো! বোমা ফাটবে!'

ডেনিয়েলসনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুহা-মুখ থেকে ভলকে বেরোল কালো ধোঁয়া ও গুঁড়ো হয়ে যাওয়া বাদামি পাথরের মেঘ। থরথর করে কাঁপতে লাগল পাহাড়। মস্ত কোনও ঢাকের শব্দের মত চারপাশে ছড়িয়ে গেল বুক-কাঁপিয়ে-দেয়া ভারী আওয়াজ। লাবনীর মনে হলো ফাঁকা হয়ে গেছে ওর বুক। অন্তর থেকে মানতে পারছে না, সত্যিই মারা গেছে রানা।

ওপর থেকে অ্যাভালাঞ্চ নামছে দেখে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে সরে গেল দুই হেলিকপ্টারের পাইলট। তুষারের অ্যাভালাঞ্চ নয়, ওদের দিকে আসছে বোমার ধাক্কায় আলগা হওয়া পাথরের বড় সব খণ্ড। খরস্রোতা নদীর মত কার্নিশে পড়ে গড়িয়ে নামতে লাগল অনেক নিচের জমির দিকে।

প্রথম হেলিকপ্টারের পিছু নিল দ্বিতীয়টা। ফিউজেলাজে লাগল

উড়ন্ত সব পাথরের টুকরো। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সরে যেতে গেল যান্ত্রিক ফড়িং। প্রকাণ্ড এক পাথরের বোল্ডার পড়ল কার্নিশে, পরক্ষণে কার্নিশ ধসিয়ে দিয়ে নেমে গেল পাহাড় বেয়ে। চারপাশ ঢেকে গেল ধুলোয়।

চিরকালের জন্যেই হারিয়ে গেছে চাঁদের বাঁকা পথ, আর কখনও ওই পথে যাওয়া যাবে না আটলান্টিসের শেষ শহরে।

জানালায় হাত রেখে নিচে চেয়ে থাকল লাবনী। অনেক উঁচু পাহাড় থেকে পড়ছে স্রোতের মত হাজার হাজার পাথর। আর সেসবের ভেতর চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে...

'রানা...' ফিসফিস করল লাবনী। চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। 'কখনও ভুলব না তোমাকে... কোনওদিন না...'

শাফট বেয়ে সরসর করে নামছে রানা। তখনই ওকে খপ্ করে ধরল ব্লাস্ট ওয়েভ, সঙ্গে এনেছে পাথুরে ধুলো ও পাথরের টুকরো। ওগুলো কামড় বসাচ্ছে দেহের অবারিত অংশে। থরথর করে কাঁপছে চারপাশ, বজ্রপাতের মত বিকট আওয়াজ। অসহায়ভাবে পিছলে পড়ছে রানা।

শাফটে দেখা দিল উজ্জ্বল আলো...

কিন্তু ওটা দিনের সোনালি আলো নয়, ধসে পড়া গুহার বদ্ধ পরিবেশে ফিউয়েল-এয়ার মিক্স-এর অতি উত্তপ্ত আগুন নামছে শাফট বেয়ে ওদের দিকে!

সামনের আঁধারে নেমে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই রানার। ওর পেছনের আলো হয়ে গেল লাল থেকে কমলা। তারপর হলদে। ধেয়ে আসছে আগুন!

হঠাৎ সামনেই সোনালি আলো দেখল রানা। শাফটের মুখ থেকে সরে গেছে তুষার। ওটা সৌভাগ্য কি না তা বোঝারও সময় পেল না ও। কাজ করল ওর ট্রেনিং, তুষারের স্তূপে হুমড়ি খেয়ে

পড়েই পেছনের লকলকে আগুন থেকে বাঁচতে গড়িয়ে দিল শরীর।

শাফট থেকে আগুন বেরোতেই ভুস্ করে বাষ্প হলো তুষারের স্তূপ। পাহাড়ি, পাথুরে ঢালে গড়িয়ে পড়ছে রানা, মোটেও পতনের আঘাত কমিয়ে দিচ্ছে না নরম তুষার।

ব্যথা বোঝার সময় নেই রানার, হিস-হিস আওয়াজ শুনেই বুঝে গেল, এবার ওপর থেকে নামবে আলগা পাথরের স্রোত!

কয়েক সেকেণ্ড পর গড়িয়ে পড়া ঠেকাতে পারল রানা। চোখ গেল ওপরে। মনে মনে আশা করল, ছাতের মত কার্নিশে পাথর পড়েই ওকে চ্যাপটা না করে ছিটকে যাবে নিচের ঢালে।

মুঠোর মত থেকে শুরু করে ষাট-সত্তর কেজি ওজনের পাথর আছড়ে পড়ল ওপরের কার্নিশে। দু'হাতে মাথা ঢেকে পড়ে থাকল রানা। চারপাশে ছিটিয়ে পড়ছে পাথর। গেঁথে যেতে চাইছে, খোঁচা লাগছে, অসহায় রানার মনে হলো চিরকাল ধরে চলবে এই প্রলয়ঙ্করী পতন।

কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পর থেমে গেল সব আওয়াজ। মনের ওপর জোর খাটিয়ে উঠে বসল রানা। গা থেকে ধুলো ও পাথরের খণ্ড খসে পড়তেই তাকাল ওপরে।

ওপরে ছাত নয়, খাড়া পাহাড়ের সরু কার্নিশ। ওটাই রক্ষা করেছে ওকে। পাশেই এক বোল্ডার, ওপরের ওই পাহাড়ি ঠোঁটে পড়ে দু'টুকরো হয়েছে, নইলে এতক্ষণে ফাটা তরমুজের মত অবস্থা হতো ওর মাথার। বোল্ডারের ওদিকে ভাঙা সব কালো পাথর। বাতাসে ভাসছে ধুলো। কিন্তু দেখা গেল দূরে হিমালয়ের অনেক উঁচু সব চূড়া।

ঘুরে রানা দেখল, ও দাঁড়িয়ে আছে চওড়া এক উপত্যকার ওপরের কিনারায়। ক্লাইমিং গিয়ার ছাড়াও নেমে যেতে পারবে। কপালকে ধন্যবাদ দিল ও। ইকুইপমেন্ট বলতে কিছুই নেই ওর কাছে। এমন কী হারিয়ে ফেলেছে ফ্ল্যাশলাইটও।

বিরান এলাকা, কিন্তু রানার নাকে এল বাষ্পের ভেজা গন্ধ। একটু দূরে যেখানে তুষার পুড়িয়ে মেঘ তৈরি করেছে আগুনের হলকা, সেখান থেকেই আসছে ঝিরঝিরে হাওয়া। কয়েক সেকেণ্ড পর ছোট ছোট সব পাথরের নিচে প্রায় চাপা পড়া ড্রেককে দেখল ও। এক দৌড়ে পৌঁছে গেল তার সামনে। হাঁটু গেড়ে বসে সরাতে লাগল পাথর। 'ড্রেক, শুনছ?'

'রানা?' ভোঁতা শোনাল ড্রেকের কণ্ঠ। 'তুমি?'

'হ্যাঁ। আহত? নড়তে পারবে?'

'জানি না। ওফ্, ব্যথা!'

'ব্যথা কোথায়?' জানতে চাইল রানা। ড্রেক গুরুতর আহত হলে পাহাড়ি এই এলাকা থেকে তাকে নামাতে পারবে না ও।

'পড়ার সময় খুব খোঁচা দিয়েছে প্যান্টের পকেটে রাখা চাবির গোছা...' খুব ধীরে উঠে বসল ড্রেক। ছিঁড়ে উড়ে গেছে ওর চোখের কালো পট্টি। দেখা গেল লাল-বেগুনি-হলদে হয়ে আছে চোখের চারপাশ। ফোলা পাতা খুলতে পারল না। বিড়বিড় করে বলল, 'উফ, ব্যথা কাকে বলে!'

পাহাড়ের ওপরের দিকে চোখ বোলাল রানা। একপাশ থেকে এখনও উড়ছে ধোঁয়া ও ধুলো।

'তোমার বস্ যা চেয়েছে, তা-ই পেয়েছে। ওই শহর উড়ে গেছে, ওখানে আর কিছুই পাবে না কেউ।'

'কিন্তু হারামজাদা ডেনিয়েলসন পেয়ে গেছে যা খুঁজছিল,' তিক্ত চেহারা করল ড্রেক।

'তার সঙ্গে কিছু বিষয়ে আলাপের ইচ্ছে আছে আমার,' বলল রানা।

'মাফ করবে না আমাকে?' রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ড্রেক। 'আমি হয়তো বোকা, কিন্তু একই ভুল দু'বার করি না।'

কয়েক সেকেণ্ড তাকে দেখে নিয়ে বলল রানা, 'দেখব তুমি

বোকা কি না।' হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ও।

'উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে ডেনিয়েলসনকে,' বলল ড্রেক।

'আরও একটা কাজ আছে আমার,' হাতটা ছেড়ে দিল রানা। 'ওই লোকের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে লাবনীকে।'

কুঁচকে গেল দু'জনের ভুরু। শুরু হয়েছে ধুপ-ধুপ আওয়াজ। জানালায় দেখা গেল সূর্যের প্রতিফলন। পাহাড় ঘুরে গম্ভীর আওয়াজ তুলে উপত্যকার আকাশে দেখা দিয়েছে ডেনিয়েলসনের দুই হেলিকপ্টার। মাত্র কিছুক্ষণের ভেতর চলে গেল বহু দূরে। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে ড্রেককে দেখল রানা। 'বেশকিছু জায়গা থেকে সহযোগিতা পাব। ডোনাটি লুক্কা মারা গেছে, ব্রাদারহুডের কাছ থেকে কি এখনও সাহায্য পাবে তুমি?'

'পাব,' বলল ড্রেক। 'কী করতে চাও?'

'বেড়াতে যাব নরওয়েতে, যাবে আমার সঙ্গে?'

মাথা দোলাল ড্রেক। 'বেড়াতে আমারও খুব ভাল লাগে। লোভিসের কাছে পৌঁছে দেব লড়াই।' ভুরু কুঁচকে গেল তার। 'কিন্তু আপাতত সমস্যা হচ্ছে, আটকা পড়েছি হিমালয়ের কোলে। যানবাহন বা ইকুইপমেন্ট নেই।'

'বড় সমস্যা নয়,' বলল রান। 'এখানে আসার আগে খুঁটিয়ে দেখেছি ম্যাপ।' উপত্যকার দূরে দেখাল। 'ওদিকে আছে ছোট একটা গ্রাম। আশা করি সন্ধ্যার আগেই ওখানে পৌঁছুতে পারব।'

আটাশ

নরওয়ের দক্ষিণ উপকূল। নিচে বরফে ঢাকা প্রকৃতির কোথাও সম্পূর্ণ ন্যাড়া কালো সব পাথুরে পাহাড়, আবার কোথাও বিস্তৃত বনভূমি, কিন্তু ওদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই লাবনীর। বার্জেন থেকে তিন মাইল দূরে রেইভেন্সফিওর্ড পেরিয়ে এল গালফস্ট্রিম ভি বিযনেস বিমান, সামান্য দূরেই ডেনিয়েলসনের ব্যক্তিগত এয়ারপোর্ট।

বিমানের জানালা দিয়ে কিছুই দেখছে না লাবনী, মন পড়ে আছে গত কয়েক দিনের ঘটনায়। সেসিলি নানানভাবে ওকে খুশি রাখতে চাইলেও দুঃখে ভারী হয়ে আছে বুক। বাবা-মার লাশ দেখতে হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে আটলান্টিস, ডোনাটি লুক্কা উড়িয়ে দিয়েছে আটলান্টিয়ান শেষ শহর, আর তার ওপর শুনতে হয়েছে মাসুদ রানার মৃত্যু-সংবাদ। এখনও মনের চোখে দেখছে মানুষটার মায়াভরা চোখ ও মৃদু হাসি। মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, বুঝে গিয়েছিল চাইলেও বাঁধতে পারবে না তাকে। সেটা ওর উদ্দেশ্যও ছিল না। আসলে ভাল বন্ধু বা প্রেমিক হওয়ার সব গুণ ছিল রানার। মস্তবড় সব বিপদ থেকে আড়াল করে রেখেছিল ওকে। এখনও ভাবতে পারছে না লাবনী, মানুষটা আর নেই। আসলে গত কয়েকদিনে একেবারে বদলে গেছে ওর জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা।

'মন খারাপ?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল সেসিলি।

'উম? ও, না।'

‘তোমাকে খুব ভাবুক লাগছে।’

‘তাই?’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেসিলিকে দেখল লাবনী। ‘এমনি ভাবছিলাম।’

‘কী বিষয়ে?’

‘মনে পড়ছে, এতবছর যা খুঁজলাম... আটলান্টিস... পেয়েও হারালাম। বদলে গেল জীবনের সব। এখন একেবারে ফাঁকা। জানি না কী করব।’

মিষ্টি হাসল সেসিলি। ‘এখন থেকে আমাদের সঙ্গে থাকবে আমাদেরই একজন হয়ে। আমরা নিজেদের মানুষদের দেখভাল করি।’

‘তোমাকে ধন্যবাদ দিইনি। আসলে এত কিছু করেছ আমার জন্যে, গুনতে শুরু করলে শেষ হবে না।’

‘ধন্যবাদ দিতে হবে না। আর জেনে রাখো, হারিয়ে বসোনি আটলান্টিস।’

‘বুঝলাম না।’

‘এবার নতুন এক আটলান্টিস গড়ব আমরা। অতীতের কথা আর ভাবতে হবে না। নিজেরাই তৈরি করে নেব ভবিষ্যৎ।’

চোখ নাচাল লাবনী। ‘কীভাবে গড়বে আটলান্টিসের মত সাম্রাজ্য? এগারো হাজার বছর আগের ডিএনএ কী করে বদলে দেবে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীকে?’

‘সবই জানবে,’ লাবনীর দিকে ঝুঁকে গেল সেসিলি। ‘গোপন করব না কিছুই। আমার মনে হয় ভবিষ্যতের জন্য তুমি রেডি।’

‘ভবিষ্যতের জন্যে রেডি... মানে কী?’

‘এবার জানবে এরপর কী করব আমরা। আসলে গোটা পৃথিবীকে নতুন করে গুছিয়ে নেব।’

শেষবারের মত বাঁক নিয়ে দীর্ঘ রানওয়ের দিকে নামতে লাগল বিমান।

হেন্ড্রিক ড্রেকের চোখে চোখ রাখল রানা। 'সবই যদি জানতে, হামলা করতে দেরি করলে কেন? ঝামেলা কমত।'

'আমরা তখনও জানতাম না ঠিক কী করবে ডেনিয়েলসন। বাধ্য না হলে হামলা করবে না স্থির করেছিল ডোনাটি লুক্কা।' কাঁধ ঝাঁকাল ড্রেক। 'নইলে প্রকাশ পেত ব্রাদারহুডের নাম, গোপন থাকত না এই সংগঠন।'

'এখনও গোপন রাখার উপায় নেই।' উঠে এয়ারক্রাফটের হোল্ডের পোর্টহোল দিয়ে উঁকি দিল রানা। বিমানটা টুইন-প্রপ সি-১২৩ প্রোভাইডার কার্গো এয়ারক্রাফট। কয়েক মিনিট আগে পেরিয়ে এসেছে নরওয়েজিয়ান উপকূল। তুষার ছাওয়া জমির অনেক ওপর দিয়ে চলেছে উত্তর দিকে।

অবশ্য, কিছুক্ষণ পর একবারের জন্যে নিচে নামবে বিমান।

হোল্ডের যাত্রীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। এরা ডোনাটি লুক্কার বারোজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, ব্রাদারহুডের সদস্য। রানা ও ড্রেক স্বর্ণ-চূড়া থেকে ফেরার পর চারদিনের ভেতর জড় করা হয়েছে তাদেরকে। আগেই মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। সব জানার পর তিনি চেয়েছিলেন বিসিআইএ-র একদল এজেন্টকে পাঠাবেন। কিন্তু ওর প্ল্যান খুলে বলেছে রানা। এখন নরওয়ের মাটিতে যে হামলা হবে, তার সঙ্গে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে জড়াতে পারবে না কেউ। ড্রেক ও ব্রাদারহুড সহায়তা করছে, তা-ই আরও লোকের দরকার নেই ওর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে রানার পরিকল্পনা জেনে তারপর সন্তুষ্ট হয়েছেন বস।

এই বারোজন যোদ্ধা কেমন ট্রেনিং পেয়েছে, তা সময় নিয়ে পরখ করেছে রানা। সন্তুষ্ট হওয়ার পর ওর মনে হয়নি আরও লোক চাই।

লাবনীকে নিয়ে বায়ো ল্যাবে বাবার অফিসে ঢুকে ডেস্কের সামনে থামল সেসিলি। জানালার সামনে আরামদায়ক চেয়ারে বসে আছে ডেনিয়েলসন, নিচে বিস্তৃত রেইভেন্সফিওর্ড এলাকা। 'ফার, আমার মনে হয় সময় হয়েছে। লাবনী এখন শুনতে তৈরি।'

লাবনীর ধারণা হলো, লোকটা যেন নিজের ভেতর নেই। চুপ করে থাকল ডেনিয়েলসন।

'কী বিষয়ে বলবেন?' জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'এত গোপন কী জানাতে চায় সেসিলি? খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে।'

'রহস্যময় নয়, তবে গোপনীয়,' বলল ডেনিয়েলসন।

লাবনীর চোখে চেয়ে আছে সেসিলি। 'সব শুনতে চাও?'

'অসুবিধে কী?' মৃদু হাসল লাবনী।

কিছু বলল না সেসিলি। চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে দূরে দেখল ডেনিয়েলসন। 'মূল কথাঃ আজকের পর একেবারে বদলে যাবে এই পৃথিবী।'

'কাজটা তো দশ বছরেও প্রায় অসম্ভব।'

'কিন্তু তা-ই করব আমরা। কাজটা কঠিন, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এ বিষয়ে কাজ করেছি। তোমাকে ধন্যবাদ, লাবনী, তোমার কারণেই পাল্টে দিতে পারব পৃথিবী। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু তুমি আটলান্টিস আবিষ্কার করেছ বলে।'

'সবই তো ধ্বংস হয়ে গেল,' বলল লাবনী, 'চেষ্টা করলে হয়তো আটলান্টিসের কিছু আর্টিফ্যাক্ট এখনও উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু বেশিরভাগ হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্যে।'

'তাতে কিছুই যায় আসে না,' বলল ডেনিয়েলসন।

'কিছুই যায় আসে না?' অবাক হয়েছে লাবনী। 'কিন্তু...'

'তিব্বতে আটলান্টিয়ান রাজা-রানির শরীর থেকে যে ডিএনএ স্যাম্পল পেয়েছি, ওটা হাজার কোটি টন সোনা বা অরিচালকামের

চেয়েও দামি। ওই ডিএনএ স্যাম্পল চিরকালের জন্যে পাল্টে দেবে এই পৃথিবীকে, রক্ষা করবে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল লাবনী। 'তা হলে কি আপনি কোনও ভ্যাকসিন বা ওই ধরনের কিছু পেয়েছেন?'

'কিছু তো পেয়েইছি,' হাসল ডেনিয়েলসন, চোখে রহস্য। 'এসো, তোমাকে দেখাই।' ডেস্ক ঘুরে লাবনী ও সেসিলির পাশে পৌঁছে গেল সে। রওনা হবে দরজার দিকে, এমন সময় বেজে উঠল ইন্টারকম। বিরক্ত চেহারায় যন্ত্রটার বাটন টিপল ডেনিয়েলসন। 'হ্যাঁ, কী?'

'স্যর,' স্পিকারে এল অ্যালরিক জ্যাগারের কণ্ঠ: 'এইমাত্র কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বলল, এয়ারপোর্টে জরুরি অবতরণের জন্যে অনুমতি চেয়েছে এক বিমান। ইঞ্জিনের সমস্যা, পৌঁছতে পারবে না বার্জেনে।'

'ওরা এখন কোথায়?'

'দশ মিনিট দূরে, আসছে দক্ষিণ থেকে।'

ঠোঁট মুচড়ে কী যেন ভাবল ডেনিয়েলসন, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ওদেরকে নামার অনুমতি দাও, প্লেন সারাতে সাহায্য করো, কিন্তু সতর্ক চোখ রাখবে।'

'জী, স্যর,' কেটে গেল লাইন।

'সময় নষ্ট হলো বলে দুঃখিত, লাবনী; এসো,' দরজার দিকে পা বাড়াল বিলিয়নেয়ার।

'না, ঠিক আছে,' বলল লাবনী, 'এইমাত্র প্রাণে বাঁচালেন ওই বিমানের মানুষগুলোকে। কে জানে, সত্যিই হয়তো রক্ষা করতে পারবেন পৃথিবী!'

'তা তো বটেই,' হাসল ডেনিয়েলসন, 'চলো, দেখবে সব।'

'এইমাত্র ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিঙের জন্যে অনুমতি দিয়েছে,' ইঞ্জিনের

শব্দের ওপর দিয়ে রানাকে বলল ড্রেক। 'আমরা দশ মিনিট পর নামছি।'

'আর কোনও সমস্যা নেই তো?' জানতে চাইল রানা।

'নরওয়েজিয়ান এটিসি বারবার জানতে চাইছে, আমাদের ফ্লাইট প্ল্যান নেই কেন। সময় নিচ্ছে পাইলট। নিচের ওদের সন্দেহ হওয়ারই কথা।'

'ফাইটার বিমান না পাঠালেই হলো,' মন্তব্য করল রানা। ঘুরে চোখ রাখল কেবিনের লোকগুলোর ওপর। 'তৈরি হয়ে নিন। সময় দশ মিনিট, তারপর জাম্প করব আমরা।'

লাবনী ও সেসিলিকে কন্টেইনমেন্ট এরিয়ায় নিয়ে এল লোভিস ডেনিয়েলসন। পেরিয়ে গেল ওরা আরেকটা এয়ারলক, হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল ভূগর্ভস্থ ফ্যাসিলিটির অনেক গভীরে।

করিডোরের শেষপ্রান্তে বড় একটা ঘরের সামনে থামল ওরা। 'এখানে সব,' বলল বিলিয়নেয়ার। পুরু স্টিলের দরজায় ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের লোগো। দরজার পাশে বায়োমেট্রিক রিডারে আঙুল রাখল সে। নিঃশব্দে সরসর করে খুলে গেল ভারী দরজা। 'প্রথমে পা রাখো, লাবনী, এ সম্মান তোমার প্রাপ্য।'

ঘরে ঢুকে অবাক হলো লাবনী। চিনল মাত্র কয়েকটা সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট। অন্যগুলো একেবারেই অচেনা। এই ঘর প্রকাণ্ড এক ল্যাবোরেটরি। পেছনে একসারি সুপার-কমপিউটার। আরেক পাশে নীলরঙা প্রকাণ্ড সব কেবিনেট। ওখানে সংযোগ দেয়া হয়েছে লিকুইড কুলিং সিস্টেমের। ল্যাবের আরেক কোণে আইসোলেশন চেম্বার, জানালার কাঁচ কালো রঙের।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল ডেনিয়েলসন, 'এখানে যে দুর্দান্ত প্রাপ্তি হয়েছে, ওটার কারণেই একেবারে পাল্টে গেছে আমার জীবন। এই ঘরে সেই অদ্ভুত আবিষ্কারটার কারণেই চিরস্থায়ী হবে আমার

ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য। বছরের পর বছর ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে প্রতিটি জাতির ভেতর খুঁজেছি এক ই জেনেটিক লিনিয়েজ।'

'আটলান্টিয়ান জিন?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'ঠিক। পৃথিবীর মাত্র একভাগ মানুষের আছে নিখুঁত জেনোম। আর আমরা ওই এক পার্সেন্টি মানুষের ভেতর পড়ি।'

'পৃথিবীর এক পার্সেন্টি? প্রায় সত্তর মিলিয়ন মানুষ।'

'সংখ্যায় ব্রিটেনের জনগণের সমান। কিন্তু আটলান্টিয়ানরা ছড়িয়ে আছে গোটা পৃথিবী জুড়ে সব জাতির ভেতর। এ ছাড়াও আছে জেনেটিক মার্কারসহ খুঁতওয়ালা মানুষ। আটলান্টিয়ানরা সবসময় নিজেদের ভেতর বিয়ে করেনি। তাদের সন্তানদের ধরলে পৃথিবীর সবমিলে পনেরোভাগ মানুষের রক্তে আছে আটলান্টিয়ান মার্কার।'

'এক বিলিয়নের চেয়ে সামান্য বেশি,' বলল লাবনী।

হাসল লোভিস ডেনিয়েলসন। 'সন্দেহ কী, তুমি আমাদের একজন। আটলান্টিয়ানদের বড় গুণ: আমরা অঙ্কের মাধ্যমে চিন্তা করি, যুক্তির বাইরে যাই না।'

মুখ খুলল সেসিলি: 'আমাদের গবেষণায় জেনেছি, গোটা পৃথিবীর সব নিউমেরিকাল বা লিংগুইস্টিক সিস্টেম আবিষ্কার ও উন্নয়নের পেছনে রয়েছে প্রাচীন আটলান্টিয়ানদের উত্তরপুরুষরা

'আটলান্টিস তলিয়ে গেলেও ওই দেশের মানুষই টেনে তুলে এখানে এনেছে মানব-সভ্যতাকে,' বলল ডেনিয়েলসন। 'তারাই নেতা, আবিষ্কারক, গবেষক। হাজারো উপায় বের করেছে বলেই আজও টিকে আছে এই মানব-সমাজ। ভাষার উন্নয়নে, কৃষিতে, মেডিসিনে সবখানে তাদের জয়জয়কার। কিন্তু দুঃখের কথা...' গম্ভীর হলো ডেনিয়েলসন, 'সবসময় প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী মানব-সভ্যতা নিয়ন্ত্রিত হলেও, আটলান্টিয়ানরা বদলে দিয়েছে সব।

আগে হেরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হতো দুর্বলরা, অথচ আজ আমাদের কারণেই টিকে থাকছে তারা।'

'ব্যাপারটা খারাপ কোথায়...' বলতে শুরু করেছে লাবনী।

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ডেনিয়েলসন। 'আমি একমত নই। আর গত পঞ্চাশ বছরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সব। এখন পৃথিবীর জনসংখ্যা সাত বিলিয়ন। ভাবতে পারো— সা-ত বি-লি-য়-ন মানুষ? অথচ, সবার টিকে থাকার জন্যে যথেষ্ট সম্পদ নেই এ বিশ্বে। আর এসব মানুষের ভেতর পঁচাশি ভাগের মধ্যে একেবারেই নেই আটলাণ্টিয়ান জেনোম। তার মানে, পাঁচভাগের চারভাগ মানুষই অনর্থক ভোগ করছে এই পৃথিবীর সম্পদ।'

কথাটা এত সহজে বলা হয়েছে, হতবাক হয়ে গেছে লাবনী। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন?'

'আসি মূল কথায়: এসব মানুষের কোনও মূল্য নেই। কিছু আবিষ্কার করে না। কিছুই সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না। এমন কী, ভাবেও না এরা। অথচ, গবগব করে খেয়ে শেষ করছে পৃথিবীর সব খাবার। এরা বেঁচে আছে শুধু জন্ম দিতে আর ভোগ করতে।'

'এসব কী বলছেন?' চমকে গেছে লাবনী। 'আমার মনে হয় না এভাবে মানুষ সম্পর্কে বলা...'

ওর দিকে ঝুঁকে এল ডেনিয়েলসন। 'লাবনী, আমেরিকার দিকে তাকাও। নিজের চোখেই দেখবে সব। দেশ জুড়ে বিরাজ করছে কুঁড়ে ও নির্বোধ মানুষ। ভোগ করা ছাড়া আর কোনও কাজই নেই। এই সুযোগ দিয়েছে গণতন্ত্র। বেশিরভাগ মানুষ প্রথম সুযোগে কাজ ফাঁকি দিচ্ছে, কিছুই ভাববে না তারা, কিছুই করবে না; কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ারও নেই। যারা তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে, তারা নিজেরাই লোভী, ফলে দুর্নীতিপরায়ণ তাদের একমাত্র কাজ আখের গুছিয়ে নেয়া। চাই আরও টাকা!' তিক্ত হয়ে

গেছে ডেনিয়েলসনের কণ্ঠ: 'কিন্তু সত্যিকারের নেতা কখনও এমন করত না! আটলান্টিয়ানরা ভাল করেই জানত, সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে খাটাতে হবে মানুষকে, নইলে তারা হয়ে উঠবে অলস।'

'কিন্তু ওই একই ফাঁদে পড়েছিল আটলান্টিয়ানরাও,' বলল লাবনী। 'মনে নেই ক্রিটিয়াসের কথা? "ওরা যখন খুব গর্বিত ও সুখী, ওই একই সময়ে হয়ে উঠেছিল অর্থ ও ক্ষমতার জন্যে ভয়ঙ্কর লোভী। আর সেজন্যেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেন দেবতারা।"'

'ওই একই ভুল আবার করা হবে না।'

'তা-ই হবে!' জোর দিয়ে বলল লাবনী, 'আটলান্টিয়ান হোক বা অন্য জাতির, আমরা আসলে মানুষই। প্লেটো এজন্যেই বলেছেন: "কখনও বদলে যাবে না মানুষের চরিত্র।"'

'অতীত থেকে শিক্ষা নেব আমরা।'

'কী করে?' জানতে চাইল লাবনী। 'কী করবেন আপনি? দুনিয়া বদলে দেবেন আজ থেকে এগারো হাজার বছর আগের ডিএনএ ব্যবহার করে?'

'তা-ই করব!' বলল গম্ভীর ডেনিয়েলসন। ইশারায় দেখাল সারি সারি সুপার-কমপিউটার। 'ক'দিন আগেও এসব মেশিন হাজার হাজার বিষয়ে হিসাব কষত, কিন্তু সত্যিকারের নিখুঁত আটলান্টিয়ান ডিএনএকে বেস করার পর, আমরা জেনে গেছি কোন্‌টা সঠিক ডিএনএ। এমন কী একটু বদলে গেছে আমাদের জিন। কিন্তু আমরাই এখন বিশ্বে খাঁটি রক্তের আটলান্টিয়ানদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। ...কিন্তু এবার দেখবে...' কালো রং করা জানালাসহ ঘর দেখাল সে। 'কীভাবে বদলে গিয়েছিল আটলান্টিয়ান ডিএনএ। কোনটা খাঁটি বা নিখুঁত, তা-ও বুঝবে।'

'আসলে কী বোঝাতে চান?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'সবসময় জরুরি ছিল মানব-সভ্যতার ভারসাম্য রক্ষা করা,' বলল ডেনিয়েলসন, 'এমন এক পৃথিবী, যেখানে সমাজের হাল

ধরবে বৈধ মালিক বা আটলান্টিয়ানরা। সেক্ষেত্রে মানুষ হয়ে উঠবে প্রায় দেবতার মত। অনর্থক থাকবে না এত মানুষ।' ল্যাবের আরেক প্রান্তে চলে গেল সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছু নিল লাবনী। পুরো বুঝছে না কী বলতে চাইছে লোকটা। মাথা খারাপ হয়ে গেল শেষে? কথা শুনে মনে হচ্ছে উন্মাদ ডোনাটি লুক্কার যমজ ভাই!

'এখানে আছে আমার আবিষ্কৃত নিখুঁত আটলান্টিয়ান ডিএনএ,' কাঁচ ঘেরা কেবিনের পুরু রাবারের সিল দেখাল ডেনিয়েলসন। 'আর তারই একটু বদলে নেয়া ডিএনএ নিয়ে আগে কাজ করেছে সুপার-কমপিউটার। অথচ, মাত্র ক'দিন আগেও বোঝার উপায় ছিল না, কোন ডিএনএ সম্পূর্ণ খাঁটি।'

কাঁচের কেবিনে উঁকি দিল লাবনী। ওখানে একসারিতে বেশ কয়েকটি কাঁচ ও স্টিলের সিলিণ্ডার। ভেতরে পানির মত কী যেন।

লাবনী বুঝতে পারল না, ওগুলো পানি কি না। অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কী?'

'নাম দিয়েছি ত্রিশূল বা ট্রাইডেন্ট,' বলল ডেনিয়েলসন। 'পসেইডনের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। প্রতিটি সিলিণ্ডারে আছে জেনেটিকালি ইঞ্জিনিয়ার্ড ভাইরাস।'

প্রায় লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল লাবনী। 'কী!?'

'আমরা আসলে নিরাপদ,' নিশ্চয়তা দিতে চাইল সেসিলি।

'নিরাপদ?'

'হ্যাঁ,' বলল ডেনিয়েলসন, 'বা অন্য কথায়, আমাদের কিছুই করবে না ওই ভাইরাসে। এমনভাবে তৈরি, বুঝবে আটলান্টিয়ান ডিএনএর জেনেটিক সিকিউয়েন্স, হামলা করবে না ভুলেও। এমন কী যাদের দেহে সামান্য আটলান্টিয়ান জেনোম আছে, তারাও থাকবে নিরাপদ। বুঝলে না? কিন্তু যার দেহে আমাদের ডিএনএ সিকিউয়েন্স নেই... রক্ষা নেই তার।'

লাবনীর মনে হলো, দম আটকে আসছে ওর। বেসুরো কণ্ঠে

বলল, 'হায়, আল্লা! আপনারা কি উন্মাদ হয়ে গেলেন?'

'আগে শোনো আমাদের কথা, লাবনী,' নরম সুরে বলল সেসিলি। 'বুঝতে পারছি, এসব মানতে পারছ না, কিন্তু মনের গভীরে ঠিকই জানো, ভালর জন্যেই কাজটা করছি আমরা। পচে গেছে এই পৃথিবীর মানব-সভ্যতা। এভাবে চলতে দিলে আরও ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে। আসলে পৃথিবীকে রক্ষা করতে চাইলে একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্বোধ মানুষগুলোকে সরিয়ে দেয়া। সেক্ষেত্রে অনায়াসেই এই গ্রহ শাসন করতে পারবে আটলান্টিয়ানদের উঁচু সমাজের মানুষ।'

'তোমাদের মনে হচ্ছে না কী ভয়ঙ্কর, জঘন্য কাজ করতে চাইছ?' প্রায় ফুঁসে উঠল লাবনী। 'কোটি কোটি মানুষকে মেরে ফেলবে? শেষ করবে পৃথিবীর পঁচাশিভাগ মানুষকে? তার মানে, সাড়ে পাঁচ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ!'

'এটা জরুরি,' সহজ সুরে বলল ডেনিয়েলসন। 'এ কাজ না করলে সবাই মিলে পড়ব মস্ত বিপদে। ওই পঁচাশিভাগ মানুষ খেয়ে সাফ করবে সবকিছু। নষ্ট করবে জরুরি সব সম্পদ। আর তারপর সব ফুরিয়ে গেলে মরব আমরা সবাই। কিন্তু যারা যোগ্য, একটা সুযোগ পাবে তারা। অর্থাৎ আমরা। নতুন করে গড়ে নেব এই পৃথিবী। যারা বাঁচবে ভাইরাস থেকে, তারা আটলান্টিয়ান। তাদেরকে জড়ো করবে ডেনিয়েলসন ফাউণ্ডেশন।'

কয়েক পা পিছিয়ে গেল লাবনী। 'ক্ষমতা থাকবে আপনার হাতে? উন্মাদ হয়ে গেছেন? আপনি কিন্তু মানুষ নিয়ে কথা বলছেন, ইঁদুর নিয়ে নয়! বলুন তো, ঠিক কবে মহাসর্বনাশ করতে চান পৃথিবীর?'

নিষ্ঠুর হাসি ঝুলছে লোভিস ডেনিয়েলসনের ঠোঁটে। 'যাক, তবুও তো জানতে চাইলে, ডক্টর আলম! আজই শুরু হবে কাজ!'

আবারও দম আটকে এল লাবনীর। 'ক্‌-কী... বলছেন?'

'এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে এয়ারবাস এ-থ্রিএইটি ফ্রেইটার। রওনা হবে পনেরো মিনিট পর। প্রথমে যাবে প্যারিসে, তারপর ওয়াশিংটনে। আর যাওয়ার পথে ত্রিশূল ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে ইউরোপ ও উত্তর আটলান্টিকের জেটস্ট্রিমে। গোটা পৃথিবী ঘুরবে ওই বিমান। প্রতিটি দেশে পৌঁছে দেবে ভাইরাস। মাত্র কয়েক দিনের ভেতর মরে সাফ হয়ে যাবে ফালতু, অকর্মা জনগোষ্ঠী।'

'তারপর যা খুশি করবেন?' ফিসফিস করল লাবনী।

'জানতে চাইলে না, মারা যাওয়ার আগে তাদের কী হবে?' কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে সুইচ টিপল ডেনিয়েলসন। চলে গেল কালো জানালাওয়ালা ঘরের কাছে। ডিপোলারাইযড হতেই কালো জানালা হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ। 'ভাল করে দেখো কী হবে এদের।'

কী দেখবে ভেবে ভয় লাগল লাবনীর, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর বুকে সাহস জড় করে চলে গেল জানালার সামনে। প্রথমে ওর চোখে পড়ল স্টেইনলেস স্টিলের একটা টয়লেট, পাশেই নিচু একটা বাঙ্ক... আর ওখানে...

দু'হাতে মুখ চেপে ধরল লাবনী। এমনই ভয় পেয়েছে, বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। 'প্রফেসর জিম করে...'

ছাতের দিকে চেয়ে আছে লোকটা। কিন্তু মনে হলো না কিছু দেখছে। চোখের সাদা অংশ রক্তের মত লাল। ফুটে উঠেছে সব শিরা। ফেটে গেছে সারাদেহের লালচে ত্বক। মৃদু ওপরে উঠছে তার বুক, ফুঁপিয়ে উঠে দম নিতে চাইছে।

'মাত্র গতকাল ইনফেক্ট করেছি,' শীতল, শান্ত স্বরে বলল ডেনিয়েলসন, 'ট্রাইডেন্ট ভাইরাস সবসময় সরাসরি হামলা করে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমকে। এক এক করে বন্ধ করে দেয় সব অঙ্গের কাজ। পরীক্ষার সময় যা হয়েছে, তাতে ধরে নিতে পারি, করেলি মরবে আগামী আট ঘণ্টার ভেতর।'

'হায়, আল্লা... ভীষণ ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল লাবনী। 'আপনি এভাবে মেরে ফেলবেন মানুষটাকে? প্লিয! আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কথা... এবার দয়া করে অ্যান্টিডোট দিন মানুষটাকে... অন্তত বাঁচুক...'

'কোনও ভ্যাকসিন নেই,' বলল ডেনিয়েলসন, 'নইলে পূরণ হতো না উদ্দেশ্য। ভাইরাস ছড়িয়ে গেলে ঠেকাতে পারবে না কেউ। মরতেই হবে বাজে লোকদের।'

'লাবনী,' খুব নরম সুরে ডাকল সেসিলি, 'করেলি যা করেছে, সেজন্যে ওর ওই শাস্তিই পাওনা হয়েছে। বেঈমানের মাফ হয় না। তোমার বাবা-মাকে তুলে দিয়েছিল ডোনাটি লুক্কার হাতে। একই কাজ করেছে পরে ব্রাযিলে, কেডিয উপসাগরে তোমার প্রতি। সে তোমার বন্ধু নয়। সঙ্গে জুটে গিয়েছিল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।'

'কারও এমন করুণ মৃত্যু আমাদের কাম্য হতে পারে না,' ফিসফিস করল লাবনী। ওর কাঁধে হাত রাখল সেসিলি। কিন্তু ঝটকা দিয়ে সরে গেল ও। 'তোমরা মানুষ না! আমাকে স্পর্শ কোরো না!'

'লাবনী...'

রাগে কাঁপছে লাবনী। ঘুরে তাকাল বাপ-বেটির দিকে। 'ভাবছ তোমাদের সঙ্গে সায় দেব? উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছ তোমরা! আর কখনও পৃথিবীতে এত অশুভ কাজ কেউ করেনি! এমন কী হিটলারও তোমাদের তুলনায় শিশু! নিজেদের মতই হিংস্র পশু বলে মনে করো আমাকে?'

'তুমি আমাদের একজন,' জোর দিয়ে বলল সেসিলি।

'না! আমি তা নই! আমি তোমাদের সঙ্গে নেই!'

'তা হলে তো খুব দুঃখের কথা,' শীতল কণ্ঠে বলল লোভিস ডেনিয়েলসন, 'কারণ তা হলে বাঁচবে না তুমি। বিরোধিতা করবে এমন কাউকে রাখা হবে না। হয় আমাদের সঙ্গে থাকবে, নইলে...'

'হ্যাঁ, আমি তোমাদের সঙ্গে নেই!'

'সেক্ষেত্রে আমি দুঃখিত, মরতে হবে তোমাকে,' কোটের ভেতরে হাত ভরল লোভিস ডেনিয়েলসন।

যেন ধীর হয়ে গেল সময়। ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে দেখল লাবনী, কোটের ভেতর থেকে রুপালি সেই পিস্তলটা বের করেছে লোভিস ডেনিয়েলসন। অস্ত্রের নল ঘুরে বুকে স্থির হতেই লাবনীর মন চাইল ঘুরে দৌড় দেবে, কিন্তু একতিল শক্তি পেল না দু'পায়ে। অবাক চোখে দেখল, লোকটার তর্জনী চেপে বসছে ট্রিগারে!

'ফার! না!' গুলি বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে পিস্তলের নল অন্য দিকে সরিয়ে দিল সেসিলি। লাবনীর পাশ দিয়ে গিয়ে পেছনের দেয়ালে লাগল বুলেট। চিৎকার করে উঠতে চাইল ও, কিন্তু গলা দিয়ে বেরোল শুধু চাপা গোঙানি।

মেয়ের ওপর ভয়ঙ্কর রেগে গেছে ডেনিয়েলসন। কিন্তু নরওয়েজিয়ান ভাষায় ঝড়ের গতিতে কী যেন বলে চলেছে সেসিলি। পুরো এক মিনিট পর থামল সে। ততক্ষণে রাগ সামলে নিয়েছে বিলিয়নেয়ার। একবার কাঁধ ঝাঁকাল। 'তোমার প্রাণ বাঁচাল আমার বেয়াড়া মেয়ে, ডক্টর আলম। আপাতত বেঁচে গেলে।'

'লাবনী, প্লিয,' দ্রুত বলল সেসিলি, 'জানি, সব শুনে মন স্থির রাখতে পারছ না। কিন্তু দয়া করে আমার কথা মন দিয়ে শোনো। ভাল করে জানি, তুমি আমাদেরই একজন। আমাদের মত করেই যুক্তি মেনে চলো। বুঝছ না? যা চাইবে তাই পাবে, শুধু যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। প্লিয, বুঝতে চেষ্টা করো। যুক্তির বাইরে যেয়ো না!'

'যুক্তি?' ফুঁপিয়ে উঠল লাবনী। 'তোমরা মেরে ফেলবে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষকে, আর আশা করবে তোমাদের যুক্তি মেনে চলব? এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। সবাইকে মারছ, মারো আমাকেও!'

‘খামোকা সময় নষ্ট করছ, সেসিলি,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল ডেনিয়েলসন। ‘আগেই বুঝেছি, এই মেয়েকে দিয়ে কিছুই হবে না। মনে নেই, মানা করে দিয়েছিল ডোনাটি লুক্কাকে খুন করতে? আসলে দূষিত সমাজের কারণে বিষাক্ত হয়ে গেছে ওর মন। হাজার চেষ্টা করেও ওকে বোঝাতে পারবে না।’

‘পারব, ফার!’ প্রায় মরিয়া হয়ে বলল সেসিলি, ‘যুক্তি বুঝবে ও!’

‘বেশ,’ কয়েক মুহূর্ত পর বলল ডেনিয়েলসন, ‘প্রথম চালানের ভাইরাস রিলিয পর্যন্ত সময় দিলাম। এরপর পরেও যদি যুক্তি বুঝতে না পারে... সেক্ষেত্রে ওকে খুন করতে হবে, তোমাকেই।’

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেসিলির। ‘না, ফার! আমি ওকে কখনও খুন করতে পারব...

‘হ্যাঁ, তাই করতে হবে,’ চোখে রাগ নিয়ে মেয়েকে দেখল ডেনিয়েলসন। ‘কী বলেছি বুঝতে পেরেছ, সেসিলি?’

আস্তে করে মাথা দোলাল মেয়েটা। ‘বুঝেছি, ফার।’

‘গুড। এবার ওকে নিয়ে যাও এয়ারক্রাফটে।’

দ্বিধা নিয়ে বাবার দিকে তাকাল সেসিলি। ‘ওখানে?’

‘কখন কোথায় ভাইরাস ফেলতে হবে, সেটা তোমাকে বলে দেবে পাইলট। বুঝতে পারছি, একেবারে শেষসময় পর্যন্ত এই মেয়েকে সুযোগ দিতে চাও।’ মাথা দোলাল সেসিলি। ‘সেক্ষেত্রে তোমরা জেনে যাবে, ঠিক কতক্ষণ সময় পাচ্ছ। মনোভাব পাল্টে না নিলে খুন করে সাগরে ফেলে দেবে লাশ।’

লাবনীর দিকে পিস্তল তাক করে রেখেই ডেস্কের সামনে গেল লোভিস ডেনিয়েলসন, বাটন টিপল টেলিফোনের। ‘সিকিউরিটি, ডেনিয়েলসন বলছি। ট্রাইডেণ্ট ল্যাবে দু’জন লোক পাঠাও। আমার মেয়ে আর ডক্টর আলমকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে এয়ারফিল্ডে। সর্বক্ষণ চোখ রাখবে ডক্টর আলমের ওপর আমি চাই হ্যাণ্ডকাফে

আটকে রাখা হোক তার হাত। পালাতে চেষ্টা করলে দেরি না করে খুন করবে।' সেসিলির দিকে তাকাল সে। 'সেসময় আমার মেয়ের কথায় গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

'আমার বুঝি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত?' টিটকারির সুরে বলল লাবনী।

'কৃতজ্ঞ থাকো সেসিলির কাছে। নইলে এতক্ষণে লাশ হতে।'

পিছলে সরে গেল ল্যাবের দরজা। ভেতরে ঢুকল ইউনিফর্ম পরা দুই গার্ড। হাতে উদ্যত অস্ত্র। ঘৃণা ঝরল লাবনীর চোখ থেকে। ওর দু'হাত পেছনে নিয়ে হ্যাণ্ডকাফে আটকে দিল এক গার্ড।

'প্যারিসে নেমেই ফিরবে কোম্পানির বিমানে কাল,' মেয়েকে বলল ডেনিয়েলসন। তাকাল লাবনীর দিকে। 'ডক্টর [illegible]লম?'

দরজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে, ঘুরে দেখল ও। 'কী?'

'আশা করি মগজ কাজ করবে তোমার, সেক্ষেত্রে ফিরতে পারবে সেসিলির সঙ্গে।'

জবাব দিল না লাবনী। পিঠে ঠেলা দিয়ে ল্যাব থেকে বের করা হলো ওকে। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ককপিট জানালা দিয়ে বাইরে দেখল রানা। সামনেই দেখা যাচ্ছে রেইভেন্সফিওর্ড।

দ্রুত পায়ে আবারও হোল্ডে এসে ঢুকল ও। ড্রেকের উদ্দেশে বলল, 'একটা কথা, মনে রেখো ওদের ভেতর সিভিলিয়ান আছে। ডেনিয়েলসনের হয়ে কাজ করে, কিন্তু এসবের সঙ্গে জড়িত নয়। এদেরকে খুন করব না আমরা। যারা গুলি করবে আমাদের দিকে, শুধু তাদের দিকেই অস্ত্র তুলব। ঠিক আছে?' সিলিঙের রিলিয লাইনে প্যারাশুট আটকে নিল ও।

'কাজটা করা কঠিন হবে,' বলল ড্রেক। 'চেষ্টা করব তোমার কথামত কাজ করতে।' মৃদু হাসল। 'কিন্তু তাদের ভেতর যদি ওই কোম্পানির উকিল থাকে?'

'লোভ হবে বদমাসটাকে খুন করতে, কিন্তু কাজটা করা উচিত হবে না,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, সবাই রিলিয লাইনে দাঁড়ান!'

বাটন টিপে দিতেই নিচের দিকে নামতে লাগল প্রোভাইডারের রিয়ার র‍্যাম্প। দ্রুত নিচে চলেছে বিমান। কনকনে হু-হু হাওয়া এল ভেতরে। প্রায় চাপা পড়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। নিচের অফিসদালান পেরোতে শুরু করেছে বিমান। একটু সামনেই লোভিস ডেনিয়েলসনের বাড়ি, পাহাড় ও নিচের বায়োল্যাব।

বাড়ির মাত্র এক শ' ফুট ওপর দিয়ে চলল বিমান। বাড়ি পেরিয়ে যেতেই নিচু হয়ে গেল জমিন। প্যারাশুট জাম্প করতে প্রয়োজন কমপক্ষে আড়াই শ' ফুট উচ্চতা। বাড়ি থেকে বায়োল্যাবের মাঝের জমি অনেক নেমে গেছে।

'জাম্প!'

দলের নেতা হিসেবে বিমান থেকে প্রথম ঝাঁপ দিল রানা। তিন সেকেণ্ড পর রিলিয লাইন টানতেই পিঠের প্যাক থেকে বেরোল প্যারাশুট। যে অল্প উচ্চতা থেকে লাফ দিয়েছে, এখন ঠিকভাবে প্যারাশুট না খুললে সোজা আছড়ে পড়বে নিচের জমিতে—ফলাফল করুণ মৃত্যু।

ঝড়ের গতি তুলে উঠে আসছে ঘাস, তুষার আর পাথর। খাঁড়ির দিকের সেতু লক্ষ্য করে চলেছে একটা গাড়ি।'

এক সেকেণ্ড পর হ্যাঁচকা টান খেল রানা। খুলে গেল প্যারাশুট। নিজেকে তৈরি করে নিল ও। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর ভীষণ ঝাঁকি খেল মাটিতে পড়ে। পতনের গতি কমিয়ে আনার আগেই গন্তব্যে পৌঁছে গেছে প্যারাশুট। ব্যথা পাত্তা না দিয়ে খুলে ফেলল মস্ত ছাতির স্ট্র্যাপ। ওর চারপাশে এসে ধুপ-ধাপ করে

পড়ছে অন্য প্যারাশুটিস্টরা।

যাত্রীদের ফেলে বাঁক নিল সি-১২৩ বিমান, ওপরে উঠতে শুরু করে পৌঁছে গেল খাঁড়ির আকাশে। তখনই নিচ থেকে ছিটকে উঠল সরু এক ধোঁয়ার রেখা, ওটার মুখে স্টিংগার অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইল।

মাত্র দু'সেকেণ্ড পর সি-১২৩ বিমানে লেগে বিস্ফোরিত হলো ক্ষেপণাস্ত্র। উড়ে গেল বিমানের এক ডানা, চারপাশে ছিটিয়ে গেল তেলতেলে কালো ধোঁয়া আর জ্বলন্ত লালচে ফিউয়েল। কাত হয়ে পড়তে লাগল বিমান। গোঁত্তা মেরে নামল উপত্যকার শেষমাথায় পাহাড়ের ওপর। ওখানে তৈরি হলো বিশাল এক কমলা আগুনের গোল বল।

'কপাল!' আফসোস করল ড্রেক।

আগেই প্যারাশুট খুলে হেকলার অ্যাণ্ড কচ ইউএমপি-ফোরটিফাইভ সাবমেশিনগান হাতে তুলে নিয়েছে রানা। চিৎকার করে নির্দেশ দিল, 'সবাই রওনা হও!'

ঊনত্রিশ

বিমানটাকে পাহাড়ে পড়ে বিস্ফোরিত হতে দেখল ভীত লাবনী। গলা শুকিয়ে গেছে ওর। 'হায়, আল্লা!'

'নিশ্চয়ই ডোনাটি লুক্কার লোক!' গলা চড়ে গেল সেসিলির। 'শেষ চেষ্টা করছে!'

'সফল হোক!' দেহ মুচড়ে গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে

দেখল লাবনী। শেষ প্যারাশুটিস্ট নেমে পড়েছে মাটিতে। 'নরকে পাঠিয়ে দিক সব, সঙ্গে তোমার বাবাকেও!'

চড়াৎ শব্দে লাবনীর গালে নামল সেসিলির জোরালো চড়।

কাত হয়ে সিটে পড়ে গেছে লাবনী, বিস্মিত। গায়ে হাত তুলল মেয়েটা! ব্যথার চেয়ে বড় কথা অপমান, আরও তিক্ত হয়ে গেল ওর মন।

মার্সিডিস পৌঁছে গেছে সেতুর কাছে। নির্দেশ দিতে লাগল সেসিলি। 'সিকিউরিটি সেন্টারে ওদের সতর্ক করুন! তারা চোদ্দজন! চলেছে বায়োল্যাব লক্ষ্য করে!' ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল, 'তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন বিমানের কাছে!'

ট্যাকটিকাল সিচুয়েশন বুঝে নিচ্ছে রানা। খোলা এলাকায় ভাল কোনও কাভার পাবে না ওরা। ওই একই অবস্থা হবে ডেনিয়েলসনের লোকদেরও। অবশ্য, নানান দালানের আড়াল নিতে পারবে তারা। কিন্তু তাতে খুব সুবিধা হবে না, সংখ্যায় কম বলে শেষ পর্যন্ত হারতেই হবে তাদেরকে।

'ড্রেক! ওদিক কাভার দিক ছয়জন!' সিকিউরিটি ব্লকের দিকে ইশারা করল রানা।

ওর কথা শুনে মাথা দুলিয়ে নির্দেশ জানিয়ে দিল ড্রেক।

দল থেকে আলাদা হয়ে গেল ছয়জন। এদিকে ল্যাবের গেট লক্ষ্য করে চলেছে রানা। বায়োল্যাবে ঢোকার মাত্র কয়েকটা দরজা। মেইন ডোর আর সিকিউরিটি এন্ট্রান্স বাদ দিলে রয়েছে ফায়ার এস্কেপ ও পাতাল গ্যারাজের র‍্যাম্প। আর তার মানেই সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা, লোভিস ডেনিয়েলসনের ফোর্স বেরিয়ে আসবে...

গাঢ় কালো রঙের কাঁচের দরজা খুলে যেতেই দৌড়ে বেরিয়ে এল ইউনিফর্ম পরা সব গার্ড। প্রত্যেকের সঙ্গে এমপি-সেভেন।

ওগুলোর বুলেট ভেদ করবে বডি আর্মার।

মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েই ঠিক দিকে ইউএমপির নল তাক করল রানা। একই কাজ করেছে ড্রেক ও অন্য ছয়জন। .৪৫ ক্যালিবারের গুলির আঘাতে বায়োল্যাবের সামনের দিকের দেয়াল থেকে উড়ল ধুলো ও সিমেন্টের চাকা। বিস্ফোরিত হলো কালো কাঁচের দরজা। ওদিকে ছিটকে পড়ল রক্তাক্ত কয়েকজন মৃত গার্ড।

রানাদের বামদিকে খ্যার-খ্যার আওয়াজে চালু হলো বেশ কয়েকটা এমপি-সেভেন। এইমাত্র সিকিউরিটি ব্লক থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন গার্ড। তাদের মৃত সঙ্গীদের চেয়ে অনেক হুঁশিয়ার তারা। অপেক্ষাকৃত ভাল কাভারও পেয়েছে। লুকিয়ে পড়েছে দেয়াল বা সিঁড়ির আড়ালে।

মাত্র তিরিশ গজ দূরে ড্রেকের দ্বিতীয় দল। কিন্তু খোলা এলাকা পেরিয়ে রাস্তা ধরে এগোতে হবে তাদেরকে। দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা, তিনজনের একদল ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। কাভার দেবে অন্যদেরকে। এদিকে অন্য তিনজন দৌড়ে গেল কাছের দালান লক্ষ্য করে।

পাল্টা গুলি করছে সিকিউরিটি গার্ডরা। কিন্তু ছুটন্ত লোক গেঁথে ফেলা কঠিন। গার্ডদের একজন বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে মাথা তুলল দেয়ালের ওদিক থেকে। .৪৫ ক্যালিবারের বুলেটের আঘাতে চুরমার হয়ে গেল খুলি। পিছিয়ে গিয়ে ধুপ্ করে পড়ল তার লাশ।

অন্যরা গুলি করছে।

রাস্তায় পড়ে গেল ড্রেকের দ্বিতীয় দলের একজন। বুকে লাল ফুলের মত ফুটে উঠেছে রক্তের ছাপ। দৌড় না থামিয়েই তাকে পেরিয়ে গেল অন্য দুই যোদ্ধা. সামনের দালানে পৌঁছে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাভার নেয়ার জন্যে।

মাটিতে পড়ে থাকা শত্রুদের দিকে মন দিল গার্ডরা। তাদের বুলেট বিঁধতে লাগল যোদ্ধাদের খুব কাছের মাটিতে। রানা দেখল,

একসারিতে ছিটকে মাটি তুলতে তুলতে সাপের মত এক লোকের দিকে গেল বুলেটের সারি। অথচ তাকে সতর্ক করতে পারবে না ও চাইলেও।

ক্ষত-বিক্ষত মাটির সঙ্গে ছিটকে উঠল তাজা রক্ত।

লক্ষ্য পাল্টে নিল গার্ডরা। অন্য দু'যোদ্ধাকে একই জায়গায় আটকে রাখতে চাইছে।

দালানের আড়াল পেয়ে যাওয়া যোদ্ধাদের তরফ থেকে গার্ডদের দিকে গেল এক জোড়া গ্রেনেড। বাতাসে ভেসে গিয়ে পড়ল ঠিক জায়গায়। বুক সমান উচ্চতায় সিঁড়ির ওপর নামল গ্রেনেড, বিস্ফোরিত হয়ে চারপাশে ছিটিয়ে দিল ভয়ঙ্কর ধারালো শ্র্যাপনেল। দুই বিস্ফোরণে তিরিশ ফুটের ভেতর ভেঙে গেল সমস্ত জানালার কাঁচ।

'মেইন ডোর!' চিৎকার করেই এণ্ট্রান্স লক্ষ্য করে ছুট দিল রানা। ওর পিছু নিল ড্রেক আর দলের অন্যরা। ছড়িয়ে পড়েছে কাভার দেয়ার জন্যে।

বিধ্বস্ত দরজার কাছে পৌছে গেল রানা, একদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে উঁকি দিল দালানের ভেতর। ঘোড়ার নালের আকৃতির রিসেপশন ডেস্কে এখন কেউ নেই। দুই গার্ড পড়ে আছে মাত্র কয়েক ফুট দূরে, মৃত।

দরজার আরেক পাশে পযিশন নিয়েছে ড্রেক। লবিতে ঢুকে পড়ল রানা, ওকে কাভার দিল ড্রেকের এক লোক। ডেস্কের ওদিকে কাঁচ দেয়া ছাতওয়ালা সেণ্ট্রাল করিডোর। একপাশে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে আর নিচে।

দরজা খুলে যেতেই অস্ত্র তাক করল রানা। বেরিয়ে এসেছে সোনালি চুলের এক তরুণী। রানাকে দেখে ভয়ে বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা।

'কী, ভয় পেলে?' হাত তুলে ড্রেককে গুলি না করতে ইশারা

দিল রানা। 'তুমি ইংরেজি বলতে পারো?'

বড় বড় চোখে মাথা দোলাল মেয়েটা।

'ঠিক আছে, বেরিয়ে যাও বিল্ডিং থেকে। দাউদাউ আগুনে পুড়বে এ দালান।' রানার চোখ পড়ল দেয়ালে ফায়ার অ্যালার্মে। 'ভেতরে আরও কেউ আছে?'

মাথা দোলাল মেয়েটা। এতই ভয়, কথা বলতে পারছে না।

'তা হলে ওদেরকে বলো, এক দৌড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।' ইউএমপির বাঁটের আঘাতে অ্যালার্মের কাঁচের ঢাকনি ভেঙে ফেলল রানা। ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল অ্যালার্ম। কুঁচকে গেল ওর ভুরু। এই মারাত্মক আওয়াজের ভেতর গার্ডদের এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও, সিভিলিয়ানদের দালান থেকে বের করে দেয়া খুবই জরুরি।

এতই, কারণ পাঁচ মিনিট পর থাকছে না এই দালান!

সামনের দরজা পেরিয়ে গেল রানা, হাতে তৈরি অস্ত্র। পিলপিল করে বেরিয়ে এল একদল লোক। ওর মনে হলো না, কেউ দেখছে ওকে, ঝড়ের গতি তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে দালান ছেড়ে। একজনও সশস্ত্র নয়। পরের সিকিউরিটি স্টেশনের দরজা লাথি মেরে খুলল রানা। ভেতরে কেউ নেই।

কিন্তু খুব কাছেই থাকবে আরেক দল গার্ড।

লবিতে ঢুকে পড়েছে ড্রেক আর তার দলের লোক। তাদের পাশ কাটিয়ে ভাগছে সিভিলিয়ানরা। ফায়ার অ্যালার্মের ঝনঝন আওয়াজের ওপর দিয়ে নির্দেশ দিল রানা, 'ঠিক জায়গায় বসিয়ে দাও বোমা!' তাদের ইশারায় দেখিয়ে দিল একটা দরজা। ওদিক থেকেই হাজির হয়েছে ডেনিয়েলসনের কর্মচারীরা। 'তবে টাইমার চালু করার আগে দেখে নেবে সিভিলিয়ানরা সবাই বেরিয়ে গেছে কি না!'

'কাজটা কঠিন, তাতে সময় লাগবে!' আপত্তি তুলল ড্রেক।

ওপর তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে এখনও নামছে অনেকে। 'এদের ভেতর গার্ডরাও লুকিয়ে থাকতে পারে। তখন...'

'লক্ষ্যভেদ ভুলে গেলে?' ধমকের সুরে বলল রানা। দেখল তিক্ত হাসছে ড্রেক। কাভার নিল সে ডেস্কের আড়ালে। ওখান থেকে চোখ রাখল সিঁড়ি আর মাঝের করিডোরের ওপর। লবি পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বায়োল্যাবের কর্মচারীরা। কিন্তু...

তাদের ভেতর লুকিয়ে আছে গার্ডরা! ধাক্কা দিয়ে ভিড় সরিয়ে ওপরে তুলল এমপি-সেভেন...

রানা ভাবল, নিশ্চয়ই বুদ্ধি করে মাথা নিচু রাখবে সিভিলিয়ানরা। ওর তিন গুলি গেল সবার মাথার ওপর দিয়ে। পরক্ষণে আড়াল নিল ও। চিৎকার জুড়েছে ভীত লোকজন। এমপি-সেভেনের গুলির আওয়াজে চাপা পড়ল আর সব আওয়াজ। রিসেপশন ডেস্কের দামি মার্বেল খুবলে তুলল বুলেট। চারপাশে ছিটিয়ে গেল পাথরের টুকরো ও শ্র্যাপনেল।

এমপি-সেভেনের চেয়ে অনেক গম্ভীর আওয়াজ তুলল ইউএমপি। পাল্টা গুলি করেছে ড্রেক ও তার লোক। ওদিক থেকে থেমে গেল গুলি। আবার শোনা গেল সিভিলিয়ানদের আর্তচিৎকার। ডেস্কের কোনা দিয়ে উঁকি দিয়ে রানা দেখল, মারা পড়েছে শুধু গার্ডরা।

'ঠিকই বলেছ, রানা,' চিৎকার করে বলল ড্রেক, 'তাক করলে দেখি মাঝে মাঝে লক্ষ্যে গুলি লাগেও!'

উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির লোকগুলোকে নেমে আসতে ইশারা করল রানা। 'বেরিয়ে যান! দালান ছাড়ুন!' হুড়মুড় করে নামতে লাগল সবাই। 'ড্রেক, তোমার লোকদের বলো কলামে আরও এক্সপ্লোসিভ সেট করতে। পুরো দালান ধসিয়ে দিতে হবে!'

'আমাদের কাজ গছিয়ে দিয়ে নিজে কই যাবে?' জিজ্ঞেস করল ড্রেক।

সেন্ট্রাল করিডোর দেখাল রানা। 'কন্টেইনমেন্ট এরিয়ায় থাকবে ডেমিয়েলসন। ধসিয়ে দিতে হবে, পুরো টিলা। যাতে বেরোতে না পারে ওই লোক।'

'শুনে শান্তি পেলাম মনে। আমি কাভার দেব। অ্যালেক, জনি, আমার সঙ্গে এসো। অন্যরা চার্জ বসাও বেসমেন্টে। তার আগে ঘাড় ধরে বের করে দাও সবাইকে!'

করিডোরে ঢুকে রানা দেখল সামনে থেকে ছুটে আসছে আরও টেকনিশিয়ান। দেরি হবে না তাদের দালান থেকে বেরিয়ে যেতে। 'ড্রেক, এসো!'

করিডোর ধরে দৌড়াতে শুরু করেছে রানা। পিছু নিল ড্রেক এবং তার দুই সহযোদ্ধা। চারজন সশস্ত্র লোক ধেয়ে আসছে দেখে ভয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল কর্মচারীরা।

'এখান থেকে বেরোও!' চিৎকার করে বলল রানা। 'এবার বোমা ফাটবে!'

বোমার কথা চিৎকারের চেয়ে বহু গুণ কাজ করল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে করিডোর ফাঁকা করতে ঝড়ের বেগে ছুটল সিভিলিয়ানরা। তখনই চিৎকার করে বলল ড্রেক, 'ওদিক থেকে আসছে গার্ডরা!'

করিডোরের দূরে দেখা দিয়েছে ইউনিফর্ম পরা দুই গার্ড। ঝট করে আড়াল নিল এক সিকিউরিটি পোস্টের পেছনে। ওখান থেকে তাক করেছে অস্ত্র।

লাফ দিয়ে আগের জায়গা থেকে সরে গেল রানা। ওকে পাশ কাটিয়ে করিডোরের মুখে এক মাঝবয়সী কর্মচারীকে গেঁথে ফেলল বুলেট। ধুপ করে পড়ল লাশ।

এখনও করিডোরে ধাক্কাধাক্কি করছে কর্মচারীরা। তাদের কারণে লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না রানা। কিন্তু লোকগুলোর জীবনের মূল্য নেই গার্ডদের কাছে।

রানার কাছ থেকে সামান্য দূরে এক মহিলার কাঁধ খুবলে নিল

বুলেট। রক্ত ছিটকে লাগল বেচারির মুখে। পিছলে পড়ে গেল মেঝেতে।

গার্ডরা এভাবে গুলি করলে আহত হবে অনেকে।

ইউএমপি তুলেই সিকিউরিটি স্টেশন লক্ষ্য করে এক ঝাঁক গুলি পাঠাল রানা। চাইছে সিভিলিয়ানদের বাঁচিয়ে গুলি ক াতে। চারপাশে গুলি লাগতেই দেরি না করে আড়াল নিল গার্ডরা।

'কাভার ফায়ার!' নির্দেশ দিল রানা। ওর পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল এক লোক, খপ্ করে তার কাঁধ ধরল , দেখিয়ে দিল আহত মহিলাকে। 'ওকে নিয়ে যাও!' ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লোকটার মুখ। মাথা দোলাল। করিডোর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত। মহিলাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে চলল।

গার্ডদের মনোযোগ আটকে রাখতে আরেক দফা গুলি পাঠাল রানা, পরক্ষণে তেড়ে গেল করিডোর ধরে। ড্রেককে পরিষ্কার অ্যাংগেল দিতে ছুটছে একদিকের দেয়ালের পাশ দিয়ে। সামনের দরজায় কুঁকড়ে পড়ে আছে এক লোক, লাফিয়ে তাকে টপকে গেল রানা। একটু দূরেই প্রথম এয়ারলক।

রানার পেছনে তিনটে অস্ত্রের একটা থেমে গেছে। তারপর চুপ হলো দ্বিতীয়টা। রিলোড করছে ড্রেকের লোক। রানা বুঝে গেল, এ সুযোগে এদিকে গুলি পাঠাবে ডেনিয়েলসনের গার্ডরা। ভুল হয়নি ওর, একদিকের কাউন্টারের পেছন থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এক গার্ড, হাতে তৈরি এমপি-সেভেন...

পরক্ষণে রানার একরাশ গুলি খেয়ে পেছনে উড়ে গেল লোকটা। খালি করে ফেলেছে রানা ম্যাগাযিন। ডাইভ দিল, চকচকে মেঝেতে পড়ার আগেই খুলে ফেলল খালি ক্লিপ।

কাউন্টারের ওদিক থেকে সিধে হলো দ্বিতীয় গার্ড।

কমপক্ষে তিন সেকেণ্ড লাগবে শত্রুর রিলোড করতে...

এমপি-সেভেন ঘুরিয়ে রানার দিকে তাক করল গার্ড...

কিন্তু ড্রেকের ইউএমপির একটা গুলি উড়িয়ে দিল তার খুলি।

ঘুরে তাকাল রানা, পেছনে ছুটে আসছে ড্রেকের দলের অন্যরা। রিলোড করে নিল ও। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চমৎকার লক্ষ্যভেদ!'

'হ্যাঁ, খুবই,' বলল আরেকটা কণ্ঠ।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা।

লোভিস ডেনিয়েলসন!

সামনের দরজা লক্ষ্য করে গুলি করল রানা। ওই একই সময়ে গুলি করেছে ড্রেক। ফুল-অটোতে আছে ওদের ইউএমপি, প্রচণ্ড গতি এক ঝাঁক গুলি লাগল ওদিকের কাঁচে।

কাঁচের দরজায় 'টিং! টিং!' আওয়াজ তুলল বুলেট। মাথা ভোঁতা হয়ে পড়ল সব মেঝেতে। স্বচ্ছ অ্যালিউমিনিয়াম আর্মার মোটেও টসকে যায়নি।

'কুকুরের বাচ্চা খুব সতর্ক!' বিড়বিড় করল ড্রেক।

সামনে বাড়ল ডেনিয়েলসন। থামপ্রিন্টের নিচের স্পিকারে শোনা গেল কণ্ঠ: 'মিস্টার রানা, বলতেই হচ্ছে, তোমাকে দেখে অবাক না হয়ে পারিনি।'

'তোমার সঙ্গে আলাপ আছে আমার,' বলল রানা। ওর চোখ খুঁজছে দরজা খোলার উপায়। নিশ্চয়ই সিকিউরিটি স্টেশনে ওভাররাইড করার...

'ভেবে লাভ নেই,' রানার মন পড়ল ডেনিয়েলসন। 'ল্যাবের দিক সম্পূর্ণ সিল করা। কোনও উপায় নেই যে ভেতরে ঢুকবে।'

'আমরা হয়তো ঢুকতে পারব না, কিন্তু এমন ব্যবস্থা নেব, যাতে তুমিও বেরোতে পারবে না,' বলল ড্রেক। বেল্টের প্যাক বের করে দেখাল। 'সিএল-টোয়েন্টি। ওজন পুরো দু'পাউণ্ড। তিব্বতে যেমন পাহাড়ের ভেতর ছাত ধসিয়ে দিয়েছিলে আমাদের মাথার ওপর, ঠিক একই কাজ করব— মাথার ওপর ছাত পড়ে মরবে।'

টিটকারির হাসি হাসল ডেনিয়েলসন। 'চেষ্টা করে দেখো।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

'লোভিস!' পেছন থেকে ডাকল রানা, 'লাবনী কোথায়?'

ঘুরে তাকাল ডেনিয়েলসন। 'ডক্টর আলম আছে আমার মেয়ের জিম্মায়। ওকে বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত সেসিলি। এখনও ভাবছে, ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার আগে ওকে আমাদের যুক্তি বোঝাতে পারবে।'

'ভাইরাস? কখন ছড়িয়ে দেবে?' চমকে গেছে রানা।

'আমার পাঠানো এয়ারবাস পনেরো হাজার ফুট উঠে যাওয়ার পর,' বলল ডেনিয়েলসন। চট্‌ করে পরস্পরকে দেখল রানা ও ড্রেক। 'হ্যাঁ, একটু পর রওনা হবে। আবারও দেরি করে ফেলেছ, মিস্টার ড্রেক। আমাকে ঠেকাতে পারেনি ডোনাটি লুক্কা, তুমিও পারবে না। মারা যাওয়ার আগে ভেবো, করুণভাবে হেরে গেছ। এখন যাই করো, মরবে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর।' আবারও দেখা দিয়েছে নরওয়েজিয়ানের মুখে টিটকারির হাসি। 'গুড বাই, জেন্টলমেন।' ঘুরে হাঁটতে লাগল সে। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দ্বিতীয় এয়ারলক দরজা।

রাগ সামলাতে না পেরে আবারও দরজার ওপর ব্রাশফায়ার করল ড্রেক। সামান্য দাগও পড়ল না দরজায়। 'কুকুরের বাচ্চা!'

'সত্যিকারের,' সায় দিল রানা।

ওর দিকে তাকাল ড্রেক। 'কী মনে হয়, হারামজাদা মিথ্যা বলছে? মানে... ওই ভাইরাসের ব্যাপারে?'

'ওই প্লেন এরই ভেতর টেকঅফ না করলে, এখনও সুযোগ আছে।' বেল্ট থেকে সিএল-টোয়েন্টি খুলে নিল রানা। 'ওটাকে ঠেকাতে না পারলে সর্বনাশ হবে। ...এসো, যে কাজে এসেছি, তা শেষ করি। বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেব এই দালান।'

হ্যাঙার থেকে বের করে রানওয়েতে দাঁড় করানো হয়েছে এয়ারবাস এ-থ্রিএইটিকে। পাইলট চালু করেছে প্রকাণ্ড সব ইঞ্জিন।

বিমানের বিশাল ডানার নিচে এসে থামল মার্সিডিস, বামের দরজা খুলে লাবনীকে ঠেলে নামাল সেসিলি, হাতের ইশারা করল সিঁড়ি বেয়ে উঠতে। তৈরি দুই সশস্ত্র গার্ড।

গুহা সদৃশ এ-থ্রিএইটি এয়ারক্রাফটে তিনটে ডেক। এই বিমান এয়ারলাইনার মডেলের মত হলে লাবনী বুঝত, ওরা উঠেছে নিচের ডেকে। তিনটে ডেকেই রাখা যায় কার্গো। পেছনের হোল্ডে দরজা। ওদিকে তাকাল লাবনী, জানালাহীন মস্ত ডেক প্রায় চারভাগের তিনভাগ মালপত্রে বোঝাই।

এসব কন্টেইনারে কোথাও আছে ভাইরাস, ছড়িয়ে দেয়া হবে পৃথিবী জুড়ে।

ওপরের ডেকের খাড়া সিঁড়ি দেখাল সেসিলি। লাবনী ভেবেছিল, ওখানেও বোঝাই থাকবে মালপত্র। কিন্তু উঠে এসে অবাক হলো। এই ডেক দুর্দান্ত বিলাসবহুল কেবিন।

'বিমানে এটা বাবার প্রাইভেট অফিস,' বলল সেসিলি। খুলে দিল লাবনীর হ্যাণ্ডকাফের তালা। 'বোসো, লাবনী।'

মনে অস্বস্তি নিয়ে সিটে বসল লাবনী, দেখল চারপাশ। কেবিনের দু'পাশের পোর্টহোল, পেছনের দেয়ালে দরজা। ওটা বোধহয় গেছে ওপরের আরও কোনও হোল্ডে। সামনেই 'এল' শেপের ডেস্কে কমপিউটার মনিটর ও দুটো লাল টেলিফোন।

লাবনীর মুখোমুখি চামড়ার সোফায় বসল সেসিলি। ওদের সঙ্গে ওপরের ডেকে আসেনি দুই গার্ড, রয়ে গেছে নিচের লাউঞ্জে। লাবনী ভাবছে, সেসিলিকে আটকে ফেলে কোনওভাবে নেমে যেতে পারবে কি না বিমান থেকে। মন দমে গেল ওর। না, লড়াই করে পারবে না। ওর অত শক্তি নেই।

'জানি না কী ভাবছ,' বলল লাবনী, 'কিন্তু জেনে রাখো, এসব

পাপের সঙ্গে আমি কোনওভাবেই নিজেকে জড়াব না।'

'ভাবছি না যে তুড়ি বাজালেই তুমি বদলে যাবে,' বলল সেসিলি, 'জানি, বাস্তব মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তোমার। কিন্তু আগে বা পরে, সবই বুঝতে হবে। এ শুধু সময়ের ব্যাপার।'

'তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ! কখনও ভুলেও ভেবো না তোমার সঙ্গে এসবে সায় দেব।'

আহত চোখে লাবনীকে দেখল সেসিলি। 'প্লিয, এখনই মনস্থির কোরো না, লাবনী। বুঝছ না, তুমি আমাদের একজন। সত্যিকারের আটলান্টিয়ান। মানব জাতির সেরাদের একজন। যারা শাসন করবে এই পৃথিবী, তাদের একজন হওয়ার অধিকার আছে তোমার।' সোফা ছেড়ে লাবনীর সামনে থামল সেসিলি। লাবনীর মনে হলো, আবারও ওর গায়ে হাত তুলবে মেয়েটা। কিন্তু তা না করে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে। 'আমি তোমাকে খুন করতে চাই না, লাবনী! শুধু একবার মুখে বলো, পাল্টে নিয়েছ মনোভাব। এমন কী সত্যি বলতে হবে, তা-ও নয়! সব শেষ হলে ঠিকই বুঝবে, যা করা হয়েছে, তা আমাদের সবার জন্যে মঙ্গলজনক। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছ, তা মুখে না বললে বাঁচতে পারবে না।'

'তুমি তো বলছ, আমি সেরাদের একজন, তারপরেও মেরে ফেলবে?' তিক্ত হাসল লাবনী।

'বাবার অবাধ্য হতে পারব না। কাজটা করব না!' লাবনীর হাত ধরতে চাইল সেসিলি, কিন্তু হাত টেনে নিল লাবনী। 'আমি বেশি কিছু চাইনি তোমার কাছে। মিথ্যাই বলো! আন-ও, প্লিয, বলো!'

'কোনও কারণেই মিথ্যা বলব না,' বলল লাবনী।

নিচু গর্জন বদলে গিয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। বারকয়েক কাঁপল বাতি, নড়ে উঠে রওনা হয়ে গেল এ-থ্রিএইটি এয়ারক্রাফট।

'টেকঅফ করার পনেরো মিনিট পর ছাড়া হবে প্রথম ব্যাচ ভাইরাস,' বলল সেসিলি। আবারও গিয়ে বসল সোফায়। 'মন বদলে নেয়ার জন্যে ওই পর্যন্ত সময় পাবে। লাবনী, প্রিয়, আমাকে বাধ্য কোরো না তোমাকে খুন করতে।'

স্টারবোর্ড পোর্টহোল দিয়ে দূরে চোখ রাখল লাবনী। ভীষণ ভয় লাগছে, তা হলে মরেই যেতে হচ্ছে ওকে!

রানা, ড্রেক এবং দলের আরও কয়েকজন ফিরতি পথে ছুটে চলেছে দালানের দরজা লক্ষ্য করে, তখনই শুনল বাইরে বিরতি নিয়ে চলছে গুলি। অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এসে কাউকে দেখল না রানা। ভাল করেই জানে, এখন প্রথম কাজ হওয়া উচিত বায়োল্যাব থেকে বহু দূরে সরে যাওয়া।

খোলা এলাকায় এসে ঝেড়ে দৌড় লাগাল ওরা। অনেকটা দূরে রানা দেখল কয়েকজন সিভিলিয়ানকে, দৌড়ে চলেছে। দু' শ' ফুট দূরে রাস্তায় দুটো সাদা গ্র্যাণ্ড চেরোকি জিপ, পেছনে আড়াল নিয়েছে কয়েকজন ইউনিফর্মড্ গার্ড। খতম করতে চাইছে ড্রেকের অবশিষ্ট দুই যোদ্ধাকে। সামান্য দূরেই কয়েকটা লাশ।

খাঁড়ির দিকে চোখ যেতেই রানা দেখল, খুব ধীর গতি নিয়ে রানওয়ের দিকে চলেছে চকচকে, সাদা এ-থ্রিএইটি ফ্রেইটার।

ওই বিমানে আছে লাবনী!

বায়োল্যাব থেকে ভাগছে কয়েক কর্মচারী, তাদের উদ্দেশে একঝাঁক গুলি পাঠাল গার্ডরা।

ভাল করেই জানে রানা, লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা খুবই কম, তবুও দৌড়ের ভেতর ব্রাশফায়ার করল শত্রুদল লক্ষ্য করে। লুকিয়ে পড়ুক তারা, সে সুযোগে গবেষণাগার থেকে সরে যাবে ওরা।

রানার পাশে ছুটতে ছুটতে ধুপ্ করে রাস্তায় পড়ল ড্রেকের এক যোদ্ধা। থেমে গেল রানা, টেনে সরিয়ে নেবে আহত সঙ্গীকে। কিন্তু

এক সেকেণ্ড পর বুঝল, বেচারার গলা ছিঁড়ে নিয়েছে বুলেট। পানি থেকে তোলা মাছের মত ছটফট করছে মৃত্যুপথযাত্রী লোকটা। ঘুরেই আবারও ছুটল রানা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে সিএল-টোয়েন্টি...

বায়োল্যাবের দিকে চেয়ে আছে লাবনী, পরক্ষণে চমকে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর চোখের সামনে মুহূর্তে চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ল মস্ত কমপ্লেক্স। শুনল বেশ কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। শত শত ফুট ওপরে উঠল টনকে টন জঞ্জাল। খাঁড়ির দিকে ধেয়ে এল নিউক্লিয়ার বোমার শকওয়েভের মত ধুলোর বিশাল এক ঢেউ। বিড়বিড় করল লাবনী, 'হায়, আল্লা!'

সিট ছেড়ে উঠে পোর্টহোলে চোখ রাখল সেসিলি। 'মাই গড!'

কণ্ঠ থেকে বিজয়ের সুর গোপন করতে পারল না লাবনী, 'তোমাদের বায়োল্যাব শেষ!' সফল হয়েছে লুক্কার লোক! তখনই ওর মনে পড়ল, আসলে মোটেও পাল্টে যায়নি পরিস্থিতি।

ল্যাব থেকে বের করে বিমানে তুলেছে ভাইরাস। পনেরো মিনিট পর ছেড়ে দেবে বাতাসে।

ভুল টার্গেটে হামলা করেছে ব্রাদারহুড!

কান ঝনঝন করছে রানার, মনে হলো যখন তখন টলে পড়বে। চোখ আড়াল করতে হাত রাখল কপালে। আকাশ থেকে ঝরঝর করে পড়ছে মাঝারি শিলের মত পাথর ও সিমেন্টের টুকরো। চট্ করে চারপাশ দেখে নিল ও।

এখন কেউ এদিকে গুলি করছে না। শক্তিশালী শকওয়েভ ধাক্কা দিয়ে পেছনে উল্টে ফেলেছে দুই জিপ। ভারী যন্ত্রদানব চ্যাপ্টা করে দিয়েছে গার্ডদেরকে।

প্রায় উধাও হয়েছে প্রকাণ্ড বায়োল্যাব। এখনও রয়ে গেছে

দু'চার জায়গা, কিন্তু বোঝার উপায় নেই ওখানে কোনও দালান ছিল। যত্ন করে তৈরি দেয়াল এখন ভাঙা, কালো দাঁতের মত। আবর্জনার থেকে বেরিয়ে আছে বাঁকাচোরা সব স্টিলের গার্ডার।

ভাঙা কংক্রিটের ধুলোর মাঝ দিয়ে দূরে দেখতে চাইল রানা। বুঝতে হবে, কতটা ক্ষতি হয়েছে ভূগর্ভস্থ কন্টেইনমেন্ট এরিয়ার। আবর্জনা আর জঞ্জালে ঢাকা পড়েছে প্রবেশ পথ।

সময় লাগবে না আবারও সব মেরামত করতে, তিক্ত মনে ভাবল রানা। টিলার ওপরে প্রায় অক্ষত ডেনিয়েলসনের অফিস। ফাটল ধরেছে কয়েকটা দেয়ালে, কিন্তু এতবড় বিস্ফোরণেও কিছুই হয়নি একটা কাঁচেরও। স্বচ্ছ যে আর্মার ব্যবহার করেছে এয়ারলক ডোরে, বোধহয় ওই একই জিনিস দিয়ে তৈরি।

রয়ে গেছে লোভিস ডেনিয়েলসন আর তার ভাইরাস।

ঝট্ করে খাঁড়ির দিকে চোখ ফেরাল রানা। রানওয়ের পুবে চলেছে এ-থ্রিএইটি। একবার শেষমাথায় পৌঁছলেই ঘুরে গিয়ে প্রচণ্ড গতি তুলে উঠবে আকাশে। আর তারপর সঠিক সময়ে বাতাসে ছাড়বে ভাইরাস।

ওর পাশে থেমে বিড়বিড় করে কী যেন বলল ড্রেক। পেছনে রানা দেখল দ্বিতীয় যোদ্ধাকে, পড়ে আছে রাস্তায়। চোখে মৃত্যু-ভয়। বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। মরবে আগামী কয়েক মিনিটের ভেতর। কিছুই করার নেই রানা বা ড্রেকের।

মানুষটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে তাকাল রানা। 'চলো, ভাইরাস ওই বিমানে! ঠেকাতে হবে!'

মুখ থেকে ধুলো সরিয়ে খাঁড়ির সেতু দেখাল ড্রেক। 'ওরা টেকঅফ করবে, রানা, ওই পথে ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারব না।'

ডেনিয়েলসনের বাড়ির দিকে তর্জনী তাক করল রানা। 'ওখানে আছে গাড়ি। এসো!'

জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ডেস্কে মনিটর। নীল আলো পড়ল উদ্বিগ্ন সেসিলির মুখে। 'মিস ডেনিয়েলসন,' বলল নারী কণ্ঠ, 'আপনার বাবা আলাপ করতে চান ভিডিয়োলিঙ্কে।'

'ওহ্, থ্যাঙ্ক, গড!' হাঁফ ছাড়ল সেসিলি। 'আমি ভেবেছি তুমি খুন হয়ে গেছ, বাবা!'

কেবিনের স্পিকারে এল লোভিস ডেনিয়েলসনের কণ্ঠ: 'আমি ভাল আছি। প্রায় অক্ষত কন্টেইনমেন্ট এরিয়া।'

'এরা কি ডোনাটি লুক্কার লোক? প্যারাশুট নিয়ে নামতে দেখেছি।'

'হেণ্ড্রিক ড্রেক। আর মাসুদ রানা।'

হতভম্ব হয়ে গেছে সেসিলি। 'কী বললে, ফার? তুমি না বলেছিলে ডোনাটি লুক্কা...

'রানা!' একদৌড়ে ডেস্কের কাছে এল লাবনী। 'ও বেঁচে আছে? কী হয়েছিল? ও ঠিক আছে তো?'

'তোমার বান্ধবীকে বলো, সেসিলি, সে যদি আমাদের কেউ হতো, এতো খুশি হতো না,' তিক্ত শোনাল ডেনিয়েলসনের কণ্ঠ। 'নিশ্চয়ই বুঝছ, সে কোন্ পক্ষের? আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে হেণ্ড্রিক ড্রেক। তার সঙ্গে মাসুদ রানা।'

ভুরু কুঁচকে স্ক্রিন দেখল সেসিলি। 'তুমি তা হলে মিথ্যা বলেছ, ফার' রানা যদি বেঁচেই থাকে, সেক্ষেত্রে...'

'এখন এসব ভাবার সময় নয়, সেসিলি,' মেয়েকে থামিয়ে দিল ডেনিয়েলসন। 'আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শত্রুদেরকে পরাস্ত করা। কন্টেইনমেন্ট এরিয়ায় এখনও আমাদের হাতে রয়ে গেছে ভাইরাসের কালচার। এদিকে সেতু পাহারা দিতে তার দলের লোককে পাঠিয়ে দিয়েছে জ্যাগার। চাইলেও তোমাদের বিমানে হামলা করতে পারবে না শত্রুরা। আমার ধারণা, এরই

ভেতর লাশ হয়ে গেছে মাসুদ রানা আর হেণ্ড্রিক ড্রেক। তা না হয়ে থাকলেও একটু পরই হবে।'

'সত্যিই দুর্দান্ত সব জিনিস,' প্রশংসার সুরে বলল ড্রেক। ওরা আছে বিলিয়নেয়ারের বাড়ির ভূগর্ভস্থ গ্যারাজে। এখানেই রাখা হয়েছে সেসিলির গাড়ি আর মোটরসাইকেলের কালেকশন। 'কোন্টা সবচেয়ে দ্রুত? ল্যাম্বোরগিনি, নাকি ম্যাকলারেন?'

গাড়ি ও মোটরসাইকেলের চাবি থাকে একটি কেবিনেটে। গুলি করে ওটার তালা উড়িয়ে দিল রানা। 'আমাদের চাই কনভার্টিবল... ফেরারি।' উজ্জ্বল কমলা এফ৪৩০ স্পাইডার দেখিয়ে দিল ও। খেয়াল করল, ওই গাড়ির পাশের জায়গায় এখন সেসিলির রেসিং মোটরসাইকেল নেই। দেরি না করে ব্যস্ত হাতে কেবিনের ভেতর সঠিক চাবি খুঁজল রানা। কাজটা সহজই হলো। কালো ও হলদে এক ঘোড়ার লোগো জানিয়ে দিল, সে-ই ফেরারি গাড়ির চাবি।

'কনভার্টিবল? কেন?'

'কারণ ঝাঁপিয়ে পড়ব ওটা থেকে। যাওয়ার পথে থাকবে গার্ডরা, সহজে পেরোতে দেবে না সেতু।' ড্রেকের দিকে চাবি ছুঁড়ল রানা। 'চলো! ড্রাইভ তুমি করছ!'

'কী করবে, তা তো বলবে?' রানার মতই লাফিয়ে গাড়িতে চাপল ড্রেক।

'এখনও জানি না, যাওয়ার পথে ঠিক করব প্ল্যান।'

'পাগল হলে?' ড্রাইভিং সিটে বসে ইগনিশনে চাবি ভরে ইঞ্জিন চালু করল ড্রেক। ভয়ঙ্কর কোনও হিংস্র জন্তুর মত গর্জে উঠেছে ইঞ্জিন। 'ভাবছ, একটা ইউএমপি দিয়ে উড়িয়ে দেবে বিমান?'

'ওটাকে উড়িয়ে দিতে চাই না, ওখানে লাবনী আছে। রওনা হও!'

অ্যাক্সেলারেটর চাপতেই কর্কশ শব্দ তুলে একই জায়গায় ঘুরল

গাড়ির সবক'টা চাকা, পরক্ষণে ছিটকে রওনা হলো। 'ইয়াহু!' হুঙ্কার ছাড়ল ড্রেক। তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে প্রধান দরজা লক্ষ্য করে ছুটল গাড়ি। ওটা বেরোবে বলে এরই ভেতর খুলছে অটোমেটিক ডোর। 'ওই মেয়েকে বাঁচাতে টেকঅফের সময় লাফিয়ে উঠবে বিমানে?'

'প্রয়োজনে তা-ই করব!' ড্রেকের পিঠে ঝুলন্ত গিয়ার দেখেছে রানা। 'দাও তোমার গ্র্যাপলিং গানটা!'

'তুমি শালা আসলে পুরো পাগলই রয়ে গেছ!' আপত্তির সুরে বলল ড্রেক, কিন্তু যন্ত্রটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

পুরো দরজা খুলতে সময় লাগবে, কিন্তু এরই ভেতর তৈরি ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরোল নিচু ফেরারি। মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল ড্রেক। ফলে আহত জানোয়ারের মত জোরালো গর্জন ছাড়ল ইঞ্জিন। বুলেটের গতি তুলে ছুটল গাড়ি। 'দারুণ! দুর্দান্ত! আগে চালাবার সৌভাগ্য হয়নি!'

ইউএমপি পরীক্ষা করে দেখল রানা, তারপর চোখ রাখল পাহাড়ি, আঁকাবাঁকা পথে। সেটা আবার সোজা গিয়ে মিশেছে সেতুতে। তার আগে দুটো গ্র্যাণ্ড চেরোকি দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে মজবুত রোডব্লক। আরও কিছুটা দূরে সেতুর ওপর এক রুপালি বিএমডাব্লিউ এক্স-ফাইভ।

আঙুল তুলে দেখাল ড্রেক, দুই জিপের ওদিকে কুঁজো হয়ে অপেক্ষা করছে ডেনিয়েলসনের বেশ কয়েকজন গার্ড। 'বলতে খারাপই লাগছে, রানা, ফেরারি কিন্তু বুলেটপ্রুফ নয়!'

'জিপও বুলেটপ্রুফ না! ...রেডি তুমি?' শেষ বাঁক পেরিয়ে গেল এফ৪৩০ স্পাইডার।

'ইয়াপ্!' বামহাতে ইউএমপি তুলল ড্রেক, ডানহাতে স্টিয়ারিং হুইল। সোজা রাস্তায় পড়েই সরাসরি রোডব্লকের দিকে বিদ্যুদ্বেগে ছুটল গাড়ি।

গতি আরও বাড়ছে, একই সময়ে ডানের জিপের জানালা লক্ষ্য

করে গুলি করল রানা। গাড়ির পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে এসইউভি উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল ড্রেক। অস্ত্রের খালি কেসিং ঠুং-ঠাং শব্দে লাগছে উইণ্ডশিল্ডে।

ঝাঁক-ঝাঁক গুলির আঘাতে থরথর করে কাঁপছে দুই জিপ। বিস্ফোরিত হলো কাঁচ, ফুটো হতে লাগল ধাতব প্যানেল। এক লোককে পড়ে যেতে দেখল রানা। আশা করছে না যে গার্ডদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে। ওর উদ্দেশ্য অন্য। মাথা নিচু করে রাখুক তারা, সে-সুযোগে তাদেরকে পাশ কাটাবে ফেরারি।

'পেভমেন্টে ওঠো!' চিৎকার করল রানা।

'কী?'

'ফুটপাথ!' রাস্তা জুড়ে আছে দু'জিপ, কিন্তু ডানে পথচারীর জন্যে ফুটপাথ।

'আঁটবে না গাড়ি!'

'অত ভাবতে হবে না তোমাকে!'

আসলে ওদের আর কোনও উপায় নেই। সরাসরি দুই টনি আমেরিকান এসইউভির গায়ে গুঁতো লাগলে চুরমার হবে হালকা ইতালিয়ান স্পোর্টস্কার।

ডানে সরে ফুটপাথের দিকে ফেরারি নিয়ে গেল ড্রেক। জিপ থেকে গুলি করছে গার্ডরা। 'ক্লিক!' শব্দে থামল রানার অস্ত্র। 'ঠং-ঠং!' শব্দে এফ৪৩০-এর গায়ে বিঁধছে বুলেট। ঝড়ের গতিতে গার্ডদের পেরিয়ে গেল ফেরারি।

'যা-শ্শালা!' চিৎকার করল ড্রেক, 'আমরা আটকে যাব!'

বাঁকের কাছে গাড়ি পৌঁছুতেই শক্ত হয়ে বসল রানা। 'থেমো না!' বাড়ি লাগতেই ভেঙে পড়ল গাড়ির সামনের স্পয়লার, নিচু চাকাগুলো প্রচণ্ড জোরে দড়াম করে লাগল কংক্রিটে। ঝাঁকি এতই বেশি, রানার মনে হলো হাড়গোড় দিয়ে ভাঙা হয়েছে ওর মেরুদণ্ড।

রানার দিকে গাড়ি ঘেঁষে গেল সেতুর রেলিঙে। ওদিকে ড্রেকের

সামনের উইং লাগল জিপের গায়ে। পাতলা টিনের মত মুচড়ে গুটিয়ে গেল ধাতব হালকা অংশ। ছিঁড়ে পড়েছে দুই উইং মিরর। ঝরঝর করে রানা ও ড্রেকের কোলে নামল ভাঙা কাঁচ।

'মাথা নামাও!' সতর্ক করল রানা। তখনই আবারও রাস্তায় উঠে এল ড্রেক, সিটে কুঁজো হয়ে গেছে এক শ' বিশ বছর বয়সী বৃদ্ধের মত। একরাশ গুলি লাগল গাড়িতে। রানার মাথার মাত্র দুই ইঞ্চি দূরে বিঁধল একটা বুলেট।

আবারও তুমুল বেগ তুলছে ড্রেক, গতির কারণে সিটে গেঁথে গেল রানা। কয়েক সেকেণ্ডে অনেক পেছনে ফেলেছে জিপ।

'বাপ্ রে!' বিড়বিড় করল ড্রেক। জোর বাতাস কাটিয়ে চিৎকার করে রানাকে বলল, 'ঠিক গাড়ি বাছাই করেছ! এবার...'

চুরমার হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ড।

হোঁচট খেল ড্রেক। বুকের ক্ষত থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত। বডি আর্মারের ডানে, ওপরে দেখা দিয়েছে এবড়োখেবড়ো একটা ফুটো। অ্যাক্সেলারেটর থেকে পা সরে গেছে বলে কমে গেল ইঞ্জিনের গর্জন। দ্রুত কমে আসছে ফেরারির গতি।

খপ্ করে স্টিয়ারিং হুইল ধরে রানা আশা করল, সেতুর ওপর রাখা বিএমডাব্লিউতে গুঁতো দেবে না এফ৪৩০।

সামনের ওই গাড়ির পাশে একজনের হাতে চকচক করছে অস্ত্র। লোকটাকে চিনে ফেলল রানা।

অ্যালরিক জ্যাগার!

আর তার হাতের ওই অস্ত্র চিনতেও দেরি হলো না রানার।

ডেনিয়েলসনের সিকিউরিটি ফোর্সের চিফ এইমাত্র ওটা দিয়ে গুলি করেছে ড্রেককে।

তার হাতে ওর নিজের ওয়াইল্ডি।

লোকটার দিকে ইউএমপি তুলেই মনে পড়ল রানার, পাল্টে নিতে হবে ম্যাগাযিন। ওদিকে দীর্ঘ রুপালি ব্যারেল ওর দিকেই

ঘুরিয়েছে জ্যাগার। এবার অনায়াসেই খুন করবে তাকে!

স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়েই একলাফে দরজা পেরিয়ে ঝাঁপ দিল রানা। শুনল ওয়াইল্ডির বিকট গর্জন। এক সেকেণ্ড আগে সিটের যেখানে ছিল রানা, সেখানে তৈরি হলো মুঠো ভরে দেয়ার মত বড় এক গর্ত। সেতুর রাস্তায় পড়েই শরীর গড়িয়ে দিয়েছে রানা। শুনল আরেকটা গর্জন।

রানার পা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে এক চাকা অ্যাসফল্ট খুবলে তুলেছে ম্যাগনাম বুলেট। আবারও শরীর গড়িয়ে দিল ও। পিঠে জোর খোঁচা দিল গ্র্যাপলিং গান। শুরু হলো ধাতব মুড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ। সোজা গিয়ে বিএমডাব্লিউ-এর পাশে গুঁতো মেরে থেমে গেছে ফেব্রারি। ইঞ্জিন বন্ধ। আগেই লাফ দিয়ে গাড়ির আড়াল নিয়েছে জ্যাগার।

ওই একই সময়ে উঠে বিএমডাব্লিউ লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করেছে রানা। ওকে দেখে আবারও গুলি করল জ্যাগার। কিন্তু ডাইভ দিয়ে এক্স-ফাইভের পেছনে গিয়ে পড়ল রানা। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অস্ত্রের পুরনো ম্যাগাযিন ফেলে নতুনটা ভরতে।

কিন্তু তখনই টের পেল, কোথাও কোনও গড়বড় আছে!

নতুন ম্যাগাযিনের শেষমাথা মুচড়ে গেছে। রাস্তায় পড়ার পর ওরই ওজনে বারোটা বেজেছে জিনিসটার। ফিট হলো না ইউএমপির রিসিভারে।

অকেজো ম্যাগাযিন ফেলে দিল রানা। শত্রুকে শেষ করতে গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে আসছে জ্যাগার, হাতে ওয়াইল্ডি। এবার বাগে পেয়েছে সে রানাকে। এক গুলিতে...

দেরি না করে লোকটার গোড়ালি উচ্চতায় সাঁই করে ইউএমপির বাঁট চালাল রানা। গুলি ছুঁড়ল জার্মান, কিন্তু তার এক সেকেণ্ড আগে গোড়ালি ফেটে গেছে মারাত্মক আঘাতে। রানার থেকে কমপক্ষে তিনফুট দূর দিয়ে গেল ম্যাগনাম বুলেট। ভারসাম্য

হারিয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিতে চাইল জ্যাগার।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে গুঁতো দিল লোকটার বুকে। গার্ডরেইলে পিঠ দিয়ে পড়ল জার্মান। আরেক ধাক্কা দিয়ে তাকে সেতু থেকে ফেলতে চাইল রানা।

কিন্তু পেশিবহুল লোক অ্যালরিক জ্যাগার, শুধু গায়ের জোরে তাকে হারিয়ে দেবে রানা, তা প্রায় অসম্ভব। বুঝে গেছে, পড়েছে কী ধরনের বিপদে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে চাইল সে। কোনওভাবেই গার্ডরেইল টপকে পড়বে না। কাত হয়েই ওয়াইল্ডির বাঁট নামাল শত্রুর ঘাড়ে। তীব্র ব্যথায় রানার মনে হলো পাগল হয়ে গেছে। পরক্ষণে ওর মাথার পাশে লাগল জ্যাগারের বুট। ভারসাম্য হারিয়ে ধুপ করে সেতুর রাস্তায় পড়ল রানা। চোখের সামনে বনবন করে ঘুরছে সব। মুখ তুলে তাকাল।

ওর কপালে তাক করা হয়েছে ওয়াইল্ডি। এক সেকেণ্ড পর ওটার পেছনে দেখা দিল জ্যাগারের মুখ। দাঁত বের করে হাসছে জার্মান...

ভীষণ ব্যথার জন্যে তৈরি রানা। কুঁচকে গেছে চোখ-মুখ।

"বুম!"

কিন্তু ওয়াইল্ডি নয়, গর্জে উঠেছে অন্য অস্ত্র!

ওটা ড্রেকের ইউএমপি। অস্ত্রের ম্যাগাযিনের শেষ বুলেট রক্তাক্ত গর্ত তৈরি করেছে জ্যাগারের ডান কাঁধে। জার্মানের হাত থেকে ছুটে গেল ওয়াইল্ডি, হেলান দিল সে রেইলিঙে।

পড়ন্ত ওয়াইল্ডি খপ্ করে ধরে নল ঘুরিয়েই বলল রানা, 'অস্ত্রটা বোধহয় আমার।'

ওর গুলি ঢুকল জ্যাগারের ডান চোখে। চারপাশে ছিটিয়ে গেল চোখের অসংখ্য কণা। মগজে ঢুকে খুলির ওপরের অংশ উড়িয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। প্রচণ্ড আঘাতে পেছনে ঝাঁকি খেল জ্যাগারের মাথা, টপকে গেল সে রেলিং। এক শ' ফুটেরও বেশি নিচে তার

জন্যে অপেক্ষা করছে বরফ-ঠাণ্ডা পানি।

ব্যথাভরা মাথা চেপে ধরে টলতে টলতে ফেরারির পাশে পৌঁছুল রানা। গাড়ির দরজার ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে ড্রেক। ঠোঁটে রক্তাক্ত বুদ্বুদ। রানা ধারণা করেছিল মারাই গেছে সে। কিন্তু খুলে গেল একটা চোখ, রানাকে দেখল।

দুর্বল স্বরে বলল ড্রেক, 'ভালই হয়েছে, আমাকে মেরে ফেলোনি, তাই না, দোস্ত?' সোজা করে নিল দেহ, বসল সিটে। 'এসো, তোমাকে না বিমান ধরতে হবে?'

দরজা খুলে ড্রেককে প্যাসেঞ্জার সিটে বসাতে চাইল রানা, কিন্তু মাথা নাড়ল লোকটা। 'বাদ দাও, দোস্ত... আমি প্রায় শেষ... দেরি কোরো না, শত্রুরা আসছে।' পেছনের রাস্তা দেখল সে। এরই ভেতর ধাওয়া শুরু করেছে রোডব্লকের একটা জিপ। পেছনে করপোরেট দালানের দিক থেকে আসছে আরও সব গাড়ি। 'আমি ওদেরকে ঠেকিয়ে দেব... দেখো...'

'কী দিয়ে?'

করুণ হাসল হেণ্ড্রিক ড্রেক। 'আমাকে মাফ করে দিয়ো, দোস্ত... মাফ...' হাত তুলে এক চাকা সিএল-টোয়েন্টি তুলে দেখাল। 'টাইমার চালু করে দিয়েছি। সেতু পেরিয়ে যেতে পাবে আর বড়জোর বিশ সেকেণ্ড...' গায়ের শেষ জোরটুকু কাজে লাগিয়ে ফেরারি থেকে রানার পায়ের কাছে রাস্তায় পড়ল ড্রেক। 'শেষ পর্যন্ত লড়বে... দোস্ত...

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত,' কথা দিল রানা। এক সেকেণ্ড দেখল বন্ধুকে, তারপর ঝট্ করে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। ইঞ্জিন চালু করেই বিএমডাব্লিউ থেকে পিছিয়ে নিল গাড়ি, পরক্ষণে প্রথম গিয়ার ফেলেই টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর।

চার শ' তিরাশি হর্সপাওয়ার উড়িয়ে নিয়ে চলল গাড়িটাকে। ঘণ্টায় ষাট মাইল গতি ওঠার পর দ্বিতীয় গিয়ার ফেলল রানা। তীক্ষ্ণ

চিৎকার করছে ইঞ্জিন।

তৃতীয় গিয়ারে গতি হলো আশি মাইল। চকচকে ক্রোম গেট পেছনে ফেলল স্পোর্টস কার। রিয়ারভিউ মিররে রানা দেখল, ড্রেকের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে একটা জিপ। অন্যান্য গাড়িও উঠে পড়েছে সেতুর ওপর।

ঝড়ের গতি তুলে সেতুর শেষমাথায় পৌঁছে গেছে ফেরারি, কিন্তু ভাল করেই জানে রানা, হাতে সময় খুব সামান্য। এবার যে-কোনও সময়ে ফাটবে বোমা।

এক শ' মাইল বেগে চললেও আরও গতি তুলছে ফেরারির ইঞ্জিন। কিন্তু আরও কয়েক সেকেণ্ড লাগবে শক্ত জমিতে গাড়ি নামতে...

তখনই উজ্জ্বল আলোর ঝিলিকে আয়নায় হারিয়ে গেল পেছনের সব দৃশ্য। এক সেকেণ্ড পর এল বজ্রপাতের মত আওয়াজ। পরের মুহূর্তে আরম্ভ হলো নিচু, ভারী, ভয়ঙ্কর একটা গম্ভীর গর্জন।

তখনই হঠাৎ করেই সেতু হয়ে গেল ঢালু...

খসে পড়ছে সেতু!

ড্রেকের বোমা উড়িয়ে দিয়েছে সেতুর দুই খিলানের মাঝের অংশ, ফলে কাঠামোর দু'দিক নেমে যাচ্ছে নদী লক্ষ্য করে! অ্যাক্সেলারেটর টিপে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই রানার। মনে মনে আশা করল, সেতু ধসে যাওয়ার আগেই ফেরারি পৌঁছে যাবে কঠিন জমিতে।

খাড়া অংশ পাড়ি দিচ্ছে বলে দ্রুত কমছে গাড়ির গতি। রাস্তায় দেখা দিয়েছে একরাশ ফাটল। মাত্র এক মুহূর্ত পর কাত হয়ে গেল সেতু, খসে পড়ছে অনেক নিচের নদীতে!

কিন্তু সেতুর শেষাংশ পেরিয়ে খাঁড়ির শক্ত রাস্তায় পৌঁছে গেছে দ্রুতগতি ফেরারি। পেছনে মুহূর্তে হারিয়ে গেল সেতু। সাইলেন্সার

পাইপ ভেঙে পড়েছে বলে কর্কশ, জোরালো আওয়াজ তুলছে ইঞ্জিন, কিন্তু তুমুল বেগে চলছে গাড়ি। গতি কমাতে ব্রেক চাপল রানা। অ্যান্টিলক সিস্টেম কাজ করছে, ফলে সরসর করে একপাশে সরল ফেরারি। যে-কোনও সময়ে ফাটবে চাকা।

রানা বনবন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতেই পাক খেল গাড়ি, ছুটল একটু দূরের দেয়াল লক্ষ্য করে। ব্রেক প্যাডেল থেকে পা তুলে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরেই আবারও পা সরিয়ে নিল রানা। পরক্ষণে রাবার পুড়িয়ে এয়ারফিল্ডের দেয়াল থেকে একফুট দূরে থামল ফেরারি। অ্যাসিডের মত ঝাঁঝাল ধোঁয়া ঘিরে ধরেছে রানাকে। খুক-খুক করে কাশতে লাগল ও। চোখ পড়ল সেতুর দিকে। ওখানের বাতাসে ভাসছে শুধু ধুলোবালি। সেতুসহ নদীতে পড়ে মারা পড়েছে ডেনিয়েলসনের সিকিউরিটি ফোর্স। ওর পিছু নেবে না আর কেউ।

হেণ্ড্রিক ড্রেকের কথা মনে পড়তেই খচ্ করে বুকে খোঁচা খেল রানা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল, তারপর ঘুরে তাকাল রানওয়ের দিকে। কালো টিলার পটভূমিতে দেখা গেল সাদা এ-থ্রিএইটি এয়ারবাস। যে কোনও সময়ে ঘুরে দৌড় লাগাবে ওটা।

মার খাওয়া ফেরারির গিয়ার ফেলল রানা, নতুন করে চাকার রাবার পুড়িয়ে কর্কশ আওয়াজে রওনা হয়ে গেল রানওয়ে লক্ষ্য করে।

ত্রিশ

ট্যাক্সিওয়েরের শেষে এসে আরও ধীর হলো এ-থ্রিএইটি-র গতি, আধ পাক ঘুরে স্থির হলো— সামনে এখন পুরো আড়াই মাইল দীর্ঘ রানওয়ে।

বিমানের ওপর চোখ রেখে ফেরারি গাড়ির মেঝেতে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরেছে রানা, উঁচু গিয়ার পড়ছে বলে বাড়ছে গতি। তীব্র বেগ হাওয়ায় সরু হয়ে গেছে রানার চোখ। দরদর করে বেরোচ্ছে জল। আপাতত কিছুই করতে হবে না ওকে, স্রেফ এগোতে হবে সোজা পথে।

এ-থ্রিএইটি বিমান সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না রানা। ট্রেনিং নেয়নি সময়ের অভাবে। ওই মালবাহী বিমানের লেআউটও জানা নেই। একবার উঠতে পারলে দেখবে কী করা যায়।

প্রথম কাজ বিশাল ওই এয়ারক্রাফটে ওঠা। সে-তুলনায় সামান্য পিঁপড়ে ওর ফেরারি। চাইলেও ঠেকাতে পারবে না বিমানের টেকঅফ। সে-চেষ্টাও করবে না রানা। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে গুলি ছুঁড়বে না বিমান লক্ষ্য করে। এয়ারক্রাফটে আগুন ধরলে বা কোনও কারণে ক্র্যাশ হলেও খুন হবে লাবনী।

অবশ্য, ভাইরাস ঠেকাতে গিয়ে হয়তো ধ্বংস করতে হবে উড়ন্ত বিমান। সেক্ষেত্রে ওর নিজের বাঁচার সম্ভাবনাও খুব কম।

আপাতত এক শ' পঞ্চাশ মাইল গতি তুলে ছুটছে ফেরারি। চোখভরা পানির কারণে স্পিডোমিটার দেখছে না রানা। সামনে

আবছা সাদা রেখা, ওটা এ-থ্রিএইটি বিমান। এক্ষুণি রওনা হবে।
হাতে সময় নেই, যা করার করতে হবে খুব দ্রুত।

'মিস ডেনিয়েলসন!' ইন্টারকমে শোনা গেল পাইলটের কণ্ঠ: 'রানওয়েতে গাড়ি!'

পোর্টসাইডের জানালা দিয়ে উঁকি দিল সেসিলি। 'আরে!'

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে জানালা দেখল লাবনী। বহু দূরে গেছে রানওয়ে। আর বিমানের পেছন পেছন ছুটে আসছে কমলা এক ফেরারি কনভার্টিবল! প্রচণ্ড গতি ওটার।

একমাত্র আরোহীকে দেখল লাবনী। খুব চেনা মনে হলো। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'আরে, আশ্চর্য! মাসুদ রানা!'

চমকে গেছে সেসিলিও। চলে গেল ইন্টারকমের কাছে। 'মিস ডেনিয়েলসন বলছি। যাই ঘটুক, দেরি না করে টেকঅফ করবেন। ওই লোক যা খুশি করুক, আকাশে তুলতে হবে বিমান, এটা আমার নির্দেশ।' আবারও জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল সেসিলি। 'কী করছে লোকটা?'

'বিমান ঠেকাতে চাইছে,' বলল লাবনী।

দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল সেসিলির চোয়াল। 'পারবে না।' সিঁড়ির সামনে গিয়ে গলা উঁচু করে নির্দেশ দিল, 'আপনারা অস্ত্র হাতে নিন, হ্যাচ খুলুন! আমাদের টেকঅফ ঠেকাতে চাইছে এক লোক, তাকে...'

লাবনী দেখেছে, ওর দিকে পিঠ দিয়ে আছে সেসিলি, আলতো হাতে ধরেছে সিঁড়ির হ্যাণ্ডরেইল।

কী করা উচিত পুরো বুঝলও না লাবনী, অন্তরে তাগিদ আসতেই দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে জোর ধাক্কা দিল সেসিলির পিঠে।

সতর্ক হওয়ার সময় পেল না সেসিলি, পিছলে গিয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল নিচের ডেকে। তার আগে ঠাস্ করে মাথা ঠুকে

গেছে ধাতব সিঁড়ির ধাপে। কপাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে তার। হতভম্ব হয়ে গেছে একেবারে।

প্রায় অবাক চোখে সেসিলিকে দেখল লাবনী। যেন বুঝতেও পারছে না কী করেছে। দু'সেকেণ্ড পর কেটে গেল বিস্ময়। ভাবল: লড়ব, না পালাব?

পালাও, লাবনী!

কেবিনের পেছনের দরজার দিকে ছুট লাগাল মেয়েটা। মনে মনে প্রার্থনা করল, যেন খোলা থাকে দরজার তালা।

সহজেই দরজা খুলে গেল। ওদিকে ঢুকে লাবনী দেখল, এদিকটা ওপরের হোল্ড। সুড়ঙ্গ বা ধাতব পাঁজরের মত দেখতে, একদিকে সারি দিয়ে রাখা কার্গো কন্টেইনার। চারপাশে আবছা আলো ফেলেছে ছাতের সাদা লেড বাতি।

দরজায় কোনও লক নেই, চট্ করে চারপাশ দেখল লাবনী। এমন কিছু চাই, যেটা দিয়ে আটকে দেবে দরজা।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে মেঝে ও দেয়ালের সঙ্গে পুরু স্ট্র্যাপে বাঁধা সবচেয়ে কাছের কন্টেইনার। যেটাকে রিলিয লিভার বলে মনে হলো লাবনীর, দেরি না করে হ্যাঁচকা টান দিল ওটাতে। জোরালো 'ক্ল্যাঙ্ক!' শব্দে খুলে গেল স্ট্র্যাপ। ওটার একটা অংশ দেয়ালের স্পার-এ পেঁচিয়ে নিল ও, অন্য অংশ দরজার হ্যাণ্ডেলে। শক্ত করে বেঁধে দিল, ফলে দরজা খোলা ঠেকাতে পারবে না, কিন্তু সরু জায়গা দিয়ে ঢোকা হবে কঠিন।

পিছিয়ে এসে হোল্ডে চোখ বোলাল লাবনী।

কোথায় ভাইরাস...

উড়ন্ত বিমান থেকে ভাইরাস ফেলতে চাইলে, এমন কোনও কন্টেইনার চাই, যেটা থাকবে এয়ারবাসের গায়ের কাছে। একবার ওই কন্টেইনার খুঁজে পেলে হয়তো কোনওভাবে ওটাকে স্যাবোটাজ করতে পারবে লাবনী।

কেবিনের ওদিক থেকে এল জোরালো পদশব্দ। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে কেউ।

হোল্ড ধরে সামনে ছুটল লাবনী।

নড়ে উঠেছে এয়ারবাস এ-থ্রিএইটি. এদিকে ফেরারি নিয়ে রানওয়ের শেষমাথায় পৌঁছে গেছে রানা। চোখ থেকে দরদর করে ঝরছে জল। হাত দিয়ে মুছে নিল। ভালভাবে দেখতে হবে বিমান। ওই যে, ফিউজেলাজের নিচে পাঁচ আণ্ডারক্যারেজ পা বা স্ট্রাট। নাকে একটা, অন্য চারটা ছড়িয়ে আছে মস্ত বিমানের ওজন নেয়ার জন্যে।

রানা জানে, বিমানের পেটে গুটিয়ে উঠছে আণ্ডারক্যারেজ, এমনসময় উঠতে হবে ল্যাণ্ডিং কোনও স্ট্রাটে। এরপরের কাজ অ্যাক্সেস হ্যাচ পেরিয়ে ফিউজেলাজে ঢুকে পড়া।

ওই ঝুঁকি নিতেই হবে। আর সেক্ষেত্রে কাজটা করতে হবে এখনই। গতি তুলছে এ-থ্রিএইটি এয়ারবাসের চার ইঞ্জিন।

গাড়ি রানওয়ের একপাশে সরে যেতেই কর্কশ আওয়াজ তুলল ফেরারির চাকা। বিমান থেকে সরে গেলে চলবে না। গতি না কমিয়ে যেতে হবে এয়ারক্রাফটের পেটের নিচে।

পাশেই প্যাসেঞ্জার সিটে গ্যাটলিং গান রেখেছে রানা। বুঝে গেছে, মাত্র একবারই সুযোগ পাবে লক্ষ্যভেদ করার। ভুল হলে বিমানের ইঞ্জিন থেকে আসা তাপে ফেরারি সহ পুড়ে ছাই হবে। আর কোনওভাবে বেঁচে গেলেও মরবে ডেনিয়েলসনের লোক বা ভাইরাসের হামলায়।

বুঝতে পারছে রানা, সফল হলেও বোধহয় মরতে হবে ওকে বিমান দুর্ঘটনায়। তাই বলে গুটিয়ে নেবে হাত?

বাম ডানার ইঞ্জিনের পেছনে আসতেই পুড়ে যেতে চাইল ওর মুখ। প্রচণ্ডগতি হাওয়ায় বাঁক নিতে চাইছে হালকা ফেরারি। বাধ্য

হয়ে অ্যাক্সেলারেটরে চাপ কমাল রানা। এখন কোনও ভুল হলে নতুন করে ধরতে পারবে না ছুটন্ত বিমানকে।

এয়ারক্রাফটের নাকের কাছে হ্যাচ খুলে যেতেই অস্ত্র হাতে ঝুঁকল ডেনিয়েলসনের লোক, খতম করবে রানাকে।

ফিউজেলাজের সরাসরি পেছনে এসে গাড়ি সোজা করে নিল রানা। এ-থ্রিএইটি-র পেটের দু'জোড়া ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট লক্ষ্য করে তাক করেছে ফেরারির নাক।

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল প্রকাণ্ড সব ইঞ্জিনের হুঙ্কার, অনেক বেশি গতি পাওয়ার জন্যে ছুট দিয়েছে এয়ারক্রাফট।

বিশাল বিমান হলেও অল্প রানওয়ে ব্যবহার করে আকাশে উঠতে পারে এয়ারবাস। জ্বলন্ত বাতাসের ঝটকা খেয়ে রানার মনে হলো, ফেরারিসহ পড়েছে মারাত্মক হারিকেনের মধ্যে। বিমানের লেজের তলা দিয়ে ছুটে চলেছে স্পোর্টস কার। চোখের সামনে শুধু মস্ত ফিউজেলাজ। যে-কোনও সময়ে আকাশে ওঠার আগে হাতুড়ির মত নেমে চ্যাপ্টা করবে রানা সহ গাড়িটাকে।

পেছনের আণ্ডারক্যারেজ স্ট্রাটের মাঝে আছে রানা। এখনও গতি বিমানের চেয়ে বেশি। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর...

খপ্ করে ম্যাগহুক তুলে নিল রানা। সরাসরি সামনে ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট। মেঝেতে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল ও। বিমানের সঙ্গে একই গতি চাই ওর। সামান্য বাঁক নিয়ে চলে এল বাম স্ট্রাটের খুবই কাছে। দুর্দান্ত গতি তুলে চারটে দানবীয় চাকা ঘুরছে বলে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে চোখে।

মাত্র একবার সুযোগ...

ফেরারি থেকে মাত্র একফুট দূরে বিমানের চাকা।

গতি আরও বাড়িয়ে এগোচ্ছে এয়ারবাস। আণ্ডারক্যারেজের গর্তে ম্যাগহুক তাক করল রানা

সুযোগ মাত্র একবার...

রানা ফায়ার করতেই ছিটকে গেল গ্র্যাপলিং হুক, পেছনে কেবল। চাকার পাশ কাটিয়ে বিমানের ভেতরের দেয়ালে গিয়ে লাগল হুক। এখন যদি খসে পড়ে...

না, ধাতব বাল্‌ক্‌হেড ফুটো করে আটকে গেছে ভালভাবেই!

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ওটার সাহায্য চাই রানার। সুইচ টিপে টেনে নিল কেবল। স্টিয়ারিং হুইলের মাঝে বার কয়েক ঘুরিয়ে নিল ম্যাগহুকের হাতল। স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনে থেকে এল এক শ' মাইলেরও বেশি বেগের বাতাস। শক্ত করে ধরেছে কেবল।

আণ্ডারক্যারেজের নিচে বাঁক নিয়ে সরতে চাইল গাড়ি।

দরজা পেরিয়ে কেবল ধরে সামনে রওনা হলো রানা। বিমানের চাকা থেকে ছিটকে উঠছে ধুলোবালি, ছিটকে লাগছে ওর মুখে। মাত্র কয়েক ফুট যেতে হবে। কিন্তু এরই ভেতর টানটান হয়ে উঠেছে কেবল। খুলে এলে মরবে রানা।

ওর বুটের সোল ঘষে গেল রানওয়ে, আরেকটু হলে পড়ে যেত ও। এত শক্ত করে ধরেছে কেবল, কেটে বসল আঙুলের মাংসে। দরদর করে বেরোচ্ছে রক্ত।

ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট আর মাত্র একফুট দূরে। আরেকবার এগোতে পারলে উঠে যেতে পারবে আণ্ডারক্যারেজে।

চাবুকের মত শপাং করে ঝটকা দিল কেবল। একপাশে ছেঁচড়ে সরে গেছে ফেরারি। ওটা যেন বিমানের পেছনে আটকে রাখা ছোট কোনও খেলনা। কেবলের ঝাঁকি বুঝে চমকে গেল রানা। খুলে আসছে গ্র্যাপনেল হুক!

ঝটকা দিয়ে সামনে বেড়ে ল্যাণ্ডিং স্ট্রাটে উঠে পড়তে চাইল ও। রক্তাক্ত দু'হাতে ধরে ফেলল ধাতব দণ্ড, ওই একই সময়ে 'শটাং!' শব্দে ছিঁড়ে গেল কেবল।

ছাড়া পেয়ে গেছে ফেরারি, চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে সরে

যেতে লাগল বিমানের তলা থেকে। রানার নাকের সামনে দিয়ে ছিটকে গেল প্রচণ্ড গতি ম্যাগনেটিক হুক। এত ভয় পেয়েছে, দু' সেকেণ্ড থমকে গেল রানা। অবাক হয়ে দেখল, এয়ারবাসের নিচে পিষে গেল ফেরারি, নানাদিকে ছিটকে গেল ধ্বংসাবশেষের হাজারো টুকরো।

গাড়ি বিধ্বস্ত হতে থরথর করে কাঁপল প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট। শক্ত হাতে দণ্ড ধরে ব্যস্ত হয়ে পা রাখার জায়গা খুঁজল রানা। গলা শুকিয়ে গেছে এফ৪৩০ ফেরারির পরিণতি দেখে।

নিচে পোক্ত ধাতব প্লেট পেয়ে এক সেকেণ্ড পর নিজেকে বিমানের পেটে টেনে তুলল রানা। ওর ধারণা ভুল না হলে, ভেতরে থাকবে কোনও অ্যাক্সেস হ্যাচ। এর এদিক ওদিক হলে আণ্ডারক্যারেজ বিমানে উঠে এলেই চিঁড়ে-চ্যাপটা হবে ও।

মুখ তুলে ধাতব দেয়াল ছাড়া কিছুই দেখল না রানা। আছে একরাশ কেবল আর হাইড্রলিক লাইন!

দরজা বা হ্যাচ কই?

সর্বনাশ!

রানওয়ে ত্যাগ করে এয়ারবাস আকাশে ভেসে উঠতেই কান ফাটানো আওয়াজ ছাড়ল চার ইঞ্জিন। ভাঁজ হয়ে হুইল ওয়েল্-এ উঠে আসতে লাগল ল্যাণ্ডিং গিয়ার। প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে ছাতের দিকে উঠছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিউজেলাজের ধাতব পাঁজর ঘ্যাচ করে দু'টুকরো করবে ওর দেহ, কিন্তু...

পাশেই একটা হ্যাচ!

অ্যাক্সেস প্যানেলটা বড়জোর দু'ফুট চওড়া। ঝুলছে ছোট্ট হ্যাণ্ডেল। ওই হ্যাণ্ডেল খপ্ করে ধরে টান দিল রানা।

খুলল না হ্যাচ।

একেবারে নতুন বলেই আড়ষ্ট, অথবা ওটা লক করা। রানার মনে হলো, তালা দিয়ে হ্যাচ বন্ধ নয়। গায়ের জোরে হ্যাণ্ডেলে

মোচড় দিল ও, আর তখনই খুলে গেল হ্যাচ। সরু ফাটল দিয়ে বেজির মত ঢুকে পড়ল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ধুম্ আওয়াজ তুলে ওর পেছনে জায়গামত বসল আণ্ডারক্যারেজ। চাকাসহ স্ট্রাটের মাত্র তিন ইঞ্চি ওপরে সিলিং!

বাইরের দরজা বুজে যেতে প্রায় অন্ধকার হয়েছে চারপাশ। ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে গিয়ে মনে হচ্ছে ভোঁতা একটা গর্জনের মত। চারপাশ দেখে নিল রানা। প্রায় হামাগুড়ি দিতে হবে এমন এক জায়গায় আছে। ছাত মাত্র চার ফুট ওপরে। ওখানে জ্বলছে উজ্জ্বল সাদা লেড বাতি। দেয়ালে অসংখ্য কেবল। সব গেছে বিমানের পেটের দিকে।

হ্যাচ বন্ধ করে কেবল অনুসরণ করে চলল রানা।

এবার পথ খুঁজে ঢুকতে হবে হোল্ডে।

হোল্ড ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় পেছনের দরজায় ধুম্-ধুম্ আওয়াজ পেল লাবনী।

ওর জানা নেই, হোল্ড ভরা এসব কন্টেইনারের ভেতর কী। কিন্তু খেয়াল করল, ওগুলোর একটাও প্লেনের বডির সঙ্গে যুক্ত নয়, পুরু সব স্ট্র্যাপ দিয়ে বিমানের দেয়ালে আটকে রাখা হয়েছে। খাড়া হয়ে উঠছে এ-থ্রিএইটি, তাল সামলাবার জন্য স্ট্র্যাপ ধরে ধরে এয়ারক্রাফটের পেছনের দিকে চলেছে লাবনী।

আগের চেয়ে জোরে পড়ছে দরজায় ধাক্কা।

হাতে সময় নেই। আরও দুটো হোল্ড খুঁজে দেখলে ভাইরাসের কন্টেইনার পাওয়া যেতে পারে।

আরেকটা হ্যাচ খুলে বেজির খাঁচার মত জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। আছে সামনের নিচের হোল্ডে। আণ্ডারক্যারেজের কারণে দু'ভাগ হয়েছে এ-থ্রিএইটি-র নিচের ডেক। পেছনে না গিয়ে সামনে

বাড়ল রানা। ওদিক দিয়ে হয়তো পৌঁছুতে পারবে ককপিটে। সেক্ষেত্রে হয়তো পাইলটদের হুমকি দিয়ে বিমান নামানো যাবে নিরাপদ কোনও এয়ারপোর্টে।

কিন্তু পেছনের ডেকে ভাইরাস রয়ে গেলে, হয়তো রিলিযের আগে বুঝবেও না।

হোল্ড পুরো ভরা। অ্যালিউমিনিয়াম কন্টেইনারের মাঝ দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ওপর দিয়ে যে যাবে, তা-ও প্রায় অসম্ভব। মাত্র একফুট ওপরে বিমানের ছাত।

সবচেয়ে কাছের কন্টেইনারের ছাতে উঠে পেটে ভর দিয়ে ক্রল শুরু করল রানা।

দরজা ও চৌকাঠের মাঝের সামান্য ফাঁক দিয়ে ঢুকল সেসিলি, হ্যাণ্ডেলে বাঁধা স্ট্র্যাপের তলা দিয়ে পেরিয়ে পা রাখল হোল্ডে। চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে দূরে দেখল নড়াচড়া। নিচের ঠোঁট থেকে রক্ত মুছল। আঙুলে লাল দাগ দেখে বিড়বিড় করে বলল, 'লাবনী, তোমার উচিত হয়নি এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া।'

পিস্তল উঁচিয়ে লাবনীর পেছনে চলল সেসিলি।

হোল্ডের সামনে দরজা, সতর্ক ভঙ্গিতে গিয়ে ওটা খুলল রানা। ওদিকে ক্যাটারিং কার্ট আকারের এক কার্গো লিফ্ট। পাশেই ওপরে ওঠার মই।

ধাপ বেয়ে উঠে ছোট এক ইউটিলিটি রুমে পৌঁছে গেল রানা। চারপাশে চেপে আসা সব লকার। লেবেল্স বোঝার সাধ্যি নেই, নরওয়েজিয়ান ভাষা। লকারে বোধহয় আছে নানান জরুরি ইকুইপমেন্ট। ওয়াইল্ডি হাতে ওদিকের দরজার সামনে থামল। কবাট ফাঁক করে সাবধানে উঁকি দিল।

কেউ নেই ওপাশে। বিমানের ককপিটের কাছে পৌঁছে গেছে

ও। এই ঘর কোনও ক্রু এরিয়া, পেছন দেয়ালে দরজার পাশে কয়েক সারি সিট। খোলা দরজা দিয়ে মেইন হোল্ড দেখল রানা। ওদিকে আরেকটা দরজা। তার ওপাশেই ককপিট।

ইউটিলিটি রুম থেকে বেরিয়ে উদ্যত ওয়াইল্ডি হাতে এগোল রানা। বামে সরু সিঁড়ি উঠেছে ওপরের ডেকে। ওদিকে কেউ নেই। রানার মনে পড়ল ডেনিয়েলসনের কথা। ক্রুজিং অলটিচ্যুডে পৌছলেই এয়ারবাস থেকে ফেলা হবে ভাইরাস। এখনও ওপরে উঠছে বিমান, কিন্তু পনেরো হাজার ফুট উঠতে বেশিক্ষণ লাগবে না। এখন প্রথম কাজ হওয়া উচিত...

বিনা দ্বিধায় ককপিটের দরজায় পৌছে গেল রানা; হ্যাণ্ডেল টেনে খুলেই তাক করল ওয়াইল্ডি।

ঘুরে চেয়েছে কো-পাইলট। হয়তো ভেবেছিল কোনও ক্রু। এক সেকেণ্ড পর নরওয়েজিয়ান ভাষায় পাইলটের উদ্দেশে ঘেউ করে উঠল সে।

সিটে শরীর মুচড়ে কী যেন ধরতে গেল পাইলট।

পিস্তল!

সংকীর্ণ, বদ্ধ ককপিটে কামানের মত বিকট আওয়াজ তুলল রানার ওয়াইল্ডি। পাইলটের সিটের পিঠ ফুটো করে লোকটাকে ভেদ করে সামনের মনিটরে গাঁথল ম্যাগনাম বুলেট। ইন্সট্রুমেন্টগুলোর ওপর ছিটিয়ে পড়ল তাজা রক্ত।

হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পাইলট, মৃত। হাত থেকে খসে গেছে কন্ট্রোল স্টিক। বিমান ভীষণ কাত হতেই ককপিটের দেয়ালে আছড়ে পড়ল রানা। নিজেকে সামলে চোখ তুলে দেখল, বিমান স্থির না করেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কো-পাইলট। ঝট্ করে অস্ত্রটা তুলেই রানার দিকে তাক করতে গেল সে।

আবারও গর্জন ছাড়ল রানার ওয়াইল্ডি।

লাবনীকে ধরতে মেইন হোল্ড লক্ষ্য করে চলেছে দুই সিকিউরিটি গার্ড, এমন সময় শুনল গুলির আওয়াজ। আর তখনই কাত হয়ে গেল এয়ারবাস। তাদের বুঝতে দেরি হলো না, দেখা দিয়েছে মস্ত কোনও সমস্যা। দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ হওয়ার আগেই দৌড় দিল তারা ককপিট লক্ষ্য করে।

বড় একটা কন্টেইনারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ব্যথা পেয়েছে লাবনী, কাতরে উঠল। চট্ করে একটা স্ট্র্যাপ ধরে সিধে করে নিল নিজেকে। পুরো নিশ্চিত, গুলির আওয়াজ শুনেছে ও। আর তখনই কাত হয়ে গেছে বিমান।

ওই গুলির আওয়াজ রানার অস্ত্রের।

ফিসফিস করল লাবনী, 'রানা!'

বিশ্বাস হচ্ছে না ওর, বিমানে উঠে পড়েছে রানা?

আবারও ঝাঁকি খেল বিমান।

রানা সত্যিই উঠে এলে ও-ই করছে এসব...

দুই পাইলটের লাশের মাঝে কোনওমতে ঠাঁই করে নিয়েছে রানা, দেখল এত বড় বিমানের জন্যে কোম্পানি তৈরি করেছে ছোটদের জয়স্টিকের মত স্টিক। ওটা ধরে নাড়তেই সোজা হলো বিমান। আগে কখনও পাঁচ শ' টন ওজনের এ-থ্রিএইটি এয়ারবাস চালায়নি। চোখ বোলাল কন্ট্রোল প্যানেলে। সব শিখতে চাইলে লাগবে দিনের পর দিন ট্রেনিং। তার ওপর সব কিছুর নিচে নরওয়েজিয়ান ভাষা লেখা! চোখ পড়ল আর্টিফিশাল হরাইযনের ওপর। এখনও ওপরে উঠছে বিমান।

ব্যস্ত হয়ে অটোপাইলট বাটন বা সুইচ খুঁজল রানা।

ওই যে কন্ট্রোল প্যানেলের ওপরের দিকে!

বড় সুইচটা দাবিয়ে দিল ও। কন্ট্রোল স্টিক ছাড়ার আগেই মিষ্টি, সিন্থেটিক এক মহিলাকণ্ঠ জানাল: চালু করা হয়েছে অটোপাইলট।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে সমতল হলো ডেক। আল্টিমিটার খুঁজল রানা। বারো হাজার ফুট ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে এ-থ্রিএইটি এয়ারবাস। আরও তিন হাজার ফুট উঠলেই ছেড়ে দেয়া হবে ভাইরাস। দুশ্চিন্তা এল মনে: ভাইরাস রিলিযের জন্যে কোনও টাইমার নেই তো?

এ-থ্রিএইটি বিমান সিধে হতেই উঠে দাঁড়াল সেসিলি ডেনিয়েলসন। ককপিটে বিকট দুই আওয়াজ বলে দিয়েছে, সম্ভবত খুন হয়ে গেছে দুই পাইলট। তাদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী মাসুদ রানা।

মাসুদ রানা!

লোকটা কীভাবে উঠল বিমানে?

এখন এসব ভেবে লাভ নেই। আসল কথা, ওই লোক ওদের মিশনের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সে কি লাবনীর চেয়েও ঝুঁকিপূর্ণ? দুই বিপদের ওজন বুঝতে চাইছে সেসিলি। মাঝের ডেকের পেছনে একটা কন্টেইনারের ভেতর ভাইরাসের সব ক্যানিস্টার। কন্টেইনারের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়েছে একটা পাইপ। ওটার মাধ্যমেই বিমানের লেজ থেকে জেটস্ট্রিমে ছড়িয়ে দেয়া হবে মৃত্যু সলিউশন। লাবনী একবার ওই কন্টেইনার খুলতে পারলে হয়তো নষ্ট করবে রিলিয মেকানিযম।

কিন্তু সেক্ষেত্রে আগে পেতে হবে কন্টেইনার, পরের কথা ওটা খোলা। ওদিকে ককপিটে মাসুদ রানা। মস্ত বিপদ আসবে তার তরফ থেকেই।

শেষবারের মত পলায়নরত লাবনীকে দেখে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সেসিলি।

ওপরের হোল্ডের পেছনে পৌঁছে গেছে লাবনী। এদিকের কোনও কণ্টেইনারে এমন কোনও সাইন নেই, মনে হবে ওটা বিমানের বাইরে ছড়িয়ে দেবে ভাইরাস।

তার মানে, ভাইরাস আছে অন্য কোনও ডেকে।

ভয়ে কাঁপতে লাগল লাবনীর গা। ফিরতে হবে হোল্ডের সামনের দিকে। ওখানে আছে শত্রুপক্ষের কেউ। কিন্তু পেছনের বাল্‌ক্‌হেড-এ একটা হ্যাচ দেখে নতুন করে স্বস্তি পেল ও। হ্যাচ খুলে ছোট এক কম্পার্টমেন্টে পা রাখল। ছাত খুব নিচু। কোনও অ্যাক্সেস এরিয়া। দেয়ালে বড় সব ফিউজবক্স। ওগুলো থেকে দেয়াল বেয়ে গেছে পুরু রাবারে মোড়া সব তার।

মেঝেতে আরেকটা হ্যাচ।

ঝুঁকে ওটা খুলল লাবনী। নিচের হোল্ডে ধাতব কণ্টেইনার। সামনের প্যালেটে স্ট্র্যাপ-দিয়ে-বাঁধা চকচকে মোটরবাইকটা চিনল লাবনী। ওই মোটর সাইকেলের জন্যে খুব গর্বিত সেসিলি।

মাঝের হোল্ডে নেমে এল ও।

অটোপাইলট চালু হতেই কণ্ট্রোল প্যানেল থেকে পিছিয়ে এসেছে রানা। আপাতত কিছুক্ষণ সময় পাবে। ভাবছে, দুই পাইলট তো খুন হয়ে গেল, কীভাবে মাটিতে নামাবে এই দানব?

পেছনে পদশব্দ শুনে রানা সরে যেতেই ওর মাথার পাশ দিয়ে গেল বুলেট, লাগল ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। ককপিটের দরজা দিয়ে দেখল ও, পেছনের বালকহেডের আড়াল নিয়েছে এক লোক। বোধহয় আশা করছে তাকে কাভার দেবে তার সঙ্গী, আর সে সুযোগে সামনে বেড়ে শত্রুর সর্বনাশ করবে সে।

শত্রুকে দ্বিতীয় গুলির সুযোগ না দিয়েই ওয়াইল্ডি তুলে পাল্টা জবাব দিল রানা, বালকহেড ফুটো করে পাতলা দেয়ালের পাশে

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার মগজে বিধল ম্যাগনাম বুলেট। কেবিনে ছড়িয়ে গেল রক্ত। একমুহূর্ত পর মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ল লাশ।

একজন বিদায় নিল, ভাবল রানা। কিন্তু বাইরে আছে আরেকজন।

একঝাঁক গুলি ঢুকল ককপিটে। চারপাশে উড়াল দিল ভাঙা প্লাস্টিক ও ফাইবারবোর্ড। রানার মত একই কাজ করছে লোকটা, বালকহেডের ওদিক থেকে পাঠাচ্ছে গুলি। মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা, একটার পর একটা গুলি বিঁধছে ককপিটের দেয়াল ও ওপরের সাইড প্যানেলে।

রানা দেখেছে কেবিনের মেঝেতে মৃত লোকটার পিস্তল। ওটা সিগ-সাওয়ার পি২২৬। ওর ধারণা হলো, মৃত গার্ডের সঙ্গীর কাছেও আছে একই পিস্তল। ওটার ম্যাগাযিনে আঁটে পনেরোটা বুলেট। এরই ভেতর খরচ করেছে তেরোটা। তার মানে...

পর পর আরও দুটো গুলি ঢুকল ককপিটে।

রানার গুনতে ভুল হয়ে থাকলে খুন হবে। এক ঝটকায় শরীর গড়িয়ে দিয়েই লাফিয়ে উঠে ককপিটের দরজার সামনে হাজির হলো ও। ভুল হয়নি। ব্যস্ত হয়ে পিস্তলে নতুন ম্যাগাযিন ভরতে চাইছে লোকটা।

'বুম!' শব্দে বুলেট উগলে দিল ওয়াইল্ডি। বুকে গুলি নিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পেছনের কম্পার্টমেন্টে গিয়ে পড়ল লাশ।

এক দৌড়ে ককপিট ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, লাথি মেরে সরিয়ে দিল দুই গার্ডের অস্ত্র। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে বুঝে নিল, বেঁচে নেই লোকগুলো।

আরও কোনও ক্রু না থাকলে, বিমানে রয়ে গেছে শত্রুপক্ষ বলতে শুধু সেসিলি ডেনিয়েলসন।

এবার ওই মেয়েকে কাবু করতে পারলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবে ও। অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারবে লাবনীকে। ঠেকাবে

ভাইরাসের রিলিয।

আর তারপর?

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

এসব বিমান মাটিতে নামার পর আড়াইতলা ওপর থেকে রাবারের নরম, ঢালু পথ ফেলে দেয়া হয় যাত্রীদের জন্যে। কিন্তু আগে তো নামাতে হবে বিমান? ওর কাছে কোনও প্যারাশুটও নেই। হুম্, কীভাবে এই বিমান থেকে জান নিয়ে নামবে, সেটা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ!

গুলির আওয়াজ শুনে মোটর সাইকেলের পাশে লুকিয়ে পড়েছে লাবনী। ভীষণ ভয় লাগছে। যে-কোনও সময়ে গুলি করতে করতে ওর ঘাড়ের কাছে হাজির হবে শয়তান লোকগুলো!

না, তা বোধহয় হবে না! শেষ গুলি করেছে রানা। ওর অস্ত্রের আওয়াজ চেনে ও। কপাল ভাল হলে, এতক্ষণে মরে গেছে শত্রুরা।

'রানা?' গলা উঁচু করে ডাকল লাবনী। 'রানা?'

হোল্ড থেকে মহিলা কণ্ঠ শুনেছে রানা। ওর নাম ধরে ডেকেছে।

কিন্তু সে কি লাবনী, না সেসিলি? ইঞ্জিনের আওয়াজের ওপর দিয়ে বুঝতে পারেনি মেয়েটা কে। খুব সাবধানে দরজার পাশে পৌঁছল রানা। শীতল আলোয় উঁকি দিয়ে দেখল, ওদিকে একের পর এক কন্টেইনার। 'লাবনী? তুমি?'

হোল্ডের পেছনে উঠে দাঁড়াল কালো চুলের কেউ। 'হ্যাঁ, আমি।'

দ্রুত পায়ে হোল্ডে ঢুকল রানা।

নিচের হোল্ডে রানার কণ্ঠ শুনেছে সেসিলি। দেরি না করে আবারও ফিরল একযেকিউটিভ কেবিনে। একবার সিঁড়ি থেকে উঁকি দিয়ে

নিশ্চিত হলো, হামলা করতে উঠে আসছে না রানা। নীরবে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল সেসিলি।

অস্ত্র হাতে ঢুকল ক্রু রুমে। এদিকে নেই রানা। মেঝেতে পড়ে আছে ওর দলের মৃত দুই গার্ড। হাঁ হয়ে আছে ককপিটের দরজা। দূর থেকেও বুঝে গেল, লাশ হয়ে গেছে দুই পাইলট।

এখন ককপিটে ঢুকে দরজা লক করতে পারে সেসিলি। নিজ হাতে তুলে নিতে পারে বিমানের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু কাজটা হবে খুব বিপজ্জনক। বালকহেডে ঢুকেছে একরাশ গুলি। কী যন্ত্র নষ্ট হয়েছে, কে জানে! তা ছাড়া, দরজার ওদিক থেকে গুলি করবে মাসুদ রানা।

আরও সমস্যা আছে, ককপিটে আটকা পড়লে সেই সুযোগে ভাইরাসের ক্যানিস্টার স্যাবোটাজ করবে রানা আর লাবনী।

মাত্র এক সেকেণ্ড ভাবল সেসিলি, তারপর এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ককপিটে। চট্ করে দেখে নিল বিমানের স্ট্যাটাস। বুলেটের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটা প্যানেল। অবশ্য, অন্যগুলো থেকে পেল গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য। বিমান আপাতত চলছে অটোপাইলটে। উচ্চতা এয়ারক্রাফটের বারো হাজার ফুটের সামান্য বেশি। গতি তিন শ' বিশ নট। কোর্স থেকে সরে গেছে বিমান। নিশ্চয়ই এরই ভেতর এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল বুঝে গেছে, গোলমাল হয়েছে এই বিমানে। তা ছাড়া, বেশ কিছুক্ষণ হলো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি পাইলট। ওরা চুপ করে থাকলে দেরি না করে ইন্টারসেপ্ট করতে ফাইটার বিমান পাঠাবে কর্তৃপক্ষ।

বিপদ!

মিলিটারি আকাশে ওঠার আগেই ফিরতে হবে রেইভেন্সফিওর্ডের ব্যক্তিগত এয়ারপোর্টে। সেক্ষেত্রে গোপন করতে পারবে সবই। দোষ চাপিয়ে দেবে কর্মচারীদের ঘাড়ে। সামান্য বিরতি শেষে আবারও বিমান নিয়ে উঠে ছড়িয়ে দেবে ট্রাইডেণ্ট

ভাইরাস।

অটোপাইলট কন্ট্রোল পরখ করল সেসিলি। ভাগ্য ভাল, নষ্ট হয়নি কোনও যন্ত্র। ওর বাবার বিশেষ অর্ডার দেয়া এ-থ্রিএইটি বিমানের কমপিউটার বর্তমানে দুনিয়া-সেরা। এদিকে আধুনিক ন্যাভিগেশনের সব যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে রেইভেন্সফিওর্ডের এয়ারপোর্টে। ইমার্জেন্সি হলে মানুষের কোনও সাহায্য ছাড়াই রানওয়েতে নিরাপদে নেমে পড়বে এই বিমান।

এখন পাইলট নিয়ন্ত্রণ করছে না এই এয়ারক্রাফট। নিজেও বিশাল বিমান চালাতে পারবে না ও। তবুও কপাল ভাল, ল্যাণ্ডিং নিয়ে ভাবতে হবে না ওকে।

হঠাৎ করেই ঘামতে লাগল সেসিলি, সতর্ক হাতে অ্যাকটিভেট করল ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিং সিকিউয়েন্স।

সেসিলির রেসিং বাইকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে লাবনী, সারি সারি কন্টেইনারের মাঝ দিয়ে গিয়ে ওর সামনে থামল রানা। 'যাক, তুমি সুস্থ।'

ছলছল করছে মেয়েটার চোখ। 'ভেবেছি তুমি মরেই গেছ!'

'না, তোমার তো জানার কথা, আমার আশপাশেও আসে না যম টাইপের কেউ।' মৃদু হাসল রানা।

'কী যে ভাল লাগছে যে তুমি...' থেমে গেল লাবনী। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল 'রানা, তুমি হয়তো জানো না, এই বিমানে...'

'ভাইরাস তুলেছে। হ্যাঁ, জানি। বলতে পারবে কোথায় আছে জিনিসটা?'

'না, তবে বিমানের বাইরে ছাড়ার জন্যে হুকের মত কিছু থাকবে। ওপরের হোল্ডে তেমন কিছু নেই।'

'এই হোল্ডের সামনের দিকেও নেই,' বলল রানা। 'নিচের হোল্ডেও তেমন কিছু দেখিনি।'

'তা হলে বেশি খুঁজতে হবে না! চলো!' রানার কনুই ধরে হোল্ডের পেছনের দিকে রওনা হলো লাবনী। 'বামে খুঁজবে তুমি, আর আমি ডানে।'

রানার দিকে কম কন্টেইনার, মনে হলো না ওগুলোর ভেতর অস্বাভাবিক কিছু আছে। পেছনের কার্গো দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা। ওখানে থেমে চেক করল কন্ট্রোল। ভাবল, এখন এই দরজা খুলে দিলে হয়তো এক্সপ্লোসিভ বোল্ট কাজ করবে, ফলে বিমান গিয়ে পড়বে অনেক নিচের সাগরে।

'রানা!' নিজের নাম শুনে দরজার কথা ভুলে ঘুরে তাকাল রানা। হোল্ডের পেছনে পাগলের মত হাত নাড়ছে লাবনী। 'এদিকে এসো! পেয়ে গেছি!'

ওদিকে চলল রানা। একেবারে পেছনের কন্টেইনারের পাশে মেয়েটা। ওই বাক্সের মত কন্টেইনারের সঙ্গে আছে স্টিলের দুই হোস, সোজা গেছে পেছনের বালকহেডে। 'এই যে, এটাই! কিন্তু জানি না, কী করে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া ঠেকাতে হবে। তুমি কিছু জানো এসব ব্যাপারে?'

'জেনে নেব,' কন্টেইনারের সামনে থামল রানা। চোখে পড়ল এদিকের প্যানেলে পেটমোটা প্যাডলক। ওর ওয়াইল্ডির বাঁটের কয়েক ঘা খেয়েই ভেঙে গেল তালা।

ভেতরে চোখ যেতেই আঁৎকে উঠল লাবনী। 'হায়, আল্লা!'

বায়োল্যাবে ওকে ভাইরাসের স্বচ্ছ তরলের ছোট সব ফ্লাস্ক দেখিয়েছে ডেনিয়েলসন। কিন্তু এগুলো দানবীয়। যেন তিনটে তেলের ড্রাম। 'এবার কী করব আমরা?'

'সব নষ্ট করে দেব,' বলল রানা। আঙুল তাক করেছে ড্রামের নিচে ইলেকট্রিক পাম্পের দিকে। পাশেই সহজ এক কন্ট্রোল প্যানেল। প্রথম বাটন টিপলে খুলবে ভালভ, দ্বিতীয়টা পাইপের ভেতর দিয়ে পাম্প করবে ভাইরাস বাইরের পরিবেশে।

'যদি বুবি-ট্র্যাপ করা থাকে?'

'এসব করতে যাবে কেন? তারা তো ভেবেছে, এই বিমানে কেউ উঠতেই পারবে না।' প্যানেলের দিকে পিস্তলের নল তাক করল রানা।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হায়-হায় করে উঠল লাবনী। 'গুলি করলেই হলো নাকি! যদি গুলি লেগে শর্ট সার্কিট হয়? আর ওমনি বুম্ করে ফেটে গেল সব?'

গম্ভীর চোখে লাবনীকে দেখল রানা। 'প্যানেল খুলতে পারব, কিন্তু তাতে সময় লাগবে। আর অত সময় এখন আমাদের হাতে নেই।' আবারও প্যানেলের দিকে পিস্তল তুলল।

কিন্তু ভীষণ এক ঝাঁকি খেল এ-থ্রিএইটি এয়ারবাস। হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিল রানা ও লাবনী।

'আরে, ব্যাপারটা কী?' চমকে গেছে রানা।

হোল্ডের সামনের দিক দেখল লাবনী। 'সেসিলি ককপিটে! কী করছে মেয়েটা!'

'বিমান ঘুরিয়ে নিচ্ছে,' তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। 'সোজা ফিরবে রেইভেন্সফিওর্ডে। আর নামতেই আমাদের ঘিরে ফেলবে অন্তত পঞ্চাশজন গার্ড।'

'কিন্তু... ও তো বলেছিল, এই বিমান চালাতে পারে না!'

'কমপিউটারে কোন্ ভাষা ব্যবহার করে সেসিলি?' জানতে চাইল রানা। 'নরওয়েজিয়ান, না ইংরেজি?

'ইংরেজি।'

'গুড।'

'কেন?'

'আশা করছি, বিমানে তাদের কমপিউটারে ইংরেজি ব্যবহার করেছে দুই মরা পাইলটও।'

'সেসব জেনে কী করবে?'

'গুছিয়ে বলার সময় নেই। শুধু বলব, এসব বিমানকে চালাতে পারে ওসব কমপিউটার। যেখানে যেতে বলবে, সেখানে নেবে। আর তাই করছে এখন সেসিলি।' পকেট থেকে সুইস আর্মি নাইফ বের করে লাবনীর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'এটার ভেতর স্ক্রু-ড্রাইভার আর কাঁচি পাবে। খুলে ফেলো সামনের প্যানেল। যত তার পাবে, কেটে ফেলবে।'

'আমি পেশাদার আর্কিওলজিস্ট, ইলেকট্রিশিয়ান নই! তুমি কী করবে?'

'রুখে দেব সেসিলিকে,' লাবনীকে পাশ কাটিয়ে ওয়াইল্ডি হাতে ককপিটের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা।

ছুরি নিয়ে আড়ষ্ট সব ফলা বের করতে চাইল লাবনী। মট্ করে ভেঙে গেল ওর শখের আঙুলের নখ। 'ধাত্তারি!' ফলা বের করতে গিয়ে ফলাফল আগের মতই হলো। পেছন থেকে ডাকল রানাকে, 'রানা! একমিনিট!'

শুনে থাকলেও পাত্তা দেয়নি রানা।

বিরক্ত হয়ে ওর পেছনে ছুটল লাবনী।

ক্রু রুমের কাছে পৌঁছে আরও সতর্ক হলো রানা, উঁকি দিল ভেতরে। ওদিকে ককপিটের দরজা এখনও খোলা। কোথাও নেই সেসিলি।

অস্ত্র হাতে ক্রু রুমে ঢুকল রানা।

মেঝের দু'পাশে পড়ে আছে দুই মৃত গার্ড।

কোথায় গেছে সেসিলি?

ওকে পাশ কাটিয়ে হোল্ডে ঢুকবে, তা ছিল অসম্ভব। তার মানে, আছে সামনের সেকশনে। হয় ককপিট, ইউটিলিটি রুম, অথবা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে ওপরের ডেকে।

ককপিট ডোরের ওপর চোখ রেখে ইউটিলিটি রুমের কাছে পৌঁছে গেল রানা, থামল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, ঝট্ করে দরজা

খুলে ভেতরে তাক করল ওয়াইল্ডি।

ইউটিলিটি রুম খালি।

দরজা বন্ধ করে ওখানে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা। অস্ত্র হাতে কাভার করল ঘরের কোণ। তারপর সিঁড়ি।

না, এদিকে নেই কেউ।

এবার...

এক পা যাওয়ার আগেই ওপর থেকে ওর মুখে নেমে এল সেসিলির প্রচণ্ড এক লাথি।

একত্রিশ

পেছনের দরজায় আছড়ে পড়েছে রানা। নাক ভেঙে না গেলেও তীব্র ব্যথায় চোখ থেকে দরদর করে ঝরছে পানি। এদিকে এ-থ্রিএইটি বিমান কাত হয়ে ঘুরছে বলে কঠিন হয়ে উঠেছে ভারসাম্য বজায় রাখা।

মেঝেতে নেমে এসেই এক পায়ে ভর করে দ্বিতীয় লাথি ছুঁড়ল সেসিলি। রানার পাঁজরে হাতুড়ির মত খটাক করে লাগল বুটের হিল। দম আটকে গেছে রানার। তৃতীয় লাথি পড়ল ওর হাতের অস্ত্রের ওপর ছিটকে গিয়ে পেছনের বালকহেডে লাগল ওয়াইল্ডি।

সামলে উঠতে না পারলেও বামহাতে সেসিলির চোয়ালে ঘুষি বসাতে চাইল রানা। ঠিক জায়গায় লাগাতেও পারল, ঝটকা খেয়ে মাথা পেছনে গেল মেয়েটার। ফুঁপিয়ে উঠেছে ব্যথা পেয়ে। চট্ করে পিছিয়ে গেল এক পা। বিষাক্ত চেহারা করে দেখল রানাকে।

রানা দেখে ফেলেছে, মেয়েটার লেদার জিন্সের ওয়েস্টব্যাণ্ডে

ঝুলছে পিস্তল। কিন্তু ওর চোখ লক্ষ্য করেছে সেসিলি, হ্যাঁচকা টানে বের করে নিতে চাইল অস্ত্র। ওই একই সময়ে সামনে বেড়ে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল রানা তার বুকে। কাত হয়ে পিছিয়ে ইউটিলিটি রুমের দরজায় পড়ল মেয়েটা। ফুসফুসে এমন ব্যথা পেয়েছে যে আটকে গেছে দম।

সোজা হয়েই ট্রিগার টিপে দিল সে।

বাম উরুতে বুলেট বিঁধতেই ভয়ানক ব্যথায় রানার মনে হলো, বিমানের ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। ভর রাখতে পারল না জখমী পায়ে, কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। বামহাতে চেপে ধরেছে ক্ষত। হাড়ে না লেগে মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। রক্তাক্ত হয়ে উঠছে প্যান্টের পায়া।

এদিকে সমতল হয়েছে এ-থ্রিএইটি-র মেঝে। নতুন কোর্স পেয়ে ফিরে চলেছে রেইভেন্সফিওর্ড লক্ষ্য করে।

সামান্য বিশ্রামের জন্যে দরজায় হেলান দিয়েছে সেসিলি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'রানা, এবার মরবে!' অস্ত্রের নল থেকে চুইয়ে বেরোচ্ছে নীল ধোঁয়া, সরাসরি তাক করল ওটা রানার মুখ লক্ষ্য করে।

বিজয়িনীর হাসি মুখে।

পেরিয়ে গেল দুটো সেকেণ্ড, তারপর আঙুল চেপে বসতে লাগল ট্রিগারে।

'সেসিলি!' হোল্ডের দরজায় পৌঁছে গেছে লাবনী। দু'হাতে শক্ত করে ধরেছে রানার ওয়াইল্ডি। তাক করেছে সেসিলির বুক লক্ষ্য করে। চাপা স্বরে বলল, 'অস্ত্রটা ফেলে দাও!'

'লাবনী?' অবাক চোখে ওকে দেখল সেসিলি। অস্ত্র সরায়নি রানার দিক থেকে।

'অস্ত্রটা ফেলো, সেসিলি, দেরি করবে না।'

'এখনও মনোভাব পাল্টে নেয়ার সুযোগ আছে, লাবনী,' প্রায়

অনুনয়ের সুরে বলল সেসিলি, 'সেক্ষেত্রে ফিরতে পারবে আমার সঙ্গে।'

'কোনওভাবেই রানাকে খুন করতে দেব না,' কঠোর চোখে সেসিলিকে দেখল লাবনী।

'আমাদের প্ল্যান শেষ করবে, সে-সুযোগ ওকে দেয়া অসম্ভব,' আবারও রানার দিকে তাকাল সেসিলি। এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে রানা। ক্ষত থেকে সরিয়ে ফেলেছে হাত। বুঝতে পারছে, মস্ত ভুল করছে লাবনী। একেবারে কাঁচা কাজ। উচিত সেসিলিকে গুলি করা। কিন্তু নিজ মুখে সেটা বলতে বাধল ওর।

'তোমরা উন্মাদ!' ধমকের সুরে বলল লাবনী। 'বদ্ধ উন্মাদ তোমার বাবা!'

রাগের ছাপ পড়ল সেসিলির চেহারায়। 'বাজে কথা বলবে না, লাবনী!'

'তুমি ভাল করেই জানো সে পাগল হয়ে গেছে, সেসিলি! কত বড় পাপ করেছে, নিজেও ভাল করে জানো! আল্লার দোহাই, বছরের পর বছর সারা পৃথিবী জুড়ে সাহায্য করেছ গরীব মানুষকে! ভাবো তাদের কথা! ওরা কৃতজ্ঞ তোমার প্রতি! তাদের কৃতজ্ঞতা ছুঁয়ে যায়নি তোমার মনকে?'

'যা করতে হবে, তা করতেই হবে,' বলল সেসিলি। চেহারা দেখে মনে হলো দ্বিধান্বিত। 'বাবার অবাধ্য হব না আমি।'

'আগেই তা হয়েছ,' গলা নরম করল লাবনী, 'নইলে অনেক আগেই তোমার বাবা খুন করত আমাকে। এইমাত্র দেখেছি তোমাকে। ইচ্ছে করলে খুন করতে পারতে রানাকে। কিন্তু সময় নিয়েছ। তার কারণ, তুমি জানো কোনটা আসলে পাপ। তুমিও পছন্দ করো রানাকে। অনেকবার তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে ও।'

'কিন্তু রানা আমাদের দলের কেউ নয়...

'আসলে আমাদের বলে কোনও দল নেই, সেসিলি,' বলল

লাবনী। 'আমরা সাধারণ মানুষ। আর মানুষ সাধারণই হয়। হ্যাঁ, এক কোটি সমস্যা আছে পৃথিবী জুড়ে, কিন্তু তার মানেই এটা নয় যে একজন আরেকজনকে খুন করতে হবে।'

অনিশ্চয়তা নিয়ে লাবনীকে দেখল সেসিলি। 'সব সমস্যা দূর করতে পারব আমরা...'

'সাড়ে পাঁচ শ' কোটি মানুষকে খুন করে?' মাথা নাড়ল লাবনী। 'ওটা কোনও সমাধান নয়।' ভারী পিস্তল এখনও তাক করে রেখেছে সেসিলির দিকে। কয়েক পা এগিয়ে গেল লাবনী। 'সেসিলি, আমি তোমাকে চিনি। তুমি হিটলার বা মুসোলিনি নও। পবিত্র একটা মন আছে। চেষ্টা করলে হয়তো তোমার বাবাকে ঠেকাতে পারবে। নইলে ওই দানবগুলোর মত হয়ে উঠবে সে। অস্ত্রটা নামিয়ে রাখো, সেসিলি।'

নিষ্কম্প হাতে নড়ল না পিস্তল। 'বাবার অবাধ্য হতে পারব না আমি।'

'রানাকে খুন করতে দেব না আমি তোমাকে।'

সেসিলির পিস্তলের নল ঘুরে গেল লাবনীর বুক লক্ষ্য করে। চাপা স্বরে বলল মেয়েটা, 'আমি তোমাকে খুন করতে চাই না, লাবনী। আমাকে বাধ্য কোরো না।'

দুই মেয়ের কে হারবে, জানে না রানা। কিন্তু বুঝতে পারছে, আহত পা নিয়ে এত দ্রুত নড়তে পারবে না যে, কেড়ে নেবে সেসিলির অস্ত্র।

'আমিও তোমাকে খুন করতে চাই না, কিন্তু বাধ্য হলে তাই করব,' সেসিলিকে বলল লাবনী। থরথর করে কাঁপছে হাতের ভারী পিস্তল। 'অন্যায় করছ তোমরা।'

প্রায় কাতর অনুরোধের মত শোনাল সেসিলির কণ্ঠ: 'আমি তিন গুনব, লাবনী। দয়া করে হাত থেকে ফেলে দেবে অস্ত্র। ...এক...'

'দরকার পড়লে সত্যিই গুলি করবে তোমাকে,' লাবনীকে সতর্ক করল রানা।

'দুই...'

'সেসিলি, অস্ত্রটা ফেলে দাও!'

'তিন!'

গুলি করেছে সেসিলি।

এত কাছ থেকে মিস করা অসম্ভব। কিন্তু তাই করেছে মেয়েটা। একেবারে শেষমুহূর্তে হাত সরিয়ে গুলি করেছে লাবনীর পাশের দেয়ালে।

কুঁচকে গেছে লাবনীর চোখ। এক সেকেণ্ড পর গুলি করল ও। ওর হাতে লাফিয়ে উঠল ওয়াইন্ডি। আরেকটু হলে পড়ে যেত মেঝেতে।

পিঠ দিয়ে দরজার ওপর পড়ল সেসিলি। গুলি লেগেছে বুকে। তিন সেকেণ্ড পর পিছলে ধুপ করে পড়ে গেল রানার পায়ের কাছে।

অবিশ্বাস ও ভয় নিয়ে সেসিলিকে দেখল লাবনী। হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্রটা। ফুঁপিয়ে উঠল: 'হায়, আল্লা!' ভাবতে পারছে না কী করে বসেছে।

'লাবনী...' ফিসফিস করে বলল সেসিলি। চোখ থেকে নামল এক ফোঁটা অশ্রু। বুজে গেল চোখ।

'হায়, আল্লা! আমি এটা কী করলাম!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লাবনী।

'ঠিকই আমাদেরকে খুন করত,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'এসো, অনেক কাজ পড়ে আছে।'

সেসিলির ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না লাবনী। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমি খুনি হয়ে গেলাম!'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছ। সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। মন শক্ত করো, লাবনী। হাতে অনেক

কাজ।'

রানার পায়ের ওপর স্থির হলো লাবনীর চোখ। দরদর করে নামছে রক্ত। 'হায়, আল্লা! ব্যাণ্ডেজ লাগবে!'

'সময় নেই,' আড়ষ্ট পায়ে ককপিটের দিকে চলল রানা। 'অফ করতে হবে অটোপাইলট।'

'তারপর কী করব আমরা?' চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল লাবনী। 'বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে মরব?'

'প্রথমে ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়া ঠেকাব,' বলল রানা। 'তারপর যোগাযোগ করব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তাদের জানাতে হবে কী করছে লোভিস ডেনিয়েলসন।'

'আর বায়োল্যাবের ভাইরাস, ওগুলোর কী হবে?' রানার পাশে ধীর পায়ে হাঁটছে লাবনী। 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার আগেই কোটি কোটি মানুষ খুন করার ব্যবস্থা করবে বদ্ধ উন্মাদটা। কে জানে, হয়তো এরই ভেতর আকাশে তুলেছে আরেকটা বিমান!'

'বায়োল্যাব...' বিড়বিড় করল রানা।

'হ্যাঁ, কী?'

'ওই দালান উড়িয়ে দিয়েছি আমরা। কিন্তু আস্ত রয়ে গেছে কন্টেইনমেন্ট এরিয়া। ওটা ধ্বংস করতে হবে।'

'কী করে?'

লাবনীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে বিমান দেখল রানা। চুপ করে আছে।

চমকে গেল লাবনী। বুঝে ফেলেছে, রানার মনের কথা।

'পাঁচ শ' টনি বিমান, পেট ভরা জেট ফিউয়েল, এ দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়,' বলল রানা।

'কিন্তু মরব আমরা দু'জনও! আমাদের সঙ্গে প্যারাশুট নেই!'

'বিমানেও নেই,' মাথা নাড়ল রানা। 'বাঁচার উপায় নেই।' কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবল ও, তারপর ঘুরে দেখল হোল্ড।

'গুড! ককপিটে পরে গেলেও হবে, আগের কাজ হোল্ডে!'

অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে তিক্ত চোখে নিচের বায়োল্যাব দেখছে লোভিস ডেনিয়েলসন। এখনও ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠছে ধোঁয়া। দূরে খাঁড়ি। তার আগে সেতুর সিমেন্ট ও রডের ভাঙা কিছু চিহ্ন। তার এলাকায় এসে কোটি কোটি ডলারের ক্ষতি করেছে মাসুদ রানা আর ড্রেকের লোক। এরই ভেতর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে, কঠোর সুরে জানতে চেয়েছে, তার এলাকায় এসব ভয়ঙ্কর হামলা কোথা থেকে এল।

নিজেকে আড়াল করেছে সে।

এখন এটাই বড় কথা, মাসুদ রানা এ-থ্রিএইটি বিমানে উঠে পড়লেও সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেছে কন্টেইনমেন্ট এরিয়া।

স্পিকারফোনে বলে উঠল এক লোক: 'স্যর, এইমাত্র কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে জানাল, আবারও রেইভেন্সফিওর্ডের দিকে আসছে বিমান। ওটা চলছে অটোপাইলটে।'

'আমার মেয়ের কাছ থেকে কোনও খবর এল?'

'এখনও না, স্যর। এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল থেকে জানতে চাইছে, আসলে কী হয়েছে ওই বিমানের।'

'জানিয়ে দাও, সামান্য যান্ত্রিক সমস্যা। সে-কারণেই আবারও ফিরছে।' খাঁড়ি পার করে এয়ারপোর্টের দিকে চোখ গেল ডেনিয়েলসনের। 'কতক্ষণ পর নামবে?'

'বড়জোর ছয় মিনিট, স্যর।'

'দু'মিনিট পর পর কী ঘটল আমাকে জানাবে।' ফোন রেখে দূরের আকাশে চোখ রাখল ডেনিয়েলসন। ওদিক থেকে আসবে বিশাল বিমান। ওটা থেকে যোগাযোগ করছে না কেউ। চলছে ওটা অটোপাইলটে। চিন্তিত হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু এ-থ্রিএইটি বাড়ি ফিরছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এখনও ওই বিমানের কর্তৃত্ব তারই

লোকের হাতে। মাসুদ রানা পারলে অন্য কোথাও নিয়ে যেত বিমানকে, প্রথম সুযোগে যোগাযোগ করত নরওয়েইজিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। সেসব কিছুই হয়নি। বিমান একবার নেমে এলেই গোপন করা হবে সত্যিকারের পরিস্থিতি। দোষ চাপিয়ে দেয়া হবে মুসলিম জঙ্গীদের ওপর।

আর সঠিক সময়ে আবারও আকাশে উড়বে বিমান। এর পরের বার ভুল হবে না ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে।

মেইন হোল্ডে পোর্ট সাইডে পেছনের সব কন্টেইনারের দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'এই তিনটে স্ট্র্যাপ ছাড়া অন্যসব ফিতা খুলে দাও।'

'কিন্তু বিমান নড়ে গেলেই আলগা হবে সব,' দ্বিধা নিয়ে বলল লাবনী।

'আরও জরুরি কাজ করবে,' বলল রানা। 'এসো, কাজ সেরে ফেলো।' লাবনী হাত লাগাল স্ট্র্যাপ খুলতে, ওদিকে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে কার্গো ডোরের কন্ট্রোলের সামনে থামল রানা।

'কী করছ, রানা?'

'উড়িয়ে দেব দরজা।'

ভীষণ ভয় লাগল লাবনীর। 'কী করবে বললে?'

'কন্টেইনার ফেলে পথ তৈরি করব, দেখেছ ওই মোটর সাইকেল?'

প্যালেটে রাখা মোটরবাইক দেখল লাবনী। 'হ্যাঁ, তো?' এবার চট্ করে বুঝে গেল কী ভাবছে রানা। 'না! অসম্ভব! তুমি বদ্ধ উন্মাদ!'

'লোভিস ডেনিয়েলসনের মতই?' হাসল রানা। 'এ ছাড়া উপায়ও নেই। এমনিতে এক শ' মাইলেরও বেশি বেগে বিমান থেকে পড়লে উপায় থাকবে না বাঁচার।'

'আর আমরা যদি উড়ন্ত বিমান থেকে মোটর সাইকেল নিয়ে ঝাঁপ না দিই?'

'নিজেই জানো। বলছি না আমার প্ল্যান নিখুঁত। কিন্তু ওই এয়ারপোর্টে বিমান থেকে নামলেই গুলি খেয়ে মরব।'

'আমার ধারণা, তুমি পাগল,' বলল লাবনী, দ্রুত হাতে ডেক থেকে খুলছে কন্টেইনারের বাঁধন।

দরজার ওয়ার্নিং সাইন নরওয়েজিয়ান ভাষায় লেখা। তবে অন্য বিমানের এ অংশে কী লেখা থাকে, ভাল করেই জানে রানা। লাবনী শেষ স্ট্র্যাপ খোলার পর বলল ও, 'ঠিক আছে, ফেরো মোটর সাইকেলের পাশে। শক্ত হাতে ধোরো ওটাকে।' লাবনী প্যালেটের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর সামনে বাড়ল রানা। একহাতে ধরল ফিউজেলাজের স্পার, অন্য হাতে টান দিল লাল রং করা দুই লিভারের একটা।

ওই দুই লিভারের কারণেই কাজ করবে এক্সপ্লোসিভ বোল্ট।

এবার রানা টান দিল দ্বিতীয় লিভারে...

'কড়াৎ!' আওয়াজ তুলে বোল্ট বিস্ফোরিত হতেই ভারী কব্জা ভাঙল, নিচে রওনা হলো কার্গো ডোর। শোঁ-শোঁ হাওয়া ও ইঞ্জিনের আওয়াজের তুলনায় কিছুই নয় দরজা ভাঙার বিস্ফোরণ। হারিকেনের গতি তুলে হোল্ডে ঢুকল তুমুল হাওয়া অনেক নিচে নেমে এসেছে বলে ডিপ্রেশারাইয হলো না এ-থ্রিএইটি বিমান, যদিও গতি এখনও তিন শ' নটের বেশি।

হোঁচট খেল বিমান। দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাল কমপিউটার। কিন্তু ধাতুর সঙ্গে ধাতুর কর্কশ শব্দ তুলে রোলারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে প্রথম কন্টেইনার। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেল ভাইরাস রাখা কন্টেইনারের ওপর, পরক্ষণে হ্যাচের মস্ত হাঁ পেরিয়ে হারিয়ে গেল নিচের আকাশে।

ওটা পড়তে দেখল রানা। ওরা এখনও সাগরের ওপরের

আকাশে, কিন্তু কয়েক মিনিটের ভেতর নিচে থাকবে মাটি।

ভারী কন্টেইনার নেই বলে আবারও ভারসাম্য স্থির করতে চাইল এ-থ্রিএইটি। রোলারের ওপর দিয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলে নামছে আরেকটা ধাতব ক্রেট। ওটা কাত হয়ে হুড়মুড় করে এল ঠিক রানার দিকেই!

আহত পা নিয়ে কোথাও যাওয়ার নেই ওর!

হাতের স্পার ছেড়ে দিয়েই প্রায় লাফিয়ে পিছিয়ে যেতে চাইল রানা। কিন্তু খোলা দরজার ভয়ঙ্কর বাতাস হ্যাঁচকা টানে ফেলে দিতে চাইল ওকে। চোখের কোণে দেখল খোলা কার্গো ডোর, ভাইরাসের কন্টেইনার ও হোল্ডের দেয়াল। ডানদিকে খোলা আকাশ ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি।

ধুপ করে ফ্রেমের ওপর রানা আছড়ে পড়তেই ওকে গেঁথে ফেলেছে ঝোড়ো হাওয়া। পরক্ষণে নিয়ে যেতে চাইল উড়িয়ে।

হাতের নাগালে একটা স্ট্র্যাপ দেখে খপ্ করে ধরল রানা। রোলারের ওপর দিয়ে এসে ওকে পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল আলগা কন্টেইনার। ওটার পেছনে এল তৃতীয় কন্টেইনার। ওগুলো যেন ট্রেনের বগি। এবারেরটা বেরিয়ে যেতেই আবারও ওপরে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেল এয়ারক্রাফট। হুড়মুড় করে রানার দিকে এল আরও কন্টেইনার। সামনেরটা লাগল ভাইরাসের বাক্সে, ধুম করে আওয়াজ তুলে থামল রানার মুখ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে। ওটার সামনের চ্যাপটা অংশে হামলে পড়ল ঝোড়ো হাওয়া, এক টানে নিয়ে গেল বাইরে।

ভীষণ শীতল দমকা হাওয়া ধরে বসল রানাকে। চোখ প্রায় খুলতেই পারল না বেচারা। সুযুকি মোটর সাইকেলের পাশে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে লাবনী। খোলা দরজা দিয়ে দিগন্তে কালো রেখা দেখল রানা। ওটাই নরওয়েজিয়ান উপকূল।

উঠে ভাইরাসের কন্টেইনার ঘুরে স্টারবোর্ডের কন্টেইনার

আটকে রাখার স্ট্র্যাপগুলো ধরে লাবনীর দিকে চলল রানা। ঝড়ের মত আওয়াজের ওপর দিয়ে বলল, 'খোলো মোটর সাইকেল! ইঞ্জিন চালু করো!'

পাল্টা চেঁচিয়ে বলল লাবনী, 'যদি গ্যাসোলিন না থাকে?'

দুর্দান্ত ব্যথা সত্ত্বেও হেসে ফেলল রানা। 'তা হলে তৈরি থাকো সহমরণের জন্যে!'

'এহ্! তুমি আমার স্বামী নাকি!'

'ঠিক আছে, আপত্তি আছে যখন, থাক! ...আমার একবার যেতে হবে ককপিটে।'

'কী করতে?' ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল লাবনী।

'অফ করব অটোপাইলট!' কন্টেইনার ধরে ধরে হোল্ড পেরিয়ে ক্রু এরিয়ায় পৌঁছে গেল রানা। বিমান কয়েকবার কাত হওয়ায় পিছলে কেবিনের একপাশে গেছে দুই মৃত গার্ড। সিঁড়ির মুখে পড়ে আছে সেসিলি ডেনিয়েলসন। মেঝের একটু দূরেই ওয়াইল্ডি পিস্তল দেখল রানা। সামনে বেড়ে ওটা তুলে নিতে চাইল, কিন্তু উরুতে এমনই ব্যথা, ঠিক করল ফেরার সময় নেবে অস্ত্রটা।

ককপিটে ঢুকে অটোপাইলট ডিসপ্লে দেখল। বুঝে গেল, বিমানের প্রতিটি অটোমেটিক ইমার্জেন্সি সিস্টেম চালু করে দিয়েছে সেসিলি। নিচের উপকূলের কোনও সিগনাল অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোর্স ধরে রেইভেন্সফিওর্ড লক্ষ্য করে চলেছে বিমান।

ককপিটে আলো জ্বলছে, তবুও কয়েক মাইল দূরে পরিষ্কার দেখল রানওয়ের উজ্জ্বল বাতি। এখনও উত্তর আটলান্টিকের ওপর রয়ে গেছে বিমান। আর সামান্য গেলেই উপকূল। তিন মাইল ভেতরে এয়ারপোর্ট। অন্যান্য কন্ট্রোল চেক করল রানা। সহজ অবতরণের জন্যে ইঞ্জিন মন্থর করে এয়ারবাসের গতি ও উচ্চতা কমিয়ে এনেছে কমপিউটার।

জানালা দিয়ে সামনে দেখল রানা। ওই যে উপকূলের গায়ে

কালো খাঁড়ি। কুচকুচে কালো ধোঁয়া উঠছে বায়োল্যাব থেকে।

টার্গেটি পেয়ে গেছে ও।

এ-থ্রিএইটি-র কোর্স অনুযায়ী বিমানের উইণ্ডশিল্ডের সেন্ট্রাল পিলার বরাবর তাকাল রানা। সরাসরি সামনে পড়বে রানওয়ের বাতি। এবার কয়েক ডিগ্রি ডানে সরিয়ে নিতে হবে বিমান।

আল্টিমিটার দেখল রানা। উচ্চতা আট হাজার ফুট। আরও নামিয়ে নিতে হবে বিমান।

উরুর ব্যথা সহ্য করে মৃত পাইলটের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, একহাতে জয়স্টিক ধরে, অন্যহাতে ডিঅ্যাকটিভ করল অটোপাইলট।

গা শিরশির করে দেয়া গুঞ্জন ছাড়ল কমপিউটার। পাত্তা দিল না ও। সামান্য ডানে কাত করল জয়স্টিক। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল বিমান উইণ্ডশিল্ডের সেন্ট্রাল পিলার থেকে বামে সরল রানওয়ের বাতি। কাত করে স্টিক ধরে রেখেছে রানা। সরাসরি ধোঁয়ার স্তূপের দিকে চলেছে বিমান। আস্তে করে সোজা করে নিল জয়স্টিক। আবারও সোজা হলো বিমান।

এখনও কোনও বিপদ হয়নি। এবার সবচেয়ে কঠিন কাজ...

সামনে জয়স্টিক ঠেলল রানা। নিচে নাক তাক করল বিমান। হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে গতি। দ্রুত কাউন্টডাউন করছে আল্টিমিটার। রানা যা করছে, সব চোখের আন্দাজে। বেশি ওপরে রয়ে গেলে টার্গেটি পেরিয়ে যাবে বিমান। আবার বেশি নামলে আছড়ে পড়বে খাঁড়ির পাথুরে জমিতে।

চার হাজার ফুট উচ্চতা থেকে নেমে গেল বিমান। সামনে দেখা দিয়েছে উপকূল। ফুরিয়ে আসছে সময়।

আরও সামনে জয়স্টিক ঠেলল রানা। আরও খাড়া হয়ে নামছে বিমান। কমপিউটারের স্পিকার থেকে এল সতর্ক-ধ্বনি। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলকে বলল রানা, 'জানি, বাপু!'

তিন হাজার ফুট উচ্চতায় নামল বিমান।

চট্ করে এয়ারস্পিড ইণ্ডিকেটর দেখল রানা। গতি বড়জোর এক শ' নটের মত।

এই বেগ এখনও অনেক বেশি, কিন্তু রানার এ বিষয়ে কিছু করার নেই। গতি আরও কমিয়ে দিলে আকাশ থেকে পাথরের মত খসে পড়বে বিমান।

উচ্চতা মাত্র দু'হাজার ফুট।

ঝড়ের গতি তুলে বিমান লক্ষ্য করে ছুটে আসছে উপকূল।

সোজা বায়োল্যাবের ধোঁয়া ভরা স্তূপের দিকে নাক তাক করেছে এয়ারবাস।

হাত বাড়িয়ে অটোপাইলট প্যানেলের ক্যান্সাল বাটন টিপল রানা। আশা করল, এর ফলে মুছবে সেসিলির সব কমাণ্ড। আগের প্রোগ্রামিং অনুযায়ী রেইভেন্সফিওর্ডের এয়ারপোর্টে বিমান নামলে সর্বনাশ হবে ওদের দু'জনের।

একহাজার ফুট উচ্চতায় নেমে এল এয়ারবাস। ককপিট ভরে গেল ক্ল্যাক্সোনের ঝনঝন আওয়াজে। তার ওপর দিয়ে এল সিন্থেটিক মহিলা কণ্ঠ: 'ওয়ার্নিং! গ্রাউণ্ড প্রক্সিমিটি অ্যালার্ট! ওয়ার্নিং! গ্রাউণ্ড প্রক্সিমিটি অ্যালার্ট!'

'আরে জানি, শালী!'

ছয় শ' ফুট... পাঁচ শ'...

বিমান সমতল করে নিতে চাইল রানা। অলস গতিতে সেন্ট্রাল পযিশনে ফিরল আর্টিফিশিয়াল হরাইযন।

তিন শ' পঞ্চাশ ফুট।

সমতল হয়েছে এয়ারবাস। সাগর থেকে প্রায় তিন্ শ' ফুট ওপরে খাঁড়ির পাথুরে দেয়াল। সামনে দেখল রানা। কোর্স ও অল্টিচ্যুড অনুযায়ী চলেছে বিমান। খাঁড়ির সামান্য ওপর দিয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে পাহাড়ি বায়োল্যাবের বুকে।

আশা করল রানা, আল্টিচ্যুড সম্পর্কে সঠিক ধারণা করেছে। নইলে...

অটোপাইলট অ্যাকটিভ করল রানা। ওর হাত ভাসছে জয়স্টিকের ওপর। বিমান নিয়ে উঠে যেতে চাইলে বা এয়ারপোর্টের দিকে বাঁক নিলে ঠেকাবে কমপিউটারের নির্দেশ। তেমন কিছুই হলো না। মুছে গেছে আগের সব প্রোগ্রাম। স্থির কোর্সে একই গতি নিয়ে বিমান নিয়ে চলেছে অটোপাইলট।

ঘুরে উরুর ব্যথা উপেক্ষা করে হোল্ডের উদ্দেশে চলল রানা। বুঝতে পারছে, রক্তশূন্যতায় ঘুরছে মাথা। মনে হচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়া জরুরি। হাতে সময় নেই, বিড়বিড় করে বলে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল ও।

চমকে গেল ক্রু এরিয়ায় এসেই।

কোথাও নেই সেসিলি!

দরজা পেরিয়ে হোল্ডে গেছে রক্তের ফোঁটা।

তীব্র ব্যথা সহ্য করে মেঝে থেকে ওয়াইল্ডি তুলে নিল রানা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার কাছে পৌঁছে ডাকল: 'লাবনী!'

সুযুকির মোটর সাইকেল থেকে সব স্ট্র্যাপ সরিয়ে ফেলার পর, কাত হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্বিচক্রযান। ফিউয়েল ট্যাঙ্কের গায়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে চাবি। মোটর সাইকেল সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান লাবনীর। তবে ব্যাগ থেকে চাবি নিয়ে ইগনিশনে দিয়ে ইঞ্জিন চালু করতে সমস্যা হয়নি।

কিন্তু ফিউয়েল গজ দেখাল: 'এম্পটি'। ট্র্যান্সপোর্টের জন্যে অতি সামান্য ছাড়া সরিয়ে ফেলা হয়েছে বাকি সব তেল। নিশ্চয়ই এতক্ষণে রানা কাজ শেষ করেছে, ঘুরে ককপিটের দিকে তাকাতেই চমকে গেল লাবনী।

সেসিলি! ওর খুব কাছে পৌঁছে গেছে।

মোটর সাইকেলের পাশ থেকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল সে লাবনীকে। ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল দুই মেয়ে। গায়ের ওপর থেকে সেসিলিকে সরাতে চাইল লাবনী, কিন্তু তখনই কনুইয়ের জোর গুঁতো লাগল ওর মাথায়। পাগল হয়ে গেল ব্যথায়।

ওর গলা টিপে ধরেছে সেসিলি। ব্যথায়, রাগে বিকৃত হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। কপালের পাশে উড়ছে সোনালি চুলের গোছা। 'হারামজাদি!' চিৎকার করে বলল সেসিলি। দাঁতে মেখে আছে রক্ত। 'তোকে সবই দিয়েছিলাম! কিন্তু আমার বিশ্বাস নষ্ট করেছিস তুই!'

দম নিতে পারছে না লাবনী। দুই হাতে সরিয়ে দিতে চাইল সেসিলির হাত। কিন্তু মেয়েটার পেশি যেন স্টিলের কেবল। শ্বাসনালীতে গেঁথে বসেছে দুই বুড়ো আঙুল। চোখে অন্ধকার দেখছে লাবনী, কানে শোঁ-শোঁ আওয়াজ, চাপা দিয়েছে দিয়েছে ঝোড়ো হাওয়াকে।

হোন্ডের মাঝে সেসিলিকে দেখল রানা। লাবনীর বুকে চেপে গলা টিপে ধরেছে মেয়েটা। দু'জন পরস্পরের এতই কাছে, নিশ্চিত না হয়ে গুলি করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

লাবনী বুঝে গেছে, অচেতন হয়ে যাচ্ছে, একটু পর মরবে। মুখের কাছে ভয়ঙ্কর রাগী সেসিলির মুখ। দুর্বল হাতে তার হাত সরিয়ে দিতে চাইল লাবনী। কী যেন ঘষে গেল ওর আঙুলে।

খুব শীতল ওটা।

শক্ত।

ধারালো।

ওর আটলান্টিয়ান লকেট...

শেষ চেষ্টা হিসেবে লকেট ধরল লাবনী, পরক্ষণে ওটা নামিয়ে

আনল সেসিলির ডান কবজির ভেতর অংশে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল সেসিলি। কবজির ছেঁড়া রগ থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত। চমকে গিয়ে লাবনীকে ছেড়ে অবাক চোখে দেখল ক্ষত।

গায়ের সমস্ত জোর ব্যবহার করে সেসিলির মুখে ঘুষি মারল লাবনী। ভয়ঙ্কর মেয়েটা চিত হয়ে পড়ে যেতেই প্রায় অবশ শরীরে গড়িয়ে সরে গেল।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওর কাছে চলে এসেছে রানা। গম্ভীর মুখে বলল, 'গুড পাঞ্চ!'

'তোমার কাছ থেকেই শিখছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লাবনী।

'মোটর সাইকেলে ওঠো!' কার্গো ডোর দিয়ে রানা দেখল, ঝড়ের গতিতে পেছনে পড়ছে সাগর। আর মাত্র দুই মাইল দূরে বায়োল্যাব। একমিনিটের চেয়েও কম সময়ে ওখানে পৌঁছবে এয়ারবাস।

সুযুকির পিঠে চেপে বসল রানা। উরুর ব্যথায় কুঁচকে ফেলেছে মুখ। ওর পেছনে উঠেছে লাবনী। কী করতে হবে বুঝতে পেরে নিজেকে বদ্ধ উন্মাদ বলে মনে হচ্ছে ওর। না, বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই! রানাকে খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু মরবেই যখন দু'জন, আর দুঃখ করে কী হবে!

রানার কোমর জড়িয়ে ধরল লাবনী। 'ঠিক আছে, রানা!'

উঠে বসেছে সেসিলি, রানা ও লাবনীকে মোটর সাইকেলে দেখে হাঁ হয়ে গেল মুখ।

থ্রটল মুচড়ে ধরেছে রানা। বার কয়েক একই জায়গায় চক্কর কাটল মোটর সাইকেলের পেছনের চাকা। হাজার হাজার ভ্রমরের মত গুঞ্জন তুলছে হাই-পারফর্মিং ইঞ্জিন। প্যালেট পেছনে ফেলে ছিটকে খোলা দরজার দিকে ছুটল দ্বিচক্রযান।

খপ করে হাত বাড়িয়ে লাবনীকে ধরতে চাইল সেসিলি, কিন্তু

দেরি হয়ে গেছে অনেক।

কার্গো ডোরে পৌঁছে যাওয়ার আগেই ঘণ্টায় সত্তর মাইল গতি তুলেছে সুযুকি। আরও বাড়ছে বেগ।

হ্যাণ্ডেল সোজা করে নিল রানা, পরক্ষণে উড়ে বেরিয়ে গেল খোলা আকাশে।

বিমান থেকে পড়লে যে গতি থাকার কথা, তার অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে ছুটন্ত দ্বিচক্রযান। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া, ছুঁড়ে দেয়া পাথরের মত ওরা পড়ছে নিরেট জমির দিকে!

মস্ত ভুল হয়ে গেছে, ভাবল রানা। যাহ্, মরেই গেল ওরা!

'চোখ বুজে রাখো!' চিৎকার করে বলল লাবনীকে।

এইমাত্র ওরা পেরিয়ে গেল রেইভেন্সফিওর্ডের উত্তর দিকের টিলা।

পড়বে ওরা খাঁড়ির বুকে!

নিচে তাকাল রানা। তুমুল বেগে ওদের দিকে উঠে আসছে পানি...

'ঝাঁপ দাও, লাবনী!'

•

টলতে টলতে ককপিটের দিকে চলেছে সেসিলি। কবজির ক্ষত থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত। বুঝতে পারছে, রিঅ্যাকটিভেট করা হয়েছে অটোপাইলট। কমপিউটার কাজ করলে এখনও জরুরি অবতরণ করতে পারবে বিমান।

কিন্তু ককপিটে ঢুকে সেসিলি বুঝে গেল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে!

ডানদিকে পিছনে হারিয়ে গেল ওদের বাড়ি। সামনেই বায়োল্যাবের ধ্বংসাবশেষ। সরাসরি পাহাড়ে বাবার মস্ত অফিসের জানালার দিকে চলেছে এয়ারবাস!

ভীষণ ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল সেসিলি।

খাঁড়ির আকাশে মস্ত শকুনের মত বিশাল বিমান দেখে হতবাক হয়েছে লোভিস ডেনিয়েলসন। সোজা ওটা আসছে অফিস লক্ষ্য করে! প্রায় সব চিন্তা দূর হয়ে গেল তার, শুধু মন বলল: পালাও! কিন্তু সময় নেই আসলে! একেবারেই সময়...

সুস্থ পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে মোটর সাইকেল থেকে এক পাশে ঝাঁপ দিল রানা। একই কাজ করল লাবনী। সোজা নিচের পানি লক্ষ্য করে নেমে যেতে লাগল ওরা দু'জন।

ঘণ্টায় এক শ' মাইল বেগে পাহাড়ে নাক গুঁজল এ-থ্রিএইটি এয়ারবাস বিমান।

প্রচণ্ড গতির পাঁচ শ' টন ধাতু ও জেট ফিউয়েল মিলে যে ভয়ানক বিস্ফোরণ হলো, তাতে কোনওভাবেই রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই রেইভেন্সফিওর্ডের কণ্টেইনমেণ্ট এরিয়ার। বিমান আছড়ে পড়তেই ছিঁড়ে গেল চারটে মস্ত ইঞ্জিন, বোমার মত চুরমার করল কংক্রিটের সব দেয়াল। এয়ারবাসের ডানা বিধ্বস্ত হওয়ায় দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল জেট ফিউয়েল। তরল এক নীল আগুনের ঢেউ গিলে ফেলল গোটা কমপ্লেক্স। চারপাশে যা পেল, ছাই করে দিল একমুহূর্তে।

পৌঁছে গেল লেলিহান আগুন কণ্টেইনমেণ্ট এরিয়ার প্রতিটি কোণে। বিস্ফোরিত হলো ভাইরাস রাখার গবেষণাগার। এক পলকে পুড়িয়ে দিল চারপাশ। মারাত্মকভাবে অসুস্থ জিম করেলির লাশের ছাইও থাকল না। দু'সেকেণ্ড পর ধসে পড়ল গোটা পাহাড়। সেখানে থাকল মস্তবড় এক গর্ত। আর তখনই চারদিক থেকে নেমে এসে চিরকালের জন্যে ভাইরাসের এলাকা চাপা দিল মিলিয়ন মিলিয়ন টন ওজনের পাথর।

রানা জানে, অনেক ওপর থেকে পানিতে পড়লে প্রায় কংক্রিটের ওপর আছড়ে পড়ার মতই অবস্থা হবে ওদের।

বাঁচতে চাইলে আগে বিক্ষুব্ধ করতে হবে পানি সমতল।

ভারী মোটর সাইকেল সাঁই করে নামতেই চারপাশে ছিটকে উঠেছে পানি। পরের মুহূর্তে সাগরে পড়ল রানা ও লাবনী।

পানির ওপর দিক অস্থির থাকুক বা না থাকুক, রানার মনে হলো বারোতলা বাড়ি থেকে পড়ে চুরচুর হয়েছে ওর দেহের সবক'টা হাড়। মারাত্মক ব্যথা, তার ওপর ভীষণ ঠাণ্ডা পানি। তলিয়ে চলেছে রানা।

একটু নিচেই কী যেন।

মোটর সাইকেল কাত হয়ে পানিতে পড়েছে বলে তলিয়ে যাওয়ার গতি কম। পেছনের চাকার সঙ্গে বেধে গেছে লাবনীর পোশাক। ভীষণ ভয় নিয়ে ঝটকা দিয়ে সরে যেতে চাইল ও, কিন্তু ছিঁড়ছে না শক্ত কাপড়।

তখনই খপ করে লাবনীকে ধরল কে যেন।

হাঙর!

এবার মরলাম, হাল ছেড়ে দিল লাবনী।

তখনই ছিঁড়ে গেল ওর কোট।

অবাক হয়ে ভাবল লাবনী, টেনে তুলছে কে?

পানিতে পড়ার পর প্রথমবারের মত চোখ মেলে দেখল, ওর কোমর ধরে সাঁতরে উঠছে রানা!

মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল ওরা সাগর সমতলে। হাঁপিয়ে গেছে রানা, নিচু স্বরে বলল, 'তীরের কাছেই আছি!'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা বেঁচে আছি!' বলল লাবনী।

'ঠিক আছ তো?'

'মরিনি বুঝতে পারছি।' আকাশের দিকে তাকাল লাবনী। 'ওই বিমান কোথায় গেল?'

'নরকে!' মাথা কাত করে খাঁড়ির পুবের দিক দেখাল রানা। ওদিক থেকে আকাশে উঠছে কুচকুচে কালো, তেল ভরা ধোঁয়া।

'আর ভাইরাস?'

'বেশি ভাজা হওয়ায় পুড়ে গেছে। খেতে ভাল লাগবে না।'

'আর সব?'

'ভাইরাসের সঙ্গে উধাও।'

কালো মেঘের দিকে তাকাল লাবনী। মুখে দুঃখের ছাপ। 'সেসিলি...'

পাহাড়ি তীরের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। লাবনীকে ঠেলে তুলবে কী, আহত রানাকেই টেনে তুলল মেয়েটা। মুখ ম্লান হয়ে গেল রানার ঊরুর ক্ষত দেখে। 'হায়, আল্লা! এখনও রক্ত পড়ছে! জলদি ডাক্তার লাগবে!'

'তা ঠিক।' শীতে খটা-খট শব্দ তুলছে রানার দাঁত। 'একটু দূরের পাহাড়ের ওপর ক্লিনিক আছে। কিন্তু দুঃখের কথা, লোভী লোভিস ডেনিয়েলসনের লোক চালায় ওটা। আমাদেরকে দেখলে মোটেও খুশি হবে না।'

কথাটা মাত্র শেষ করেছে রানা, গুলির আঘাতে চুরমার হলো ওর মাথার পাশের পাথর। ফিওর্ড থেকে এল রাইফেলের আওয়াজ।

'সর্বনাশ!' আঁৎকে উঠল লাবনী। চট্ করে তাকাল দূরে। বিপরীত তীরে কয়েকজন লোক! দু'জন আঙুল তুলে দেখাল ওদেরকে।

খুব কাছের মাটিতে বিঁধল আরেকটা বুলেট। পাথরের কণা লাগল রানা ও লাবনীর মুখে।

'লুকিয়ে পড়ো,' তাগাদা দিল রানা।

'তুমি?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানাকে দেখল লাবনী। ও নিজে হয়তো পাথুরে, পাহাড়ি তীর বেয়ে উঠে যেতে পারবে, কিন্তু ফুটো পা নিয়ে নড়তে পারবে রানা?

'আপাতত এখানেই থাকছি,' বলল রানা। 'রওনা হয়ে যাও।'

'তোমাকে ছেড়ে যাব না!' রানার কনুই চেপে ধরল লাবনী। ওর মাথার চুলের মাঝ দিয়ে গেল কী যেন, পেছনে বিস্ফোরিত হলো একটা পাথর।

'পালাতে পারব না,' হতাশ কণ্ঠে বলল রানা।

টিলার ওপর কয়েকজন লোক, হাতে টেলিস্কোপিক সাইট সহ রাইফেল।

রানার পাশে বসে পড়ল লাবনী। 'রানা?'

'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ...'

এবার এল মেশিনগানের গুলির আওয়াজ। থেমে গেছে রাইফেলের গর্জন। দূরের টিলা থেকে দীর্ঘ চিৎকার করে পড়ল ডেনিয়েলসনের এক লোক। এক শ' ফুট নিচের পাথরে তৈরি হলো অস্বস্তিকর ভেজা আওয়াজ।

'কী শুরু হলো?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল লাবনী।

রানা জবাব দেয়ার আগেই টিলা পেরিয়ে এল নরওয়েজিয়ান আর্মির তিনটে হেলিকপ্টার। কেবিনে দেখা গেল গানার। খাঁড়ির ওদিকে গেল দুই হেলিকপ্টার, অন্যটা নেমে এল রানা ও লাবনীর খুব কাছে।

'এরা এল কীভাবে?' রানার কাছে জানতে চাইল লাবনী।

'হয়তো ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিয়েছে কেউ, নরওয়েজিয়ান কর্তৃপক্ষও জানতে চেয়েছে, কী কারণে এত বিস্ফোরণ হচ্ছে লোভিস ডেনিয়েলসনের এলাকায়।'

লাউড স্পিকারে গমগম করে উঠল একটা কণ্ঠ: 'আপনারা নরওয়েজিয়ান ভাষা জানেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'বাপের জন্মেও ওই ভাষা শিখিনি,' চেঁচাল লাবনী।

'মাথার ওপর হাত রাখো,' ওকে বলল রানা। 'এত কিছুর শেষে গুলি খেয়ে মরে-যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়।'

'ঠিক!' একহাতে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল লাবনী, অন্য হাত মাথার ওপর।

হেলিকপ্টার থেকে র‍্যাপেল করে নেমে আসছে কয়েকজন সৈনিক।

লাবনীর কাঁধে হাত রেখে অপেক্ষা করল রানা।

বত্রিশ

নিউ ইয়র্ক।

দরজা খুলে ক্লান্ত পায়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল লাবনী। ভয়ঙ্কর সব বিপদ শেষ হওয়ার পর পেরিয়ে গেছে পুরো একটা মাস, কিন্তু ক্লান্তি দূর হয়নি ওর।

কিচেন কাউন্টারে একগাদা চিঠির পাশ থেকে তুলে নিল কেতলি। কফি খেলে হয়তো কমবে দুর্বলতা।

জ্বলন্ত চুলায় কেতলি চাপিয়ে সোফায় বসল লাবনী, হাতে তুলে নিল ওর বুকে ঝুলন্ত লকেট।। মনে পড়ছে, গেছে কী দুর্দান্ত সব অভিযানে। আটলান্টিস খুঁজতে গিয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল উন্মাদ

লোভিস ডেনিয়েলসনের সঙ্গে। ভাল হয়েছে মরেছে লোকটা। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তার সব সংগঠন। ভাবা যায়, আরেকটু হলেই ট্রাইডেন্ট ভাইরাসের হামলায় মরত কোটি কোটি মানুষ!

প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল নরওয়েজিয়ান সরকার। তারপর ন্যাটো। পরে সবই গোপন করেছে তারা। সাধারণ মানুষ কখনও জানবে না মৃত্যুর কতটা কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তারা।

খুট্ করে একটা আওয়াজ হতেই ঘুরে তাকাল লাবনী। ভয় পাওয়ার সময় পেল না, খুলে গেছে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা!

'রানা! তুমি কোত্থেকে?'

দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এল রানা। না বলতেই বসল পাশের সোফায়।

'কফি খাবে?'

'তা খাওয়া যায়,' হাসল রানা।

'তুমি না দেশে ফিরেছিলে?' কৌতূহল দূর করতে পারছে না লাবনী।

'ওখানে জরুরি কাজ ছিল। একটু আগে এসেছি।' জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম বের করে বাড়িয়ে দিল ও, 'পড়ো। আমি বানাচ্ছি কফি।'

খাম নিল লাবনী। ফড়াৎ করে ছিঁড়ল এক প্রান্ত।

দুই কাপ কফি নিয়ে ফিরে এল রানা। বসে পড়ল ওর পাশে।

খাম থেকে কাগজ বের করে মন দিয়ে পড়ছে লাবনী। চিঠি শেষ করে চোখ তুলল ও, 'মানে?'

কিছুদিন আগে বিলিয়নেয়ার লোভিস ডেনিয়েলসন যেসব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়েছে, ঠিক একই কাজ করতে পারে অন্য কেউ,

তা-ই ইউএনও চাইছে আন্তর্জাতিক একটা আর্কিওলজিকাল প্রিযার্ভেশন এজেন্সি গড়বে। আর সেই সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দিতে চাওয়া হয়েছে লাবনীকে!

'চিঠিতে যা দেখছ, তা-ই,' হাসিমুখে বলল রানা।

লাবনী বুঝে গেছে, এসবের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে রানার। দেশে ফিরে আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সব কিছু বুঝে নিয়ে সরকার থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ইউএনও-কে। আর সে কারণেই আজ এত সম্মানের চাকরির নিয়োগপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে রানা।

'কাজটা নেবে?' কফিতে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'এত সম্মানের যোগ্য আমি?' ভুরু কুঁচকে ভাবছে লাবনী।

'আমার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইউএনও থেকে ওরা কিছু না জেনে এ প্রস্তাব দেয়নি। আমার মনে হয়, এই সম্মান মাথা পেতে নেয়াই উচিত।'

'ঠিক আছে। তা হলে...'

'গুড!' কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল রানা, দরজার দিকে এগোল। 'চলি তা হলে, হয়তো শীঘ্রি দেখা হবে আবার।'

'চললে!'

'হ্যাঁ, জরুরি কাজ।'

নিজেও লাবনী সোফা ছেড়ে রানার পিছু নিল। ভাবছে, কেমন মানুষ এই মাসুদ রানা? শুধু একটিবার হাত বাড়ালেই চিরকালের জন্যে কৃতজ্ঞ হয়ে যেত লাবনী। কিন্তু হাত বাড়াল না ও। কী করে এমন হয় কেউ?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে রানা।

লাবনীর মন চাইল ডাকবে। বলার অনেক কথা ছিল। কিন্তু কোত্থেকে বুকে চেপে বসল একরাশ অভিমান। একটু ঘুরেও তো

দেখতে পারে লোকটা! মাত্র একবার? তা হলেই তো উড়ে গিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত ও!

সত্যিই সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিষ্ঠুর মানুষটা, জানল না, টপটপ করে অশ্রু নামছে লাবনীর গাল বেয়ে।

(সমাপ্ত)

মাসুদ রানা

মাসুদ রানা সিরিজের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

প্রিয় পাঠক, আগামী মে ২০১৬-তে পূর্ণ হচ্ছে কাজী আনোয়ার হোসেন রচিত, দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী সিরিজ মাসুদ রানা-র গৌরবময় ৫০ বছর। এই অনবদ্য মুহূর্তটি উদ্‌যাপনের জন্য ভক্ত পাঠকদের উদ্দেশে আমাদের বিশেষ নিবেদন:

রহস্যপত্রিকা, মে ২০১৬ সংখ্যায়...

কাজী আনোয়ার হোসেন-এর কলম থেকে রানার আনকোরা নতুন বড়গল্প

অন্তরে পাপ

লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে গিলটি মিয়ার একটা কেসে জড়িয়ে গেল রানা। একদিনেই বেরিয়ে এল আসল খুনি।

সেই সঙ্গে রানার ৫০ বছরের ইতিহাস নিয়ে একাধিক বিশেষ ফিচার, যা থেকে আপনারা জানতে পারবেন সিরিজের বিভিন্ন জানা-অজানা তথ্য, রানার আদ্যোপান্ত।

এ ছাড়াও প্রকাশিত হচ্ছে সুবর্ণ জয়ন্তীর বিশেষ উপন্যাস...

রানা-৪৪৭

দুরন্ত কৈশোর

রচনা: কাজী আনোয়ার হোসেন, সহযোগী: ইসমাইল আরমান

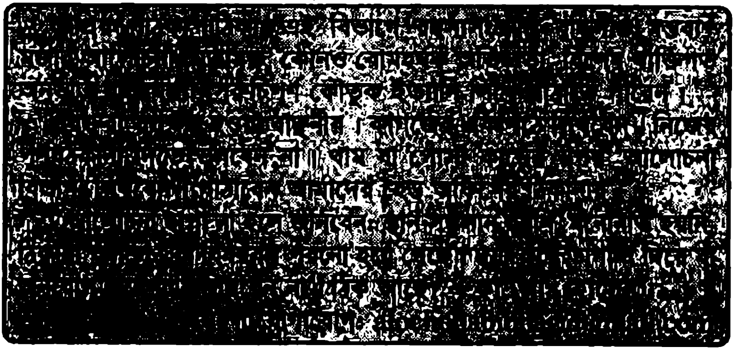
অর্ধশতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে এই বইয়ে প্রথমবারের মত আপনাদের শোনানো হবে রানার অজানা অতীত, তার রোমাঞ্চকর কৈশোরের কাহিনি। সাধারণ এক কিশোরের দুর্ধর্ষ নায়কে রূপান্তরিত হবার অসামান্য উপাখ্যান। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে বইয়ে থাকছে কাজী আনোয়ার হোসেন-এর স্মৃতিচারণমূলক ভূমিকা।

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের এই আনন্দঘন আয়োজনে সবাইকে রইল সাদর আমন্ত্রণ। ধন্যবাদ।

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

আলোচনা



আনিস-উজ-জামান
১৭০ মেরাদিয়া মেইন রোড, ঢাকা ১২১৯। মো: ০১৯৮৫-৯১১০৭৩

প্রিয় কাজীদা,

চিঠির শুরুতে আপনাকে এবং সেবার সকল লেখককে বর্ষার কদম ফুলের, কাশ ফুলের ও পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার অপার্থিব গানের শুভেচ্ছা। আশা করি বর্ষার অসাধারণ দিনগুলো আপনি ও সেবার লেখক ভাইয়েরা বেশ ভালভাবেই উপভোগ করছেন।

কাজীদা, মাসুদ রানা সিরিজের নরকের কীট ১, ২ পড়লাম। কী বলব–অসাধারণ, ফাটাফাটি, অসাম, বিস্ময়কর। এ বইয়ে মাসুদ রানা আর সোহেলের অ্যাকশন ও বীরত্ব বেশ অসাধারণ লেগেছে। বইয়ের কয়েকটি লাইন পড়ে চোখে পানি চলে এসেছে–'হতবাক হয়ে ওকে দেখল জ্যাসিন্টা। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। রানাকে ভাল করেই জানে তানিয়া। মনের জোরের প্রতিযোগিতায় নেমেছে দুর্ধর্ষ বিসিআই এজেন্ট। হয় জিতে যাবে, নইলে মরবে–কোনওটাতেই যেন কোনও আপত্তি নেই। ভেজা কণ্ঠে বলল জ্যাসিন্টা, "রানা মারা যাচ্ছে, আর আমরা...?"' (নরকের কীট ২; পৃষ্ঠা নং ২১০)

কাজীদা, অনুবাদ দ্য ইয়েলো গড, দ্য লায়ন'স স্কিন, তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১৩৪ ও কুয়াশা ভলিউম ১৪ পড়লাম। বইগুলো অসম্ভব সুন্দর ও মন ছুঁয়ে যাওয়া বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

❋ আপনার চিঠি পেয়ে মনটা ভাল হয়ে গেল। সত্যিই এতগুলো মনছোঁয়া ভাল বই লিখেছি আমরা? ...আপনাকে ধন্যবাদ।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩।

রানা পড়ার টান এমন যে তা কোনওভাবেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। এমন হয় যে ব্যস্ততার কারণে পড়ার সুযোগ হয়নি কিছুদিন। হঠাৎ একদিন মনে হয় রানার সঙ্গে কত যুগ যেন হয়ে গেল কোনও মিশনে যাওয়া হয়নি। নেয়া হয়নি অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার ও রোমাঞ্চের স্বাদ। কতদিন পাই না বিপদের গন্ধ। পদে-পদে মৃত্যুর হাতছানি! এমনই অনুভূতির তাড়নায় প্রায় বিকারগ্রস্তের মতই ঘুমে ফাঁকি দিয়ে এক বৈঠকে পড়ে ফেললাম মাসুদ রানা সিরিজের ৪৪১তম বই–শার্প শুটার।

বহু-বহু দিন পরে ফিরে পেলাম রহস্যমোড়া কাহিনি এবং ঠাণ্ডা মাথার অনুসন্ধানী রানাকে। এর সব কৃতিত্বই প্রিয় লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন দা-র। দাদার সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি। প্রতিমাসে রানা চাই। কাজী মায়মুর হোসেনকে বলব বাবার পাশে থেকে বাবার প্রতি খেয়াল এবং নতুন রানা সৃষ্টিতে সহযোগিতা করার জন্য। থ্যাঙ্কস!

❋ আপনাকেও থ্যাঙ্কস... ঠিক তা-ই করছে ওরা দুজন।

সুকর্ণ আহমেদ ও মোঃ নাসির উদ্দিন, মোবা: ০১৭৩৭-৩০৪২৬৫
সার এ. এফ. রহমান হল, রুম নং-৫১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮-১০-০৯ তারিখে দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় হেড লাইনে দেখলাম মায়ানমার সেন্ট মার্টিন দ্বীপ দখল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার। যদি পারতাম তা হলে রানা ও সোহেল হয়ে আমরা ষড়যন্ত্রকারীদের চিরতরে শেষ করে দিয়ে আসতাম।

১৯-১০-০৯ তারিখে সন্ধ্যায় নিউ মার্কেট-এর একটা বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করলাম গুপ্ত আততায়ী। পড়লাম, অসাধারণ লেগেছে। গুপ্ত আততায়ী ১-এ প্রস্তুতি এবং ২-এ আক্রমণ ও অ্যাকশন দেখে সত্যি রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। ভাল লাগার মত দুই খণ্ডের গুপ্ত আততায়ী উপহার দেবার জন্য আপনাকে অসংখ্য প্রজাপতির শুভেচ্ছা।

❋ দ্বীপটা দখল করার প্রস্তুতি কারা নিচ্ছে: মায়ানমার, না ডেইলি স্টার? ...আপনাদের জন্যও শুভেচ্ছা।

জালাল উদ্দিন, মোবা: ০১৭১২-৭২৪৯৭৫
গ্রাম: কামার কাপন, ডাক: কদমহাটা, জেলা: মৌলভীবাজার ৩২০০।

অনেক রানা ভক্তের মত আমিও মাসুদ রানা সিরিজের খুব বেশি ভাললাগা কিছু বই ৬/৭ মাস পরপর কালেকশান থেকে বের করে পড়ি।

'শান্তিদূত' তার মধ্যে একটি। অনেকে জানতে চায়—যতই ভাল লাগুক, একটি বই এতবার পড়লে কি ভাল লাগে? হ্যাঁ, লাগে। আচ্ছা, বস (জনাব কাজী আনোয়ার হোসেন), আপনি কি মাসুদ রানার কোনও বই ৬/৭ বার পড়েছেন? না পড়ে থাকলে 'শান্তিদূত' দিয়ে ট্রাই করতে পারেন।

❋ আমার অত সময় নেই যে!

সানজানা ফারিয়া রিসৃতা

সানজানা ক্লিনিক অ্যাণ্ড নার্সিং হোম, যশোর রোড, রসুলপুর, সাতক্ষীরা।

প্রিয় লেখক,

আপনি আমার চিঠি ছাপিয়েছেন, তাও 'দ্বীপান্তর'-এর মত দুর্দান্ত ফাটাফাটি বইয়ে। তার জন্য আমি আপনাকে যে কী গিফ্ট দেব বুঝে পাচ্ছি না। আপাতত বাক্সভর্তি 'ধন্যবাদ'-ই দিলাম।

আচ্ছা, একটা কথা বলেন তো, সোহেল রানার চেয়ে কোনও অংশে কম? আপনি ইদানীং সোহেলের উপস্থিতি এত কম করে দিচ্ছেন কেন? শুরুর দিকের 'মাসুদ রানা'-তে ওর কত ঘটনা ছিল আর এখন এত কম। সোহেল কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে নাকি? আপনি কি 'সহযোদ্ধা' টাইপের আরও কিছু বই লিখতে পারেন না? যেখানে সোহেলের উপস্থিতি অনেক বেশি থাকবে? প্লিজ, এই ইচ্ছাটা পূরণ করে দিন না!

❋ প্রিয় পাঠিকা,

আপনি বোধহয় অনেক আগেই রানা পড়া বাদ দিয়েছেন। গত দুই-তিন বছরে তো বেশ কয়েকটা বইয়ে এসেছে সোহেল, বড়সড় ভূমিকায়। ওসব বইয়ের নাম জানাতে বলবেন না, আজকাল কোনও নাম মনে থাকে না আমার। ...চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।

শফিক

ধানমণ্ডি, ঢাকা।

শুভেচ্ছা নেবেন। কিছুদিন আগে ঢাকার কোনও একটি বুকস্টলে দেখলাম সেবা'র একটি সিরিজের বেশ কয়েকটি বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা একেবারেই সাদা। অর্থাৎ ছাপা হয়নি। এই কপিগুলো সেই বুকস্টল সেবা প্রকাশনীতে ফিরিয়ে দেবে। আমার প্রশ্ন, এই কপিগুলো দিয়ে সেবা প্রকাশনী কী করবে?

❋ যদি রিসেন্ট বই হয়, ফর্মা থাকলে বাইণ্ডার পৃষ্ঠা বদলে দেবেন। আর পুরনো হলে বই বেশ কিছু জমলে ওজন দরে বেচে দেয়া হবে। ...আমারও শুভেচ্ছা।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই ভি.পি.পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

৩/৫/১৬ আওার ড্রেক'স ফ্ল্যাগ+হেরিওয়ার্ড দ্য ওয়েক+অক্ষ অন আ কমেট
(অনুবাদ ভলিউম) রূপান্তর: অনীশ দাস অপু/কাজী মায়মুর হোসেন

আণ্ডার ড্রেক'স ফ্ল্যাগ/জি. এ. হেনটি/অনীশ দাস অপু: জি. এ. হেনটি আমাদের দেশের পাঠকদের কাছে খুব একটা পরিচিত নাম না হলেও ইনি কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রচনায় হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের চেয়ে কোন অংশে কম নন। বরং অ্যাডভেঞ্চার রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি হ্যাগার্ডের চেয়েও মুনশিয়ানার ছাপ রেখেছেন। তাঁর 'আণ্ডার ড্রেক'স ফ্ল্যাগ' আক্ষরিক অর্থেই একটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে রোমাঞ্চ, উত্তেজনা আর শিহরণ!

হেরিওয়ার্ড দ্য ওয়েক/চার্লস কিংসলে/অনীশ দাস অপু: এটি চার্লস কিংসলের লেখা শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক উপন্যাস। প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। একাদশ শতাব্দীতে হেরিওয়ার্ড বলে সত্যি একজন দুঃসাহসী আউট-ল ছিলেন, যাঁর পদে পদে ছিল বিপদ আর মৃত্যুর হাতছানি। ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা উইলিয়ামের বিরুদ্ধে এলিতে কিছু বিদ্রোহী ইংরেজকে নিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রাজা উইলিয়াম পরবর্তীকালে তাঁকে ক্ষমা করলেও নর্মানরা হেরিওয়ার্ডকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশেলে চার্লস কিংসলে এই মহৎ হৃদয় এবং দুঃসাহসী পুরুষটিকে নিয়ে লিখেছেন অনবদ্য এই কাহিনিটি।

অফ অন আ কমেট/জুল ভার্ন/কাজী মায়মুর হোসেন: ওকী! গহীন বনের আকাশে ওই মশাল জ্বালে কে! বিজ্ঞানী কি তবে বাঁদর হয়ে গেলেন? গোপনে কি গবেষণা করছেন ডক্টর অক্স? শান্তশিষ্ট মানুষগুলো হঠাৎ করে যুদ্ধংদেহী হয়ে গেল কেন? জাহাজটা কি সত্যি ভুতুড়ে? ডুববে ওটা? মাদাম এলকে পাবার আশায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামবেন কাউন্ট চিমাসচেক আর ক্যাপ্টেন সারভাদাক, কিন্তু তাঁদের পরিচিত পৃথিবীটা হঠাৎ করে ষোলোভাগের একভাগ হয়ে গেল কীভাবে? কেন পশ্চিমে উঠছে সূর্য, কেন অস্ত যাচ্ছে ছয় ঘণ্টা পরপর?